# Megh Jochhona

****

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

# মেঘ

# জোছনা

****

ছোট গল্প সঙ্কলন

গার্গী ভট্টাচার্য

লেখিকা ইভা খাসনবীশকে

শ্রদ্ধাসহ,

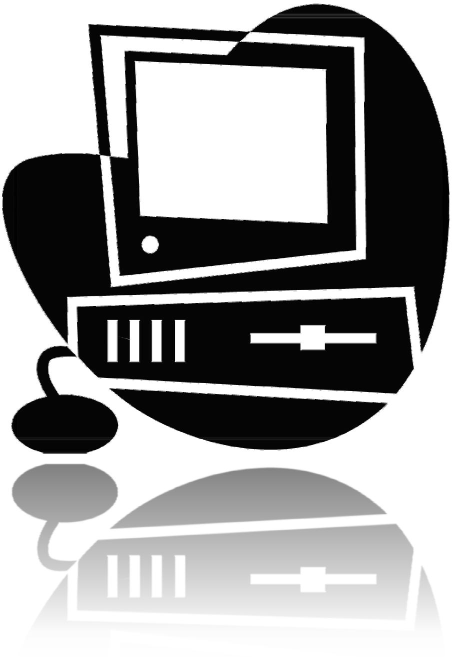

# লাজো ও জোনাকিরা

সুভদ্রার বয়স ৪০ হল । বসবাস দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে । একটু পা টেনে টেনে হাঁটে । ছোট বেলায় পোলিও হওয়াতে পা টা শক্তি হারিয়েছে । পেশায় সে আইনজীবি ।

বাবা ছিলেন আইনজীবি । বাংলা থেকে সুদূর মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন কাজে । এখানেই মুম্বাইয়ের কাছে উল্লাসনগরে বসবাস শুরু করেন । ভদ্রলোক পরোপকারি ছিলেন ।

এতটাই যে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে উনি পরের জন্য কাজ করে বেড়াতেন ।

বিনাপয়সায় সস্তার বার ড্যান্সার ও দরিদ্র মানুষের হয়ে আইনি লড়াই লড়তেন ।

স্ত্রী বিরক্ত হতেন কিন্তু উপায় ছিল না । তিন ভাই বোনের মধ্যে সুভদ্রাই আইন পড়েছিলো । তারপর প্র্যাকটিশ করতো । সেও সফল আইনজীবি । পরে বিয়েও হয় এক আইনজীবির সঙ্গে কিন্তু কিছুদিনের মাথায় ডাইভোর্স হয়ে যায় । লোকটি ছিল মদ্যপ ও লম্পট ।

এখন স্বামীহীনা সুভদ্রা ছোট শহর রেবালাতে থাকে । এই ছোট শহর এক শিল্প শহরও বটে । সদ্য গড়ে ওঠা সাইবার শহর । সুভদ্রা বেশির ভাগ কাজই করে সাইবার ল নিয়ে । ভারতে এই বিষয়ে সচেতনতা কম । লোকে জানেও না অর্থবলও নেই মোকাবিলা করার কাজেই সুভদ্রার আরেকটা কাজ হল সচেতনতা বাড়ানো । এই বিষয়ে একটি কনসালটেন্সি চালায় ও আর ওর এক কলিগ । নিবারণ দাম । সেও বাঙালী ।

সুভদ্রা মাঝে মাঝে ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি জায়গায় বেড়াতে যায় । কিছুদিন তাজা বাতাসে চাঙ্গা হয়ে আবার ফিরে আসে কর্মস্থলে । আছে লুপ্ত সভ্যতার কিছু অংশ । মিউজিক্যাল পিলার বিশেষ দেখার মতন জিনিস । প্রাসাদের এক মন্দির আছে । শিব মন্দির । তার গায়ে অনেক পিলার । সেই পিলারে কান দিলে ও হাত দিয়ে গায়ে বাজালে শোনা যায় সুন্দর মিউজিক । কোনটা সেতারের মতন কোনটা তবলার মতন । সেখানে অনেক সাহেব ও মেমসাহেবেরা আসে ছুটি কাটাতে । প্রাকৃতিক পরিবেশে কেটে যায় কটাদিন । কাছেই আছে এক স্যাঙ্‌চুয়ারি । সেটাও দ্রষ্টব্য । সুভদ্রা এখানে এসে বেশ কটা দিন কোনো কোনো সময় এক সপ্তাহ কাটিয়ে যায় । সঙ্গে আসে ওরই অ্যাপার্টমেন্টের আরেক বান্ধবী হেমা । হেমার স্বামী থাকে মধ্যপ্রাচ্যে । একটি মুসলিম দেশে যাবেনা বলে গোঁড়া হেমা সন্তানদের নিয়ে এখানে থাকে । যদিও সে ঘরে থাকে তবুও তাদের ফ্ল্যাটে গৃহবধূ বলে কোনো কনসেপ্ট নেই । বিশাল ফ্ল্যাট । সেখানেই সবজির দোকান, ক্রেশ, বয়স্কদের হোম, লাইব্রেরি, জিম, বুকস্টোর, মেডিসিন শপ, কাফেটেরিয়া । সেইসব চালায় এই ফ্ল্যাটের হোমমেকারগণ । কাজেই কেউ গৃহবধূ নন । হেমাও একরকম এক কর্মী । ওদের ডিউটি রাউন্ডে হয় । রাতে ২৪ ঘন্টার মেডিসিন শপে হেমা ডিউটি দিলে ওর বাচ্চারা থাকে সুভদ্রার সঙ্গে । সুভদ্রার নিজের একটি সন্তান আছে, কন্যা সন্তান । নামটা অদ্ভুত ভৈরবী । সুভদ্রাই রেখেছে । সুভদ্রার কেন জানি ভৈরবী, চামুন্ডা, ধূমাবতী এই নামগুলি ভারি ভালোলাগে । বেশ একটা শক্তির আবেশ পাওয়া যায় এইসব শব্দ শুনলে ।

এই দিওয়ালিতে সুভদ্রা ও হেমা ছেলেপুলেদের নিয়ে গেছে বেড়াতে সেই পাহাড়ি প্রদেশে । আজমনগরম্‌ । আছে প্রাচীন রাজবাড়ির ভগ্নাংশ । পাথর ও কাঠের প্রাসাদ । দুরে কৈরি নদী । মিউজিক্যাল পিলার, শিব মন্দির । স্যাঙ্‌চুয়ারি । সবুজের আহবান । রাজবাড়ির কাছে

টুরিস্টদের জন্যই গড়ে উঠেছে নানান দোকান পাট । আর ছোট ছোট কাঠের দেওয়াল ও টিনের চাউনি দেওয়া খাবারের দোকান ।

এরকমই একটি দোকান চালায় হেনরি । হেনরি ফ্রেঞ্চ । এখানে ও এসেছিল বেড়াতে । আসলে সারা ভারত ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ে আর কোনো অজ্ঞাত কারণে তার এই জায়গা ভালো লেগে যায় । এখানেই সে থাকতে আরম্ভ করে ও ব্যবসা ফেঁদে বসে ।

বেশি কাস্টমার সাহেব । অনেক চীনা পর্যটকও আসে ।

ওর দোকানে বেশ সুস্বাদু খাবার মেলে । ফ্রেঞ্চ বলে কথা ।

ওর কুচকুচে কালো, পৃথুলা দেশি বৌ একমনে তদারকি করে চলে দোকানের খাবার দাবারের । সুভদ্রা এলে এখানেই ডিনার ও লাঞ্চ খায় । ব্রেকফাস্ট হোটেলে খেয়ে নেয় । পাহাড়ের গায়ে তাঁবু । সেগুলোই হোটেল । এয়ার কন্ডিশনড্ হোটেল । এলাহি ব্যবস্থা তাঁবুর ভেতরেই । পাশে খাদে গোলাপের চাষ ।

ইদানিং এই হেনরির দোকান মোঁপাসাতে এলে ও দেখতে পায় একটি কুচকুচে কালো রমণী বেশ গ্রাম্যধরণের শাড়ি পরা, বাসন্তী রঙের শাড়ি যা কালোরূপে এক ঝলক এনেছে, মাথার চুলগুলোতে রূপোর তার জড়ানো মনে হচ্ছে এমনভাবে পেকেছে চুল, রূপার খাড়ু, নথ ইত্যাদি কপালে বড় লাল সিঁদুরের টিপ বেশ স্মার্টলি বসে মেমসাহেব সাহেবদের সঙ্গে চা পান করছে ও খিল খিল করে হাসছে । কয়েকবার লক্ষ্য করেছে সে । শেষে একদিন হেনরির বৌকে জিজ্ঞেস করলো আড়ালে গিয়ে এই মেয়েটি কে । সুভদ্রা হেনরির দোকানের একজন বাঁধা ধরা খদ্দের বেড়াতে এলে এখানেই আসে তাই ওকে ওরা খাতিরও করে । হেনরির বৌ রুকমা জানালো যে মেয়েটি ফরচুন টেলার । কপাল দেখে বলে দিতে পারে কার কী ভবিতব্য । শুধু তাই নয় ওর ললাটে ভেসে ওঠে ওম্ শব্দটা । নিজের থেকেই ভেসে ওঠে । একবার স্থানীয় এক নাস্তিক ওকে ধরে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করে যে ওর এইসব বুজরুকি কিনা । কিন্তু পরীক্ষা করেও ওর কপালে কোনো গুপ্ত চিপ কিংবা অন্য কিছু পাওয়া যায়নি বরং নার্স ও ডাক্তারের পূর্ব জীবনের কিছু কথা ও বলে দেয় যা শুনে ওরা চমকিত এবং নাস্তিক ব্যাক্তিটির উপপত্নী কেমন আছে জানতে চায় লোক সমক্ষে তাতে সেই যে লোকটি গা ঢাকা দেয় আর ওকে কেউ দেখেনি ।

- ইন্টেরেস্টিং ! সুভদ্রা মৃদু হেসে ওঠে ।

- মেয়েটি আগে এখানে ছিল না কোথা থেকে এসেছে কেউ জানেনা । যা বলে মিলে যায় তাই ওকে নিয়ে এত কৌতুহল ।

- কী মিলেছে ?

- অনেক কিছু, এক সাহেব তো ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো সুদূর বেলজিয়ামে । সেখানে ব্যবসা ফাঁদবে বলে কিন্তু ও রাজি হয়নি । এই দেখো এত কথা বললাম ওর নামটিই বলা হয়নি । ওর নম লাজো । আমরা ওকে সবাই লাজো বলেই ডাকি ।

সুভদ্রার খুব অবাক লাগে । আজকালকার যুগে মানুষ ফরচুন টেলারকে নিয়ে এত মাতামাতি করছে ? লাজোকে সে বেশ কয়েকবার দেখেছে ।

বেশ একটা সপ্রতিভতা আছে ওর মধ্যে । সুভদ্রা লোক চরিয়ে খায় । কাজেই লাজোকে দেখে বুঝতে পারে যে একটি সরলতাও ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে । যেমন পাথরের খাঁজে ফুটে থাকে নামহীন ফুল ।

সুভদ্রা ভাবলো একবার ওকে মিট করবে কারণ ওর নিজের ভাগ্যটা জানার অদম্য কৌতুহল না থাকলেও মহিলাকে কালটিভেট করতে চায় । হেনরির মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্ধশিক্ষিত বৌ যে ওর সঙ্গে ফ্রান্সেও ঘুরে এসেছে তার কাছ থেকে জেনে নিলো কখন লাজোকে একা পাওয়া যাবে । জেনে নিয়ে সেই মতন স্থির করলো সে দোকানে আসবে । রুকমা অর্থাৎ হেনরির বৌ জানালো যে লাজো সাধারণত এখানে কোনো কাস্টমারের সঙ্গেই আসে । একা আসেনা। তবে একা পাওয়া যেতে পারে ঐদিকে । মন্দিরের দিকে । ওখানে কৈরি নদীর ধারে সে অনেকটা সময় কাটায় ।

দিনে না গিয়ে সুভদ্রা রাতেই গেলো । পূর্ণিমার রাত চারপাশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে ।

কৈরি নদীর পাড়ে বালি, তার ওপাশে মন্দির । মিউজিক্যাল পিলারে হাত রেখে বাজনা শুনছে লাজো । পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে লাজোর দিকে ।

আজ সে পরেছে লাল শাড়ি ঘাগড়ার মতন করে । রূপার অলঙ্কারে ভরানো শরীর । গুন গুন করে কী একটা গান গাইছে । বোধহয় কোনো ফোক সং ।

- লাজো, সুভদ্রার কন্ঠস্বর শোনা যায় ।
- জী ?

বাকি কথা বাংলায় তর্জমা করে লেখা ।

- আমি তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই ।
- আমার সঙ্গে ? কেন ?
- এমনি । তোমায় প্রায়ই দেখি হেনরির দোকানে তাই ।
- হ্যাঁ ওখানে আমি যাই । মানে যেতে হয়, কাস্টমারদের সাথে ।
- তুমি কি গণৎকার ?
- আমি কপালে লেখা দেখতে পাই ।
- কী দেখো ?
- অনেক কিছু ।
- এই শক্তি কি তোমার ছোটবেলা থেকেই আছে ?
- নাহ্ ! পরে হয়েছে । কিন্তু মেমসাহেব আপনার মতন মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি । আপনার আছে একটি উজ্জ্বল আলোর মালা আর একটি শক্তি আপনাকে ঘিরে রেখেছে যা সত্যি শক্তিমান ।

সুভদ্রা বেশ অবাক হল । উকিলের জেরার মতন নাহলেও আস্তে আস্তে জেনে নিতে লাগলো ওর এই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা । জানলো লাজো আদতে রাজস্থানি ।

আজমেরের কাছে এক গ্রামে ওর জন্ম । বিয়ে হয়েছিলো মাত্র ৪ বছর বয়সে।

বৈধব্য ১৭ বছরে । ১৬ বছরে একটি সন্তানের মা হয়েছিলো সে। কন্যাসন্তান ।

কিন্তু মরুভূমির ভয়ানক বালি ঝড়ে একদা সেই মেয়েকে হারায় । তাতে দু:খ হলেও ক্ষোভ ছিলনা । কারণ তার কাছে থাকলেও বা কি হত ? খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যেতো । তারপর অদ্ভুত জীবন । হয়ত বৈধব্যও । সারাটা জীবন একাকীত্ব । গ্রামের কারো কুনজরে পড়লে ধর্ষণ । লাজো সন্তান হারানোতে দু:খিত হলেও যেন একপ্রকার আশীর্বাদ ওর কাছে এটা । যেখানেই থাক সুখে থাক দু:খে থাক সে তো দেখতে যাচ্ছে না !

- তুমি তো কপাল দেখতে পাও তা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কপাল দেখতে পাওনি ? কোথায় তোমার মেয়ে ?

- হা হা হা হা ! একচোট হেসে নেয় লাজো । তারপরে মিহি স্বরে বলে ওঠে

- বঁচে বর্ত্তে আছে । আছে সুখী গৃহকোণে ।

সুভদ্রা হাসিতে যোগ দেয়না, দিতে পারেনা । ওর কন্যাকে ছেড়ে ও কিন্তু থাকতে পারেনা । ওর খুব কষ্ট হয় ।

রাত বেড়ে গেছে সেদিনের মতন সুভদ্রা নিজ নিকেতনে পা বাড়ায় । পা টেনে হাঁটে বলে ওর একটু সময় লাগে পৌঁছতে । মেয়ে ওকে দেখেই জড়িয়ে ধরে ছুট্টে এসে । তারপর দুজনে অনেকক্ষণ আদর সোহাগ চলে । পরদিন ভোরে কি মনে করে সুভদ্রা একা একা আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে ঘুরছিলো । পাখির কুজন আর ঠান্ডা হাওয়ায় বেশ লাগছিল । সাধারণত অন্য সময় তো এইভাবে প্রকৃতির কোলে ঘোরা হয়না, জেট জীবন মানেই দৌড় । ওকে খোঁড়াতে খোঁড়াতেও দৌড়াতে হয় ।

লাজোকে দেখতে পেলো । লাজো নিজের মনে গুন গুন করতে করতে আসছে ।

সুভদ্রার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো । মুখে ছড়িয়ে গেলো হাসি । ভোরের চিকন রোদের মতন ।

- কী খবর ?

- খবর ভালই, তোমার খবর কী ?

- আমিও ভালই ।

- কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

- এই একটু এদিক ওদিক ঘুরছি । শহরে এই অবকাশ তো হয়না ।

- আজকে রাতে চলে এসো ঐখানে আবার গল্প হবে । কতদিন আছো এখানে ?

- তুমি তো জ্যোতিষী তুমিই বলো ।

হা হা হা করে হেসে উঠলো লাজো । তারপর বললো -- কাল চলে যাবে তো তাই না ?

মিষ্টি হেসে সুভদ্রা আলতো করে হ্যাঁ ছুঁয়ে দিলো ।

লাজোর পায়ে পায়ে জড়িয়ে মিষ্টি আলো ঢাকা পড়ে গেলো গুলমোহর গাছের আড়ালে । লাজো চলে গেলো । ওর যাওয়া আসা দুটে বড় অদ্ভুত । যেন এক দমকা বাতাস ।

গোধুলি হতেই সুভদ্রা পা বাড়ালো লাজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে । চারিদিকে অন্ধকার জেঁকে বসেছে । সদ্য পূর্ণিমা গেছে তাই অল্প আলো আছেই ।

লাজো আজ সাদা চোলি গোছের কিছু পড়েছে । লাজোর মাথায় সাদা ফুল ।

বেণী বেয়ে দু একটা অসতর্ক ফুল পড়ে যাচ্ছে । চারপাশের ঝরে আছে সাদা থোকা থোকা বুনো ফুল ।

এই শ্বেত শুভ্র প্রান্তরে লাজো শুরু করলো আরেক কাহিনী ।

মেয়েকে হারানোর পরে সে থাকতো একা । স্বামী তো গত হয়েছিলেন । গ্রামের কিছু যুবকের কুনজরে পড়লো । অন্ন সংস্থান হত এক বড়লোকের বাড়ির স্ত্রীর সঙ্গদান করে । ভদ্রমহিলার ব্যবসায়ী স্বামী ভীষণই ব্যস্ত । মহিলাটি এককীত্বে ভুগতো । লাজোকে মাইনে দিয়ে রেখেছিলো সঙ্গী করে । ওর সুন্দর কথাবার্তা ও নম্র স্বভাব দেখে মালকিন খুশি হয়ে মাইনে দ্বিগুণ করে দেন ।

এইসময় এক পুর্ণিমা রাতে লাজো একা একা নিজ গৃহে ফিরছিলো ।

এমন সময় একদল ছেলে এসে ওকে তুলে নিয়ে যায় গ্রামের শেষপ্রান্তে এক খামার বাড়িতে । ওকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ও রক্ষা পেয়ে যায় । কারণ ওকে যখন বলাৎকারের চেষ্টা করা হচ্ছিলো তখন নাকি ওর দেহ থেকে ইলেকট্রিক শক্ বেরোচ্ছিলো । তাতেই ছেলেগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে যায় । লাজো ছেঁড়া পোশাকে বসে থাকে । পরে ঘরে ফেরে কিন্তু এই শকের কথা গ্রামে রটিয়ে দেয় ওরা । বলে লাজো অপয়া, লাজোকে বিদেয় করো ।

কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই লাজোর নিজেরই এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় ।

ও যেন কেমন অন্ধকারে জোনাকি জ্বলার মতন বিন্দু বিন্দু আলো দেখতে পায় । আলোগুলো জুড়ে জুড়ে বড় বড় ছবি হয়ে যাচ্ছে । সেই ছবি চলমান ।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে নানান ঘটনা । ও ওর বাবাকে দেখতে পাচ্ছে, মা কে, ওর হারানো মেয়েকে । মেয়ে ঘুমিয়ে আছে মাটিতে । পরণে মলিন পোশাক, মাথার চুল এলোমেলো । মেয়ের গলায় ওর পরিয়ে দেওয়া লাল নীল পুঁথির মালা ।

লাজো বুঝতে পারে যে ওর চেতনায় কোনো ঐশ্বরিক শক্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে ।

ও নিয়মিত অন্ধকারে জোনাকি দেখতে পায় । জোনাকিরা জমাট বেঁধে আলোর মালা হয়ে ভেসে যায় ঘটনার আকারে যেন ছায়াছবি ।

ওর দেহে এক অপার্থিব শক্তির জাগরণ হয়েছে ।

তারপরে ও পথে পথে ঘুরতে শুরু করে । ওর নাম ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ নারী রূপে । লোক আসতে থাকে । অনেক তদন্তের জন্যে অনেক সময় পুলিশ এসেও ওর সাহায্য নিয়েছে । ওর বিশেষ দেখতে পারার ক্ষমতার জন্যে । অনেক অপরাধী যারা লুকিয়ে ছিলো তারা ধরা পড়ে গেছে, অনেক খুনের আসামীকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে লাজোর সহায়তায় । তারপর লাজো এখানে, ওখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পড়ে এই স্থানে । এই নিরালা ওর ভালোলাগে । এখানেও টুকটাক ক্ষমতা দেখায় । মোলাকাৎ হয় সাহেবদের সাথে ।

এই পর্যন্ত শুনে হাসলো সুভদ্রা। বললো : খুব অদ্ভুত তোমার কথা। খুব অদ্ভুত। নিজে তোমার সঙ্গে পরিচিত নাহলে আমি এগুলো বিশ্বাস করতাম না।

তোমার কি আর কোনো ক্ষমতা জন্মেছিলো ?

লাজো হেসে বললো, হ্যাঁ। আমি লোকের রোগ ভোগ সারাতে পারি।

কিন্তু আমি কাউকে ডাকি না। কেউ নিজে থেকে এলে তখন আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করি।

- তোমার কোনো চেলা নেই ?

- একজন চেলা আছে। সে আগে ড্রাগস্ নিতো। ঝিমিয়ে পড়ে থাকতো। হিপি লোক। কিন্তু আমি ওর চোখে দেখেছিলাম নীল আলোর খেলা। তাই ওকে শিষ্যত্বে বরণ করি। এখন সে লোকের রোগ সারায়। তবে ওর ক্ষমতা কতদিন থাকবে জানিনা কারণ ও ব্যবসায়িক ভাবে ওর বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করছে।

  এইসব শক্তি টাকাপয়সা দিয়ে বিক্রী করলে বেশি দিন চালানো যায়না।

- কেন তুমিও তো টাকা পাও সাহেবদের কাছ থেকে।

- তা পাই কিন্তু সে অন্ন সংস্থানের জন্য আর ওরা খুশি হয়ে দেয়। আমি ব্যবসা করিনা।

  আরো কিছু কথা হল। তারপর সুভদ্রা চলে যাবার সময় হঠাৎ নিচু হয়ে ওর পায়ে হাত দিয়ে লাজো বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠলো।

- যা যা দৌড়া ! যা যা যা --ওরে যা রে মেয়ে --

সুভদ্রা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। লাজোর চোখ মুখ বদলে গেছে। লাজো আরো জোরে চেঁচাচ্ছে -- দৌড়া, দৌড়া !

সুভদ্রা খানিকটা কিছু না বুঝেই দৌড়বার চেষ্টা করলো। পারলো না।

লাজো হাসছে। আবার চোখমুখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সুভদ্রা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে।

আলোময় দিন। চারপাশে খুব আলো। ওর ঈষৎ রোগা ডিগডিগে পায়ে যেন হঠাৎ ভীষণ বল এসে গেছে। ও পা টা মাটিতে সোজা করে রেখে দেখলো ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ওর পা টা সোজা হয়ে গেছে। পায়ে খুব জোর এসে গেছে। সুভদ্রা সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে ! সুভদ্রা ভালো হয়ে গেছে। সুভদ্রার পা ভালো হয়ে গেছে !

: প্রাণিক হিলিং - মদু স্বরে উচ্চারণ করে ভ্রূ পল্লবে ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো সুভদ্রা। দূরে লাজো মিচকি মিচকি হাসছে। লাজোর চোখ মুখ ভীষণ উজ্জ্বল। আলোর শেষে অন্ধকারে জোনাকিরা জমাট বেঁধেছে !

লাজো ও জোনাকিরা। তারাই বদলে দিলো সুভদ্রার জীবন। সুভদ্রা এখন সুস্থ। হেঁটে চলে বেড়ায় নর্মাল মানুষের মতন। নিজের জীবনে এই অভিজ্ঞতা না হলে সে কোনদিন বিশ্বাস করতো না এইসব। লাজো বলেছিলো যে এটা সে এমনি করেনি। সে স্বার্থপর। সে তো মা। তাই জোনাকিরা দেখা দিলেও সন্তানের সুখ দু:খ যাঁর হাতে তাকে সে অবহেলা করতে পারেনা। অতিমানবী হয়েও সে মানবী। কারণ সে একজনের মা।

আর তার মরুঝড়ে হারানো মেয়ে, সুভদ্রার অনাথ আশ্রম থেকে পাওয়া মেয়ে ভৈরবী যে একই । হ্যাঁ ভৈরবীকে একাকিনী সুভদ্রা তুলে এনেছিলো অনাথ আশ্রম থেকে ।

- ভৈরবীকে তুমি দেখতে চাওনা ?
- ওকে আমি রোজই দেখি । যখন জোনাকিরা জমাট বাঁধে ও আলোর মেয়ে হয়ে আমার সামনে আসে ।

সুভদ্রা জানে যে সত্যি তখন ভৈরবী আসে । ভৈরবীকে আসতেই হবে । কারণ ও যে লাজোর মেয়ে ! ওকেও জোনাকি হতেই হবে । কেউ মানুক আর নাই মানুক ।

অন্ধকার হয়ে এলেই ভৈরবী জোনাকি হয়ে উড়ে যায় তার হারানো মায়ের আঁচলে । লাজোর কাছে ।

---

# নাড়ী

মেয়েটির নাম জোছনা । জ্যোৎস্না নয় জোছনা । জন্ম এক বেওয়ারিশ লাশকে কবর দেওয়া মানুষের ঘরে । জোছনায় যখন ভেসে যাচ্ছিলো চরাচর তখনই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো জোছনা ঘরোয়া উপায়ে দাইমার হাতে তাই তার বাবা নাম রেখেছিলেন জোছনা । কেউ জ্যোৎস্না বললে ও তাকে শুধরে দিতো । এহেন জোছনা অনেক কষ্টে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা শেষ করলো । অ্যালোপ্যাথি পড়তে পারেনি অর্থের অভাবে । তাই পড়লো কবিরাজি ।

ওর বাবা কাজ বলতে করতেন শবদাহের কাজ । আর তাঁর শখ ছিলো বেওয়ারিশ লাশকে কবর দেওয়া । অদ্ভুত এক শান্তি পেতেন উনি এই কাজ করে । সংসারের যাবতীয় খরচ চালাতে হত শবদাহ করার মাইনে থেকে । কখনো কখনো বড়লোক ক্লায়েন্ট হলে কিছু উপরি রোজগার হত । নাহলে টানাটানির সংসার ছিলো তাঁর । মেয়ের কৃতিত্বে বাবা খুব খুশি হলেন । মেয়ে কিছুদিন হাসপাতালে কাজ করে নিজের একটি ছোট চেম্বার খুলে বসলো । নাম দিলো নাড়ী । কারণ তার মতে ভেষজ চিকিৎসা শাস্ত্রে নাড়ী ধরে মানুষের সমস্ত রোগ ব্যাধির হদিস পাওয়া যায় । এ এক ম্যাজিক যেন । তাই ক্লিনিকের নাম হল নাড়ী ।

আমি বহুদিনের ডায়বেটিস রুগী । একদা গেলাম মেয়েটির কাছে এক বন্ধুর মাধ্যমে খোঁজ পেয়ে । অল্প বয়সী, শ্যামা, ছিপেছিপে গড়ণের মেয়ে । জোছনা নাম হলেও রং কালোর দিকেই । খুবই নম্র । আমাকে চেম্বারের এক কোণায় বসতে দিলো । দেখলাম সে প্রেগন্যান্ট ।

পেটটা উঁচু হয়ে আছে । আমার নাড়ী পরীক্ষা করে সে বললো : আপনার শরীরে ডায়বেটিস মাঝারি আকারে বাসা বেঁধেছে । আপনাকে নিজের প্রতি যত্নশীল হতে হবে ।

আপনার পিত্তের প্রকোপটা বেশি । সেদিকে একটু নজর দিতে হবে ।

তারপরে আমার সমস্ত কষ্ট ও পুরাতন যত ব্যাধি হয়েছে প্রায় সবগুলির ফিরিস্তি দিতে লাগলো । বললো সব নাকি নাড়ী ধরে বোঝা যাচ্ছে ।

সম্ভবতঃ তারাশঙ্করের কাহিনী নিয়ে তৈরি আরোগ্য নিকেতন সিনেমাটির কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিলো । জীবন্ত এক মশাইকে দেখবো ভাবিনি । অবশ্য ইনি মশাই নন, মহীয়সী ।

আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার হল মেয়েটির বিয়ে হয়নি কিন্তু সে গর্ভবতী । পরে শুনলাম সে গর্ভভাড়া দেয় । সারোগেট মাদার । এতে তার কিছু উপার্জন হয় যার অনেকটাই সে দান করে দেয় অনাথ আশ্রমে ।

জোছনা করেছে আড়ি, আসেনা আমার বাড়ি, গলি দিয়ে চলে যায় ---

বহু পুরনো একটি গানের কলি আওড়াচ্ছি সে বললো : এই গানের মানে কী ?

বললাম । তখন সে বললো : জোছনা তোমার সঙ্গে আড়ি করেনি বন্ধুত্ব করেছে ।

তা বন্ধুত্বই বটে । আমার নাড়ী ধরে সমস্ত নাড়ি নক্ষত্র বলে দেওয়া ও তার জন্য ওষুধ ও নিদান দেওয়া প্রকৃত বন্ধুরই লক্ষণ । কারণ সে অর্থ নিতো খুবই কম ।

বলতো : তুমি আমার বন্ধু, অর্থ নেবো কি হে ?

জোছনার চেম্বারের পাশেই মাংসের বিরাট দোকান । মিট মার্ট ।

আমাকে সে নিরামিষে জোর দিতে বলেছিলো । তবুও বাঙালী বলে কথা !

লোভে পড়ে একদিন মাংস কিনে নিলাম । বাড়ি গিয়ে কষে আলু ফালু দিয়ে রান্না করে খেলাম । কিছুদিন পরে তার চেম্বারে গিয়ে হতবাক । আমাকে জিজ্ঞেস করলো কী কী খেয়েছি ।

বললাম : সবজি, ভাত ইত্যাদি ।

ও চোখ ছোট করে জানতে চাইলো : মাংস খাওনি ?

- নাতো ।

- সত্যি বলছো তো বন্ধু ?

- হ্যাঁ । ( চোখের চামড়া নেই আমার এক বিন্দুও )

- তাহলে শুনে রাখো তোমার নাড়ী কিন্তু বলছে তুমি মাংস খেয়েছো ।

আমি হতভম্ব । এত অপদস্থ জীবনে কোনদিন হইনি । ঘোর কলিতে মিথ্যাচার করিনা বললে চরম মিথ্যাভাষণ হবে তবে এরকম হাতেনাতে ধরা কোথাও পড়িনি ।

এইভাবেই ছোটখাটো মিথ্যে ও সত্য দিয়ে গড়া উপাখ্যান সম্বল করে এগিয়ে যেতে লাগলাম জোছনা মাখা পথে । আস্তে আস্তে আমার শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো । আমি লিখি ও একটি ওয়েবজিন চালাই শুনে আমাকে অনুরোধ করলো ভেষজের গুণাগুণ নিয়ে লিখতে । গল্পাকারে । যাতে সাধারণ মানুষ সেগুলি পড়ে বিভিন্ন উপকারিতা সম্বন্ধে জানতে পারেন ইত্যাদি । মাঝখানে আমার খুব শারীরিক অসুবিধে হওয়াতে বললো : তুমি অতীতে বাস করছো, বাস করো বর্তমানে । তুমি তোমার গল্পের চরিত্র হয়ে যাচ্ছো, ইউ আর লিভিং ইওর ক্যারেকটার্স, লিভ ইওর ওন লাইফ ----সবই বললো শুধু নাড়ী পরীক্ষা করে ।

সুক্ষ্ম ভাবে বিচার করে দেখলাম যে কথাটা ঠিকই বলেছে জোছনা ।

একবার সে খুব গল্প করছিলো । বলছিলো : আমার বাবা তো কবর দিতেন । বেওয়ারিশ লাশের ঠিকানা লাগানো ওঁর কাজ ছিলো । বেশ আনন্দের সঙ্গেই এই কাজ করতেন উনি । যেন কোনো বিশেষ ধরণের সমাজ সেবা করছেন । কত রকমের ঘটনা দেখতাম । মনে পড়ে,একবার দেখেছিলাম এক ধনী বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিলো ফুটপাথে পড়ে । বাড়ির লোক বহুদিন যাবৎ-ই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলো, একা থাকতেন কিন্তু মারা যাবার পর কোথার থেকে খবর পেয়ে তাঁরা ছুটে আসে । যদি সম্পত্তির কিছু অংশ হাতানো যায় ! আবার আরেক মহিলার পুত্র কন্যারা কবর দানের পরে এসে মৃতদেহ খোড়ার ব্যাবস্থা করেন ও নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করেন কে দেহটা নিয়ে যাবেন । তবে সবথেকে মজার ঘটনা হল একবার এক ব্যাক্তিকে সৎকারের জন্য আনা হলে জোছনা নাড়ী ধরে দেখে যে ব্যাক্তি জীবিত । তখন সেই বেওয়াড়িশ লাশকে কবর না দিয়ে পাঠানো হল হাসপাতালে । এইরকম নানান টুকিটাকি ঘটনা শুনলাম ।

জোছনার বাবার অবসেশান ছিলো মানুষ কবর দেওয়া । অনেক সময় নিজের গ্যাটের সামান্য টাকা খরচ করেও উনি কবর দেবার ব্যবস্থা করতেন । বলতেন : ভগবান খুশি হবেন ।

একবার এক উন্মাদ ম্যানহোলের মধ্যে দিয়ে নরকের রাস্তা খোঁজার জন্য যাত্রা করে । কিছুটা গিয়ে সে আটকে যায় ও চোকড্ হয়ে মারা যায় । তাকে তুলে এনে কবর দেওয়া হল । কিছুদিন পরে লোকজন বলতে লাগলো যে তার অতৃপ্ত আত্মাকে দেখা যাচ্ছে । কে নাকি রাস্তার ম্যানহোল খুলে রাতে উঠে আসে ও পর পর সমস্ত ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে রাখে । কেউ কেউ পা হড়কে পড়েও গেছেন । সেই নিয়ে তদন্ত হল ।কোনো কিনারা করা গেলোনা । ভাবলাম এইসব কাহিনী নিয়ে একটি গল্পের সিরিজ লিখবো কিন্তু ব্যাক্তিগত কারণে শহর ছাড়তে হল । অনেক বছর পর্যন্ত জোছনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো না । আমি শিলং এর একটি ম্যানজমেন্ট কলেজের কাছে থাকতাম । পতিদেব ওখানে ম্যানেজমেন্ট পড়াতেন । কলেজের একটি চার্চ ছিলো । সেখানে কিছু ব্রাদার ও নান থাকতেন । আমি ওখানে প্রবেশের সুযোগ পেতাম । বাইরের লোকের প্রবেশাধিকার ছিলোনা । ওখানে রোজমেরি বলে একজন নান ছিলেন । আমার সঙ্গে বেশ ভাব ছিলো । পূর্বাশ্রমে উনি হিন্দু ছিলেন বলে শুনলাম । নাম ছিলো ছায়া । আগে কেরালায় ছিলেন । একটি চার্চে থাকতেন কিন্তু বহু পাদ্রী দ্বারা ধর্ষিত বিভিন্ন নানদের কাহিনী পুস্তকারে লেখার জন্য রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হন । এসে পৌঁছান শিলং । এখানকার পাহাড়ি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন যীশুর বাণী, মানব প্রেম ।

ওঁনার পিতা হিন্দু হয়েও কবর দিতেন । যীশু প্রেমে মাতোয়ারা না হয়েও । ছিলেন অত্যন্ত উচ্চস্তরের মানব সন্তান । বলতেন : সবাই স্বার্থপর হলে জগৎ চলবে কী করে ?

এই কবর দেবার কাজটা কাউকে না কাউকে তো করতে হবেই ।

স্বার্থান্বেষীদের বোঝা উচিৎ যে স্বার্থ দ্বারা চালিত হতে হতে একটা সময় আসবে যখন পুরো সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে । তাঁদের ছেলেমেয়েরাও সেই বিনাশের কবলে পড়বেন ।

সাচ্চা মানুষ, অসাধারণ জীবন বোধ । বলতেন : আমি নিছক কবর দাতা । দেহকে কবর দিই, আত্মায় আমার অধিকার কোথায় ??

রোজমেরির একটি সহোদরা ছিল, নাম জোছনা, বাবা সাধ করে একজনের নাম জোছনা ও অন্যজনের ছায়া দিয়েছিলেন কারণ ছায়া জন্মেছিল এক বর্ষণ মুখর রাতে যখন গগনে গগনে ডেকেছিলো দেয়া ।

জোছনা, নিজের উদ্যোগে ডাক্তারি পড়ে তবে কবিরাজি, কারণ তাঁদের সেই আর্থিক ক্ষমতা ছিলো না চিরাচরিত অ্যালোপ্যাথি পড়ার আর ভেষজ বিদ্যা তো বহু পুরাতন তুলনায় অ্যালোপ্যাথি নবীন বিজ্ঞান ।

মেয়েটি সারোগেট মাদার হয় অনেকবার, একধরণের সমাজ সেবা । যেইসব মেয়েরা মা হতে অক্ষম তাঁরা রোজমেরির সহোদরার গর্ভ ভাড়া নিতো । সাধারণত সারোগেট মায়ের আইডেন্টিটি গোপন থাকে । কিন্তু এই মেয়েটি নিজে ডাক্তার ও নাড়ী বিশারদ কবিরাজ হওয়ায় লোকে পরেও এঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতো । বাচ্চাদের নাড়ী টিপে সে বলে দিতে পারতো ভূত ভবিষ্যৎ । একদিন জরায়ুর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । রোগ ধরা পরে একদম শেষ স্টেজে । কিছু করার ছিলনা । হয়ত বহুবার গর্ভভাড়া দেবার কারণেই এই রোগ । সেই ব্যাপারে রোজমেরি অন্ধকারে ।

নাড়ী বিশেষজ্ঞ নিজের নাড়ী পরীক্ষার বোধহয় কোনোদিন সময় পাননি !

তাঁর পিতার মতন ভগিনীও একধরণের সমাজ সেবা করতো, অদ্ভুত সেবা যার মূল খোঁজার কোনো অর্থ নেই । কারণ তার হদিস পাওয়া যায়না ।

জন্ম ও মৃত্যু এই দুই অধ্যায় নিয়ে লড়ে গেলো দুটি মহৎ প্রাণ যাঁদের কথা লেখা হয়নি কোথাও কারণ আজকের এই বাণিজ্যিক যুগে তাঁদের হয়ে গলা ফাটানোর কেউ নেই ।

# সাইকোপ্যাথ

সুমেরু সিন্‌হার সকাল হয় সূর্য ওঠার আগেই । প্রথমেই এক কাপ কফি খায় । তারপরে অন্যান্য দৈনিক কাজ সেরে হাঁটতে বার হয় ।

বাড়ির কিছুটা দূরে আছে এক পার্ক । বিরাট বড় বড় গাছ হাত ধরাধরি করে নিচে ফুল ছড়িয়ে হোলি খেলছে যেন । বাঁধানো পিচের রাস্তা পার্কের মধ্যেই । ইতিউতি ফুলের বাগান । প্রথম আলো পড়ে ঝিলমিল করছে । ছোট বড় মাঝবয়সী সবাই এই পার্কে আসে । কেউ ব্যায়াম করেন কেউ হাঁটেন কেউ বা নিছক সময় কাটান ।

সুমেরু বেশ মুখ চেনা আর সমীহ করার মতই মানুষ । প্রায় রোজই তার ছবি খবরের কাগজে আসে । সে একজন টাফ কপ । সুপার কপ বললেও চলে ।

এরকম সৎ ও কর্মঠ পুলিশ কর্মী সমাজে আজও আছেন সেটাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর । সুমেরুর স্ত্রী কলেজে পড়ায় । তার নাম সাহানা । সে যখন বিবাহ করেছিলো তখন সুমেরু ছিল একজন অধ্যাপক । পড়ে আই পি এস দিয়ে পুলিশ ফোর্স জয়েন করে । এখন সাহানা বলে তাড়াতাড়ি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিতে ।

কারণ মুম্বাই এর পাঁচ তারায় ব্লাস্টের পরে সে ভয় পায় ভীষণ ।

সুমেরু তাকে আশ্বস্ত করে : আরে বাবা অত ভয় পেলে কি চলে ?

আর আমি তো অ্যাটি টেররিস্ট স্কোয়াডে নেই ! আমি সিম্পেল অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অফ পুলিশ ----- !

ইদানিং একটা কেসের সমাধান করতে সুমেরু নিজে এসেছে ধানগাঁ তে । কারণ কেসটি অদ্ভুত । ধানগাঁ একটি মফ:স্বল । কিছুটা দূরে আছে সমুদ্র । এখানে ফরাসী উপনিবেশ ছিলো তাই বেশির ভাগই ফরাসীদের পরিত্যক্ত বাড়ি ঘর রয়েছে । আকারে বৃহৎ আর প্রাচীন ধাঁচের । কোনটা হোটেল হয়েছে, কোনটা হাসপাতাল, কোনটা নিছক খালি পড়ে আছে । রাস্তা গুলো চওড়া, গাছে ছাওয়া আর এলাকায় প্রচুর সাইকেল । সেইসব সাইকেল চড়ে উড়ে যাচ্ছেন অনেক সাদা চামড়ার মানুষ যাদের বাবা কাকারা এসেছিলেন সুদূর ফ্রান্স থেকে । ইদানিং এখানে মানুষ হঠাৎ-ই দলে দলে এইড্‌সে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন । কেন কেউ জানেনা । কিছুদিন পরে এইড্‌স মড়কের আকার নেবে । ডাক্তারেরা হতাশ । এখানে অবশ্যই খুব বড় হাসপাতাল নেই । একটি আছে মিশনারি হাসপাতাল । সেখানে কিছু সংখ্যক ডাক্তার আছেন । কিন্তু কেউ এর কোনো কূল কিনারা করতে পারছেন না ।

কাজেই কমিশনার অফ পুলিশ, অ্যাসিসটেন্ট এসেছেন স্বয়ং । টাফ কপ । যাঁর নাম শুনলে বড় বড় মাফিয়া ও ক্রিমিন্যাল ভয়ে শিঁটিয়ে থাকে ।

আমাদের দেশ ভারতে ক্রাইম কমানো কিংবা রোধ করার সেরকম রাস্তা নেই কারণ পুলিশ দূর্নীতিগ্রস্ত ও লুঠপাট করতে অভ্যস্ত । তারা কোনো নিয়ম মানেনা । যে রক্ষক সেই ভক্ষক । কেউ প্রতিবাদ করলে পুলিশই তাঁকে মেরে ফেলে । সহকর্মী হলেও । তবুও কিছু সৎ অফিসার তো আছেনই তাঁদের জন্যেই আজও ফোর্স টিঁকে আছে ।

সুমেরু সেরকমই একজন । যেখানে কাজের জন্য তাঁর যাওয়া প্রয়োজন সেখানে সে নিজে যাবেই । তাঁর পদমর্যাদা পারেনা তাঁকে আটকাতে । নিজের এ- কে ৪৭টা নিয়ে খেলা করতে সে খুবই ভালোবাসে । সমাজের নোংরা সরানোকে সে তাঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছে । যেসব ক্রিমিন্যালকে কোর্টে নিয়ে গেলে বিচারের নামে প্রহসন হয় ও অর্থবল ও প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে তারা ছাড়া পেয়ে যায় সেসব ক্রিমিন্যালকে এনকাউন্টার করে আউট অফ কোর্ট বিচার করে সে । তবে বুঝে শুনে । নাহলে মানবাধিকার কমিশনের নেতা নেত্রীর চক্ষুশূল হয়ে পড়বে । যখন উগ্রপন্থীরা নিরীহ লোক মারে তখন কোথায় থাকেন এইসব মানবাধিকার কমিশনের পেয়াদারা ? সুমেরুর নিরীহ প্রশ্ন ।

উগ্রপন্থী ধরো আর মারো । এইসব বিকৃত মস্তিস্কের মানুষের আবার বিচার কী ?

সুমেরুর থিওরি - ভেরি ভেরি সুমেরুভিয়ান, বলে তাঁর বন্ধু বান্ধব ।

একবার অনেক রাতে বাড়ি ফিরে সবে ডিনারে বসেছে এমন সময় শোনা গেলো পাশের এক আদিবাসী মহলে কিছু বড়লোকের লক্কা পায়রা গিয়ে মেয়েদের রেপ করেছে । বড়লোক বাপের টাকায় প্রাইভেট কলেজে পড়ে তারা, মেধার খরা পুষিয়ে নেয় টাকা দিয়ে । বাপের ডোনেশানে কলেজ চলে, পুত্র-কন্যা ক্লাসে স্ট্যান্ড করে ।

এহেন কিছু যুবক উত্যক্ত করেছে অসহায় যুবতীদের । সুমেরু গিয়ে তাদের লকআপে পোড়ে । এবং নিন্দুকে বলে, তাদের এমন আড়ং ধোলাই দেওয়া হয়েছে যে রাতারাতি তারা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে । বলিউডি সিনেমার রাফ অ্যান্ড টাফ পুলিশ ম্যান যেন রূপালি পর্দা থেকে নেমে এসেছে বাস্তবে ।

ধানগাঁয়ের এই ঘটনা বেশ ভালো ছাপ ফেলেছে সব জায়গায়, মিডিয়ার কল্যাণে । আজকাল এত চ্যানেল যে খবরের খরা দেখা যায় সর্বত্র । কাজেই নসু ঘোষ কেঁদেছের সঙ্গে সঙ্গে এইসব চাঞ্চল্যকর সংবাদও পরিবেশিত হয়, নিপুনভাবে, কখনো কখনো ফ্যাব্রিকেট করে । তাই পড়ে অনেকেই বলেন : আরেব্বাবা, যা লেখা যায় তাই কি সামনা সামনি বলা যায় ?? এরা কত কিই না লিখছে দেখো। কারো ওপরে রাগ হলে তাকে একেবারে নাঙ্গা করে নাচাচ্ছে । জার্নালিজমের এথিকস্, কোড অফ কন্ডাক্ট ভুলে ।

কাজেই এই খবর রটে গেলো চারিদিকে । যা রটলো না তা হল স্বয়ং অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অফ পুলিশ এর তদন্তে গেছেন ।

রাত বারোটা । দামী সিগারে একটি সুখটান দিয়ে সুমেরু এগিয়ে চলে চাঁদ ভাসি পথে । এক পাশে ধান ক্ষেত, ধানফুলের সুবাসে বাতাস পাগল পারা, অন্যপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পুরনো ফরাসী কটেজগুলো । সুমেরু দেখলো আধো আলো আধো ছায়াতে একটি অবয়ব হেঁটে আসছে দ্রুত গতিতে ওরই দিকে । কিছুক্ষণ পরে দেখলো সেই অবয়বটি-আহ্, একটি শব্দ করে নিজের হাতটা টিপছে । হয়ত কোনো পোকা মাকড় কামড়েছে ! সুমেরু নিজগতিতে এগিয়ে চলে । এইরকমভাবে সে পর পর তিনদিন তিনজনকে আহ্ করতে দেখলো । নতুন এইড্স রুগীর সংখ্যাও বাড়লো কিছুদিন পরে । চতুর্থ দিন সে আর ভুল করেনা । হাতটা খপ্ করে ধরে আসামীর । পাশের নিচু জমি থেকে যে খুব দ্রুত উঠে আসে রাস্তায় ও নিমেষের মধ্যেই কাজ সেরে ফিরে যায় । হাতে সিরিঞ্জ । তাতে এইড্স্ রুগীর রক্তে চোবানো নিডিল । লোকটি এত বেঁটে যে তাকে দেখাই যায়না, প্রায় একটি ছাগল কিংবা ভেড়ার মতন সাইজ । অর্থাৎ বামন ।

বামন ক্রিমিন্যাল । সুমেরুর হাত ছাড়িয়ে সে পালাতে পারেনা । ধরা দিতেই হয় ।

জেরা হয় সুমেরুর কোয়ার্টারে । বামনটি সাইকোপ্যাথ । খুব ছোটবেলায় তাকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা যান । বাবা আবার বিয়ে করেন । এই গল্পে কোনো নতুনত্ব নেই । দিন কেটে যায় নিজ গতিতে, আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত কিন্তু বাড়েনা এই লোকটি । নাম যার অয়ন চৌধুরী । পড়াশোনা করার সেরকম সুযোগ হয়নি তার কারণ : এই নাটকা, এই বাটকুল এইসব শুনে শুনে বেচারার মন ভেঙে যায় । স্কুল কমপ্লিট করা হয়না । ফেল হয়ে যায় বার বার । সবাই কেমন নতুন বই ও জুতো জামা নিয়ে নতুন ক্লাসে যায় কিন্তু অয়ন ? তার তো জুতো ও জামার সাইজ বদলায় না ! বছরের পর বছর একই জিনিসে চলে যায় । আর পড়াশোনাও মাথায় তেমন না ঢোকায় ক্লাসও একই রয়ে যায় । বাড়িতে বকাঝকা শুনে একদিন সৎ মায়ের তাড়নায় সে পথে বেরোয় । কিন্তু নিষ্ঠুর দুনিয়া তাকে আরো বেইজ্জৎ করে । একটি দোকানে বাসন ধোয়ার কাজে নেয় । সেখানে মালিক খেতে দিতোনা, মাইনে তো দিতোই না । খাবার কথা বললে বলতো : এই তুই তো বামন তোর আবার বডির খাবার লাগে নাকি ? আমাদের মতন তোর বডি বাড়ে ?

টাকার কথায় বলতো : তোর যখন এতই টাকার খাই তখন সার্কাসে কাজ নে। ওটাই তো তোদের জায়গা শালা উল্লুক কোথাকার ।

ক্ষোভ বাড়তে থাকে অয়নের মনে । একদিন সে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায় । একটি সার্কাস দলে যোগ দেবার চেষ্টা করে । সেখানে কিছুদিন খেলা দেখায় তারপর ওদের মালিক ওকে মোলেস্ট করতে আরম্ভ করে । কারণ মালিক ছিলো সমকামী । নিজের গোপন অঙ্গে মালিকের সুড়সুড়ি ও মালিকের গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার সুড়সুড়ি তাকে সার্কাস থেকে বাইরে বার করে আনলো । আবার পথে পথে, কখনো ডাস্টবিন থেকে খাবার খেয়ে কখনো চুরি করে খাবার খেয়ে খেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগলো ।

নিজের উচ্চতাই এইসব যাতনার কারণ । কী করেছিলো সে যে তাকে এরকমভাবে হেনস্থা হতে হচ্ছে তারই স্বজাতির কাছে । শুধু একটু খাটো বলে ?

প্রেম তো আসেনি সেভাবে । সার্কাসের মেয়ে তাতিয়ানাকে ভালোলেগেছিলো ।

তাতিয়ানা জানতে পেরে কি হাসি -- এই বাটকুল তোর রস তো কম নয় !

ওরে সবাই রগড় দেখ! যেই তাতিয়ানাকে ছোঁয়ার জন্য কোটিপতিরা পাগল তাকে প্রেম নিবেদন করছে এই নাটঘুট্টাটা ! শালা !

একটা গালাগালি দিতে দিতে চলে গেলো তাতিয়ানা । সার্কাসের সহমর্কীরা নেচে কুঁদে উঠলো- জিসকি মর্দ নাটা উস্কাভি বড়া নামও হ্যায় ! পিঞ্জরে মে বিঠালো, তোতে কা কেয়া কাম হ্যায় ---

ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো অয়নের । বুকের ভেতরটা যদি খুলে দেখাতে পারতো !

এত্তো ভালোবাসতো তাতিয়ানাকে । তাতিয়ানা, তাতিয়ানা, রুশ দেশের মেয়ে, গলানো সোনার মত রং, পরীর মতন চেহারা ! শুধু একটু উচ্চতার অভাবে সে হারিয়ে গেলো তাতিয়ানার জীবন থেকে -----আচ্ছা বিজ্ঞানীরা ফলস্ পায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন তো ! রণ পায়ের মতন যা ভিতর থেকে সার্জারি করে আটকে দিলে মানুষকে লম্বা দেখাবে । বিজ্ঞানীগুলো যে কী করে ! উহ্ !

সুমেরু কথা ঘুরিয়ে বললোঃ চা খাবে ?

অয়ন একগাল হেসে বললো : হ্যাঁ সাহেব ।

সাহেব পুলিশ হলেও বেশ ভালো । এত আদর করে কেউ কোনোদিন বলেনি খাবার কথা !

কেউ সামনে বসিয়ে খাওয়ায় নি কোনোদিন। তাকে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, কেক সবই দেওয়া হল । খেয়ে টেয়ে নিয়ে সে বাকিটা বলতে লাগলো।

সুমেরুর গম্ভীর গলা ভেসে এলো : কিন্তু এই ঘৃণ্য ক্রাইম কবে থেকে আরম্ভ করলে?

- রিসেন্টলি ।

- কেন ?

- চাকরির খোঁজে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখে একজনের বাসায় যাই । অবস্থাপন্ন মহিলা । স্বামী সুচাকুরে । বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটান ।

মহিলাকে আমার দৈহিক আরাম দিতে হত । দুপুরে যেতাম বিকেলে কাজ সেরে ফিরে আসতাম । খাওয়া দাওয়াও ভালই জুটতো । মহিলা এইড্সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন । রোগ আমার দেহে বাসা বাঁধে । সমস্ত ফ্রাস্ট্রেশান ছাপিয়ে জন্ম নেয় এক ভয়ানক রাগ । রাগের প্রকোপে আমি ঠিক করি যা আমার সঙ্গে হয়েছে তা সবার সঙ্গেই হোক । বেছে নিই মানুষের শরীরে এইড্স ঢুকিয়ে দেবার এই অভিনব পদ্ধতি । প্রতিদিন আমি এক একটি সিরিঞ্জ নিয়ে আমার দেহ থেকে রক্ত বার করতাম ও তারপরে তা ফুটিয়ে দিতাম পথচারিদের গায়ে । এই একটি কাজে আমাকে সাহায্য করেছিলো আমার উচ্চতা । অসম্ভব খাটো হওয়ায় কেউ আমাকে দেখতে পেতোনা অন্ধকারে । আসলে এত বেঁটে একজন যে এগুলো করতে পারে কারো ধারণাতেই আসেনি বোধহয় । সমাজের চোখে আজ আমি সাইকোপ্যাথ । কিন্তু আমার কি দোষ হুজুর ? আমার অপরাধ কী ? বামনদের কি বাঁচার অধিকার দেয়না আপনার আইন ? আইন কোথায় থাকে যখন আমাদের ওপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে সমাজ ও সমাজপতিরা ? আইনও সুস্থ সবল মানুষের জন্যেই তৈরি, আমাদের জন্য নয় ! আজ যখন আমি নিজ হাতে দন্ড তুলে নিয়েছি তখন আইনের খুব অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে । আপনাকে পাঠাচ্ছে আইন । কিন্তু আমি যখন কেঁদেছি তখন কিন্তু কোনো শর্মা সহানুভূতি জানাতে আসেনি -- বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বামন অয়ন চৌধুরী ।

অয়নের গল্প শুনে চোখে যেন জল এসে গেলো সুপার কপের । রুমাল বুলিয়ে নিলো চোখের কোণায় । রাফ অ্যান্ড টাফ সুমেরু, যে বড় বড় মাফিয়ার এনকাউন্টার করেছে নিপুন হাতে তাঁর এই বামনের শয়তানির সামনে নিজেকে যেন বড্ড বামন মনে হচ্ছে । মনে হচ্ছে বিখ্যাত সেই লাইন কটি যা অধ্যাপক জীবনে অনেককে শুনিয়েছে : আর্ট ফর আর্ট সেক --- যা নাটকের এই অধ্যায়ে, বদলে করে নেওয়া যায় : ক্রাইম ফর ক্রাইম সেক -!

সুমেরু, অয়নকে নিয়ে গেলো রাজস্থানের গ্রাম ঝিঁঞ্জরে । সেখানে বাস করে দুনিয়ার এক বেঁটে প্রজাতি, বামন প্রজাতি । তাদের ছেলেপুলেরা বামন । হাতের কাজ ও চাষ আবাদ করে তাদের দিন কাটে । সরকার থেকে অর্থ সাহায্য আসে । কিছু মিশনারিও ওখানে কাজ করেন । এবং ধর্ম মত অনুযায়ী এরা সবাই খ্রিষ্টান ।

অয়ন আজ থেকে এখানেই থাকবে । ওদের সঙ্গে । হয়ত অন্য কোনো তাতিয়ানাকে পেয়েও যাবে সে ।

আর সুমেরু ? কেসটা ক্লোজ করতে পারবে না । অনেক উন্মাদনা আছে একে ঘিরে । কাজেই যা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, অন্য কাউকে ধরে জেলে পুড়বে, অন্ততঃ একটি সত্যিকারে হার্ডকোর ক্রিমিন্যালের শাস্তি তো হবে এই অজুহাতে ।

অয়ন তো চাঁদে হাত দিতে চায়নি, চেয়েছিলো এই পৃথিবীর ফলফুল । নিক না কুড়িয়ে কটি এই অবেলায় ।

জেল খাটুক অন্য কেউ যারা এতদিন খেলে বেড়িয়েছে, মাঠে ঘাঠে, পথে প্রান্তরে !!

# পোড়ো বাড়ি

বনের ধারে একটি পোড়ো বাড়ি অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি । আমি থাকতাম দক্ষিণ ভারতের এক জনপদে। কাছেই ছিল ঘন বন । ডাক বিভাগের চাকরি নিয়ে এই জনপদে হাজির হ'ই । আমার নাম রব, রব বোজ । আচারে আচরণে সাহেব । ছেলেবেলার অনেকটা সময় কেটেছে গোয়ায়, পরতুগিজ কলোনির কাছে । তাই মনে তীব্র একটি বাসনা ছিল সাহেব হবার । কিন্তু বিদেশ যাবার সুযোগ ঘটলো না । সেরকম মেধার পরিচয় দিতে না পারার দরুণ দেশের ডাকবিভাগে চাকরি নিয়ে হাজির হলাম এই জন মানবহীন প্রান্তরে । পোড়া দেশে পুঁথিগত বিদ্যে নাহলে যে কিছুই হয়না কাজেই !! কিছুটা ফ্রাসট্রেটেড হয়েই যেন মেধাবীদের আড়ালে নামকরণ করেছিলাম : স্টুডেন্ট গোট । সহজ বাংলায় পড়ুয়া পাঁঠা ।

দিনের বেলায় অফিস সেরে আমি বাড়ি আসতাম । নাহ- সত্যজিতের তিন কন্যা সিনেমার মতন কোন কিশোরী আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকতো না । থাকতো এক সারমেয় । নাম বব । রবের সখা বব । দুই বন্ধু মিলে বিকেলে বেড়াতে যেতাম ঘন বনের মধ্যে । সবুজের যে এত শেড হয় আগে দেখিনি । হালকা সবুজ, গাঢ় সবুজ, নীলচে সবুজ ------

খুব ভালো লাগতো ফিরতি পাখিদের কলতান ।

বুনোফুলের সুবাস, অচেনা ঝোরার তির তিরে গান । মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতাম পথের ধারের রং বেরং এর নুড়ি পাথরের দিকে । প্রাণ ভ রে উপভোগ করতাম এই সময়টুকু । খেয়াল করতাম বব-ও এক'ইভাবে চারিপাশ উপভোগ করছে । কখনো কখনো ও দুই পায়ে ভর দিয়ে চুপটি করে বসে প্রজাপতির উড়ে যাওয়ার ছন্দ দেখতো ।

পোড়ো বাড়ির দিকে প্রথম নজর যায় ববের কল্যাণেই । বাড়ির ভগ্নাংশ দেখেই ও ছুটে ভেতরে ঢুকে যায় । আমিও ওর পেছন পেছন । দেখি বাইরে থেকে পোড়ো মনে হলেও ভেতরটা পরিপাটি করে সাজানো । তবে প্রথম ঘরটি বাদ দিয়ে ।

প্রথম দিকটায় ভাঙা দেওয়াল, শ্যাওলা, অমসৃণতা । সেটুকু বাদ দিলে পরিচ্ছন্নতা ।

ফিরে এলাম সেখান থেকে । কারণ আকাশে মেঘের গুরুগুরু ।

ফিরতে হবে অনেকটা । তাই সেদিন আর অন্দরে উঁকি মারলাম না ।

আবার যথারীতি ওদিকে বেড়াই কিন্তু অন্দরে যাবার ইচ্ছে হয়নি । মনে অবশ্যি একটা ভয় ছিল । ভেতরটা এত সাফ সুতরো হল কীভাবে ? তবে কি !

নাহ আজকাল যা হচ্ছে চারপাশে, কোথায় কীভাবে ফেঁসে যাবো কে জানে !

হয়ত কোনো উগ্রপন্থীর ক্যাম্প । কে বলতে পারে ।

তবুও মনে একটা কৌতুহল জেগে উঠেছিল কাজেই একদিন সব বাধা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম ।

এবার বব যেন ছুটে অন্দরে চলে গেলো । কাকে যেন দেখতে পেয়েছে সে ।

আমিও গেলাম । এবং তাজ্জব বনে গেলাম !

একটি বিশালাকৃতির রোবট দাঁড়িয়ে ঠিক ঘরে মাঝাখানে !

অ্যাশ কালার, মাথায় টুপির বদলে জটাজুটো !

অদ্ভুত চেহারার রোবট ।

এরকম জনমানবহীন স্থানে এক রোবটকে দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি । দুয়ে দুয়ে চার করতে আমার বেশি সময় লাগেনি । শহুরে প্যাঁচালো মন নিয়ে ভেবেই বসি যে ভেতরে উগ্রপনথীর ডেরা আছে । হয়ত কোনো হাই এন্ড মেশিন লাগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে ! আমি ভাবুক ন'ই বরং কিছুটা উজবুক । তাই আগপাছ বিচার না করে শুধুমাত্র একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি ফিরে আসি । বব আসতে চাইছিল না । কখনো কখনো আমার মনে হয় আমাদের মানুষদের চেয়ে জীব জন্তু বেশি সংবেদনশীল । আমরা বড্ড স্বার্থপর । ওদের মুখে শুধু ভাষাটা নেই ।

কয়েক পা এগোতেই পেছন থেকে কে যেন বড় মিঠে স্বরে ডেকে উঠলো -- দাঁড়ান ! নির্ঘাত মহিলা উগ্রপন্থী ! আবার ডাক -হ্যাল্লো হ্যাল্লো--

দাঁড়াবার আকুতি !

আমি যুবক, মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে কাঁহাতক না তাকিয়ে পারি ! একবার দেখতে ইচ্ছে হয় স্বরের অধিকারিনীকে । অত এব পেছন পানে চাই ।

দেখি একজন মহিলা দাঁড়িয়ে । পরণে পাজামা ও ঢোলা জামা । বেশ রং চং-এ জামা এই সূর্যাস্তের প্রাককালে স্বল্প আলোতেও চোখ এড়ালো না !

এগিয়ে গেলাম । এ যেন মেঘ না চাইতেই জল !

মেয়েটি একটু মড মনে হল । একটা আলাদা স্মার্টনেস আছে কথাবার্তা, চলনে বলনে ।ওর নাম জানা গেলো হংসলেখা, বলে হামসালেকা ---

এতক্ষণে ভেতরে চলে এসেছি । এবং এই প্রথম । জানা গেল ও এখানেই থাকে । একা থাকে । কেন থাকে সেই বিষয়ে কথা হয়নি ।

পরিছন্ন একটি কামরা । কাঠের বসার জায়গা, মনে হল একটি বড় বাক্সকে সোফা বানানো হয়েছে । পোড়ো বাড়িতে এক অপরূপ আবেশ । চুঁ'ইয়ে পড়ছে একরাশ জোছনা, অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের রুদ্ধ বাতায়ন থেকে । পোড়ো বাড়ি এক উচ্চাঙ্গের কবিতা ।

পাশেই চলমান সেই অদ্ভুত রোবটিটি । নিজে মনে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে ।

মাথায় জটাজুটো । পায়ে মসৃণ জুতো ।

- সব রোবট তো মেশিনের মতন হয়, এ নাহয় কিছুটা মানুষের মতন হল কী বলেন রব ?

অপরিচিতার মুখে নিজ নাম শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম ---

--আ-আমি মানে ---আমার নাম আপনি জানলেন কি করে? রবের চোখে বিস্ময় ।

- কেন জানবো না ? আপনাকে তো আমি চিনি !

-চেনেন ? মানে ?

আমি কয়েকবার পোস্ট অফিসে গিয়েছি তখন দেখেছি ।

-বুঝলাম, কিন্তু আপনি কে ? এই নিরালায় আত্মগোপন করে আছেন কেন ?

- সে এক লম্বা গল্প, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ওঠে হংসলেখা ।

পুরো নাম - হংসলেখা কস্তুরিরঙ্গন ।

ঈষৎ কালো, শাম্বোষ্ঠী ।

মুখে হালকা হাসি--আপনি আমার কাহিনী শুনে কি করবেন ?

রব চুপ করে থাকে । তারপরে বলে ওঠে ---নাহ এমনি, নিছক কৌতুহল ।

-আপনার কৌতুহল লাগাম ছাড়া । একজনের সঙ্গে পরিচয় হলনা সেভাবে এখনো ওয়ার্মিং আপ দা ব্যারেলস চলছে ;এখনি আপনি এত হাড়ির খবর চাইছেন কেন বলুন তো ?

রব আমতা আমতা করে । তখন মিষ্টি হেসে হংসলেখা বলে ওঠে ---আমার জীবন এক গল্প, যদি শুনতে চান চলে আসুন বিকেল বেলায় ওই যে দূরের নীল পাহাড় তার পদতলে । একটা পলাশ গাছ আছে । আমি অপেক্ষা করবো ।

দুই প্রেমী এইভাবে মেলে । কিন্তু আপরিচিতা এক নারী যার সঙ্গে প্রেমের কোন সম্ভাবনাই নেই তার সঙ্গে এইভাবে দেখা করা, কেমন যেন লাগে ।

ঘরে আছে অনেক মেশিন । কোনটার বোতাম টিপে দিলেই চালু হয়ে যায় রোবট, সে ঘরদোর সাফ করে ফেলছে । কোনো বেতার মেশিন চালিয়ে সেরে ফেলা যাচ্ছে হেড মাসাজ, বার হচ্ছে কোনো রশ্মি যা মাথায় মাসাজ করে দিচ্ছে অচিরেই, কোন যন্ত্র রয়েছে যা শব্দ তরঙ্গ থেকে শক্তি শুষে নিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে রাতের আলো ।

বিকেলের সূর্য ডোবার আগে দোনোমনা করেও পলাশ গাছের তলায় হাজির হলাম

। আমি রব বোজ, আদতে বসু, গৌতম গোত্র । হংসলেখা আগেই হাজির । সময়জ্ঞান প্রখর । পলাশ গাছের নিচে পাথরে পা ডুবিয়ে বসলাম । একটি ছোট ঝোরা কুল কুল করে বয়ে চলেছে, খুশিতে মাতাল ।হংসলেখা তার জীবনের ব'ই মেলে ধরলো সামনে । এক আশ্চর্য ব'ই । যা না পড়লে জানা হয়না অনেক কিছুই ।

ব্যাঙ্গালোরের কাছে এক কলেজে পড়তো মেয়েটি । ছোটবেলা থেকেই ছিল একটি দূর্ধর্ষ টেকনিক্যাল ব্রেন । খুব'ই ছেলেবেলায় সে সারিয়ে দিতে পারতো মেকানিকের না সারাতে পারা রেডিও, সেলাই মেশিন ও টেপ রেকর্ডার । পরে বড় হয়ে বানাতে আরম্ভ করলো নানা ধরণের গ্যাজেটস । কোনোটা অদ্ভুত তো কোনো টা খুব'ই কার্যকারী । লোকে বলতো লেডি এডিসন ।বেশ কিছু ছোট খাটো প্রাইজ'ও পেল । ইচ্ছে ছিল আমেরিকার খুব বড় কোনো ইন্সটিটিউশানে গিয়ে গবেষণা করবে । সব সেইমতন চলছিলো । কিন্তু হংসলেখার ছিল একটি বোহেমিয়ান মন'ও । কলেজের কিছু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে কিছুদিন মালয়লি সিনেমায় অভিনয়ের কাজ করলো, সাইড রোলে । কিছু পয়সা পেলে তাই দিয়ে বন্ধুরা মিলে চরস, গাজা, আফিম, মদ কিনে খেতো । ধীরে ধীরে রসাতলে যাবার সঙ্গী বাড়লো । হার্ড ড্রাগস নিতে শুরু করলো নিয়মিত এবং ভিড়লো এক হিপির দলে । তারা গান বাঁধতো

ও রক গ্রুপ চালাতো -নাম : মিস্ট অ্যান্ড মারিজুয়ানা । হংস তাদের দলে, বাজনার যন্ত্রপাতিগুলো দেখভাল করতো ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন ধরণের বাজনার ইলেকট্রনিক যন্ত্র বানিয়ে দিতো ।

একটি ছেলের সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনেও গেলো । কিন্তু কয়েকদিন পরে ওর পার্টনার আত্মহত্যা করে বসলো কোন অজ্ঞাত কারণে । হংস ভেঙে পড়লো ।

কিছুদিন পরে সে বাড়ি ফিরে গেলো । হঠাৎ । কিন্তু বাড়ির লোক মেনে নিলেও মধ্যবিত্ত সমাজ তাকে অস্বীকার করলো । পড়শিদের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করলেন ওর মা । বাবা ঘোর মদ্যপ হয়ে অকালে হারিয়ে গেলেন । সম্বল একটি ছোট ভাই । তাকে বুকে করে হংস নামলো পথে । সেলসের কাজ করে দিন গুজরান আরম্ভ হল । সেখান থেকেই যোগাযোগ হল কিছু মানুষের সঙ্গে যাঁরা ওর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে ওকে কিছু মেশিন বানানোর কাজ দিলো । অচিরেই করে দিলো সে । শুরু হল এক ব্যাবসা । কিন্তু ভাগ্য আবার বাঁকা হাসি দিলো ।।

এই পর্যন্ত বলে থামলো হংস ।

আকাশে নেমেছে আঁধার । বললাম :-- আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে পারি ।

-হ্যাঁ পারি বৈ কি !

হংস হেসে উঠলো । বড় করুণ সেই হাসি । সে যেন আমার পাশটিতে নেই হারিয়ে গেছে কোথাও !

তারা দেখা যাচ্ছে আজ আকাশে নাকি কোনো ভিনগ্রহ ! সেখানেও কি কেউ আমাদের মতন সখ্যে মেতে উঠেছে ? কে জানে ?

পথ চলতে চলতে আবার শুরু হল কথা । মেঠো সুর ভেসে আসছে কোথা থেকে । বোধহয় কোনো রাখাল ঘরে ফিরছে ।

গলা ঝেড়ে আবার শুরু করলো সে ।

একমাত্র ভাই যাকে বুকে নিয়ে সে বেঁচে ছিল সে আক্রান্ত হল অদ্ভুত ব্যাধি হেয়ারি সেল লিউকেমিয়াতে । সাধারণত: এই রোগে মানুষ মারা যায় কম কিন্তু হংসর ভাই মারা গেলো । কোনো চিকিৎসাই কাজ করলো না ।

অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায় --

জীবন দীপের শেষ সলতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে মানুষ বাঁচে কীভাবে ?

কিন্তু জীবন বয়েই চলে নিজ খাতে । সে থামতে জানেনা । তাই বেঁচে থাকতে হয় সবাইকেই । কবিগুরুর গানের মতন :

আছে দু:খ আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে

তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ---

বেঁচে র'ইলো হংসলেখাও । তবে সভ্য সমাজ থেকে অনকে দূরে । এই পোড়ো বাড়িতে । মাঝে মাঝে শহরে যায় কেনাকাটা করতে । আর কখনো কখনো যায় পলাশ গাছের নিচে

নিজেকে খুঁজে পেতে । নিজের দু:খ, ব্যাথা ভাগ করে নিতে গাছটির সঙ্গে । হংস'ও বিশ্বাস করে মানুষের থেকে গাছপালা, পশু পাখি অনেক বেশি সংবেদনশীল । আমার মতন'ই তার মনোভাব । একেবারে রাজযোটক !পোড়োবাড়িতে বসে যন্ত্র বানায় । কিছু বেচে । লোক এসে নিয়ে যায় শহরের গুদাম থেকে । নিজের বানানো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক জিনিস শহরে পৌঁছে দিতে হয় । একটি গাড়ি ডেকে সে জিনিস নিয়ে যায় । কিছু জিনিস আর্ন্তজাতিক বাজারে বিক্রী হয় । সেই দায়িত্ব নিয়েছেন সেলসের কাজের সময় আলাপ হ'ওয়া এক রাজস্থানি ব্যাবসাদার ব্যাক্তি মিস্টার অগ্রবাল ।ওঁর লোক এসে জিনিস নিয়ে যায় । কিছু যন্ত্রের পেটেন্টও আছে হংসর । নেই শুধু আপনজন বলতে কেউ ।

এই অভাবনীয় উপাখ্যান শুনে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ ।

বাড়ে সখ্যতা । বাড়ে যোগাযোগ । হংস'ও যেন বহুদিন বাদে সন্ধান পায় মনের মানুষ এর । দুজনের

প্রায়'ই দেখা হয় নির্জনে । এই বেচারা ডাককর্মীর চিঠি লেখার অভ্যাস কোন কালেই ছিলনা । কাজেই মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় ।

নীল নির্জনে দুটি পরিণত বয়সের মানুষ শপথ নেয় এক সঙ্গে বাকি জীবন কাটাবার ।

যন্ত্রের মাঝে খুঁজে পাই অযান্ত্রিককে ।

পোড়োবাড়ি জুড়ে আজ তাই সাজ সাজ রব ।

মানিনীর মান ভেঙেছে । ফিরে এসেছে সে সভ্য সমাজে । শুধু গ্রহণ করেনি আমার পদবী । বলেছে : আমি বসু, বোজ ন'ই ।হংসলেখার সঙ্গে বসুটাই মানায় সবথেকে বেশি ।

# ঘোস্ট হান্টিং

## ১

কবি সুকুমার চৌধুরী এসেছেন অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে । মাসখানেকের জন্যে । মেলবোর্নের অদূরে ব্যালারাট শহরে আস্তানা গেড়েছেন এক শুভানুধ্যায়ীর গৃহে ।

সুবিশাল বাড়ি । সুইমিং পুল, অ্যালফ্রেস্কো ( আউটডোর সিটিং), চার চারখানা বেড রুম, বাগান, লিভিং রুম, কিচেন কাম ডাইনিং, চারখানা বাথরুম, অ্যাটাচড্ বার যেখানে সুস্বাদু ওয়াইন রাখা সুদৃশ্য বোতলে ও পুরনো ধাঁচের ফায়ার প্লেস সহ একটি বাড়িতে এনে তাঁকে তুললেন পাপিয়া । পাপিয়া গুহ । ব্যালারাটের বেঙ্গলি অ্যাসোশিয়েশানের প্রেসিডেন্ট । সুকুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেটে ।

পাপিয়ার স্বামী মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হর্তকর্তা । বহু টেকনিক্যাল আইডিয়া ওঁনার পেটেন্টেড আছে । নামডাকও প্রচুর । ভদ্রলোক একই সঙ্গে লোকাল প্রিস্টও । একমাত্র পুত্র অস্কার উইনিং ডাইরেক্টর জর্জ মিলারের সঙ্গে কাজ করেন স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে । অর্থাৎ এই পরবাসের বর্ধিষ্ণু বাঙালী পরিবার।

অঞ্চলের বেশির ভাগ ভারতীয় বিয়ে, পুজো ইত্যাদি হয়ে থাকে পাপিয়ার স্বামীর দ্বারা । অর্থাৎ সোসালি বেশ অ্যাকটিভ মানুষ ।

ওঁনারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই একই সঙ্গে বন্ধু বৎসল আবার আনসোসালও ।

আনসোসাল কারণ বছরের একটি সময় তাঁরা বার হন ভূত শিকারে । দুনিয়ার যত জায়গায় ঘোস্ট হান্টিং হয় সর্বত্র তাঁরা যান । সেইসময় মোবাইল অফ রাখেন ও বহির জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন । ভূত দর্শন করে ফিরে আসেন সভ্যতায় । এইভাবে পুরো ইউরোপ ঘোরা হয়ে গেছে । লোকে ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি যান ইতিহাস খুঁড়তে কিন্তু এই অদ্ভুত দম্পতি যান কবর খুঁড়তে ।

ঘোস্ট হান্টিং হল ভূতকে চাক্ষুষ করার জন্য বিভিন্ন ভৌতিক স্থানে গমন যেইসব জায়গা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে বিখ্যাত ভূতুড়ে স্থান হয়ে আছে ।

জানা গেলো ব্যালারাট শহর অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে হন্টেড শহর । ব্যালারাটের ইতিহাস খুব ভালো নয় । এখানে আগে ছিলো প্রচুর স্বর্ণ খনি । সুদূর চীন দেশ থেকে চৈনিক শ্রমিকরা এসে সেইসব খনন করে সোনার কুচি বার করতো । পরে গোল্ড রাশ হবার দরুণ অনেক খুন হয় । গোলাগুলিতে নিহত হন অনেক মানুষ । কাজেই এখানে ভূতের দর্শন পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি ।

সুকুমারের জীবনে অনেক ওঠাপড়া । পুরুলিয়ার লাল পাহাড় থেকে যাত্রা শুরু করে নাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত আসতে তাঁকে পার হতে হয়েছে বহু পথ । কিন্তু ভূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি তেমন বরং অনেক কিম্ভূত প্রাণী দেখেছেন যাঁদের পোশাকি নাম সভ্য মানুষ ।

তারা একটি বোতাম টিপে মারে কোটি কোটি মানুষ । বিজ্ঞান নামক এক আজব শাস্ত্রের কল্যাণে সবুজ পৃথিবীর গলা টিপে ধরে তবু তারা সভ্য কিন্তু যাঁরা ভূত নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা এই সভ্য মানুষের কাছে পরিগণিত হন পাগল ও অসভ্য বলে ।

সুকুমারের কোনো প্রেজুডিজ নেই । কাজেই তিনি স্থির করলেন একদিন ভূত দর্শনে যাবেন ।

কিন্তু যাবো বললেই তো যাওয়া চলেনা ! শীতের মরসুমে হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে প্রচন্ড প্যানপ্যানে বৃষ্টি । তারওপরে পুরুৎ মশাই গেছেন সিডনি, একটি মারোয়ারি পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে । তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর পত্নী পাপিয়া যিনি নাকি নিজেও খালি চোখে ভূত দেখতে সক্ষম ; যেতে রাজি নন । পাপিয়া ভূত দেখতে পান । অনেক সময় দেখেছেন বাসে, ট্রেনে পাশের সীটে কেউ বসে আছেন । একটি ধোঁয়া ধোঁয়া অবয়ব । অথবা রাস্তায় তাঁর পাশে পাশে হেঁটে চলেছেন কোনো বৃদ্ধা । ভূত মানেই ক্ষতি করে কথাটা পাপিয়া মানেন না । তাঁর মতে ভূত আসলে অন্য একটি প্যারালাল ইউনিভার্সের বাসিন্দা যা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে । কেউ কেউ সেই জগৎ ছুঁতে পারেন । তাঁদেরই মোলাকাৎ হয় অশরীরির সঙ্গে ।

লোকেরা হাসে কাজেই পাপিয়া সচরাচর এইসব কাউকে বলেন না ।

সুকুমারের বিশেষ অনুরোধে অবশেষে রাজি হলেন পাপিয়া । দিনক্ষণ ঠিক করে, রীতিমতন পাঁজি দেখে যাত্রা হল । ভূত বলে কি শুভক্ষণ নেই তাদের ?

## ২

কবর স্থানে ভূত দর্শন । একটি ফিটন গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হবে অমাবস্যার রাতে কবর স্থানে । গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হবে বিখ্যাত ভূতুড়ে কবরের আশেপাশে যেখানে দেখা গেছে প্রেতাত্মা বহুবার । কেউ কাঁদে কেউ হাসে কেউবা গটগট করে হেঁটে যায় লাঠি নিয়ে । সবই শোনা কথা । এবার দেখার পালা । ভূতকে একটু ছুঁয়ে দেখতে চান সুকুমার । কবিমন ভাবে প্রশ্ন করবেন : এই শীতে একা একা কবরে থাকতে কষ্ট হয়না ? শরীর নেই তো কী ধোঁয়াশা তো আছে ! আর শরীর বলে কি সত্যি কিছু হয় ?

বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক থিওরি বলে পদার্থ বলে কিছু নেই পুরোটাই শক্তি ।

আবার ভাবেন : ধূস ! এইসব প্রশ্ন করলে পাপিয়া ওঁকে পাগল ভাবতে পারেন ।

কাজেই চেপে রাখেন মনোবাসনা ।

মধ্য যুগীয় ফিটন গাড়ি ঠিক রাত বারোটায় তুলে নিলো তাঁদের স্টর্ট স্ট্রীট এর মুখ থেকে । যাত্রী বলতে তাঁরা দুজন ও একটি জাপানী পরিবার যার সদস্য সংখ্যা পাঁচ । গাড়িতে মোট আট জনের বসার জায়গা সারথীকে বাদ দিয়ে । অষ্টম স্থানটি দখল করেছেন গাইড । যিনি সমস্ত বলে দেবেন, ইতিহাস, ভূগোল, অবিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি । সঙ্গে আছে কিছু যন্ত্রপাতি । যা দিয়ে মাপা যায় ভূতের দৈহিক উষ্ণতা, চলাচল । অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভূত দর্শন !

সুকুমার খুব সেজে গুজে ভূত দেখতে এসেছেন । যদিও রাতের নিকষ কালো আঁধারে কেউ দেখার নেই তবুও অন্তরে উদাস হলেও বাইরে বেশ পরিপাটি এই কবি ।

তাঁর পত্রিকা খনন দেখবার মতন । মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রাইজ পেয়েছে লিটিল ম্যাগাজিনের মধ্যে সেরা হয়ে । খননও খুব সাজে । সুকুমারও সেজেছেন । উনি আজকে ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেছেন । ফিনফিনে ধুতির ওপরে মোটা শাল, ভেতরে অবশ্যই মোটা সোয়েটার কারণ বাইরের তাপমাত্রা মাইনাস ওয়ান ।

হয়ত বরফ পড়বে কিছুদিনের মধ্যেই ।

বেদ উপনিষদ, শাস্ত্রীয় সংগীত, টেগোর, রবিশঙ্করের বাজনা যা শুনে সম্ভবত জর্জ হ্যারিসন বলেছিলেন আমরা এইরকম বাজনা কল্পনাও করতে পারিনা, সত্যেন বোস, আচার্য জগদীশ বোসের দেশের মানুষকে যখন পশ্চিমের মানুষ থার্ড ওয়ার্ল্ড স্লামডগ বলে ব্যঙ্গ করেন সুকুমারের খুব দু:খ হয় ।

মনে হয় চেঁচিয়ে বলেন : ওরে তোরা মূর্খ, তোরা কিছু জানিস না, শুধু বাইরেটাই দেখলি ? অন্তরে উঁকি মারলি না ?

তবে অস্ট্রেলিয়া পশ্চিম সভ্যতায় সভ্য হয়েছে কিন্তু ভারতের পুর্বদিকে বলে সুর্যোদয় হয় অনেক আগে ।

কবরস্থান রহস্যময় । আধো আলো আধো ছায়া, আলোর অনেকটাই কৃত্রিম । বড় বড় বাতি । মানুষের সঙ্গে ভূতের সংযোগ হয় নিশুতি রাতে চাঁদের আলোয় কিংবা অন্ধকারের ঘনিমায় । ছায়া মানুষেরা আসে, ঘুরে বেড়ায় । গল্প শোনায় । কত কথা কত ইতিহাস কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনা । আধুনিক মানুষ বড় অবিশ্বাসী ।

শোনা যায় কবর নম্বর পাঁচের কাছে একটি চীনা রমণী একমনে কিছু বুনে চলেন । পক্ক কেশ, আকাশী গাউন পরা । কিন্তু সেই বুনন কোনদিনই শেষ হয়না । গল্প আছে এক চীনা রমণী প্রেগন্যান্ট অবস্থায় সোয়েটার বুনছিলেন সেইসময় গোলাগুলিতে প্রাণ হারান । গুলি করে সাদা চামড়া । যারা আজও হরিণ শিকারে যায় নিছক আনন্দ নিতে । নিরীহ হরিণের বুকে গেঁথে দেয় এক একটি অগ্নি শলাকা । সভ্য মানুষ এঁরা সবাই ।

আপাদমস্তক অরণ্যচারী কবি সুকুমার একবার অরণ্য থেকে একটি হরিণ শিশুকে এনে পুষেছিলেন । ঘরের ভেতরে থাকতো সেই শিশু । একটু বড় হলে উঠোনে । দিনের বেলায় পিকনিকে গেলে সেও যেতো । ঘুরে বেড়াতো সবুজের কোলে । কিন্তু দিনান্তে সূর্য ডোবার আগেই নিরীহ হরিণ শিশু ফিরে আসতো অসভ্য সুকুমারের কোলে । । কবি সুকুমার চৌধুরী, থার্ড ওয়ার্ল্ড স্লাম ডগ ।

গাড়ি থেকে নেমে বহুক্ষণ হাঁটাহাঁটি হল । ছায়ামানুষের দেখা পাওয়া গেলোনা ।

-মনে হয় সেজেগুজে এলে তেঁনারা আসেন না, হালকা হাসি রসিক সুকুমারের ঠোঁটে ।

- হতে পারে, তবে অনেকেই তো দেখেন তাঁরাও সেজেই আসেন, পাপিয়ার চোখে কৌতুক ।

সাহেবদের সঙ্গে মাখামাখি করেন না বলে ভারতীয়দের অধিকাংশের বদনাম আছে কিন্তু পাপিয়ারা করেন । তবুও উনি নিতান্তই বাঙালী বধূ । সিন্দুর, নোয়া পরেন । পুইঁশাক রান্না করেন বড়ি দিয়ে, রোজ ভাত খান ও আড্ডা মারেন খাবার টেবিলে, বাঙালী আড্ডা ।

পারস্পরিক রসিকতায় খেয়াল হয়নি কখন এসে পড়েছেন একটি কবরের কাছে । বেশ পুরনো কবর । গাঢ় আঁধারে যেন দেখা গেলো একটি অবয়ব বসে আছে । মনে হয় কম বয়সী ভূত ।

রোগাটে গড়ন । সুকুমার শুনেছিলেন ভূতেরা ছায়াশরীর কিন্তু একে দেখে মনে হল বেশ মানুষী শরীর ।

-হবে কোনো আধুনিক ভূত ! মনে মনে বলেন কবি ।

ভূত বসে আছে একহাতের মধ্যে মনে হয় ছুঁয়ে দেখি । পাপিয়া একটু বেশি সাহসী কিন্তু সুকুমার কৌতুহলী । তাই ছুঁতে গেলেন সুকুমারই । ভয়ে গায়ে কাঁটা দেবার বদলে রোমাঞ্চ ।

সত্যি ছুঁয়ে দেখা যাবে কি ?

ভূত মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে, একমনে কী ভাবছে ! সুকুমার এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলেন । এবং খপ করে ভূতের হাতটা ধরে ফেললেন । কিন্তু একি ? হিমশীতল ভৌতিক হাতের বদলে উষ্ণ মানুষের হাত ! ভূত হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে ! রীতিমতন ধস্তাধস্তি !

সুকুমারও ছাড়ার বান্দা নন । এইভাবে জ্যান্ত ভূতের সন্ধান পাবেন ভাবেন নি তো ।

যেন পালাবারও চেষ্টা করলো ভূত । তারপরে হঠাৎ থমকে গেলো । ভূতের কলার কবির হাতে । শেষমেশ পরাজিত ভূত কবির হাতে নিজ হস্ত সমর্পণ করে ক্লান্ত স্বরে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলো : দূর মশাই হাতটা ছাড়ুন ! বড্ড লাগছে যে ।

## ৩

খোদ বাংলা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে এসেছিলো মেধাবী ছাত্র তমাল বসাক । বাবার ছিলো কাপড়ের ব্যবসা । ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে পড়াবেন বহুদিনের শখ । নিজে যা পারেন নি তা সন্তানের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যবিত্ত প্রবৃত্তিতে আটকে পড়ে উনি ছেলেকে বিদেশে পাঠান এক দালালকে ধরে । কয়েক লক্ষ টাকা নেয় সে । ভর্তি করিয়ে দেয় এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্সে । কিন্তু দুর্ভাগ্য ছেলেটির । বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় ।

ব্যবসায়ী পিতার মুখ রক্ষা করতে সে আর দেশে ফেরেনা । সোসাল স্টেসাস বজায় রাখতে চায় তার পিতার -- আমার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় ম্যানেজমেন্ট পড়ে ।

গর্বিত মুখের ওপরে লজ্জার প্রলেপ দিতে চায়না সে।

যোগ দেয় একটি ডিসেবিলিটি সাপোর্ট সিস্টেম রিপোজে । কাজ করতে থাকে । এই সংস্থার কাজ হল শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তিদের সমস্ত কাজে সাহায্য করা প্রফেশন্যালি । মাইনে প্রতি ঘন্টায় ১৮ অস্ট্রেলিয়ান ডলার । বয়স্ক মানুষ, সাইকো ওয়ার্ডের মানুষ, ডাউন্স সিন্ড্রোমে আক্রান্ত মানুষ, প্যারালিসিসে আক্রান্ত মানুষ সবার সেবা করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য । তমাল কাজ নিলো । প্রথম প্রথম অস্বস্তি যে হতনা তা নয় । লোকের মলমুত্র পরিষ্কার করা, সাপোজিটর গোঁজা সহজ কাজ নন । কিন্তু অবস্থা চরমে উঠলো যেদিন অল্প বয়স্ক রোগিনীর ঋতুস্রাবের ন্যাপকিন কিংবা রক্তে ভেজা চপচপে ট্যাম্পন যোনি থেকে খুলে বার করতে হল । এই কাজ নিয়মিত হয়ে দাঁড়ালো । যোনি পরিষ্কার ও প্রয়োজনে অঙ্গুলি সঞ্চালন প্রচন্ড অস্বস্তিতে ফেলে দিলো অবিবাহিত ও নারী শরীরে অনভিজ্ঞ তমালকে। তমাল কাজ ছেড়ে দিলো । যোগ দিলো ঘোস্ট হান্টিং ট্যুরে । প্রতি ঘন্টায় মিলবে ৩০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার অর্থাৎ প্রায় ১২০০ ভারতীয় টাকা । লোভনীয় প্রস্তাব । ঝড় বৃষ্টিতে কাজ নেই তবে বেশি ঠান্ডা পড়লে আরেকটু বেশি মিলবে । এক ভারতীয় গুজ্জু ব্যবসায়ী এই ট্যুর অর্গানাইজ করতেন । নাম দিলীপ শাহ । আলাপ সুরাসিক্ত সন্ধ্যায় এক পাবে । য্খন চাকরির প্রস্তাব

দিলেন তখন টেবিলের তলা দিয়ে বন্ধুপত্নীর গোপন অঙ্গে হাত বোলাচ্ছিলেন যা তমালের চোখ এড়ায় নি । বন্ধু তখন মাতাল হয়ে একটু দূরে ।

এখানে ওঁনার বহু ব্যবসা আছে । শাহ্‌বাবু ঝানু ব্যবসায়ি । জানেন প্রাকৃতিক ভূত খামখেয়ালি কিন্তু তাদের দর্শন না পেলে মানুষ আসবেন না । কাজেই ব্যাবস্থা হল জ্যান্ত ভূতের । দেখা যেতে লাগলো ভূত । এই কবরের কাছে । নাম ছড়িয়ে পড়লো । চীনা রমণী সেজে কিংবা নিপাট ভালোমানুষ যুবক --তমাল বসাক হয়ে উঠলো পাকা অভিনেতা ।

প্রথমে শুধু বসে থাকতো । পরে উঠে হাঁটাচলা ও ভৌতিক আচরণও আরম্ভ করলো ।

বাড়লো টুরিস্ট । এই কবরখানায় ।

মজার ব্যাপার হল কিছু কিছু পার্ভার্ট ট্যুরিস্ট এসে ভূতের সঙ্গেও সেক্স করার আবেদন জানাতো । জানতে চাইতো সেরকম কোনো স্কিম আছে কিনা । তবে সেরকম কারো খপ্‌পরে তাকে পড়তে হয়নি । কারণ সে তো সেই অর্থে অশরীরি । এই কবরের মাঝে ।

গল্প শেষ করে করুণ চোখে চাইলো সে -- মিনতি করলো, কাউকে বলবেন না দাদা বেঘোরে মারা পড়বো এই প্রবাসে । আপনাদের হাতে তো কলম, বাঘের থেকেও ডেনজারাস্ !

সুকুমার কথা দিলেন যে এই কাহিনী গোপন থাকবে । উনি যে লেখেন তা আগেই জানিয়েছিলেন । থাকনা বস্ত্র ব্যবসায়ীর সন্তান এই পরবাসে দুধে ভাতে ।

থাকনা সুখী পিতার মুখ উজ্জ্বল : আমার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় ম্যানেজমেন্ট পড়ে !

এদিকে পাপিয়া সুকুমারকে খুঁজতে খুঁজতে এদিকেই আসছেন । হঠাৎ কবি গায়েব হয়ে গেলেন । তারপর থেকে খুঁজেই চলেছেন পাপিয়া । তাঁকে আসতে দেখে তমাল চট করে ঢুকে পড়লো কবরের মধ্যে । সেখানে থেকে গোপন পথে হয়ে গেলো উধাও । আসলে এই কবরটিও মানুষের বানানো । মৃতদেহ লোপাট । বড়লোকের মৃতদেহ ছিলো । বাড়ির লোকজন অনেক গহনা ও জিনিসপত্র দিয়েছিলেন সঙ্গে মিশরের মমির মতন । বড়লোকের খেয়ালিপনার কি শেষ আছে ।

শোনা যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ বাড়ির ছাদে রিকশা চড়ে ঘুরতেন !

শাহবাবুর ব্যবসায়িক বুদ্ধি অতুলনীয় ।

## ৪

সুকুমার অস্ট্রেলিয়া বেড়িয়ে ফিরে এসেছেন । খুব ভালো লেগেছে সবাইকে বলছেন । কিন্তু ভূত দর্শনের অন্তরালের গল্প কেউ জানেন না । একদিন হঠাৎ খনন দপ্তরে একটি গল্প জমা পড়লো । লেখিকার নাম গার্গী ভট্টাচার্য । সোনাঝুরি বলে একটি ওয়েবজিন চালান ।

একটু অফবিট মহিলা, বোহেমিয়ান, মুডি । সাধারণ মহিলা চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায়না । সুকুমারের অবাক লাগলেও কোনদিন সন্দেহ হয়নি । কিন্তু আজকের এই গল্প পড়ে -------

# মাতাহারি

অস্ট্রেলিয়ার অ্যারারাট একটি ছোট জনপদ। আধা শহর আধা গ্রাম। ছোট পাহাড়, নদে ঘেরা জায়গা। দৃষ্টি নন্দন, শান্ত পল্লী। একদিন আমি অনেক রাতে ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম। আসলে আমি গিয়েছিলাম গ্রাম্পিয়ান্স পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে। একটি অ্যাব অরিজিন রিসর্টে কয়েকদিন কাটিয়ে ফিরতি পথে অ্যারারাটে থামি কারণ আমার গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। এক লোকাল অস্ট্রেলিয়ান লোকের বাড়িতে রাতটা কাটাবার আহ্বান পাই। কোলস্ শপিং মলে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ কেনার সময় আলাপ হয় জ্যাকের সঙ্গে। জ্যাক ব্রাউন। সত্যি জ্যাকের গায়ের রঙটা একটু ব্রাউনিস্। বেশ কিছুটা দূরে ওঁর বাড়ি, নাম ড্যানাস ডেন। ড্যানা ওঁর স্ত্রী।

ছিমছাম বাড়ি। সাজানো। পুরনো পৈত্রিক বাড়িকেই রেনোভেট করা হয়েছে। আর্ধেক কাঠের আর্ধেক ইটের। বিশাল একটি মান্ধাতা আমলের ফায়ার প্লেস ড্রয়িং রুমে শোভা পাচ্ছে। দুজনের সঙ্গেই আলাপ হল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা। বয়স ৮৪ ও ৭৫ বছর। জানা গেলো জ্যাকের দ্বিতীয় স্ত্রী ড্যানা। প্রথমজন মারা গেছেন বহুদিন হল। বিয়ে হয়েছে প্রায় ২৫ বছর আগে। জ্যাকের আগের পক্ষে তিন সন্তান। ব্রায়ান, এলিস ও রবিন। ব্রায়ান ও এলিস মেলবোর্নে থাকে। রবিন থাকে সিডনিতে একটি হোমে। ছোটবেলা থেকেই সে ডাউন্স সিনড্রোমে আক্রান্ত। এই অসুখ হলে মস্তিস্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও মানুষ কিছুটা জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এদেশে এসে দেখছি মানসিক অসুস্থতা ও মস্তিস্কের অপরিপুর্ণতা সংক্রান্ত ব্যাধি খুবই কমন। প্রায় ঘরে ঘরে। এবং আমাদের মতন ওরা এগুলো নিয়ে হাসাহাসি করেনা কিংবা বাতিকগ্রস্ত নয়। বরং সহজভাবেই নেয়। কাজেই রবিনও মাঝে মাঝে বাবা মায়ের কাছে বেড়াতে আসে। তার সৎ মা ড্যানা খুব যত্ন করে তাকে রাখে। নিজে তার পাশে খাট টেনে নিয়ে শোয় যাতে রাতে পড়ে গেলে তুলতে পারেন।

স্বামী -স্ত্রী সপ্তাহে একদিন যান একটি বৃদ্ধদের ক্লাবে। নাম জেরেন্টোজ্। সেখানে দুনিয়ার বৃদ্ধ -বৃদ্ধারা আসেন সময় কাটাতে, পার্টি করতে। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে তাঁরা সুখ দু:খ বিনিময় করেন হুইস্কি, ভড্কা নিয়ে। বেশ কাটে সময়।

জ্যাক খুবই করিৎকর্মা। পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু প্রচুর দান ধ্যান করেছেন। বহু ম্যানেজমেন্ট স্কুলে শিক্ষাদান করেছেন ও অস্ট্রেলিয়ার হুজ হুতে ওঁর নাম সংযুক্ত হয়েছে। জীবনের শেষে এসে বিবাহ করলেও এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় ছিলো যৌবনেই। স্কুল কলেজে পড়তে দুজনে দুজনকে চিনতেন। কারণ জ্যাকের বোন লিনডান ছিলেন ড্যানার বান্ধবী।

ড্যানা এই শীতের রাতে এককাপ ধূমায়িত কফির কাপ এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। সঙ্গে ফিস অ্যান্ড চিপস্। মাছটার নাম স্যামন। অনেকটা ইলিশের মতন খেতে। বেশ ভালই বেক করেছেন মহিলা। সুন্দরী, সরু ঠোঁট, টিকলো নাক, সোনালি চুল। চোখ দুটো মুক্তোর মতন সাদা ও চকচকে। কথা বলেন খুব আস্তে প্রায় শোনাই যায়না। দামী সোফায় বসে আমি চুমুক দিলাম কফির কাপে।

গল্প চলছিলো নিয়ম মাফিক। ব্যাক গ্রাউন্ডে পিঙ্ক ফ্লোয়েড।

একটু হেসে ড্যানা বলে ওঠেন : জ্যাককে তো আমি আগেই চিনতাম । হি ওয়াজ আ বিগ ম্যান । আই ওয়াজ স্কেয়ার্ড অফ হিম । নেভার থট উই উড এভার গেট ম্যারেড । আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল হুবার্ট । হুবার্ট কাজ করতো পুলিশে । এক সময় ঝামেলা হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো । আই স্টিল লাভ হিম- হি ওয়াজ সো নাইস,

ভেরি ব্রেভ ।

নিজের স্বামীর সামনে পরপুরুষের প্রশংসা ! খুব অবাক হলাম । স্বামীও নিশ্চুপ । কোনো তাপ উত্তাপ নেই । ভাবলাম : এগুলো শুনে শুনে কান পচে গেছে । ভদ্রলোক বেশ ভালো । আমার সামনে কেউ এরকম করলে এমন উত্তম মধ্যম দিতাম না !

বাইরের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে আসছে এক চিলতে আলো । মনে হয় স্ট্রিট লাইট । ঘরের মেঝেতে পরে আলো সর্পিল আকার নিয়েছে । আজকাল তো বিজ্ঞান বলে : লাইট বেন্ড করে !

খাওয়া শেষে শুতে গেলাম । ঘুম আসছে না । কী করে অচেনা লোকের বাড়ি থাকতে রাজি হয়ে গেলাম জানিনা । অথচ মনে হচ্ছে এঁরা আমার কত আপন ।

পরেরদিনও আমাকে ওঁরা আটকে দিলেন । ওঁদের বাড়ির লাগোয়া একটি কটেজে আমি অবস্থান করছি । সেল্ফ সাফিশিয়েন্ট কটেজ । কিচেন থেকে শুরু করে সব আছে । ভদ্রমহিলা ওঁর একটি ভারতীয় রান্নার বই আমাকে দিয়ে গেলেন । বললেন : করে খাইয়ো । আমি বানালাম : পাটিয়ালা ব্যাংগন আর দহি চিকেন । হাল্কা রান্না ওঁরা খেয়ে খুশিই হলেন । বললেন : তোমরা ভারতীয়রা রাঁধো বেশ ভালো ।

কাছেই একটি টিলায় নিয়ে গেলেন । সেখানে বিরাট মনুমেন্ট । জ্যাকের দাদুর নামে উৎসর্গীকৃত । উনি রোটারি ক্লাবের সদস্য ছিলেন কাজেই তাঁর নামেই সৃষ্ট এই মনুমেন্ট । তিন পুরুষের রোটারি সদস্য । জ্যাক -এলাকার নামী দামী মানুষ । রোটারি ক্লাবের হর্তাকর্তা । ভদ্রলোকের মোট সাতবার বড় অপারেশান হয়ে গেছে । লিভারে ক্যানসার । হার্টে পেসমেকার বসানো । তাই নিয়েই এত কাজ করছেন, এত প্রাণবন্ত দেখেও ভালো লাগে । আমি অত্যন্ত অলস । আমার কাছে খুবই ইন্সপায়ারিং । গার্গী ওঠো, জাগো, ওয়েক আপ সিড !

বাড়ি ফিরে আবার আড্ডা । বুড়ো বুড়ি বেশ মিশুকে ।

একদিন সুযোগ পেয়ে গল্পের আশায় ড্যানাকে জিজ্ঞেস করলাম: বিয়ে এত দেরিতে করলে কেন ? তোমার প্রেমিক তো কেটে পড়েছিলো ।

ড্যানা খুব রসিক । হেসে বললেন : নটি গার্ল, এত কৌতুহল কেন ? এবার আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে নাকি ?

বললাম : হ্যাঁ যদি লেখার মতন হয় লিখবো না কেন ?

উনি এবার সাবধানী । মুখে একটা গাম্ভীর্য এনে বললেন : লিখলে পুরোটা লিখো । অর্ধ সত্য লেখা আমি পছন্দ করিনা । তারপর একটু থেমে -

- আমার দুটো জীবন আছে কোনটার সম্পর্কে জানতে চাও ?
- দুটো জীবন ? আমি অবাক হয়ে গেছি ।

- হ্যাঁ ।

- আরেকটা কোনটা ? আমি কৌতুহলী ।

- কেন, আমার পুর্ব জীবন ! আমার স্পাইয়ের জীবন ।

- স্পাইয়ের জীবন, আমার বিস্ময়ের শেষ নেই । যেন ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি আমি।

ড্যানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন -

- হ্যাঁ । আমি অস্ট্রেলিয়ান স্পাই ছিলাম । কাজ করতাম ভীনদেশে ।

সাধারণ কর্মী হয়ে ওখানে ঢুকেছিলাম । কমিউনিস্ট দেশ ।

ও, হ্যাঁ বলা হয়নি এতকথা হয়েছে আমাদের যে আমরা বন্ধু হয়ে গেছি এবং এই ঘটনা বেশ কিছুদিন পরে ঘটেছে । আমি নিয়মিত যেতাম এঁদের বাড়ি ।

সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে রাত কাটিয়ে আসতাম । সুস্বাদু রোস্ট, মিষ্টি ওয়াইন, ঢুলু ঢুলু এক স্বপ্নের জগৎ আমার আর অনেক কথার মালা । অনেক গল্প । অনেক অজানা তথ্যের আদান প্রদান । বন্ধ দরজা খুলে যাওয়া ।

ড্যানা তখন মাতাহারি । ভীন দেশের অলিতেগলিতে ঘুরে বেড়ায় । ভিনদেশী কিছু মানুষের সঙ্গে শুতে হয়েছে খবর সংগ্রহ করার জন্য । বাইরে কমিউনিস্ট কিন্তু ভেতরে ভেতরে রেসিস্ট তাঁরা । ড্যানা বললো : ওরা তো বর্বর জাত । মঙ্গোলিয়া থেকে এসেছিলো । সভ্যতা একটা ছিলো বটে তবে তা নামেই সভ্যতা । পোষা জন্তুদের যাঁরা মেরে খেতে পারে তাঁরা কি মানুষ ?? একটা সময় ওঁদের রাজারা অত্যাচার আরম্ভ করলো । মেয়েদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতো । গণ হত্যা, গণ ধর্ষণ হল ।

সমাজের নানান কোণ থেকে প্রতিবাদ এলো, এলো কমিউনিজম ।

এখন ওঁরা সুউচ্চ প্রাচীরের মতনই ওদের চারপাশে লাল পাঁচিল তুলে রেখেছে । যত সস্তার জিনিস ওখানে তৈরি হচ্ছে । কোনো কোয়ালিটির বালাই নেই । ওদের এক বিরাট বড় নেতার ব্যাভিচার ধরে ফেলায় আমাকে ওরা মার্ক করে । কিন্তু জানতো না যে আমি স্পাই । আমি ওখানে একটি কোম্পানিতে কাজ করতাম । এমন ব্যাপার রাতের বেলায় পার্টি দিতো, বন্ধুত্ব করতো পরেরদিন অফিসে গিয়ে চাকরি ছাড়ানোর নোটিশ দিয়ে দিতো । ওরা কোনো এথিক্স মানে না । যা ইচ্ছে করে । খুব বর্বর জাত । দুনিয়ার সব থেকে খারাপ দেশ ।

একনাগাড়ে বলে ড্যানা থামলো ।

চোখের কোণটা যেন চিকচিক করছে । পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হারিয়ে গেছে অতীতে । কী যেন ভাবছে ।

একটা সময় ড্যানা মেকআপ করে চোখা নাক ভোঁতা করেছিলো । একটি ভীন দেশী ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছিলো । ড্যানার দিক থেকে প্রেম ছিলোনা । ছিলো বন্ধুত্ব । শেষকালে মার্কড হয়ে যাওয়াতে বর্ডার ক্রস করে পালিয়ে যান ভারতে, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ান এম্ব্যাসি হয়ে এখানে । ভারতে খুব সাহায্য করেন এক বাঙালী । জয়গোপাল মুখার্জ্জী । উনিও কমিউনিস্ট । জ্যোতি বোসের আদর্শে বিশ্বাসী । সাচ্চা দিল কমিউনিস্ট । অতি

সাধারণ পোশাক আশাক । সাধারণ আচার ব্যবহার । একটি ছোট ঘরের বাসিন্দা । বইয়ের চাপে ঘর নুয়ে পড়েছে তাঁর । চোখে পুরু চশমা, কিছুটা ইন্তেলেকচুয়াল । বিদ্যা ভারে জর্জরিত । অথচ একই সঙ্গে সংগ্রামী ।

ড্যানার সঙ্গে দেখা দিল্লী স্টেশানে । উনি না থাকলে হয়ত দেশেই ফেরা হতনা ড্যানার । তখন তো ইমেল ছিলনা তাই যোগাযোগ রাখা হয়নি । এখন উনি কোথায় এঁরা জানেন না । আমি বাঙালী দেখে কৃতজ্ঞতা চাগিয়ে উঠেছিলো । জয়গোপাল মুখার্জ্জী নামে কোনো কমিউনিস্টকে আমি চিনিনা ।

সবিনয়ে নিবেদন করলাম । ড্যানার মুখে শ্রাবণের মেঘ । ধূলায় লুটায় বহুমূল্য বসন, ভূষণ ।

-কেন ? কেন চেনো না ? --- যেন বাঙালী বলে দুনিয়ার তাবৎ কমিউনিস্টকে আমার চিনতেই হবে ! ভদ্রতার খাতিরে বললাম : আমি তো সবাইকে চিনি না ।

শুনে ওঁর সুন্দর মুখটা কালো হয়ে গেলো ।

আসলে ড্যানার একটি সন্তান হয়েছিলো জয়গোপালের সঙ্গে, এক রাত কাটানোতে । তাকে ড্যানা শরীরে কোরে বয়ে নিয়ে এসেছিলো এদেশে । জন্ম দেয় ।সে এখন ব্রিসবেনে থাকে । মাঝে মাঝে বাবাকে দেখতে চায় । প্রতিষ্ঠিত যুবক । নম্র, বিদ্বান, ভদ্র - তাঁর পিতারই মতন।

-তখনকার দিনে যদি ফেসবুক আর অর্কুট থাকতো ! ড্যানার ব্যাথাতুর চোখের দিকে চেয়ে দেখি এক বিন্দু গলিত মুক্তো । করুণ মুখের দিকে চাইলে দু:খ হবে ক্ষুধিত পাষাণেরও ।

ছেলের নাম দিয়েছে ভেঙসরকার মুখার্জ্জী ।

- এমন আজব নাম কেন ? ভেঙসরকার তো পদবী আর বিখ্যাত ক্রিকেটারের নাম তো আসলে দিলীপ । আমি হতবাক । আমার অবস্থা লক্ষ্য করে ড্যানা বলে ওঠে : আমি যে আর ভারতীয় নাম জানতাম না, ওঁরা এখানে খেলতে এসেছিলেন । উনি ২০০ করেন । হস্পিটালে টিভি চলছিলো - সেখানে ওঁর নামটা বারবার শুনে বেছে নিই ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বলি : তুমি জয়গোপালকে খুব মিস করো তাইনা ?

চতুর মহিলা । রঙ্গ তামাশা করার পরে বললেন : হ্যাঁ । আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু মিট হিম অনলি ওয়ান্স । তাঁকে আমি জানাতে চাই যে আমাদের একটি সন্তান আছে । উনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন । কাজেই এটা আমার কর্তব্য ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসে গেছেন । একটি মিটিং-এ গিয়েছিলেন উনি । ডিসেবেলড্‌দের প্রতিষ্ঠানের মিটিং । বললেন : কেউ পয়সা ডোনেট করতে চায়না জানো তো । এরা বড়ই অভাগা !

করুণ হাসলেন । আমার রবিনের কথা মনে হল । রবিনও তো ওঁনার সন্তান ! ডিসেবেলড্ মানুষ ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে জ্যাকের চওড়া মুখ । রূপালী কেশরাশি এসে পড়েছে নাকের ওপর । কেমন জ্বল জ্বল করছে । যেন সরু রূপার তার ।

ড্যানাকে দেখে বললেন : কি আবার জে এর গল্প শুরু করেছো ?

ড্যানা নির্বাক । যেন স্বামীর কাছ থেকে পালাতে চাইছে । আমি মৃদু হেসে কথা ঘুরাবার চেষ্টা করি ।

সেদিন ফেরার সময় আমার গাড়ি অবধি এসেছিলেন জ্যাক ।সাধারণতঃ এঁরা দরজা থেকেই বাই বলে দেন । গেটটা বেশ দূরে । গাড়ি রাখা থাকে বাইরে ।

বেশ খানিকটা রাস্তা হেঁটে আসতে হয় । উনি আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন । খুবই ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ । গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন । আমি একটু গাড়ি পাগল । এই নতুন অডি গাড়ি কিনেছি দেখে এর নানান গুণাগুণ ব্যক্ত করতে লাগলেন । শেষে আমাকে বললেন : একটি অনুরোধ করবো রাখবে? গাডি?

হ্যাঁ আমাকে উনি গাডি বলতেন । আমার নামটি সঠিক উচ্চারণ করতে না পারার দরুণ ।

বললাম : কি ? বলো ।

- ড্যানার সঙ্গে জে কে নিয়ে আলোচনা করোনা । ও আলোচনা করে কিন্তু তারপর ইমোশান্স হ্যান্ডেল করতে পারেনা । ভেঙে পরে আর খুব মদ খায় । আমি তো মদ্যপান করিনা । জানো । আমি আসলে ভালোমানুষ ! তোমরা সবাই ব্যাড পিপেল । বলেই একচোট হাসলেন । ভদ্রলোক খুব দিলখোলা ।

তারপর মুখে গাম্ভীর্য এনে বললেন - আসলে ও একটা সময় স্পাইয়ের কাজ করতো তখন এক ব্যাক্তি ওঁকে বাঁচিয়েছিলো ভীনদেশের রোষ থেকে । সেই ভদ্রলোক নিজেও কমিউনিস্ট । বেঙ্গলি । ড্যানার মনে এমন আঘাত লাগে তাঁকে ছেড়ে আসার সময় যে আজকাল ও মনে করে ওঁর সঙ্গে তার একটি সন্তান আছে যার নাম ভেঙসরকার । ইউ নো, ভেঙসরকার ওয়াজ আ নাইস ব্যাটস্‌ম্যান । আই ওয়াচ ফুটি( ফুটবল) । নট ক্রিকেট । বাট আই নো ইউ ওয়াচ ক্রিকেট ! ক্রিকেট ইজ ইওর ন্যাশেনাল গেম !

অনেককেই বিশেষ করে ভারতীয়দের ও এই গল্প শোনায় । অন্যসব কিছুই ওর নর্মাল কিন্তু এই ব্যাপারটা ! ভেঙসরকার বলে আদৌ কেউ নেই জানোতো ! বৃদ্ধের গলাটা শেষদিকে যেন কেঁপে ওঠে ।

আমার আর জানার প্রয়োজন নেই । কারণ আমার জগৎ-ও ড্যানার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে । লেখক হিসেবে কতনা ভেঙসরকার, রোজ, জোসেফ আমাকে দিনরাত ঘিরে থাকে তা এই বৃদ্ধকে বোঝাই কী করে ?

তাই কথা বাড়ালাম না। মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ফিরে এলাম নিজ গৃহে ।

দিন কয়েক পরে অস্ট্রেলিয়ার এক ওয়েবসাইটে দেখলাম অ্যাডিলেড জু-তে বেড়াতে গিয়ে এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন এক বৃদ্ধা । নাম তাঁর ড্যানা । আগে স্পাই ছিলেন । হয়ত কোনো গুপ্ত ঘাতকের কাজ ।

কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে আমি, পলক পড়ছেনা চোখের ।

শুধু স্বস্তি একটাই যে বৃদ্ধের কথা রাখতে পেরেছি । আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবেনা আমার । হবেনা মিথ্যাচারের বোঝা বইতে, প্রতি দিন প্রতি মিনিট ।।

# মহাদেবীর পুজো

পশ্চিম বাংলার অধীনে রামপুরের আর্মি ক্যান্টনমেন্টের কাছে মহাদেবী বৃদ্ধাশ্রম । সবুজ সবুজ বিশাল গাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, শীতল বাতাস, মোরাম বিছানো পথ আর দূরে ছোট ছোট বাড়ি । বাড়িগুলিতে থাকেন আবাসিকেরা । সমাজের নিপীড়িত, অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা । কেউ একশো পেরিয়েছেন, কেউ বা আশি আবার কেউ নিছক অর্ধ শতাব্দী । দু একজন পঁয়তাল্লিশও আছেন । তাঁরা সংসারের কূটকাচালি দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে এখানে এসে ঘর বেঁধেছেন । হোস্টেলের মতন থাকেন ।

বৃদ্ধাশ্রমের দেখভাল করেন হীরক হালদার । পেশায় স্কুল টিচার । সুপারভিশানের কাজ করেন ওঁনার মা মায়াদেবী । সাহায্য করেন অবিবাহিতা মোটামুটি চটকদার সহোদরা - পলা । সমাজ সেবার জন্য যিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি । আর আছে গুচ্ছের চাকর বাকর, রাঁধুনি । তাদের মধ্যে আছে কিছু গ্রামীণ মেয়েও । গেঁয়ো সুন্দরী, ডাগর ডোগর চেহারা । নাকে নথ, পায়ে মল, চুলে চন্দ্রমল্লিকা ।

হীরক হালদার, বেশ মোটা পরিমাণে অর্থ নেন বোর্ডারদের কাছ থেকে । বেশির ভাগ বৃদ্ধবৃদ্ধার সন্তানেরা থাকেন বিদেশে । তাঁরা মোটা টাকা খসিয়ে বাবা মায়ের সুখ কিনতে চান । আজকাল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষ বড় একা । বুড়ো বুড়ির সংখ্যাই বেশি । পুত্র কন্যারা সবাই প্রবাসে নয় বিদেশে । রুজিরুটির তাগিদে তাঁদের চলে যেতে হয়েছে । বাংলা এখন ডাইয়িং রাজ্য । উত্তাল রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও মাওবাদী কার্যকলাপে । নেই শিল্প । তাই নেই কাজ ।

একদিকে বামদল তো অন্যদিকে ডানদল । এ বলে শিল্প হোক তো ও ব্যাগড়া দেয় । কাজেই এক টালমাটাল পরিস্থিতি । তার ওপরে আছে মারোয়ারিদের কলকাতা দখল অভিযান । শোনা যায় এক একটি মারোয়ারি নির্মিত ফ্ল্যাটে বাঙালী বাসিন্দাদের থাকতে দেওয়া হয়না । স্ট্রিক্টলি প্রো-হিবিটেট । ফ্ল্যাটের বাইরে প্রায় লিখেও দেওয়া হয় : বেঙ্গলিজ উইল বি প্রসিকিউটেড্ ।

- প্রসিকিউটেড ফর হোয়াট ? মিহি স্বরে বলে ওঠে বনী । যাঁর নামের অর্থ বনজ ।

প্রত্যুত্তরে ওঁর পতিদেব অয়ন বলে ওঠে : বাঙালির মস্তিস্ক চলে বেশি- হাত-পা কম, তাই মেরোগুলো এই অঞ্চল দখল করে পূর্ব ভারতের বাণিজ্য হেড কোয়াটার্স করতে চায় । বাঙালীগুলোকে দিয়ে ফার্মের সি এ, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যানেজারের কাজ করাবে আর নিজেরা মুনাফা লুটবে ।

- কিন্তু কেউ তো প্রটেস্ট করছে না ।

- কে করবে ? সবাই তো বিদেশে কিংবা প্রবাসে । এখানে তো থাকে কিছু বুঢ্ঢা বুঢ্ঢি ।

ওঁদের বাবা মায়েরা ওঁদের সঙ্গেই থাকেন এবং বেশ সুখী তাঁরা । ওঁরাও কলকাতা ছেড়ে যায়নি । এখানেই কবিতা, গল্প, ভাঙাচোরা নন্দন এর মাঝে ধূলোবালি কাটাচ্ছে জীবন । কিছুটা আঁতলামো করে, মাছ ভাতের লোভে ।

বুঢ়োরা থাকেন বটে মহাদেবী বৃদ্ধাশ্রমে । সন্তানেরা প্রচুর অর্থ খরচ করে রাখলেও এই আশ্রমে তাঁরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাননা । কারণ খেতে দেওয়া হয়না । মোটা চালের ভাত, জলের মতন পাতলা ডাল, পচা মাছের কিংবা শুকনো জুতোর সোলের মতন মাছের ট্যালটেলে ঝোল খেয়ে তাঁরা ক্লান্ত । কিন্তু শোনার লোক কই ? সন্তানেরা অভিযোগ শুনতে চায়না । কেউ কেউ বলে : বুড়ো বয়সে এত হ্যাংলামো করার কোনো মানে হয়না । কেউ আবার আশ্রমে অভিযোগ জানায় । তখন শুনতে হয় : কেন খাবার তো দেওয়া হয়, ওঁরা জানালা দিয়ে ফেলে দেন ।

মিথ্যে ভাষণ বুঝলেও কারো কিছু করার নেই । অতএব সংসার সমুদ্রের ডুবে যাওয়া তরী বুড়ো বাবা মায়ের দিন কাটে চোখের জলে । কেউ কেউ শুকনো হয়ে হয়ে একদিন ঝরে যান । মহাদেবীর বাগানে !

সময় ভালো কাটে পুজোর কটা দিন ও কালীপুজোর সময় । প্রচুর জাঁকজমক ও হৈ হল্লা করে পুজো কাটে । পুজো হয় আশ্রমের মন্দিরে । প্রাচীন মন্দির । দেবী চন্ডিকার ভয়ানক মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েও একরাশ মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা করেনা মায়াদেবী ও পলার । দেবীর চরণে পদ্ম দিতে দিতে -

- সবার ভালো করো মা, সবাইকে আনন্দে রাখো, ভাত কাপড় দাও ।

শুধু মায়ের মূর্তির উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন বিদ্রুপের হাসি দেয় ।

পুজোর কিছুদিন আগে মারা গেলেন ডঃ মজুমদার, অশোক মজুমদার । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন । ছেলেমেয়েরা সবাই বিদেশে । স্ত্রী মৃতা ।

ভদ্রলোক চাইতেন বাইরে যেতে, গঙ্গার হাওয়া খেতে । একবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন । তাই পরে আর যেতে দেওয়া হতনা । সেই নিয়ে উনি একবার শোরগোল তোলেন । কারণ যৌবনে ছিলেন দাপুটে মানুষ । বৃদ্ধাশ্রমের তরফে ওঁনাকে পেটানো হয় । ধস্তাধস্তিতে ওঁনার মাথা ফেটে যায় । অনেক রক্তপাত হয় । শেষকালে মারা যান । নিন্দুকে বলে : খুন । প্রমাণের কিংবা অভিযোগের অভাবে কোনো তদন্ত হয়না ।

আভাদেবীর পুত্র থাকেন বিদেশে । মায়ের বিষাদ অসুখ আছে, সোজা কথায় ডিপ্রেশান । মাঝে মাঝে হ্যালুসিনেশান হত । ভুলভাল করে ফেলতেন । কিছুদিন গোলমাল হয় । ওঁনার পুত্রের কাছে মোটা অর্থ দাবী করে আশ্রমঃ ফেলো কড়ি মাখো তেল । নাহলে ঘর খালি করো আমরা অন্য বোর্ডার নেবো ।

পুত্র মিন মিন করে বলে ওঠে : কেন পয়সা তো কম দিচ্ছি না । মাসে নগদ ছয় হাজার । বলেন আয়া রেখেছেন, কোথায় ? মা তো দেখেন না তাকে ?

- আপনার মায়ের মাথার ব্যামো আছে । পাগল ছাগলের কথা শুনলে চলে ? এইতো এত মানুষ আছেন কেউ তো কিছু বলেন না ? আপনার মা তো তাদেরকে কামড়ে দিতে যান!

এর কিছুদিন পরে পুত্র ফোন পেলো হালদারের : আপনার মায়ের এখন তখন অবস্থা । আপনি শিগগিরি চলে আসুন ।

- কেন কি হয়েছে ?

- নিউমোনিয়া ।

- ডাক্তার বলেছেন কোমায় চলে যাচ্ছেন ।

পুত্র অবাক হয় । কিন্তু পরের দিনই ফোন আসে যে সব শেষ ।

শীতকালে সম্ভবতঃ ঠান্ডা জলে জোর করে স্নান করিয়ে দেওয়ায় রোগে ধরে, আর সামলাতে পারেন নি ।

পুষ্কর গুপ্তর বাবাকে তো দাহ পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছিলো । ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিলো : হার্ট ফেলিওর ।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পুরনো পোষা কুকুর গিমলি শুতো । কথায় বলে কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি প্রখর এবং কর্ণ কুহরের কথা তো সর্বজন বিদিত কিন্তু সে মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে কিংবা গন্ধ শুকতে পারলো না ??

পুজোর সময় শুকনো মুখে হাসি ফোটে । ঘর থেকে বেরিয়ে নতুন কাপড় পরে শীর্ণ জীর্ণ হাতে নাড়ু, বাতাসা নিয়ে বসে থাকেন ওঁরা । গল্প করেন । হাসেন । কেউ কেউ গলা ছেড়ে গান করেন :

কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যা আলোর নাচন !

রুখা সুখা বৃদ্ধাবাস দুলে ওঠে সুরের তালে তালে । একটিমাত্র লগ্নে, বছরের ।

সেদিন ছিলো সন্ধিপুজো । ঢাকের গুড়ু গুড়ু ও পূজারির স্তব সমস্ত মিলিয়ে এক আনন্দ ধারার সৃষ্টি করেছিলো । মিস্টার দাস সরকারি চাকুরে ছিলেন । ছেলে মেয়ে এখানে রেখে গেছেন । ওঁনাকে ফোনে ডাকছে তাঁরা । বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় আজ শুভ লগ্নে । আসতে পারবে না এখন । হয়ত দশমীর পরে প্রণাম করতে আসবে ।

এই সময়টা শুধু নিজেদের । ছেলে মেয়ে, স্বামী স্ত্রী, এদের । বাবা মা এখন পুরনো ডাইরি । এককোণায় ফেলে রেখে দাও । মাঝে মাঝে ধূলো ঝেড়ে তুলে উল্টে পাল্টে দেখো আবার ছুঁড়ে ফেলো, কোণায় ।

ভাগ্যের নিঠুর খেলায় এইযাত্রায় আর বাবার সঙ্গে দেখা হলনা । বাবা হঠাৎই পরলোক গমন করলেন । কীভাবে মারা গেলেন কেউ জানেনা । খাটিয়ায় শায়িত এক বৃদ্ধ । শ্বেত শুভ্র কেশরাশি, কপালে ভাজ,অমল মুখখানি । কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই উনি এই বাগানে পদচারণা করছিলেন !

বোর্ডাররা আড়ালে কাঁদলেন, কেউ কেউ বললেন : ভালই হল, মুক্তি পেয়ে গেলেন, অনেক পুণ্য জমা ছিলো, আমরা তো যমেরও অরুচি !

মা দুগ্গা তুলে নিলেন ওঁনাকে মহাদেবীর পুজোয় ।

শুধু বাচ্চা চাকর ফণীভূষণ নির্বাক । একটিও কথা বলেনি সে আজ । বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়াতে পুজো ভন্ডুল হয়ে গেছে । লোকজন চুপিসারে কোথাও গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে আসছেন কিংবা প্রসাদ খেয়ে আসছেন । মা চন্ডী কি পাষাণ প্রতিমা ? এই একটি মাত্র লগ্নে যা কিছু আনন্দ হয় এখানে তাও দিলেন শেষ করে ! বুড়ো মড়ার আর সময় পেলোনা ?

বুড়োর ছেলেপুলেরা আসবার আগেই পুড়িয়ে ফেলা হল । ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন আশ্রমের ডাক্তার যেমন সর্বদাই দিয়ে থাকেন । কিন্তু ফণীভূষণের চোখে জল ।

সে যেন বোবা হয়ে গেছে । হালদার কিংবা তাঁর মা মায়াদেবী ওকে ডাকলে কুঁকড়ে থাকছে, তারপরে ধীরে ধীরে যাচ্ছে । কেমন যেন শ্লথ তার গতি প্রকৃতি ।

আসলে ফণী যদি সেদিন অন্ধ হয়ে যেতো তাহলে বোধ করি আজ স্বাভাবিক হতে পারতো । কী দেখেছিলো সে ? দেখেছিলো সরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ বেশি পরিমাণে মিলিয়ে দিয়ে খুন করা হয়েছে বৃদ্ধকে ।

কেন ?

কারণ তিনি জেনে ফেলেছিলেন যে বৃদ্ধাশ্রমের আড়ালে দেহ ব্যাবসা চালায় হালদার । দেহ দেয় তার অবিবাহিতা বোন, আশ্রমের সুন্দরী চাকরানি ও গ্রাম থেকে তুলে আনা মেয়েরা । এক প্রস্টিটিউট র‍্যাকেট । কমবয়সী কিছু বোর্ডারও আসলে দেহ উপজীবিনী । বিভিন্ন মানুষ আসেন পেছনের দরজা দিয়ে কিংবা কখনো কখনো সামনে দিয়েও । এমনিতেই হালদার স্কুল টিচার হলেও বেশ ধনবান । বলে : পৈত্রিক পয়সায় বড়লোক । চড়ে একটি গাড়িও । আশ্রমের তহবিলের টাকা সরানো ছাড়াও প্রস্টিটিউশনের ব্যবসা করে মন্দ কামায় না । ছেলে পড়ে পাহাড়ের দামী স্কুলে । মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে, মাইক্রো বায়লজি । তাদের স্কুলে-কলেজে হালদার খুবই সম্মানিত ব্যাক্তি কারণ সে সোসাল ওয়ার্ক করে, অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার শেষ ভরসা, অপরাহ্নের আলো ।

এছাড়া প্রাচীন দেবী চন্ডিকার মন্দিরের পূজারি তাঁরাই । মায়া দেবী তো সাক্ষাৎ অন্নপুর্ণা । সাইবার যুগে, বঙ্গ জীবনের ছাই ফেলতে ভাঙা কূলো আজকের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা যাঁর পাদ পদ্মে অর্পিত তিনিই ওদের প্রাণপুরুষ অর্থাৎ পিতা হীরক হালদার ।

বাচ্চাদের মাথা উঁচু হয়ে আছে শীরস্ত্রাণের হীরক দ্যুতিতে ।

# শিলালিপি

সুজিত আর অমল দুই বন্ধু । গভীর বন্ধুত্ব দুজনের । নিবাস মধ্য ভারতের এক আধা শহরে । নাম কৃষ্ণরাজপুর ।

দুজনেই পড়াশোনায় তুখোড়, বেশি ভালো অমল কিন্তু ক্লাসে প্রথম হয় সুজিত । অমল ইঁদুর দৌড়ে থাকে না সে নিজের মতন জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়ে চলে । ক্লাসে সে প্রথম দশজনের মধ্যে থাকে।

সুজিত অঙ্কে কাঁচা তাই অমলের হেল্প নিয়ে উৎরাতে হয় । অ্যালজেব্রাতে ব্র্যাকেটের বাইরে মাইনাস কমান নিলে ভেতরে কোন সাইন কিরকম হবে ওর বরাবর গুলিয়ে যায় । ওদের অবস্থা খুব ভালো । বনেদী বলা চলে ।

বিরাট গাড়ি করে স্কুলে আসে। বাবার অনেক ব্যবসা আছে । অমল সাধারণ ঘরের ছেলে । বাবা ছাপোষা কেরানি । দুজনের এক বান্ধবী আছে । নাম স্বস্তিকা । সুন্দরী, তবে সরলা নয়, বরং হুল ফোটাতে পটিয়সী ।

দুজনেই ওকে ভালোবাসে । মেয়েটি কিন্তু ভালোবাসে সুজিতকে ।

অমলের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব রেখে চলে । অমল দু:খ পায় কিন্তু প্রকাশ নেই । হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে অমল ও সুজিত দুজনেই মেডিক্যাল পড়তে গেলো । অমল গেলো স্কলারশিপের টাকা নিয়ে ।

পড়া শেষ করে সুজিত চলে গেলো ইংল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষা নিতে । অমল এই আধা শহরেই প্র্যাকটিস শুরু করলো । স্বস্তিকা অপেক্ষা করে রইলো ।

একদিন সুজিত নিজের পড়া শেষ করে ফিরে এলো জন্মস্থানে । বিয়ে করলো পছন্দের মেয়েটিকে যে এতগুলো বছর সোসাল স্ক্যান্ডেল নিয়ে আলাপ চারিতায় দিন কাটিয়েছে । এসব করতে খুব ভালোলাগে । কে কোথায় হাঁচতে গিয়ে কেশেছে, কে কোথায় কার সঙ্গে পালালো, মফ:স্বলের কোন ব্যাক্তি ইংরেজি বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে ইত্যাদি ।

টিপিক্যাল মহিলাসুলভ ঈর্ষাকাতর স্বভাব । কারো ভালো সহ্য করতে পারেনা । নিজের বোনকে দেখতে দু পায়ে দাঁড়ানো শুয়োরের মতন, আড়ালে লোকে বলে বরাহ নন্দিনী-- কিন্তু সেটা ওভারলুক করে দুনিয়ার সব অসুন্দর মেয়েদের বাক্যবাণে জব্দ করে । কেউ লজিক্যালি চেপে ধরলে তাকে উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়ে দেয় । এই অশেষ গুণবতী মেয়েটির থাকার মধ্যে আছে ইংরেজি বুলি কপচাবার ক্ষমতা ও রূপ । সে দুটিকে সম্বল করেই সে দিন গুজরান করে । লোকের কথা নিয়ে টস করা আর করার সময় একটু রং চড়িয়ে দেওয়া এই করে করে বহু লোক চিনে নিয়েছিল সে । দেখেছে লোকেরা কি গভীর বিশ্বাসে মনের কথা খুলে বলে ওর কাছে । ওকে খুব বিশ্বাসী ভাবে । আর অনাবসী ডাক্তার প্রেমিক তো উপরি পাওনা । বন্ধু মহলে আলাদা সমীহ আদায় করে নেবার চমৎকার রাস্তা শুধু সে জানতো না সুজিত বিদেশে পড়ার সময় অসংখ্য সাদা মেয়ের শয্যা সঙ্গী হয়েছিলো । একটি মেয়ে তো সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছিল । দেশে সুন্দরী বান্ধবী তো জানে সে বিদ্বান, রুচিবান । আলো নিভলে কার ঘরের খবর কে আর রাখে ?

- স্বস্তি, বিয়ে হলে আমাদের ভুলে যাবি না তো ?

- ধুস ! কি যে বলিস ! বন্ধুদের কি ভোলা যায় ? আর আন্তর্জাল তো রইলোই । বোতাম টিপে উড়ে যাবি মহাশুন্যে । মিষ্টি হেসে গড়িয়ে পড়ে স্বস্তিকা ।

- আর অমলের কি হবে ? দুষ্টু বান্ধবী তানিয়ার জিজ্ঞাসা ।

কোন উত্তর দেয়না স্বস্তিকা । অমল তাকে ভালোবাসে সে জানে । কিন্তু সে তো ওকে বন্ধু ব্যাতীত কিছুই ভাবেনা ।

আর কারো মনের ওপর যেমন কারো হাত নেই সেরকমই কাউকে ভালো না লাগলেও নিশ্চয়ই কেউ জোর করতে পারেনা । এটা স্বস্তিকার বিশ্বাস । আর কাউকে হ্যাঁ না বললে যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবেনা এটাও সে মানতে নারাজ । এক বিন্দু খোরাকও হারাতে সে রাজি নয় ।

কৃষ্ণরাজপুরের কাছেই আছে এক গভীর অরণ্য । সেখানে যদিও হরিণ বধ নিষেধ তবুও মাঝে মাঝে এই শহরের রাঘব বোয়ালের জন্য হরিণের মাংস চালান হয়ে আসে, ১০ কিলো, ১২ কিলো ।

খুব সুস্বাদু । সেদিনও এক পেটি মাংস প্রতিবারের মতন এসেছে অমলের বাবার অফিসে বড় সাহেবের জন্য ।

সেখান থেকে কিছুটা ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে এলেন । উনি অফিসের বড়বাবু । হেড ক্লার্ক । সবাই খাতির করে । আর বড়সাহেব তো সবসময় থাকেন না ! তখন ঐ ভরসা ।

বাড়িতে অবশ্য অমল এই মাংস খায়না, ভালোলাগেনা বলে নয় কষ্ট হয় । হরিণের মতন নিরীহ জীব যারা বধ করতে পারে তারা মানুষও মারতে পারে বলেই ওর ধারণা ।

জঙ্গলে ভাল্লুকের উপদ্রব আছে । একবার স্বস্তিকা একা সন্ধ্যা বেলা কোন জায়গা থেকে ফিরছিল । পথে পড়ে এক ফার্মহাউজ । সেখানে রাতের দিকে ভাল্লুক আসে । স্বস্তিকা একটি কে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠতেই সেটি এসে ওকে জাপটে ধরে, তারপর হুটোপুটি করতে গিয়ে দুজনে মিলে গড়িয়ে যায় খাদ বরাবর । বেশি চোট লাগেনি অবশ্যই ।খুব হেসেছিল অমল- শেষ অবধি তোমাকে ভাল্লুক জড়িয়ে ধরলো ! হা হা হা !

হাসিটা যেন একটু বেশি জোরেই হাসছিল অমল- হাসির সঙ্গে মিশে ছিল এক অবর্ণনীয় কষ্টের চোরাস্রোত ।

স্বস্তিকা মৃগ সংবাদ পেয়েই অমলের বাড়ি এসে পেট পুরে খেয়ে গেলো, সঙ্গে অনেক বচনামৃত পান করালো অমলকে । এই ছোট্ট চত্বরে কোথায় কি ঘটছে সব তার নখদর্পণে । কাজেই হরিণের মৃতদেহ আগমণের সংবাদ জানা বিচিত্র কি ? আর বিয়ের পর সুজিত সেই যে গেছে তো গেছে । স্বস্তিকার ভিসা মেলেনি বলে ও অপেক্ষা করে আছে । ছাড়পত্র পেলেই ডানা মেলে দেবে প্রিয়তমের সঙ্গ পেতে । বিদেশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে । কত স্বপ্ন কত আশার জাল বিছিয়ে সে অপেক্ষা করে আছে । আর কার হাঁড়িতে কি ফোড়ন পড়লো সে সব তো আছেই, শুনেছে বিদেশে ওগুলো সাধারণতঃ লোকে করে না তাহলে কি ? ইন্টারর্নেট আছে তো ! আছে ডিসকাশন ফোরামের নামে পি এন পি সির প্ল্যাটফর্ম । সেখানেই দ্বিপ্রাহরিক ভাত হজম করে নেবে ! শুধু হাই কমিশনের ঝামেলাগুলো যদি না থাকতো কবেই চলে যেতো !

সাংসারিক আঁচ লাগা আধপোড়া স্বস্তিকাকে একদিন এসে নিয়ে গেলো সুজিত । পাড়ি দিল সফেন অতলান্ত । হাজির হল এক সব পেয়েছির দেশে ।

অমল আজকাল দূরের কেল্লায় যায়, সেখানে অনেকটা সময় ব্যয় করে । পথে পড়ে অনেকগুলো ভগ্ন স্তুপ । সেখানে প্রাচীন কোন ভাষায় অনেক শিলালিপি আছে । কেউ পড়তে পারে না । যুগ যুগ ধরে ওগুলো অনাদরে পড়ে আছে ।

কি লেখা জানার কৌতুহল হলেও উপায় নেই । মনে মনে ভাবে কোনদিন যদি সুযোগ হয় তাহলে এই লিপি উদ্ধারের চেষ্টা করবে । দেখা যাক ।সুজিত তো বিদেশে জাঁকিয়ে বসেছে । স্বস্তিকাকে বিয়ে করাতে খুব দু:খ হয়েছিল অমলের, ওর সঙ্গে হলনা ! কিন্তু কি আর করা মিয়া বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি ! জানা ছিল তাকে সে কোনদিনই পাবেনা তবুও যখন অন্তিম মূহুর্ত এলো তখন বুকের ভেতরটা খালি খালি লাগতে লাগলো । বিয়েতে অবশ্যই ও যায়নি । ওরাও কোন অনুযোগ করেনি কারণ ব্যাপারটা আঁচ করা সহজ । স্বস্তিকাকে যে সে ভালোবাসতো তা তো ওরা মিয়া বিবি দুজনেই জানতো । বরং ভেঙে পড়া মনটা সারাতে কদিনের জন্য চলে গেলো উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় । শিপ্রা নদীর ধারে এই মহা সম্মেলন হয় । হিন্দু ধর্মের এক মহা পুণ্যময় তিথিতে।

নানান সাধুর সঙ্গে মোলাকাৎ হবে, কিছু উপদেশ হয়ত মিলতে পারে কি করে জীবনে শোকতাপ সহ্য করেও বাঁচা যায় । আর কুম্ভমেলায় যাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার । অতএব এক শুভক্ষণে তল্পি তল্পা বেঁধে সে রওনা দিল ।

কত সাধু সন্ত এসেছে । কেউ নাঙ্গা তো কেউ ৩০০ বছরেও চাঙ্গা । কেউ ছাই মাখা তো কারো দেহ অষ্ট বাঁকা । তবুও চলে তপস্যা । ধ্যান । আধ্যাত্মিক চেতনা প্রস্ফুটিত হয় । ভোর বেলা বিদায়ী কুয়াশায় কত মানুষ স্নান করছেন । কত মানুষ ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছে নিজেদের তাঁবুর সামনে । বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ।

কি প্রচন্ড বিশ্বাস নিয়ে এক একজন এসেছেন এই পুণ্য সম্মেলনে ।

বড় বড় সাধকেরা বলে গেছেন মনই আসল, মনকে কন্ট্রোল করলেই সাধনা হয় তার জন্য বনে যাবার প্রয়োজন নেই । সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপন করলে আপনিই মানুষের মঙ্গল হয় সব ক্ষেত্রেই । এইসব শুনেছিল অমল । আজ হাজার হাজার সাধুর সমাবেশে তার মনে হল এও এক গৃহ এও এক মিলন মেলা যার আকর্ষণ কিছু কম নয় গৃহীদের কাছেও । এর টান অন্য রকম ।

মেলায় এক প্রাচীন ব্যাক্তির দেখা পেলো যে ঐ শিলালিপির কথা জানে । শুধু জানেই না সে পড়তেও পারে ।

অমল লাফিয়ে উঠলো । তার পর সেই সাধুর সঙ্গেই চলে এলো তার তাঁবুতে । সন্ধ্যের অন্ধকারে চারপাশ কেমন রহস্যময় । আকাশের বুকে রাতপাখির কর্কশ ডাক দ্বিখন্ডিত করছে ভজনের মিষ্টি সুর ।

- বেটা পি লে !

সন্ন্যাসী গরম চা দিলেন । আর কিছু নিমকি । অমল তৃপ্তি করে খেলো ।

তার পরে সময় বার করে রাতের আঁধারে শিবিরে বসে একটা কুপী জ্বালিয়ে সে নামলো লিপি উদ্ধারের কাজে । ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে খুব অল্প সময়ে শিখে নিলো

অক্ষরমালার কারসাজি । সাধু প্রচুর জানেন । খুব জ্ঞানী ব্যাক্তি । প্রতি বার কুম্ভ অ্যাটেন্ড করেন । মিনি কুম্ভ, মহা কুম্ভ, অর্ধ কুম্ভ সবই । হিমালয়েই বসবাস । জানলো লাহিড়ি মহাশয়ের গুরু মহাবতার বাবাজিও কুম্ভে আসেন । ওনার কত বয়স কেউ জানে না । আর হিমালয়ে ওনার যেই গুহা আছে সেখানে উনি না চাইলে কেউ পৌঁছাতে পারেনা ।

তারপর মেলা শেষে সেই ব্যাক্তির সঙ্গে উজ্জয়িনী থেকে চলে গেলো আলমোড়া । সেখানেই সেই ব্যাক্তির আবাসস্থল । কিছুদিন তার ছত্রছায়ায় থেকে ঐ প্রাচীন ভাষায় বেশ চোস্ত হয়ে উঠলো । ভাষাটির নাম ভীমভবানী ভাষা । এর প্রচলন ছিল কেবল মধ্য ভারতেই । ভগবতী চেতনার আরাধনার সময় এই ভাষাতেই ঐ অঞ্চলের মানুষ স্তোত্র পাঠ করতো । মন্ত্র জপতো । ভাষাটি সংস্কৃত নয় আদপেই তবে সংস্কৃত ঘেঁষা । খুব শ্রুতিমধুর ভাষা । অমল শিখে নিল ।

তারপর নিজের শহরে ফিরে সেই সব লিপি উদ্ধারে ব্রতী হল ।

দেখলো সেই সব শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র । তাতে অনেক জটিল ব্যাধির সমাধান উল্লেখ করা । অমল লেগে পড়লো গবেষণায় । দিন রাত এক করে দিল । একটি সুত্র ধরে সে পৌঁছাতে চায় কর্কট রোগের সমাধানে । এমন একটি ঔষধ যার প্রয়োগে নির্মূল হবে যেকোন ধরণের ক্যান্সার । রোগী দেখা বন্ধ করে দিল । বাবা চাকরিতে ছিলেন তাই পয়সার অসুবিধে হলনা । বাড়ির লোকে উৎসাহই দিল । এবং পাক্কা ১০ মাস পরে সে বার করতে সক্ষম হল সেই মহৌষধের ফর্মূলা ।

বিভিন্ন ভেষজের সমাহারে বিশেষ করে দূর্বা, তুলসী ও নয়ন তারা ফুলের পাপড়ি ও পাতার সমাবেশে সৃষ্টি হয়েছিল এক ঔষধ যার সাহায্যে সেরে যেত যেকোন ধরণের কর্কট রোগ । আজ থেকে ২৫০০ বছর পুর্বে ছিল এই ব্যবস্থা ।

অমল বিমোহিত । চমৎকৃত । মানব জাতির কল্যাণে ভীমভবানী লিপিতে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা এই সম্পদ স্বয়ং ঈশ্বর তার হাতে ওষুধ তুলে দিয়েছেন । মা ভবানী, শক্তিরূপিনী জগদম্বে । যাকে আজকাল কিছু খবরের কাগজের দৌলতে কিছু পাতি লেখক ও কবি *মা -বোন* বানিয়ে ছেড়েছে । যাদের কোন ধরণাই নেই এই কসমিক এনার্জির ব্যাপ্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে । কিছুটা আঁচ করতে পারে যখন কোন দূর্ভোগ হয় । কুকর্মের শাস্তি স্বরূপ জীবন হয়ে ওঠে যন্ত্রণা । তখন আক্ষেপ করে - আমার মতন ভালো মানুষের এরকম হল কেন ?

পেছনের জীবনটা দেখা যায়না তো ! সেটা কতটা কুহেলিকাময় । কতটা আঁধারে ঘেরা । দায়ী হয় বেচারি মা ভবানী !

লেগে পড়লো অমল কাজে । অনেক পরিশ্রম করে সে তৈরি করলো একটি ডোজ । এবার পরীক্ষা করতে হবে । কাছেই ছিল এক যুবক, লিভার ক্যান্সারে প্রায় শেষ অবস্থা । ওর বাড়ির লোকের অনুমতি চইলো অমল । ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার অমলকে সকলেই খুব শ্রদ্ধা করতো । আর মেডিক্যাল সায়েন্স তো জবাব দিয়েই দিয়েছে কাজেই অমল যদি ভালো না করতে পারে খারাপ কিছুই হবেনা সেই জন্য বাড়ির লোক মত দিল ।

এরপর প্রয়োগ হল ওষুধ । ছেলেটি কিন্তু ৩ মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলো । তারপরে দেহে আর কোন ম্যালিগনেন্সি পাওয়া গেলো না । একই ভাবে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হল ব্রেন ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, রক্তের ক্যান্সারে । এবং সবই সেরে গেলো পুরোপুরি । অমল ভাবলো প্রিয় বন্ধুকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবে ।

যোগাযোগ করলো সুজিতের সঙ্গে। সুজিত শুনেই লাফিয়ে উঠলো। একেবারে এসে হাজির হল দেশে।

ততদিনে ওর সঙ্গে স্বস্তিকার সম্পর্কেও একটা চির ধরেছে। একটু ভাঙন লেগেছে যেন।

স্বস্তিকাও এলো, বাবা মায়ের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে। দেখা হল অমলের সঙ্গেও।

অমলের নিঁখুত চোখ ধরে ফেললো ওদের বিবাহিত জীবনের ফাটল।

মুখে কিছুই বললো না যদিও। কুশল বিনিময়ের পরে অমল সুজিতকে তার গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ জানালো।

- তুই তো মিরাকেল করেছিস ! ক্যান্সারের ওষুধ বার করেছিস তাও প্রাচীন শিলালিপি ঘেঁটে আর এক ঢিলে সবগুলো কর্কট পাখি মারার ব্যবস্থা, এতো চমৎকার।

- হ্যাঁ, মৃদু হাসি অমলের মুখে, আমার কি মনে হয় জানিস ?

- কি ?

- স্বয়ং শিবশম্ভু আমাকে এই ফর্মুলার সন্ধান দিয়েছেন।

হেসে ফেলে সুজিত। - নাহ্ তুই দেখছি এখনো সে দেব দ্বিজের ফ্যানই রয়ে গেলি। কবে আধুনিক হবি ?

অমল মনে মনে ভাবে - এই শিলালিপি যেই কালে লেখা সেটা কি আধুনিক ছিলনা ? তা নাহলে আজও মানুষ এত গবেষণা করেও যেই ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেনি সেই ওষুধ এই লিপিতে কি করে লেখা রয়েছে ?

আধুনিকতা আর আদিমতার সংজ্ঞা গুলো খুব জানতে ইচ্ছে করে অমলের।

সুজিত বিশ্বের দরবারে মেলে ধরার জন্য ঐ ওষুধের কার্য প্রণালী ও ডিটেলস্ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিল। স্বস্তিকাও গেলো। সুজিত দেখলো এই ওষুধ বার করার কৃতিত্ব দেখাতে পারলে সে নোবেল পর্যন্ত পেতে পারে।

তবে লবি না তৈরি করতে পারলে হবেনা। কিভাবে লবি তৈরি করা যায় ?

সে ভাবতে বসলো। নোবেল প্রাইজ যাঁরা দেন তাঁদের মধ্যে একজন বিগ শটের মেয়ে মাল্টিপেল স্কেল্রোসিসে আক্রান্ত। সুজিত দেখলো এই সুযোগ। স্বস্তিকার সঙ্গে ঝঞ্ঝাট লেগেই ছিল। সে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লো সেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের রোগে আক্রান্ত মেয়েটির সঙ্গে। তার সাথে প্রেমের অভিনয় করে করে তার আস্থা কাড়লো। এবং একদিন ডাইভোর্স হয়ে গেলো স্বস্তিকার সঙ্গে। নতুন জীবন শুরু করলো সে নতুন স্বপ্ন নিয়ে।

স্বস্তিকা দেশে ফিরে এলো। বড় মনমরা সে। মাঝে মাঝে দেখা হয় অমলের সঙ্গে। তবে চেষ্টা করে এড়িয়ে চলার। ওর মনে হয় অমলের চোখ দুটো যেন বিদ্রুপ করছে।

নিশুতি রাতে মনে মনে নিজের সঙ্গে কাটাকুটি খেলে স্বস্তিকা। কি ভেবেছিল আর কি হল --মানুষ চিনতে তার এতবড় ভুল হল ? যেই সুজিতকে এত ভালোবেসেছিল, নিজেকে

সমর্পণ করেছে তার কাছে সে অনায়াসে এক বিদেশিনীর বাহুলগ্না হয়ে ভুলে গেলো স্বস্তিকাকে ?

বড় অবাক লাগে । মানুষের মন বলে আজকাল কোন পদার্থ নেই নাকি ?

ভালোবাসার ভাষা তো বিস্মৃত হয়েছে স্বস্তিকা । কি করে সে বাকি জীবনটা কাটাবে ? একাকিনী এক অবলা নারী হয়ে সে কি পারবে ভারতের মতন কৌতুহলী দেশে নিশ্চিন্তে জীবনতরী পার করতে ?

জোড়া জোড়া চোখের প্রশ্ন চিহ্নগুলো তাকে বড্ড বেদনা দেয় । তার আর সুজিতের জীবনের অলিখিত কাহিনি সবাই জানতে চায় ।

বিদেশে এক পাতাঝরা মরসুমে শুকনো পাতায় ঢাকা পথ ধরে চলেছে সুজিত । হাতে ধরা একটি হুইলচেয়ার ।

তাতে বসে রয়েছে এক মেমবধূ । টুকরো টুকরো সংলাপ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে নবোঢ়ার হাসি ছড়িয়ে পড়ছে চিকন রোদের ফাঁক দিয়ে ডালে ডালে শাখায় শাখায় ।

- তুমি তোমার এক্স ফ্লেম কে মিস করোনা জিট ? রেনী, সুজিতের বর্তমান স্ত্রী জিজ্ঞেস করে ।
- হঠাৎ এই প্রশ্ন ?
- না এমনি, জানতে চাই ।
- না একেবারেই না বরং মনে হয় ওর সঙ্গে যে কটাদিন কাটিয়েছি আমি সেগুলো সবই মিথ্যেদিন ।

তার কোন সত্যতা নেই । শুধু শুধু মরীচিকার পেছনে ঘুরে মরেছি ।

হা হা হা, হেসে ওঠে সুজিত । হেসে ওঠে রেনী । রেনী জোন্স মুখার্জী । সুজিত মুখার্জীর পত্নী ।

রেনী খুব ভালোবাসে সুজিতকে । ওর এই অসুখটার জন্য ও ভেবেছিল কোনদিন বিয়ে হবেনা ।

একজন সঙ্গী ছিল যদিও সে নপুংসক । দুজনে বন্ধুর মতন থাকতো । তারপর সুজিত আসতে ওরা গভীর বন্ধু হল এবং বিয়েও তো হয়েই গেলো । সুজিত ওর স্ত্রীর সঙ্গে সুখী ছিলনা । রেনীর পান্ডিত্য ও গভীরতা ওর ভালো লেগেছিল । রেনী তো ঘরে বসে বসে কত বই পড়তো কত জানতো । টেগোর, নেহেরু, রাজ-নার্গিস সবার কথা ওর জানা ছিল শুধু জানা ছিলনা যে ইন্ডিয়ার বৌ হবে সে একদিন ।

আজকালও বেশি সময় কাটায় বই পড়ে কারণ সুজিত আজকাল খুব ব্যস্ত থাকে গবেষণার কাজে ।

একটি ফর্মুলা সে আবিস্কার করেছে যা দিয়ে ভেষজ ওষুধ তৈরি করা যায় সেটা যেকোন ধরণের ক্যান্সারের নিরাময় করে । এখন নানান ড্রাগ কোম্পানির সঙ্গে কথা চলছে । ওরা বাণিজ্যিক ভাবে ওষুধ তৈরি করবেন ।

সামনেই নোবেল প্রাইজ দেবার দিন আসছে । ওর এই কীর্তি নোবেল কমিটির সম্মুখে পেশ করা হয়েছে ।

রেনীর ভাই যথাসাধ্য করছে । এক ভারতীয় হিসেবে চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য সে নোবেল পেলে খুব ভালো হবে । নোবেল তো দেওয়া হয় মানব জাতির জন্য বিশেষ কোন উপকার করলে । এই উপকারের চেয়ে বড় উপকার বর্তমান যুগে আর কিছু হয় নাকি ? ক্যান্সারের মতন মারণ ব্যাধির চিকিৎসা তাও একটি মাত্র ঢিলে -- এ তো চমৎকার ।

প্রাচীন শিলালিপি পড়ে এই ওষুধ বার করেছি আমি - সুজিত হেসে ওঠে ।

- হ্যাঁ আমি জানি তোমাদের ভারতীয় সভ্যতা, দর্শন খুব উন্নত ছিল । তোমাদের হেরিটেজ, আমি বিভিন্ন বইতে সব পড়েছি । রেনি মিষ্টি করে হেসে ওঠে । আজ বড় সুন্দর লাগছে ওকে ।

আকাশী স্কার্ট ও গোলপি মানানসই জামা পড়েছে । একঢাল সোনালী চুল পিঠ ছাপিয়ে নিচে নেমেছে ।

আজ তার ভ্রপল্লবে ফাগুনের ডাক । শীত তো কেটে গেছে প্রায় । আসছে বসন্ত তাই তো হিয়া চঞ্চল ।

আনমনা হয় হৃদয় যেই তাতে বসন্তের ছোঁয়া লাগে ।

আর সুজিতের হৃদয়ে তো চিরবসন্ত কখনো সে ধরা দেয় স্বস্তিকা হয়ে কখনো রেনী ।

অমলের আজকাল একটা নতুন নেশা হয়েছে । পুরনো পুঁথির পাঠোদ্ধার । দেখছে কত চমকানোর মতন আবিস্কার করছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা । আজ সেসব কোথায় হারিয়ে গেছে । একটি ওষুধ থেকে সেরে যায় মধুমেহ রোগ । একটি গাছের বল্কল থেকে তৈরি হয় তার ওষুধ । একটি পাতার নির্যাস থেকে তৈরি করা যায় এমন ওষুধ যা দিয়ে সেরে যায় পার্কিনসনস্ ডিজিজ । নামটা অবশ্য ভিন্ন ।

অ্যালোপাথির খোঁচায় কোথায় হারিয়ে গেলো এই চিকিৎসা বিজ্ঞান ? যাকে ভেষজবিদেরা বলেন ইংলিশ ওষুধ

তার তো কত শত সাইড এফেক্ট । আধুনিক বিজ্ঞান তো চমকে যাবে এইসব সামনে এলে ।

মরা মানুষ বাঁচানো যায় না ? দূর কি আবোল তাবোল ভাবছে ! মানুষ বেঁচে থাকলে পৃথিবীতে তো কুলাবে না । তখন অন্য গ্রহে যেতে হবে, সেইখানে কি এমনি যাওয়া চলে ? কত শত বাধা রয়েছে ।

অমল সকালে উঠে এইসব পুঁথি নিয়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে তারপর প্রাতরাশ সেরে যায় হাসপাতালে ।

সে তো ধ্বনন্তরি ! সে তো খুব লোকপ্রিয় চিকিৎসক এই এলাকার । তার হাতের স্পর্শে সব রোগ দূর হয়ে যায়,

প্রচলিত আছে -- ডাক্তার অমল ঘরে ঢুকলেই রোগ সেরে যায় ।

স্বস্তিকা ফিরে এসেছে । সুজিতটা যে কি করলো ওর সঙ্গে । সত্যি মানুষ চেনা বড় কঠিন । সারাটা জীবন একছাদের তলায় থেকে স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে চিনতে সক্ষম হন না । আর এতো ছোটবেলার বন্ধু !

- অমল অমল, কার যেন উত্তেজিত গলার আওয়াজ ভেসে আসে।

স্বস্তিকা হাতে একটা কাগজ নিয়ে খুব দ্রুতপায়ে এসে ঘরে ঢোকে - অমল, অমল আমার জীবন গেছে আমি পরোয়া করিনা কিন্তু তোমাকে সে এইভাবে ঠকালো কি করে ? এই জঘন্য রাজনীতি সে কোথায় শিখলো ?

অমল অবাক চোখে চেয়ে থাকে । কিছুই বুঝতে পারেনা স্বস্তিকার কথার মাথামুন্ডু । আর আজকাল স্বস্তিকা তো তার কাছে আসেও না । হঠাৎ কি এমন হল ?

খবরের কাগজ থেকে কালো কালো গোটা গোটা অক্ষর গুলো যেন গিলে খেতে আসছে অমলকে ।

ক্যান্সারের ভেষজ ওষুধ বার করে এই বছরের নোবেল পেলেন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী সুজিত মুখার্জী ।

বহু পুরনো কোন ভারতীয় শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে উনি এই ঔষধ আবিস্কার করেছেন ।

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসক রাজবৈদ্য জীবক এই ঔষধের কথা জানতেন ।

এই অভূতপূর্ব ও আশ্চর্য ঔষধের জন্য নোবেল কমিটি ওঁনাকে এই বছরের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করছে ।

স্তব্ধ অমলের চোখ বেয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে, স্বস্তিকার চোখ এড়ায় না ।

- আমার তো সব গেছেই অমল কিন্তু তোমার মতন সৎ আত্মাকে সে এইভাবে প্রতাড়না করলো? তুমি না বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে তাকে এই ফর্মুলাগুলো দেখিয়েছিলে ?

অমল নীরব । অনেকক্ষণ পরে সে শুধু বলে- তুমি কি আমাকে গ্রহণ করতে পারো স্বস্তিকা ? আমি নতুন করে সব শুরু করতে চাই ।

স্বস্তিকার চোখের পাতা ভিজে উঠছে ।

কথায় বলে সব কাজেরই দুটো দিক থাকে । সুজিত এই পদক্ষেপটা না নিলে অমলের জীবনে হয়ত এই মূহুর্ত আসতো না কোনদিনই । আবার বেঁচে গেলো রেনী । গেলো কি ? নাকি আবার নতুন কোনো নেশায় মেতে উঠলো এক কামুক বিজ্ঞানী ? যার কাছ জীবনের অর্থ -ভোগ, নাম, অর্থ ও প্রতিপত্তি এবং সবই অসৎ পথে ।

রেনী আজ আনন্দে কেক বানিয়েছে । মায়ের কাছে শেখা । অসুস্থ শরীরে কোন জোর নেই তবুও হেল্প নিয়ে কেকটা তৈরি করেছে, একটু পুড়ে গেছে হয়ত । উনুন থেকে দূর্বল হাতে কেকের ভঙ্গুর দেহখানি বার করে সে ধপধপে সাদা ন্যাপকিন পেতে সাজিয়ে দেয় গোলাপী গোলাপী প্লেটে ।

বহু দূর দেশে সদ্য নোবেল লরিয়েট হওয়া, রাতঘুম ভাঙা এক বিজ্ঞানী নরম গদিতে পা ডুবিয়ে স্ত্রীর অভিনন্দনে কালো দন্ত বিকশিত করে -- আদিম মানবের সভ্য হবার প্রচেষ্টার

মতন দাঁত চেপে সাহেবী কথামালা উচ্চারিত হয় । যশের কাঙাল কেক সংকারের জন্য লোমশ দানবীয় হাত বাড়ায় আধুনিক মানুষি কায়দায় ।

দূরে ঘন্টা বেজে ওঠে, তমাল বনে ছাওয়া পাহাড়ি পুরাতন মন্দিরে । নিঃসঙ্গ এক নারীর হাতে হাত রেখে জীবনপুরের পথিক অমল বলে ওঠে- দুঃখ করোনা স্বস্তি, নোবেল মানে তো একটা মেডেল, একটা স্বীকৃতি । তার চেয়ে অনেক বড় এই মহাবিশ্বের রহস্যময় সৌন্দ্যর্য, বিপুল ঐশ্বর্য । দুনিয়ার যেকোন ভালো জিনিস উপলব্ধি করতে হয়, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায়না । অন্তর দিয়ে স্পর্শ করতে হয় ।

সেই স্পর্শলোভে চল না আমরা অসীমের পথে চলা শুরু করি, আজ থেকেই ।

# কয়েদি নম্বর ৪২০

কৃষ্ণকালো শিলাখন্ড বেষ্টিত ধনেশ্বরপুরাতে আছে চির কুয়াশামাখা লৌহকপাট । বড় বড় লোহার গরাদের আড়ালে দুজন কয়েদী বসে শক্ত মেঝেতে নিজমনে কাটাকুটি খেলে চলে । পরণে জেলের পোষাক । একজন উদাস অন্যজন চঞ্চল । কেউ কারো সাথে বিশেষ কথা বলেনা ।

দিনগত পাপক্ষয় চলে আপন গতিতে । একজন ডাকাতির আসামী অন্যজন খুনী। ডাকাতির আসামী লছমন সাউ । এক বিহারি ডনের ডানহাত ছিল সে ।

অন্যজন যার জেল নাম কয়েদি নম্বর ৪২০ তার সম্বন্ধে লছমন কিছুই জানতে পারেনি । বহুবার চেষ্টা করেছে নানান আছিলায় ওর পেট থেকে কথা বার করতে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । ৪২০ কোন কথাই কয় না ।

নিজের মনে থাকে, জেলের কাজ করে । অবসর সময় গীতা পাঠ করে ।

সেদিন ছিল পূর্ণিমারাত । জেলের কঠিন আবেষ্টনী ভেদ করে চাঁদের আলো চুইয়ে পড়ছিল মেঝেতে । বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসা পরিবেশে রোমান্টিক মনের আসামী ৪২০ আজ যেন একটু খোলামেলা । মনটা ফুরফুরে ।

রক্ষীর কাছ থেকে একটি বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বসলো আয়েষ করে ।

মেজাজ দেখে অন্যজন সাহসে ভর করে বললো : আজ যে বড় খুশি খুশি লাগছে কত্তা ! কত্তা স্বভাব বিরুদ্ধ একমুখ হাসি হেসে মাথাটা দেওয়ালে হেলিয়ে বসলো ।

সামান্য কিছু বাক্যালাপ হল । তখন লছমন বললো, আপনার মতন গুরু গম্ভীর ও জ্ঞানী মানুষ জেলে তাও খুনের অপরাধে ? অবাক হলাম কত্তা । কত্তা চুপ করে আছেন । আরো এক পা এগিয়ে লছমন বলে - বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কত্তা, আপনাকে কেউ ফাঁসিয়ে দেয়নি তো ?

লোহার মতন শক্ত লোমশ হাতের আঙুল ভাঁজ করে মেঝেতে ঠক্ঠক্ করে বাজাতে বাজাতে সে কিছুক্ষণ পর এক কাহিনী মেলে ধরলো লছমনের সমুখে ।

সেই কাহিনীর নির্যাসই আমরা এখন শুষে নেবো গোটা গোটা কালো কালো অক্ষরমালা থেকে।

৪২০ এর আসল নাম কপিল উচ্চারণের দৌলতে যা দাঁড়িয়েছে কাপিল ।

কাপিল ছিল একজন আর্মি অফিসার । ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতো সৈনিক হবার । বাবা ছিলেন ডাক্তার । ইচ্ছে ছিল দুই ছেলেকেই ডাক্তার করবেন কিন্তু ছোটছেলে আর্মি জয়েন করার জন্য বেঁকে বসে । প্রথমে আপত্তি করলেও পরে পিতার সম্মতি মেলে । আর বড় ছেলে ভূষণ হল ডাক্তার পিতার ইচ্ছে অনুসারে । পড়াশোনায় ভালো ছিল সে ছোটবেলা থেকেই । এম বি বি এস পাশ করে মানুষের মনের রহস্য জানার জন্য পড়লো সাইকিয়াট্রি নিয়ে । হল মনোবিদ । ঘুরে এলো বিলেত । বিলেতফেরৎ ডাক্তার ভূষণ মালহোত্রা কিন্তু বিবাহ করলো না । জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে অবিবাহিতই রয়ে গেলো সে ।

ডাক্তার হিসেবে খুব তাড়াতাড়ি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো । নাম হল যশ হল । পেয়ে বসলো অর্থের নেশা । দিবারাত্রি এক করে দিয়ে সে রুগী দেখতো । টাকা টাকা অনেক টাকা চাই তার !

ব্যাঙ্গালোরের নিমহ্যান্স এ এসে কাজ করতে করতেই খুলে বসেছিল চেম্বার ।

কতনা রুগীর আনাগোনা ছিল সেখানে । বড় বড় শিল্পপতি থেকে মডেল, অভিনেত্রী এমন কি রাজনীতিবিদ পর্যন্ত । এই প্রবল বহতার যুগে সময় সঙ্কুলান । সবাই থপ খেতে চায় । এই থপ খাবার চক্রবূহ্যে ঢুকে বেরোবার পথ পায়না অনেকেই । তারা ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকে । সেইসব ত্রিশঙ্কু কে সরলরেখায় ফিরিয়ে আনাই ভূষণের কাজ কম্মোর মধ্যে পড়ে । সে জানতে পারে বড় বড় মানুষের কত গুপ্ত কথা, কেচ্ছা কাহিনী । তবে তার হাতযশ আছে । কোন রুগী তার দপ্তর থেকে খালি হাতে ফেরেনি । প্রথম প্রথম নিয়ে যেতো ওষুধ তার পর একরাশ সুস্থতা । নিশ্চিন্তি ।

--ডাক্তার ভূষণের সঙ্গে কথা বললে মনটা শিমূল তুলোর মতন ফুরফুরে হয়ে যায়, সমাজসেবিকা ও ধনবতী ফতিমা বেগমের রিনরিনে কন্ঠ বেজে ওঠে ।

ফতিমা বোরখাধারী হলেও অসূর্যম্পশ্যা নয় । বোরখার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে উজ্জ্বল দুটি চোখ ও গোলাপের পাপড়ির মতন মিষ্টি রং ।

সমস্যাটা হ্যালুসিনেশানের । কাদের কথা শুনতে পায়, ফ্যানে কে যেন ক্যামেরা বসিয়ে গোপনে ওর ছবি তুলছে এইসব ।

- ডাক্তার ওরা আমার পিছু ধাওয়া করছে, ডাক্তার ওরা আমার ইজ্জত নিতে আসছে, আমার একটা বুক অন্যটার চেয়ে টিপে ছোট করে দিয়েছে, আমি লোকসমাজে বার হব কি করে ? ডাক্তার আমাকে ওরা বলছে আমি নাকি বেশ্যা ! ডাক্তার ডাক্তার ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম আ হোর ?

কিছুদিন চিকিৎসা করার পরে ফ্লুয়ানজল নামে একটি ওষুধ খেয়ে এখন পুরোপুরি সুস্থ । তবে মেন্টেনেন্স ডোজটা খেয়ে যেতেই হবে । সারাটাজীবন ।

সেদিন যখন রাতের বেলা লোকটার ফোনটা এলো ফতিমা ঘুমিয়ে ছিল । রাতে সে খুব লাইট খায় । চিকেন স্টিউ সঙ্গে দু এক পিস ব্রেড আর এক কাপ গরম কফি । সাধারণতঃ সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই খেয়ে নেয় । শুয়েও পড়ে তাড়াতাড়ি । ওর আবার খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস । ভোরাইয়ের তালে তালে জগিং করে বাসায় ফিরে স্নান সারে । জগিং এর সময় মুখটা ঢেকে রাখে পাতলা ওড়নার মতন কাপড়ে । আর জগিং করে তো নিজেদের বিশাল বাগানে । দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ আরো কত গাছে ঢাকা ওদের বাগান । সেই ছায়ায় দৌড়ে বেড়ায় ফতিমা । তো যাইহোক ফোনটা ধরেছিল ঘুম থেকে উঠে । ভেবেছিল ঘুম চোখে কি শুনতে কি শুনেছে কিন্তু পরের দিন যখন ফোন এলো তখন গায়ে চিমটি কেটে দেখলো যে জেগেই তো আছে ।

মোটা টাকা দাবি করছে লোকটা । ব্ল্যাক মেলিং ।

ফতিমার সব গুপ্ত কথা লোকটা জানে । কিছুই আর রইলো না পর্দার আড়ালে । ওর নাম, ওর জনপ্রিয়তা সব ধূলায় মিশে যাবে যদি না লোকটাকে ট্যাকেল করা যায় । প্রথম দু একবার টাকা দিলোও সে । কিন্তু দিন কে দিন ওর চাহিদা বাড়তেই লাগলো । যেমন হয় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে । ভাবলো পুলিশকে জানাবে । কিন্তু তাহলে তো সবাই জেনে যাবে ।

ও তো হাফ সেলিব্রিটি, সোসাল ওয়ার্কার । এই রাজ্যে ওর সেবার কথা কে না জানে ? সুলভ শৌচালয়, আর্ট গ্যালারি, গরিবের জন্য ক্যান্সার ডিটেকশন সেন্টার সব তো ওর পয়সাতেই হয়েছে । কিন্তু ও যে মাইল্ড স্কিজোফ্রেনিক সেটা জেনে গেলে ওর সামাজিক সম্মানহানি তো হবেই উপরন্তু লোক ওকে পাগল ভেবে এড়িয়ে যেতে পারে । তাই দোনোমনা করেও শেষ অবধি সে টাকা দিতে লাগলো । কিন্তু ব্ল্যাক মেলার যখন অনেক উঁচুতে উঠে গেলো তখন বেঁকে বসতেই হল । অত টাকা দেওয়া তো সম্ভব নয়, আর দেবেই বা কেন ? এর একটা বিহিত করতেই হবে । কিন্তু কি করবে সে ? কিইবা করার আছে ? ক্রমাগত চাপে থেকে থেকে একদিন সে আত্মহত্যা করে বসে । মরার আগের দিন সন্ধ্যায় দেখা করেছিল একমাত্র সহোদরা তসলিমার সঙ্গে । তসলিমাকে সব খুলে বলেছিল । উপায় ছিলনা যে ! তসলিমাও জনতো না তার এই গোপন অসুখের কথা । সে মুষড়ে পড়লো । দিদি পাগল ? ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে আছে ? মেনে নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার । চিন্তার বিষয় তো বটেই । কিন্তু তাকে কোন চিন্তার সুযোগ না দিয়েই মারা গেলো ফতিমা । অসুখটা প্রথম ডিটেক্ট করেছিলেন ফতিমার স্বামী জালালউদ্দিন, তসলিমা তখন কাজের সুত্রে দুবাইতে । অবশ্য তার কয়েকমাসের মধ্যেই জালাল মারা যান হৃদরোগে । কাজেই ব্যাপারটি আর লোক জানাজানি হয়নি । কারণ ফতিমা তখন ওষুধ খেয়ে রীতিমতন সুস্থ । আর এগুলো তো লোক জানাজানির ব্যাপার নয় । বিশেষ করে এমন একজনের ক্ষেত্রে যার একটা সামাজিক পরিচিতি রয়েছে । দেওয়ালেরও তো কান আছে !

ডাক্তার ভূষণ বলেছিলেন : এত অল্প ডোজে আপনি সুস্থ হয়ে গেলেন এটা মিরাকেল, আপনার যা বডি ওয়েট তাতে এর বারোগুণ ওষুধ সেবন করলে সঙ্গে নেশা থেকে বিরত থাকলে তবেই সুস্থ হওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভবনা ছিল সেখানে এত অল্প ডোজে এত তাড়াতাড়ি আপনি ভাল হয়ে গেলেন এটা অবাক করার মতন ব্যাপার । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

- আপনি ঈশ্বর মানেন ? ডাক্তাররা আজকাল ঈশ্বর মানেন নাকি ? ফতিমা কৌতুহলি ।
- মানে বৈকি ! সব যে আমাদের হাতে নয় তা না বোঝার মতন মূর্খ ডাক্তার আমি জীবনে দেখিনি । কত রুগীকে মৃত্যুর পরে ফিরে আসতে দেখেছি । শরীর স্তব্ধ হয়ে গেছে তারপরে রুগী বেঁচে উঠেছেন । উঠে শুনিয়েছেন নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স । আমাদের মেডিক্যাল জার্নালে আমি এরকম অনেক ঘটনা পড়েছি ।

ফতিমা নিজের অজ্ঞানতায় একটু লজ্জিত হয় । বোরখার আড়ালে মুখ রাঙা হয়ে ওঠে ।

এমন উপকারী, ব্রিলিয়ান্ট একজন চিকিৎসক অকস্মাৎ খুন হয়ে গেলেন । হয়ত প্রফেশন্যাল জেলাসীর জন্য । কিন্তু নাহ্ ! পরে জানা যায় আসল সত্য । পারদের মতন তা তো চাপা যায়না ! ভর সন্ধ্যেবেলায় নিজের চেম্বারে এই ডাক্তার কার যেন ছুরিকাঘাতে মারা যান । নির্মমভাবে তাকে খুন করা হয়েছে । মুখটি ক্ষতবিক্ষত । থ্রিলারে পড়া খুনের মতন । চেম্বার থেকে কোন কিছু খোয়া যায়নি । মনে হয়েছে দেখে যেন খুনির আক্রোশ ডাক্তারের ওপরেই বেশি, কোন দামী বস্তুর ওপরে নয় । প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই খুন সেই ব্যাপারে পুলিশ নিঃসন্দেহ ।

তদন্তে জানা যায় এক রোগিনী মাংস কাটার ছুরি দিয়ে ডাক্তারকে খুন করেছেন । ভদ্রমহিলা মানসিক রুগী । বেশ কিছুদিন যাবৎ চেম্বারে যাতায়াত করছিলেন বলে জানা গেছে অন্যান্য

লোকেদের কাছে। ওনার রোগের প্রকোপ খুব বেশি যে ছিল তা নয়। আগেও যে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছেন এরকম কিছু নয়।

উনি ডাক্তারের চেম্বারে প্রথমবার এসেছিলেন একাই। ওনাকে যাতে ডাক্তার ভর্তি করে নেন তার জন্য পীড়াপিড়ি করেন। বহুদিন বিদেশে ছিলেন তাই দেশে সেরকম কোন আত্মীয় পরিজন নেই বলেও দাবী করেন। আর একা বলে ওনার বাড়িতে দেখাশোনা করার কেউ নেই। ডাক্তার ছিল অর্থপিশাচ অতএব অচিরেই রুগী স্থান পেলেন নার্সিং হোমে। সেখান থেকেই একদিন হঠাৎ হামলা করেন। গার্ড দোবারু ওকে দেখেছিল ভেতরে ঢুকতে। সঙ্গে একটা বই ছিল। তার ভেতরেই হয়ত ছুরি ছিল !

খুনি কিন্তু বেকসুর খালাস পেয়ে যায় মানসিক রোগের গ্রাউন্ডে। পাগলের তো শাস্তি হয়না কাজেই সে মুক্ত হয়। মানসিক হাসপাতালে কিছুদিন থাকার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে সুস্থ সবল জীবন আরম্ভ করে গোয়ায়, এক মিশনারি সংস্থায়, স্বেচ্ছাসেবী রূপে।

ডাক্তারের মৃত্যুর পর জানা যায় যে উনি নানাবিধ অসামাজিক কার্জকলাপে লিপ্ত ছিলেন। প্রথমত ওনার ছিল একটি ওষুধ তৈরির কারখানা। হিউজ প্রফিটে ওষুধ সেল হত। সেখানে জাল ওষুধ তৈরি হত। ৫ মিলিগ্রাম ওষুধের মধ্যে ৪ মিলিগ্রাম স্টার্চ আর বাকিটা ওষুধ ভরে দেওয়া হত। লোকের ওষুধে কাজ হতনা। তখন বেশি বেশি করে কিনতো। এছাড়া সার্জারির নাম করে কিডনি পাচারের যে চক্র সেই চক্রেও উনি একজন দালাল হিসেবে যুক্ত ছিলেন। পয়সার জন্য যে কোন কাজ করতে উনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। এমন কি পাগলিনির আড়ালে থেকে অনেক সুন্দরী ওখানে মধুচক্রের ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। সেজন্য হয়ত রাগে, ঘৃণায় ডাক্তারকে মেরে ফেলা হয়েছে। মেরেছেন এক সাইকো। অথবা বলা যায় মানসিকভাবে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত কোন রুগী। লোকে এইভাবেই ভেবে নিয়েছেন শুধু একজন ছাড়া। সে ডাক্তারের ভ্রাতা। সে চিনতো খুনীকে। কলেজে দু ক্লাস উঁচুতে পড়তো। সে জানতো মেয়েটি মানসিক রুগী কোনদিনই ছিলনা। কারণ কলেজ ছেড়ে আর্মি জয়েন করার পরেও সে মেয়েটির গতিবিধি জানতো কমন বন্ধুদের সুবাদে। মেয়েটি ছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ ও একটা সময় কপিলকে বেশ পছন্দও করতো, কপিল পাত্তা দেয়নি। আগে ভিন্ডিকটিভ ছিল বলেই যে এখন তার জেরে খুন করবে এগুলো কোন প্রমাণ হিসেবে খাড়া করানো যায়না আইনের কাছে। আইনের চোখে গাট ফিলিং বলে কিছু নেই, সবই প্রমাণে চলে।

ডাক্তারের ভাই পূর্ব পরিচিত ও এখন ওর প্রেমে পাগল এই রূপ ধরে স্বেচ্ছাসেবী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমায় কপিল। দিন কে দিন ঘনিষ্ঠা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে আলাপন, মেয়েটি কলেজের হারানো ভালোবাসাকে পেয়ে রীতিমতন উচ্ছ্বসিত। ছেলেটি ওকে বোঝায় যে তার ভাইকে মেরে সে কোন অন্যায় করেনি কারণ তার ভাই যে ধরণের অসামাজিক কাজ করতো তাতে সে মারা যাওয়াতে সমাজের উপকারই হয়েছে।

- কিন্তু আমি তো তখন অসুস্থ ছিলাম। মেয়েটি বলে ওঠে।

প্রায় দু বছর পরে ডাক্তারের ভ্রাতার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে মেয়েটি অবাক হয়। দুজনেই তো নিজেদের রক্তের সম্পর্ককে হারিয়েছে কিন্তু পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করার কায়দা একেবারেই ভিন্ন। আর দীর্ঘদিন মানসিক হাসপাতালে থেকে ও ক্লান্ত ছিল। গোয়ায় এসে এই স্বেচ্ছাসেবীর কাজ নিয়ে একটু দম নিল খোলা বাতাসে। অবসর সময় হারিয়ে যায় সবুজ প্রাঙ্গনে, গ্রামের পথে। গোয়ানিজ কুইজিন রান্না করে। সমুদ্রর সঙ্গে কথা হয়। আর এখন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সময় কেটে যায়। ভাবে অসুস্থ অবস্থার কৃতকর্মের জন্য যাতে কোন অনুশোচনা না হয় তাই হয়ত ছেলেটি এগুলো বলে। ছেলেটি আর্মি থেকে ভলেন্টারি

রিটায়ারমেন্ট নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে । ও অকৃতদার । পরে কোন ব্যবসা করবে বলে বদ্ধপরিকর ।

মেয়েটির ওকে ভালোলাগে, কলেজের দিনগুলোর মতন । কপিল তো হিন্দু আর মেয়েটি মুসলমান । কিন্তু ওদের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই । সাবলীল বন্ধুত্ব মেয়েটিকে স্বপ্ন দেখায় ।

ছেলেটির ওপর ওর নির্ভরতা বাড়তে থাকে । একদিন মনের কথা খুলে বলে ।

ছেলেটি কিন্তু এক কথায় নাকচ করে দেয় । বলে- তোমাকে আমি ভালোবেসেছি সত্য, গার্লফ্রেন্ডের আসনে বসালেও কোনদিন গৃহিনীর সম্মান দিতে পারবো না । জানি তুমি দুঃখ পাবে কিন্তু একজন মানসিক রুগী যিনি অনেকদিন মানসিক হাসপাতালে কাটিয়েছেন তাকে আমি পত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো না । হয়ত এটা আমার সীমাবদ্ধতা । কিন্তু আফটার অল আমিও তো মানুষ !

মেয়েটি খুব ভেঙে পড়ে । যদিও বা একজন বিশেষ ব্যাক্তি এলো মনের দুয়ারে যাকে কামনা করেছে যৌবনকাল থেকে, তাকেও হারাতে হবে ? একমাত্র বোনকে হারিয়েছে নিঠুর নিয়তির কাছে । কিন্তু এবার ? না আর সে হারাতে চায়না ! আর আইন তো তাকে ছেড়েই দিয়েছে, তবে ভয় কিসের ?

শান্তভাবে যেন কিছুই হয়নি এমন করে বলে ওঠে - আমি কোনদিনই মানসিক রুগী ছিলাম না । প্রতিহিংসায় তোমার ভাইকে আমি খুন করেছি । তুমি তো জানো তোমার ভাই কতবড় বদমাইশ ও লম্পট ছিল । সমাজসেবক ডাক্তারের আড়ালে বসে সে কি না করেছে ! সরল বিশ্বাস নিয়ে যে সব রুগীরা ওখানে যেতো তাদের মুখোশের অন্তরালে কিভাবে সে হেনস্তা করেছে । আমার দিদিকে দিনের পরদিন সে ব্ল্যাকমেইল করেছে মেডিক্যাল সমস্ত এথিকস্ জলাঞ্জলি দিয়ে । যেই সমস্ত কথা আমার দিদি একমাত্র তাকেই বলেছিল চিকিৎসার প্রয়োজনে সেইসব তথ্য বাজারে প্রচার করার ভয় দেখিয়ে নিয়মিত মোটা টাকা হাতিয়েছে সে, দিদিকে তার মধুচক্রের ব্যবসাতেও নামতে চেয়েছিল, চেয়েছিল শারীরিক সুবিধে ভোগ করতে রূপসী নারীর । মনের রোগের চিকিৎসক হঠাৎ হঠাৎ শাড়ি তুলে হাত দিয়ে দিত যোনিপথে, প্রশ্ন করলে বলতো - আমাকে তো আপনার ফিজিওলজিটা বুঝতে হবে !

তোমার ভাইয়ের কি এত অর্থের অভাব ছিল ? এত ফ্রাস্ট্রেশান ছিল কেন ? কেন ? আমার নিরীহ দিদি সমাজের এক উজ্জ্বল দীপ ছিল তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে ওর জন্য । ওকে কি আমি ছেড়ে দেবো ভেবেছো ? তুমি হলে দিতে ?

কিউপিডের তীরবিদ্ধ হয়ে যেই স্বীকারোক্তি সেই কথাগুলোই নিয়ে গেলো মেয়েটিকে মৃত্যুর দিকে, ছেলেটি তো এই দিনটারই অপেক্ষায় ছিল !

তারপর একদিন এক ভরা শ্রাবণে মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো এক জঙ্গলে । টক্সিক ফল খাবার ফলে ওর মৃত্যু হয়েছে । প্রথমে এটাকে একা একা বনে ঘুরতে ঘুরতে অচেনা কিছু খেয়ে ফেলা, অ্যাডভেঞ্চারের বশে, অর্থাৎ দূর্ঘটনা বলে ভাবলেও মৃতার এক কলিগের সন্দেহ হয় । সে পুলিশকে বলে যে মেয়েটি সেদিন একা ছিলনা । ছিল ঐ ছেলেটির সঙ্গে । ছেলে কপিল আর মেয়ে তসলিমা দুজনে একসঙ্গেই বেড়াতে গিয়েছিল অন্যসব ছুটির দিনের মতন । তসলিমা ছিল কপিলের দয়িতা । তারপর তসলিমা না ফেরায় পুলিশ সন্ধান করে ওর লাশ পায় বনের ভেতরে । একটি কাজু গাছের নিচে । ওর সমকর্মিনী পুলিশকে জানায় যে ও কোনদিন একা ওখানে বেড়াতে যায়নি । ওর প্রেমিক কপিল যেতো ওর সঙ্গে,

বরাবর । প্রেমিকার মৃত্যুর পর কপিলের কোন খোঁজ পায়নি পুলিশ । সন্দেহ দানা বাধায় পুলিশ সতর্ক হয় ।

কিন্তু দেরিতে হলেও কপিল মুম্বাই এর এক পুলিশ স্টেশানে গিয়ে নিজেই ধরা দেয় । বিচারে জানা যায় যে সে তার দাদার খুনের বদলা নিতে এই খুন করেছে । পুরোটাই ছিল প্রি -- প্ল্যানড্ মার্ডার । আইনের ফাঁক গলে পালানোর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু দম নিলো কয়েদি নম্বর ৪২০ ।

কিন্তু আপনি তো নিজের হাতে আইন তুলে নেবার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন তাহলে নিজে কেন মেয়েটিকে মারলেন ? লছমন অনুসন্ধিৎসু ।

একটু হেসে কপিল বলে ওঠে - কারণ আইন ওকে ছেড়ে দিয়েছিলো । আমি ওকে শাস্তি দিয়ে আইনের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি । আরে ভায়া আমি কোনদিনই ৪২০ ছিলাম না । ছিলাম এক দায়িত্ববান মিলিটারি অফিসার । আমাদের কাজ দেশেকে অমিত্রদের হস্তমুক্ত রাখা । তসলিমা আমার পরিবারের অমিত্র, পরিবারও তো এক দেশ, ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায় । মেয়েটি আমার ভাইকে খুন করেছে । আমার ভাই যদিও অনেক অন্যায় করেছিল তবুও তাকে শাস্তি দেবার জন্য তো আইন ছিল তসলিমা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে কেন ? আর ছলনা করে বেকসুর খালাস পেয়েও গেলো । এটা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারিনি । প্রতিজ্ঞা করি এর বদলা আমি নেবো । আইন যা পারেনি আমি এবার সেটাই করবো । আমি কি ভুল করেছি লছমন ? গীতায় তো বলা আছে বৃহত্তর স্বার্থে মানুষ মারাকে খুন নয় বধ বলা হয় !

অর্ধশিক্ষিত ডাকাতির আসামী এই প্রথম অন্যায়ের বিচার চাওয়া সুশিক্ষিত এক কয়েদীর করুণ মুখটার দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ । বুকটা কেঁপে উঠলো লছমনের । এত আস্তে সে উত্তরটা দিল যে জমাট বাধা অন্ধকার ভেদ করে লৌহকপাটের এপাশে ভালো করে শোনা গেলো না ।

# হরিণ চোখো মেয়ে

ধর্মশালা বেড়াতে যায়নি লেখিকা গিয়েছিলো মানুষ চিনতে । শাল্মলী সেন । বাংলায় লেখে । স্বামীর কর্মসুত্রে বসবাস দক্ষিণ ভারতে ।

শাল্মলী নিজে অল্পবিস্তর লেখা পড়া শিখেছে, পরিবেশ বিজ্ঞানে একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী আছে তার ঝুলিতে তবে চাকরি করেনা । তার স্বামী কর্পোরেট জগতে উচ্চপদে, প্রচুর মাইনে পায় কাজেই মাসে ২৫-৩০ হাজারের জন্যে তার কাজ করার প্রয়োজন নেই, সে সময় কাটায় লেখালেখি করে । তবে ঘরে বসে বসে বানিয়ে বানিয়ে আবোল তাবোল লেখার সে বান্দা নয়, রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স যোগাড় করে লিখতে ভালোবাসে আর তাই করতেই পৌঁছায় ধর্মশালা । তার নতুন উপন্যাসের প্লট হবে এই হিমালয় নগর যার কাছে গদ্দী উপজাতির বাড়ি ম্যাকলিওড গঞ্জে বসবাস করেন নোবেল লরিয়েট শান্তির দূত দলাই লামা ।

দিল্লী বিমান বন্দরে পৌঁছে একটা ক্যাব বুক করে শালম্লী রওনা দিলো চন্ডীগড় ।

সঙ্গে কাজিন জয় । সেখানে দু- একদিন থেকে এক সুন্দর সকালে চলে গেলো ধর্মশালা । পাহাড়ি শহর, খুব যে অপরূপ তা নয় । পাইন বন, কাঠের বাড়ি, পাহাড়ি সুন্দরী । সেই একই ছাঁচে গড়া । বাজেট একটা হোটেলে দু খানি ঘর ভাড়া করে ওরা উঠলো । দিন ১৫ থাকবে । তারপর চলে যাবে অন্য এক পাহাড়ি জায়গায় । এই দিন ১৫র ভেতরে চিনে নিতে হবে মানুষ, পরিবেশ । চরিত্রেরা আসবে যাবে । তাদেরকে ধরতে হবে অক্ষর শিল্পের মাধ্যমে । লেখিকা মনোনিবেশ করে মানুষে, প্রকৃতিতে নয় ।

পাহাড়ি, বুনো, আদিম মানুষে । শহর তো অনেক দেখলো । মুখোশের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে চায় এবার ।

ধৌলাধর পাহাড়ে প্রথম আলো পড়ে রূপার মতন চকচক করে ।

বার্চ বনে মৌটুসি কিংবা অচেনা কোন পাখির গুঞ্জন, মধু নিয়ে লুটোপুটি ।

তারই মাঝে কিছু কাল্পনিক বরফ কুচি বুঝি উড়ে এসে পড়লো ওর চুলে ।

শাল্মলী হেঁটে হেঁটে চারপাশটা দেখছিলো । ঢালু রাস্তা গড়িয়ে গেছে আধা শহরের দিকে । লাল লাল জোব্বা পরিহিত ক্ষুদ্র চোখো মানুষ পিঠে বোঝা নিয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে । পাহাড়ের বাঁকে পাইন গাছের নিচে একটি ছোট খাবারের দোকান ।

মোটামুটি পরিপাটি । সবুজের মাঝে লাল, হলুদ আর গাঢ় নীল দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইন করা দোকানের দরজা জানালায় । কিছু পাহাড়ি ফুল, কিছু অর্কিড দিয়ে সাজানো । অনেক ঘুরেছে সেদিন । ঘুরে ঘুরে ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিলো ওদের । শাল্মলী ও জয় দোকানে ঢুকে বসলো ।

একজন যুবক এগিয়ে এলো । ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলো - কেয়া চাইয়ে ?

জয় হেসে বললো - মেনুকার্ড ।

- জি ?

- মেনুকার্ড, মেনুকার্ড, খানা খানে কে লিয়ে যো কার্ড দুকানকে উধারকী আদমি ইধারকা আদমি কো দেতা হ্যায় ( আজন্ম কলকাতাবাসী জয়ের হিন্দীও শোচনীয় )

এবারে যেন লোকটি বুঝলো । ভেতরে গিয়ে একটা জরাজীর্ণ পিস বোর্ডে পেস্ট করা হাতে লেখা মেনু কার্ড নিয়ে এলো ।

চিকেন মঞ্চুরিয়ান, এগ কোরি, মাটন কিরিস্পি, ল্যাম্ব-দো প্লাজা আর থামস্ আপ ব্র্যাকেটে লেমন, ওরেঞ্জ ফ্লেভার অর্থাৎ তরল পানীয় মানেই থামস্ আপ ।

শালম্লী ও জয় মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো । জয় হেসে বললো - দেখ এই একটা চরিত্র কিন্তু, একটু ঘষে মেজে নিবি --- !

শাল্মলী পাল্টা হাসি দিল । তারপর বললো- হ্যাঁ চরিত্র তো বটেই, দুনিয়ায় যত গুলো মানুষ ততগুলোই চরিত্র । আবার এটার সঙ্গে ওটার মিলন ঘটালে নতুন চরিত্র তৈরি হবে। লেখকেরা বোধহয় সেটাই করেন । আসলে সাহিত্য সঙ্গে করে নিয়ে জন্মাতে হয় । সাহিত্য শেখা যায়না । শিখে ঐ দু একটা বই, চেনাশোনাদের প্রশংসা আর

সারাটা জীবন লেখার চেষ্টা করে যাওয়া এই পর্যন্তই হয় । জীবনবোধটা না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে লিখে কোন লাভ নেই । যেই লেখা সমাজের উপকারে লাগেনা সেই লেখা লিখতে লিখতে আমি একদিন বোর হয়ে যাবো । ও তো ইন্টেলেকচুয়াল পার্ভাশনই হল । জয় নীরব শ্রোতা ।

খাবারের অর্ডার দিয়ে বসেছিল, কিছুক্ষণ পরে এলো মোটামুটি খাওয়ার মতন খাবার । গরম বলে খেতে অসুবিধে হচ্ছিল না তেমন । অন্য ধরণের স্বাদ ।

পেটপুরে খেয়ে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো ।

সেদিন ডাইরিতে লিখলো -ধর্মশালায় এক ছোট তিব্বতী রেস্তোরাঁ ।

পরদিন গেলো মনাস্ট্রি দেখতে । তারপর গেলো তিব্বতী মিউজিয়াম দেখতে ।

মোটামুটি আকারের কিছু ঘর নিয়ে এই মিউজিয়াম ।এটা তিব্বতী মানুষের দ্বারা পরিচালিত । দেওয়ালে আঁকা বিভিন্ন চিত্র । কিভাবে চীনারা অত্যাচার করে ওদের ঘর ছাড়া করেছে তারই বিবরণ । রক্ত লেগে থাকা একটি শার্ট দেখলো ।

বন্দিদের অত্যাচারের চিহ্ন । তিব্বতীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পাতা নিয়ে চীনারা জুতোর সোল তৈরি করেছিল । মাইলের পর মাইল বরফ পেরিয়ে দারা পুত্র পরিবার নিয়ে ভারতে পৌঁছাবার সময় কত শিশুর মৃত্যু হয়েছে, প্রচন্ড ঠান্ডায় ক্ষয়ে গেছে হাত পা,

তুষার ঝড়ে নিঁখোজ হয়েছেন কত মানুষ ।

অনেক অ্যামেরিকান এইসব ঘটনার বিবরণ পড়ছিলো আর কমিউনিস্টদের গালাগালি দিচ্ছিলো । সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্টদের কত না কূকীর্তি ছড়ানো কে না জানে । তিব্বত তাতে এক নতুন সংযোজন ।

শাল্মলীর কষ্ট পেলো । জয় কষ্ট পেলো । সই করে দিলো ওদের খাতায় সমবেদনা জানিয়ে । জ্বালিয়ে দিল মোমবাতি । নিচে নামার সময় তিব্বতী রেস্তোরাঁর সেই দোকানিকে দেখতে পেলো । সেও এসেছে এখানে । ওদের দেখে ঈষৎ হাসলো ।

লাল জোবরা পোশাকে আজ একে কেমন অদ্ভুত লাগছে ।

চোখ তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল । চাপা নাসিকা । ঠোঁটের ওপরে একটি কালো তিল ।

সামান্য কিছু কথার পরে সে বললো- আজকে আমার দোকানে আসুন আজ ভেড়া রান্না করেছি স্পেশান তিব্বতী প্রথায় । আপনারা আমার কাস্টমার নন অতিথি ।

ইতিমধ্যে দু একদিন আরো জয়রা এই যুবকের দোকানে খেয়েছে । ন্যুডুলস্, মাংস ইত্যাদি । তাই বেশ ভাব হয়ে গেছে । ছেলেটি উদ্বাস্তু । তিব্বত থেকে এখানে এসেছে সর্বস্ব ত্যাগে করে, চীনাদের অত্যাচারে ।

ও গল্প করছিল কিভাবে চীনারা ওদেরকে হেনস্তা করেছে । একটা সময় তিব্বতের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ছিল । তিব্বত ছিল ধর্মীয় গুরুদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র দেশ । কমিউনিস্টরা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে সব ধ্বংস করে ফেলে ।

ওর পালিয়ে এসেছে অচিন ভূমে, গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে । সঙ্গে আনতে পেরেছে কিছু পুরাতন ধর্মীয় পুঁথি । দিনের পর দিন না খেয়ে, হিমশীতল আবহাওয়ায় ওদের স্বাস্থ্য হানি হয়েছে । ও একজনকে দেখালো, তুষার ঝড়ে যার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে ।

সে আর কোনদিন দেখতে পাবেনা এই বিশ্ব সংসার ।

একটি শিশুর ভারী পাথর মেরে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে । কেন ? তার পিতা কমিউনিজমকে প্রকাশ্যে গালি দিয়েছিলো । অসুস্থ হাসপাতালগামী রুগীর পথ আটকে তাকে মধ্য রাস্তায় মরণ মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । গর্ভবতীর গর্ভপাত করানো হয়েছে, কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মকে ত্যাগ করেনি বলে । সদ্যজাত শিশুর চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে । এক গৃহবধূর যোনিদ্বার সেলাই করে দিয়েছে যাতে সে কোনদিন যৌনমিলনে সক্ষম না হতে পারে । তারপর অসম্ভব বেদনাদায়ক ঋতুদিন নিয়ে বিষাক্ত ঘা হয়ে অকালে মারা গেছে সে ।

দোষ ? বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দিয়েছিল সে।

ওদের মঠে ঢুকে চীনারা সমস্ত ধর্মীয় কাগজ পত্র নষ্ট করে ফেলেছে । বহু মূল্যবান বৌদ্ধ গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়েছে । তুমুল গালিগালাজ করছিলো ছেলেটি কমিউনিস্টগুলোকে ।

শালম্লী ভাবছিল নন্দীগ্রামের কথা । শাসক দলের স্বেচ্ছাচারিতার কথা ।

মাওবাদী মাওবাদী করে সব দোষ তো চাপিয়ে দিলো মাওবাদীদের ঘাড়ে কিন্তু ওটাও তো কমিউনিজমের আরেকটা ধারা । কমিউনিস্টগুলোর বদমাইশি তো কম দেখেনি ।

সংগঠন আর দলবাজি করে করে তৃণমূলে ছড়িয়ে ফেলেছে নিজেদের ।

ছারপোকার বংশধর ওগুলো । মিনিটে একটা থেকে এক কোটি করে বাড়ে ।

কয়েকটার মুখে মানবতার বুলি শুনলে মনে হয় এক থাপ্পর মেরে দাঁত ভেঙে দিই ।

এখন এই ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আরো অনেক অজানা দুয়ার খুলে গেলো শাল্মলীর সামনে ।

সেদিন রাতে হোটেলে শুয়ে শুয়ে কাঁচের বড় জানালা দিয়ে আকাশ দেখছিলো ।

সলমা চুমকি জড়ানো আকাশে একফালি চাঁদ । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আকাশ নেমে গেছে নিচে । দিনের বেলায় বরফের পাহাড় দেখা যায় । পরিস্কার, ঝকঝকে -মনে হয় ছুঁয়ে ফেলা যাবে।

শাল্মলী ভাবছিল যে এত সুন্দর ধরিত্রী তবুও মানুষ কেন এত খেয়োখেয়ি করে ?

কি চায় মানুষ ? আনন্দে লুটোপুটি না করে ভয়ানক মারণাস্ত্র তৈরি তে বেশি সময় ব্যয় করে, নাহলে তিব্বতের মতন সুন্দর দেশে কি করে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্বেষের আগুন ? তুষার জুড়ে আঁকা হয় রক্ত রেখা । কেন কেন ?

যেই শান্তি ও আনন্দের খোঁজে আজ মানুষ নিউক্লিয়ার বোমা বানাচ্ছে সেই শান্তি কি কোনদিন সে পাবে বহির জগতের সঙ্গে লড়াই করে ? শান্তি কি ভেতর থেকে আসবে না ? আসবে না কর্মযোগে, সেবায়, ভালোবাসায় ?

"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding." বলেছিলেন না আইনস্টাইন ?

এই যে এত বোমা সেগুলো তো চেতনা হলে নষ্ট করারও উপায় নেই । তাতে ভয়ানক পরিবেশ দূষণ হবে । অনেক অবলা জীবের ক্ষতিসাধন তো আমরা করেই ফেলেছি । এবার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করা কি উচিৎ নয় ? মহাকবি কালিদাসের মতন এবং পরে বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাসের সতর্কবাণী মনে পড়ে যায়- যে ডালে আমরা বসে আছি সেই ডালখানিই কেটে চলেছি । কেন ? কেন ?

শাল্মলীর ভাবুক মন একান্তে ভেবে যায় । রাষ্ট্রনেতা ও কিছু বিজ্ঞান সাধক নিজেদের ইগো সন্তুষ্ট করার নেশায় গ্রহ ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে । তারা কেবল নিজেদের কথাই ভাবে, স্বার্থপর দুপেয়েরা নিজেদের সন্তানের কথাও ভাবে না, পরবর্ত্তী প্রজন্ম কি করে এই ধরিত্রিতে হেঁটে চলে বেড়াবে ? এই বিষাক্ত বালুকাবেলায় ?

পরদিন ছিল একটি স্থানীয় উৎসব । জয় ও শাল্মলী গেলো কাছের নর্বুলিংক প্রতিষ্ঠান দেখতে । ওখানে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয় ।কিছু তিব্বতী শিল্প কর্ম আছে । কাঠের সেতু, ছায়াঘন পথ পেরিয়ে সবুজের কোলে এই প্রতিষ্ঠান, এখানে নানান ধরণের রং বেরংয়ের ছবি দেখা যায় । ওরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলো ।

অজানা পাখির কুজনে মাঝে মাঝে চলার পথে একটু থেমে জিরিয়ে নিচ্ছিল ।

কত মানুষ আছেন যাদের জীবন যুদ্ধের সৈনিক হয়ে সময় কাটিয়ে দিতে হয় তারা পারেন না একটু অবসর বার করে এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে । ভাগ্যিস ও সেই দলে পড়েনি । মনে মনে ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানালো ।

নর্বুলিংক থেকে বেরিয়ে আবার সেই রেস্তোরাঁর যুবকের মুখোমুখি । ও এসেছিলো এখানে ওর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে । সে এখানে কর্মরতা । টুরিস্টদের সব বোঝায়, একপ্রকারের গাইড বল যায় ।

শাল্মলীকে দেখে একগাল হেসে ফেললো । চওড়া হাসিখানা, হৃদয় ছুঁয়ে যায় । শাল্মলী ভাবে কি করে সর্বস্ব ছেড়ে এই দূর দেশে এসেও সে এত হাসতে পারে ?

ওর অন্তরের বেদনা তো স্পর্শ করেছে ওরা । দেখেছে সেখানে কি ভীষণ ক্ষত, কত গভীর জ্বালাময় গহ্বর । হিমবাহ কোলে যারা বড় হয় তারা বুঝি এমন করেই হাসতে পরে, শত দু:খেও । ওর দুচোখে দেশে ফেরার স্বপ্ন । যেখানে মেষশাবক কোলে ঘুরে বেড়ায় ওর প্রিয়া ।

- সরল পাহাড়ি মানুষ আমরা, জানিনা কোন পাপে ঈশ্বর আমাদের এই শাস্তি দিয়েছেন।

শাল্মলী মৃদু হেসে বলেন -পাপ পূণ্য বলে কিছু হয়না। সমস্ত কিছুই নির্ভর করে মানুষের ইন্টেশনের ওপর। লক্ষ্য করবে কাউকে মারলে কখনো তা খুন আবার কখনো তা বধ। হয়ত তোমাদের এই লড়াইয়ের প্রয়োজন ছিল।

হয়ত এরপরে তোমরা তোমাদের রাজ্য ফিরে পাবে তখন পারস্পরিক বন্ধন আরো দৃঢ় হবে। বিদেশে থেকে তোমরা তো আরো সংঘবদ্ধ হয়েছো।

মিষ্টি কথায় সাধারণতঃ চিড়ে ভেজে না। এক্ষেত্রে ভিজলো।

তারপর ওরা একসঙ্গে বুদ্ধ, পদ্মসম্ভব ইত্যাদি ধর্মগুরুদের মঠগুলো ঘুরে দেখতে গেলো। পথে চা খেলো। ধৌলাধরের অপরূপ শোভা দেখলো। মনটা ভালো হয়ে গেলো।

প্রতিবারই যখন এর সঙ্গে দেখা হয় শালম্লীর খুব কষ্ট হয়। ওর নিষ্পাপ মুখ আর সরল হাসি দেখে হৃদয়ে রক্ত ক্ষরিত হয়। ভাবছিল কি করা যায়। একমাত্র লেখার মাধ্যমে জনচেতনা বাড়ানো ছাড়া ওর পক্ষে যে আর কিছুই করা সম্ভব নয়।

তাই করবে। লিখবে, এদের নিয়ে লিখে যাবে। নিজেও তো স্বদেশ হারা।

ওরা তো ঢাকার মানুষ। রাতারাতি সমস্ত ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল এপারে।

বিশাল জমিদারি, কত বাগান, পুকুর ভর্তি মাছে, প্রজা।

এখন তারাই হয়ত সব জুড়ে বসেছে। ওর মেসোমশাই তো খুলনা রাজবাড়ির ছেলে। তাঁকেও এপারে এসে ফুটপাতে ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে রাত কাটাতে হয়েছিলো।

এই ধর্ম জাতপাতের লড়াইগুলো কেন হয় ? কেন মানুষ পারেনা সীমারেখা মুছে দিতে ? কেন ? সবাই তো সেই একই রক্ত মাংসে গড়া।

সেদিন রাতে তিব্বতী ছেলেটি ওদের নিজের বাসায় খেতে নিমন্ত্রণ জানায়।

দোকানের অন্যপাশে ওর একফালি সিমেন্টের ঘর। দুটি ঘর। একটা ওপরে অন্যটা নিচে। পাকদন্ডী বেয়ে নামতে হয়। সেখানে সুন্দর ফুলের টব রাখা, শাল্মলী দেখেছিল। একটা ইয়া বড় ধবধবে সাদা লোমশ স্পীৎজ আছে। কালো গভীর চোখ মেলে চেয়ে থাকে। যেন সব বোঝে শুধু ভাষা নেই ওর মুখে।

- দিনের বেলায় দোকান খোলা থাকে তাই রাত্রেই আসুন, একটু তাড়াতাড়ি আমি দোকান বন্ধ করে দেবো খন।

বলেছিল সে। তাই ওরাও বিকেলে একটু এদিক ওদিক ঘুরে সাঁঝবেলায়

হাজির হল। প্রথমে দোকনে বসিয়েই চা খাওয়ালো সে। কয়েকজন কাস্টমার ছিল। ওরা চলে যেতেই নিচে গেলো শাল্মলীরা। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে বেশ পা টনটন করতে লাগলো। নিচে মোটামুটি পরিষ্কার একটি ঘর, সেই কুকুরটা, লেজ নাড়ছে ওদের দেখে, কুইকুই করছে যেন আপনারজন এসে গেছে।

শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। ওকে খুলে দিতেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জয়ের কোলে। হাত পা চাটতে লাগলো। আদরে আদরে ভরিয়ে দিলো জয়কে।

শাল্মলী মজা দেখছে এমন সময় হঠাৎ একটা মেয়েলি কন্ঠস্বরে চমকে উঠলো ।

পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এলো কথা কটা -- আপনারা যখন খাবেন বলবেন আমি ব্যবস্থা করবো । সামান্য কিছু করেছি, একটু মুগের ডাল ঘি দিয়ে, চিকেন কারি আর আঙুরের চাটনি ।

শাল্মলী অবাক হয়ে দেখলো তিব্বতীর গৃহিনী এক বঙ্গললনা ।

ঈষৎ শ্যামলা বরণ, ছিপছিপে গঠণ, একটু ভোঁতা নাক আর হরিণের মতন দুই চোখ । একে দেখেই বোধহয় কোন কবি লিখেছিলেন - হরিণচোখো মেয়ে ।

মেয়েটি রিনরিনে গলায় বললো- আমি আগেই দেখেছি আপনাদের । নিজের দেশের মানুষ দেখে বড়ই আনন্দ হয়েছিলো । কর্তাকে বললাম- নিয়ে এসো না ওঁনাদের, গল্প করা যাবে । কতদিন বাংলা বলা হয়না । তোমার সঙ্গে বাপু ভেজাল হিন্দী বলে বলে আমি হাঁফিয়ে গেছি ।

শাল্মলী হাসলো, হাসছে তিব্বতী, চোখ মুখের পাশের চামড়া কুঁচকে । ৩২ পাটি বের করে । তারপর টুকটাক কিছু কথা হল । কেজো অকেজো কথা ।

রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ভারী ট্রাকের আওয়াজ ভেসে আসছে । দূরে কোথাও যেন বন্য জীবের হুঙ্কার শোনা গেলো ।

ওরা ভেতরে খেতে গেলো । রাত বাড়ছে আবার ফিরতে হবে ।

ভেতরে গিয়ে দেখলো কাঠের উঁচু টেবিলে বাঙালি রান্না শোভা পাচ্ছে ।

পায়ে পায়ে কুকুরসোনা হাজির । নতজানু হয়ে নাকটা উঁচু করে মাংসের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছে । কৃষ্ণকালো চোখের গভীর চাউনি যেন বলছে- আমাকে ফেলে যেন খেয়ে নিও না তোমরা ।

খাবার টেবিল বসতেই পিলে চমকে গেলো শাল্মলীর । কি দেখছে সে ?

এককোণে উঁচু বেদীতে রাখা মার্কস, লেনিন ও ট্রটস্কির ছবি ।

পাহাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো । ধূপের গন্ধে সুবাসিত ঘরখানি ।

অবাক হবার তখনো কিছু বাকি ছিল ! তিব্বতীর বাঙালি বধূ সুস্মেলী যেন মনের কথা বুঝতে পেরেই একগাল হেসে বললো- আমি সাচ্চা কমিউনিস্ট পরিবারের মেয়ে । বাবা ছিলেন শ্রমিক নেতা । আমাদের বাড়িতে কিছু মামুলি বাসনপত্র, সস্তার তেল-সাবান আর কাঠের খাট ছাড়া কোন আসবাবপত্র ছিলনা ।

বাবা যা মাইনে পেতেন সব গরীবদের দান করে দিতেন ।

আমাদের পড়শী ছিলেন লালি মাসি । লালি মাসির বর বড় সরকারি অফিসার । খুব সৎ অফিসার, কোনদিন ঘুষ নেননি । উনিও কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী এক কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে শুয়ে পড়েছিলেন এবং তরতর করে রাজনৈতিক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যান ।

তারপর শুরু হয় নানান অরাজকতা । ছাপ্পা ভোটের ট্রেনিং দেওয়াও শুরু হয় ওনার বাড়ি । ঝি চাকর থেকে শুরু করে নিজের পুত্রদেরও সেই ট্রেনিং নিতে হত ।

লজ্জায় ভদ্রলোক একদিন আত্মহত্যা করে বসেন। আমার বাবাও কমিউনিজমের

এই অবমাননা ঐ ভাঙন দেখে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছিলেন। যদিও বাইরে ছিলেন বজ্রকঠিন। দরিদ্র মানুষের অধিকার নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন উনি। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী নাহলেও শ্রমিকেরা ওনাকে ঈশ্বর বললে খুব খুশি হতেন। এইজন্য যে মানুষ ওনাকে ভরসা করে। উনি তাদের জন্য কিছু করতে পেরেছেন, পেরেছেন বিশ্বাসভাজন হতে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন সমাজতন্ত্র নিঁখুত সমাজ ব্যবস্থা নয় তবুও উনি এদের বাহবা দেন কারণ এরা দরিদ্রদের কথা বলে। ওদের যে কেউ নেই ! ওদের কথা কেউ তো বলেনা লোকে করে শুধু কোলাহল ---

এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

এই কটি লাইন বাবা সব সময় আওড়াতেন। আমাদের শেখাতেন, যা বিশ্বাস করবে তাই করবে। ডোন্ট বি আ হিপোক্রিট।

আজ ভাবলে দু:খ হয় সেই কমিউনিস্ট দল ভরে গেছে চূড়ান্ত হিপোক্রেসিতে, আসলে যেখানেই মানুষ সেখানেই বোধ হয় হিপোক্রেসি, দলাদলি।

মনুষ্যচরিত্রকে বোধহয় বদলানো যায়না কোন বিশেষ দর্শন দিয়ে।

কেউ কেউ থাকেন যারা দর্শন মেনে চলেন বাকি গড়পরতা মানুষ সুবিধেবাদী দর্শন আত্মস্থ করে নেন। ভেঙে পড়ে সিস্টেম। নস্যাৎ হয়ে যায় একদিন।

কঠোর ও অনমনীয় বাবাকে তাঁর কারখানার মারোয়ারি মালিক একদিন খুন করায়। তারপর আমাদের দুই বোনের পেছনে লেগে যায়। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন।

একরাতে আমি ও দিদি এক কাপড়ে পালিয়ে আসি। দিল্লী অবধি আসার পরে এক ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে তুললেন তার বাড়ি। ভদ্রলোক ইতিহাসের অধ্যাপক। আমাদের সঙ্গে আলাপ রেল স্টেশানে। ওঁনার সুপারিশে দিদি একটা চাকরি পেলো। দিল্লী শহরেই বসবাস আরম্ভ করলাম, দিদি এক সহকর্মীকে বিয়ে করলো। তারপর একদিন ধর্মশালায় বেড়াতে এসে আমার আলাপ হল এই সরল তিব্বতী ছেলেটির সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়লাম। শেষে বিয়ে হল। দিদি এখনো দিল্লীতেই আছে। ভরা সংসার ওর। আমারই বরং শুন্য ঘর। আমাদের কোন ছেলেপুলে হয়নি --

মুখে শ্রাবণের মেঘ, হরিণ চোখে বৃষ্টি নামে।

শাল্মলীর সেদিকে খেয়াল নেই। ও ভাবছে একেবারে ভিন্ন কথা।

এই ধার্মিক যুবকের স্ত্রী বামপন্থী হয় কি করে ?

এরা স্বামী স্ত্রী কি অন্তর্যামী ? নাহলে তিব্বতী ছেলেটি ঠিক এই মূহুর্তে বলবে কেন-- আপনি ভাবছেন আমার স্ত্রী কমিউনিস্ট, এ কি করে সম্ভব তাই না ?

আপনি তো লেখিকা, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি ?

বলুন তো মানুষের কি জাত হয় ? ভালোবাসার কি জাত হয় ?

কমিউনিস্ট তো ওর বাহ্যিক পরিচয় । অন্তরে তো আমরা দুজনেই সেই একই মানুষ, তাই না ? আর ওরাও তো মানুষের ভালো করার ব্রত নিয়েই শুরু করেছিল, ফলাফল আজ যাইহোক । কি বলেন ?

উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে আছে ক্ষুদ্র এক জোড়া সরল আঁখি ।

এই অল্প শিক্ষিত পাহাড়ি যুবকটির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শাল্মলী -- ভাবছে সত্যি কি ওর লেখক হবার যোগ্যতা আছে ? ওর মধ্যে সেই বোধ কই যা আছে এই সরল ছেলেটির ভেতরে ? নাহলে ও কেন ভাবতে বসবে কে কমিউনিস্ট আর কে ক্যাপিটলিস্ট ? আমাদের তো একটাই পরিচয়, আমরা মানুষ ।

হরিণ চোখের বৃষ্টি কেন ডুবিয়ে দেবেনা সমস্ত প্রশ্ন ? মুছে দেবেনা সমস্ত ইন্টেলেকচুয়াল যুক্তির চিহ্ন -কেন ? কেন ?

হৃদয়ই যদি হারিয়ে যায় সাহিত্য হবে কি করে ? সে তো রোবট নয় ।

নয় কিছু বৈদ্যুতিক তার, রাবারের তন্তু ও ব্যাটারির মিলনক্ষেত্র ।

# এন আর আই গিন্নী

এয়ার ফ্রান্সের প্লেনটা যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো তখন বহু মানুষ ভেঙে পড়লেও একজন খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন যাতে প্লেনটি ক্র্যাশ করে অতলান্তিক মহাসাগরে পড়ে আর চিরতরে হারিয়ে যায় তার গৃহিনী মিসেস নন্দী । অতসী নন্দী । ডাকনাম টুকু । তাঁর প্রায় দীর্ঘ দিনের হাসি কান্নার সাথী -তাঁর দুই সন্তানের মা ।

সত্যি শেষে সংবাদ এলো যে প্লেনটি ক্র্যাশ করেছে । কেউই আর জীবিত নেই । হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডঃ নন্দী । যাক্ আর ফিরছে না তাহলে ! কিছুদিন ধরেই ওর সঙ্গটা অসহ্য লাগছিলো । কিন্তু সরাসরি কিছু বলার উপায় নেই, সমস্তটাই শোনা কথার ওপরে গড়া একটা মত । সন্দেহ করলেও প্রমাণ নেই । প্রমাণ নেই বলে কিছু বলারও নেই । এই যে একত্রে থাকা এটা একটা দিনগত পাপক্ষয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো ।

নিয়ম করে খাওয়া, টুকটাক কথা, মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েদের কাছে বেড়াতে যাওয়া ও একসঙ্গে শয়ন । তবুও একটা দূর্ভেদ্য প্রাচীর ওঁদের মধ্যে । কয়েকবার মিসেস নন্দী জিজ্ঞেস করেছেন : কী হয়েছে ?

কিন্তু ডঃ নন্দী এড়িয়ে গেছেন কাজের আছিলায় । বলেছেন : খুব কাজের চাপ যাচ্ছে তাই মনটা বিক্ষিপ্ত ।

ডঃ নন্দী একটি গবেষণাগারে কাজ করেন । রিটায়ার করেছেন বেশ কয়েক বছর কিন্তু এখন বিশেষ সম্মানের সঙ্গে একটি গুরুত্বপুর্ণ পদ দখল করে আছেন তাই নিয়মিত ডিপার্টমেন্টে যান ও মাঝে মাঝে কনফারেন্সে । চাকুরি জীবনে ওঁনার খুব সুখ্যাতি ছিলো । সিনসিয়ার, ব্রিলিয়্যান্ট ও সভ্য ভদ্র হিসেবে । নিজের ফ্লিডে বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন । সব সাজিয়ে রাখা আছে ড্রয়িং রুমের বিরাট মেহগনি কাঠের শেল্ফে । সবই যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছিলেন মিসেস নন্দী যিনি আবার এক অধ্যাত্মিক গুরুর শিষ্যা । তাঁর গুরু থাকতেন গুরগাঁওতে । গুজরাটি গুরুজি । ঊষারাম বাপু । ওঁনার পন্থা হল সৎ কর্ম ও সৎ সঙ্গ ।

শিষ্যাকে শিখিয়েছেন : কর্ম করে যাও । যত কর্ম করবে তত কর্মযোগী হিসেবে মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাবে ।

তাই মিসেস নন্দী খুব কাজ করেন । ছেলেপুলেদের লুচি ভেজে খাওয়ানো থেকে ভারতের সমস্ত বাঙালী সেলিব্রিটিদের বাড়িতে তুলে তাঁদের আদ্যপান্ত সেবা অবধি ।

প্রতি বছরই দুবার --একবার সরস্বতী পুজোর সময় আরেকবার দূর্গাপুজোর সময় বাংলার সঙ্গে একটা যোগাযোগ হয় ওঁদের । কারণ সেইসময় ওদের দেশ এর সমস্ত বাঙালী একজোট হয়ে হৈ হল্লা করেন । খানাপিনা হয়, বঙ্গ সম্মেলন হয় । কিছু সাহিত্যিক ও কবি, গায়ককে যাঁরা বিদেশে যেতে উন্মুখ অথচ যাবার কোনো উপায় নেই তাঁদের এনে বেশ কটা দিন হৈ চৈ হয় । একসঙ্গে ছবি তোলা । মালা পরানো ইত্যাদি তারপর সেইসব নিয়ে পরিচিত মহলে মাইলেজ নেওয়া । দেশে এসে দেখানো : দেখো আমি অমুক কবির বাহুবন্ধনে কিংবা তমুক লেখকের সঙ্গে ডিনারে ।

এছাড়া সই সংগ্রহ তো আছেই । তো এই দেশের ঐ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সেলিব্রিটির দায়িত্ব নেন মিসেস নন্দী, অতএব গৃহ যুদ্ধ এড়াতে মিস্টার নন্দীও ।

মিসেস নন্দীর আবার লেখাজোকার শখ আছে। কিন্তু নিজে বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি এই লাইনে। কারণ মধ্যমেধার লেখিকা তারওপরে প্রবাসী বাঙালী।

ধরপাকড়ের রাস্তা জানা ছিলনা। লেখায় একটু হিন্দি ছোঁয়াও আছে। বাংলা কথায় হিন্দি টান দিয়ে দেন। যেমনঃ ওটা পাঠিয়ে দিন এটাকে লেখেন - ওটা ভেজে দিন। অতএব সাহিত্য ! সাহিত্য ডুবে যায় অতল গহ্বরে।

মিসেস নন্দীর বাড়িতে বিরাট বড় বড় ঘর। দামী আসবাবপত্র, বাগান, সুইমিং পুল। এছাড়াও ওঁনাদের একটি পাহাড়ি এলাকায় বাড়ি কেনা আছে। সেখানে মাঝে মাঝে যান। বিশেষ করে হাড় হাভাতে ভারত থেকে কেউ এলে তাকে নিয়ে তো একবার যাওয়াই চাই ! চা-ই !

অত্ত বড় বাড়িটা দেখাতে হবেনা ?

দেশে তো ছিলেন সাধারণ রেলের কেরানীর মেয়ে। থাকতেন ইউ পির ছোট্ট শহর মোগলসরাই-তে। ভোঁতা নাক, ড্যাব ড্যাবা চোখ, মাথার পেছন ও দেহের গঠণ বাঁদরের মতন বলে পরিচিত মানুষেরা আড়ালে ওঁনাকে বেবুন পাছা বলে ব্যঙ্গ করতেন। সহজে মেয়ের বিয়ে হচ্ছিলো না। যদিও তাঁর বাবা বহুবার আত্মীয় স্বজনকে ধরে কলকাতায় গেছেন ও মেয়ে দেখিয়েছেন কিন্তু কলকাতার বাঙালী ছেলেরা ওকে ঠিক পছন্দ করছিলেন না। আর বাংলায় হিন্দী টান দেখে ও -স স করে কথা বলা দেখে নাকউঁচু বাঙালী পাত্রপক্ষ ওকে বাতিলের পর্যায়ে ফেলে দিচ্ছিলেন। একবার তো ওর বাবার বিরুদ্ধে এক পাত্রপক্ষ চটি চুরির অভিযোগ আনলেন। ভদ্রলোক নাকি ছেলের বাড়ি গিয়ে নিজের পুরনো চটি ফেলে অন্য কারো নতুন চটি পরে ফিরে যান।

অতএব !

এহেন অতসীর অবশেষে বিবাহ হল ৩১ বছর বয়সে, নিজের পছন্দে- এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে।বিয়ে হচ্ছে না দেখে সে একটি ছোট স্কুলে কাজ নেয়। তার ছিলো বেড়ানোর নেশা। সেরকম এক ট্যুরে আলাপ তরুণ স্কলার ডক্টর নন্দীর সঙ্গে। উনি হিমালয়ে ট্রেকিং এ গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে। আলমোড়া স্টেশানে দেখা অতসীর সঙ্গে। ভালোমানুষ, গোবেচারা, তরুণ গবেষক ইঞ্জিনীয়ার নন্দী এর আগে কোনদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন নি। বেশ লজ্জা লজ্জা মুখ করে শুরু হল কথোপকথন। অতসী কুশ্রী হলেও স্মার্ট। প্রবাসে মানুষ তো ! ওদের একটা সাবলীলতা থাকেই। একটা স্কুটার ভাড়া করে নন্দীকে পেছনে বসিয়ে অনেক ঘোরা হল এদিক ওদিক। নন্দী মোহিত। এরকম স্মার্ট মেয়ে জন্মে দেখেনি। বাঙালী মেয়েগুলো কেমন লবঙ্গ লতিকা ধরণের। তুলো অতসী ! কিন্তু এই জ্যান্ত অতসী ভারি স্বচ্ছন্দ। ভারি শার্প। দেখতে যতই ভোঁতা হোক। অতএব কিউপিডের তীর বিদ্ধ হলেন নন্দী। তারপর বিয়ে যথাসময়ে। ডঃ নন্দীর বাড়ির মানুষ তাঁকে খুবই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ও বিশ্বাস করতেন তাই এই কুশ্রী মেয়ে পছন্দও মেনে নিলেন বিনা দ্বিধায়।

আর অন্যদিকে অতসীর বাড়ির লোক হাতে চাঁদ পেলেন।

বিয়ের পরে ওঁদের চলে যেতে হল সিকিমে। অনেক দিন ওখানে রিমোট জায়গায় থাকতে হয়েছিলো। তখন অতসীর জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। কারণ পেটে বাচ্চা নিয়ে তাকে পাহাড়ি পথে রোজ ওঠানামা করতে হত। বাজার হাট, টুকিটাকি সংসারের কাজ ইত্যাদি। একটি লেপচা ছেলে ছিল বটে কিন্তু কাজপাগল নন্দীর সংসার বিমুখতা ও পাহাড়ি পরিবেশের দূর্গমতা অতসীকে বেশি করে খাটিয়ে মারতো।

যদিও দিনান্তে দূরের পাহাড়ের নীল রং দেখে মনটা খুব ভালো হয়ে যেতো । সমস্ত শ্রম ভুলে যেতেন উনি । তবুও কষ্টের এই পরিবেশ থেকে বেরোনোর জন্য নন্দী অনেক বড় শহরে কাজের জন্য দরখাস্ত দিলেও কাজ জোটেনি । শেষে স্থানীয় এক বৃদ্ধ লামার শরনাপন্ন হলেন ওরা, এই দম্পতি । লামা ওঁদের আশীর্বাদ করেন মন্ত্রপূত: জল দিয়ে তাতেই শহরে ডঃ নন্দীর চাকরি হয় বলে ওঁদের ধারণা ।

লামা আরো বলেন যে আজকে ওদের মধ্যে ভাব ভালোবাসা থাকলেও একদিন বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তা শেষ জীবনে । নন্দী বিশ্বাস করেন নি । তাঁর পতি পরায়ণা স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন এ যেন বিশ্বাস হয়নি । তবে লামার আশীর্বাদেই ওঁরা আরো পরে বিদেশে পাড়ি দিতে সক্ষম হন এবং সেখানে নতুন করে সুন্দর সংসার পাতেন । ততদিনে এসে গিয়েছে দুই সন্তান ।

- ড্যাড তুমি কি একটু ফ্রুট জুস খাবে ?

মেয়ের ডাকে হুঁশ ফেরে ডঃ নন্দীর । মেয়ে তাঁর কাছে এসেছেন । কদিন থাকবেন ।

স্ত্রী বিয়োগের পরে উনি ভীষণ একা হয়ে গেছেন, পরিচিত মহলে সবাই এই কথাই বলছেন । অতসীর মতন গৃহকর্মনিপুণা ও একধারে লেখালেখিতে পারদর্শী মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে ডঃ নন্দী না জানি কী ভীষণ খুশি, সবাই তাই ভেবেছেন এতদিন । কিন্তু ভেতরের জরাজীর্ণ সংবাদ আর কে রাখে ?

- নাহ্ মামনি আমি এখন কিছু খাবো না । তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো । আমি একটু বাইরে হেঁটে আসি ।

বলেই মেয়ে কিছু বলার আগেই উনি পায়ে শু গলিয়ে বাইরে চলে গেলেন ।

এখন গরমকাল । ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে চারিপাশ । এ তো ফুলের দেশ !

এখান থেকে কত ফুল বিদেশে রপ্তানি হয় । ফুলের মেলা বসে, শো হয় কত কি !

বেশ ভালই লাগছিলো ফুল দেখতে । হালকা চাঁদের আলোতে ভেসে যাচ্ছে চরাচর । ফুলের ওপরে চাঁদের মিহি আলো ! কি মায়াময় পরিবেশ । এরকম পরিবেশে পাশে একজন থাকলে মন্দ লাগেনা । কিন্তু আজ পাশটা খালি ।

অতসী নাম্নী কাগজের ফুল ঝরে গেছে, অতলান্তের বুকে । হারিয়ে গেছে ঢেউয়ের তালে তালে। কোনো এক অজ্ঞাত ঠিকানায় পাড়ি দিয়েছে সেই ফুল । মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে হাঁটছেন ডঃ নন্দী । কারণ সম্প্রতি তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়েছে । এখন মুখে আনন্দের ছাপ নিয়ে আসতে পারে অযাচিত ঝড় - তাঁদের বঙ্গ সমাজের বুকে !

হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন অনেক দূরে । ওখানে একটি লেক। চারপাশ গাছে ঘেরা।

দূর থেকে একটি অবয়ব আসতে দেখা যায় । সাদা পোশাক পরে আসছেন এক তরুণী ।

কাছাকাছি আসতেই :

- হাই ! হাত তুললেন ডঃ নন্দী ।

- হাই । পাল্টা উত্তর ভেসে এলো বাতাসে ।

ডঃ নন্দীর মেয়ের থেকেও ছোট ডোরা । ডোরা জোনস্ ! পেশায় নার্স । নার্সিং-এ

গেছে শখে, ডাক্তারি না পড়ে। কারণ সাধারণ মানুষ নার্সিং কে হেয় করলেও ওটা ডাক্তারির সাবসেট নয়। প্যারালেল একটি ফিল্ড। অনেক জিনিস আছে যা ডাক্তারেরা জানেনা কিন্তু নার্সরা জানে। এবং বিদেশে এটা একটি রেস্পেক্টেবেল প্রফেশান। আর ডোরা খুব সেবাপরায়ণ। ডঃ নন্দীকেও খুব যত্ন করে। তাঁর লুকিয়ে লুকিয়ে ডোরার সঙ্গে প্রেম করা একটা নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা স্থির করেছে, যে আগে ডাইভোর্স দেবে তাকে একটা হেফটি অ্যামাউন্ট দিতে হবে অন্য জনকে। ওরা এইভাবেই চুক্তিবদ্ধ। তাই বিয়ের পরে হয়ত কেউই চট করে ঐপথ নেবেনা।

এই অসম বয়সের প্রেমের কথা জানেনা শুধু নন্দীর সন্তানেরা। অতসী তো আর বেঁচে নেই তাই বিয়েতে বাধাও নেই ! যদিও একসঙ্গে শেষদিকে ওঁরা থাকতেন তবুও দূরত্ব ছিলো। ভদ্রলোক বিমুখ হবার পরে অতসী আলদা চলে যান। ওঁদের ঐ বাড়িতে, পাহাড়ের কাছে। যেই বাড়ির পেছনে গোলাপের চাষ হয়। তারপর বিদেশে মন ভালো করতে যান অতসী। শেষে দূর্ঘটনার কবলে পড়েন।

শুরুটা কী করে হয়েছিলো ?

লেখিকা প্রীতি মজুমদারই ইঙ্গিত দেন ডঃ নন্দীকে।

- আচ্ছা ডঃ নন্দী আপনার স্ত্রী যে একা একা লেখকদের নিয়ে আপনাদের ঐ বাড়িতে যান তাতে আপনার আপত্তি নেই ?

প্রশ্নটা শুনে একটু হকচকিয়ে যান নন্দী। হ্যাঁ অতসী ওদের সঙ্গেই যায় তবে এইদিকটা নিয়ে তো কখনো ভাবেননি !

একটু আমতা আমতা করে উনি বলেন : হ্যাঁ যায় বটে তবে সে তো ওঁদের এন্টারটেন করতে।

- এন্টারটেনমেন্ট ঠিক কী ধরণের হয় জানা আছে কি ?
- হ্যাঁ, গান বাজনা, ভালো খাওয়া দাওয়া, আড্ডা--
- আর ?
- আর কী ? এই তো !
- ব্যস্ ?
- হ্যাঁ।
- আর ইউ সিওর ?
- ইয়েস আই এ্যাম !
- হা হা হা, গায়ে জ্বলুনি ধরানো একটা হাসি হেসে ওঠেন প্রীতি।
- আপনি দেখছি নিপাট ভালোমানুষ ডঃ নন্দী ! মদের ফোয়ারা বসে ওখানে। আরো অনেক কিছু, খোঁজ নিয়ে দেখুন !

সুন্দরী প্রীতি নিজের খরচে বিদেশে এসেছিল। সাধারণতঃ এঁরা বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানের ঘাড় ভেঙেই আসে। থাকে কোনো বাঙালীর বাড়ি অর্থাৎ অতসীর বাড়ি। একবার কে যেন

বলেছিলোঃ - আচ্ছা আমরা তো যথেষ্ট মানী গুণী মানুষ তবুও এঁরা আমাদের নিজেদের বাড়িতে তোলে কেন ? হোটেলে তুলতে পারেনা ? জবাবে হেসে এক নবীন কবি বলেছিলেন : আরে মশাই বিদেশে যাবার সুযোগই নেই তো হোটেল আর বাড়ি ! কটাদিন এঁদের সঙ্গে ভালই তো কাটে ! খাওয়া দাওয়া, ফূর্তি, মাঝে মাঝে হৈ হুল্লোড় করে বেড়ানো, দামী গাড়ি চাপা ! দিব্বি তো হচ্ছে সব । ফিরে গিয়ে কানেকশন কাট করে দিলেই হয় !

বিদেশে যাবার জন্যে কম্পিটিশান লেগে যায় ! মান অভিমান হয় লেখকদের মধ্যেও - ওকে ডাকলেন ? আমাকে বাতিল করে দিলেন ?

অথবা - উনি তো আগেও গেছেন এবার আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক !

ইত্যাদি ।

এক নামী লেখক পাঠকের কাছে টিটোটালার । মদ বর্জন নিয়ে লম্বা চওড়া ভাষণ দেন । কিন্তু লুকিয়ে মদ খান । সেটা বিদেশে গিয়েই । অতসী মদের সাপ্লাই দেন ।

অতসী ঘুরতে নিয়ে যান । বাজার হাট করানো, ভালো মন্দ খাওয়ানো সবই তাঁর কৃপায় হয় । তারপর লেখককূল চলে গেলে নিজেদের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানের লোকেরা মিলে হাসাহাসি শুরু হয় ।

- আরে জগন্ময় তো টয়লেট ব্যাবহার করতেই শেখেনি ! হ্যান্ড শাওয়ার দিয়ে স্নান করার কিউবিকেলের মেঝেতে বসে শৌচকার্য করে গেছেন ! ভালো করে ধোয় ও নি মেঝেটা!
- অরুণ দত্তের বৌ তো আমার টয়লেটের কমোডে স্যানেটারি ন্যাপকিন দিয়ে পুরো চোক করে দিয়ে গেছিলো !
- মৃন্ময় গুহর মেয়েটার মাথায় কী উকুন রে বাবা ।
- চৈতালি তো খেতেই শেখেনি ! কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে গিয়ে আওয়াজ করছে আর গায়ে ফেলছে ।

এতসব নিন্দের মধ্যেও উপরি পাওনা হল সেলিব্রিটিদের সই । সই শিকারিরা তাঁদের ঘিরে ধরে সই নিয়ে নেন । অনেক সই । তারপরে নেটে গিয়ে পাবলিশ করেন ব্লগে । কিংবা বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানের সাইটে ।

অতসী তো আজকাল নেটে লেখে । নেটে তো ভালো লেখা পাওয়া যায়না তাই ওঁনার লেখাই ছাপা হয় সব জায়গায় । অনেক ক্ষেত্রেই সম্পাদকেরা আরো লেখা পাওয়ার জন্য ছদ্মনামে কমেন্ট দেন : অসাধারণ হয়েছে । সুপার্ব ।

তাতেই বিগলিত অতসী । এখন উনি লেখার সঙ্গে সঙ্গে নামী লেখকদের যাঁরা ওঁর বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের সইও অন ডিমান্ড বাজারে ছাড়েন, অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে বিলি করেন । অনেকেই প্রিয় লেখকের সই পেতে উৎসুক । তাঁরা কিনে নেন । যেমন যে গ্রামে থাকেন তার কাছে বড় লেখকের সই একটি ইঁদুরের ঘাড় টিপে যোগাড় করা খুবই সহজ কাজ । লাগে সই দেবেন অতসী নন্দী ।

এই পর্যন্ত সবই সহ্য সীমার মধ্যে কিন্তু যেদিন ডঃ নন্দী জানতে পারলেন যে অতসী লেখকদের শয্যা সঙ্গিনীও হন সেদিন নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি ।

বহু লেখক সুবিধে নিলেও নেন নি কেবল গুরুচরণ । মধ্য চল্লিশ, বেয়াড়া বয়স । তবুও উনি অতসীর স্মার্ট, ঈষৎ কুশ্রী দেহের মধুরিমা ভোগ করতে রাজি হননা !

- বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে ! ছি ছি ! একি নোংরামো !

আপনারা কী এগুলো সবার সঙ্গেই করেন ? আগে যাঁরা এসেছেন সবাই আপনার শিকার !

রাগে গজগজ করতে থাকেন গুরুচরণ । মুখটা বিকৃত ।

অর্ধনগ্ন অতসী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন ।

তাঁর লেখালেখি ও লেখককূলের প্রতি একটা অদ্ভুত টান আছে । কিছুটা অবসেশান বলা যায় । তাঁর কাছে লেখকেরা দেবতা । সবাই বড় ফিলোসফার, দূর্দান্ত মানুষ ।

কাজেই দেহদানের মতন সুকর্ম করা বিচিত্র কী ? ওঁনারাও আনন্দ নেন বিদেশ বিভুঁইয়ে । কিন্তু গুরুচরণের এহেন আচরণ বিস্ময়কর । আজ পর্যন্ত যতজন এসেছেন সবাই তাঁকে ভোগ করেছেন । উল্টে পাল্টে তাঁর হরমোন ইঞ্জেকশানের দাক্ষিণ্যে ঢলঢলে দেহে হাত বুলিয়ে সবটুকু সুধা পান করেছেন । চেটেপুটে খেয়েছেন প্রায় অস্তমিত অথচ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট তীব্র যৌবনকে । এও এক অভিজ্ঞতা বই কি ?

একটু অন্যধরণের শরীর ভোগ !

বিদেশের জল লেগে এই বয়সেও লঞ্জারি পরা দেহে একটা চটক আছে ।

আগের মতন বেবুন পাছা কেউ বলেন না ওঁনাকে । এখন উনি নিজেকে ঠিক মতন গড়ে নিয়েছেন । দামী গয়না ও পোশাকে বেশ মোহময় বাঙালী লেখককূলের কাছে । জিভ দিয়ে জল গড়ালো না কেবল গুরুচরণের । যাঁর বদনাম অশ্লীল লেখক হিসেবে । একবার ধরাও পড়েছিলেন পুলিশের হাতে অশ্লীলতার দায়ে কিন্তু ছাড়া পান পরে । এক বিগ শটের হস্তক্ষেপে । অতসীর স্বামী ভদ্র সভ্য মানুষ । শয্যায় বেশি অভিযান করেন না । তাই কিছু হ্যারল্ড রবিন্স ও সেক্সটুনের বই কিনে পড়ে নিয়েছেন । এখন গুরু এলেই হয় !

গুরু যেন বলছেন : আহ্ তু, অতু ।

- গুরু গুরি গুরিয়া গুরুং, উহু ছোটছেলে, নটি বয়, স্তন নিয়ে এত খেলা একদম নয় !

গুরুচরণের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলেন মিসেস অতসী নন্দী । কিন্তু সেগুড়ে বালি ! কত মহড়া দিয়েছেন কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন গুরুচরণ -তাই নিয়ে । আদর করে ওঁনাকে বিছানায় গুরু ডাকবেন না গুর্স্ সেটা নিয়ে কত্তো ভেবেছেন । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দামী কাঞ্জিভরম ও জামদানি নিয়ে পুতুল খেলেছেন কোনটাকে খোলস করবেন সেদিন এইভেবে । দেশে গিয়ে এগুলো কিনে আনেন । আর পাঁচতারা হোটেলে থাকেন । সেসব নিয়ে ফিরে গিয়ে গল্প করেন বাঙালী মহলে । আর এখানকার ভেতো বাঙালীরা তো অবাক চোখে চেয়ে থাকেন ওঁনার দিকে ! কোথায় উঠে গেছেন মিসেস নন্দী ! পাঁচতারার ঘেরাটোপে ছুঁয়ে ফেলেন কোনো বিলিওনেয়ারের হাত ! সহজেই ।

সমস্তটা শুনেছেন ডঃ নন্দী প্রীতির কাছে । প্রীতিও কিছু ধোয়া তুলসী পাতা নন ।

ওঁনার কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝেই সাহিত্যের আসর বসে তখন ব্ল্যাক লেবেল আর নষ্টামির আসর বসে। রাত ১০টার পরে সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ওরা --যেমন খুশি করো -

-বলে একটা খেলা খেলে । তাতে যে যার সঙ্গে খুশি রাত কাটাতে পারে । অনেক সময় একাধিক জনের সঙ্গেও ।

বহু নামী লেখক ঐ আসরে হাজিরা দেন নিয়মিত ।

পরের দিন খবরের কাগজে তাঁরাই আবার ফলাও করে লেখেন : সমাজে অহেতুক যৌনতা নিয়ে । গালভার বুলি কপচান । টিভিতে নগ্নতা নিয়ে বাণী দেন, বলেন এগুলো যুব সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে । বলেই আবার নিজের কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদে নগ্নিকার চিত্র বসিয়ে দেন বাজারে খাবে বলে ।

সেইসব খবর এত দূর দেশে কেউ জানেনা । এঁরা বাঙালী লেখক দেখেই ঘরে এনে তোলেন । জিনিসপত্র আজ পর্যন্ত একবারই খোয়া গেছে । আসলে ঐ লেখক এসেছে গ্রাম থেকে তাই হয়ত লোভে পড়ে নিয়ে গেছেন ! তাতে অতসীরা কিছু মনে করেন নি । তাঁর সই তো নেওয়া হয়ে গেছে, ইনি এবারের শুভমসাহিত্য অ্যাকাডেমি পেয়েছেন । এত্তো কম বয়সে । চাট্টিখানি কথা ? একটু আঁতেল । চিবিয়ে কথা বলেন ও ভুলভাল ইংলিশ । প্রিপোজিশানে ভুল হয় সবচে বেশি !

পেনটা ইন টেবিল না অন টেবিল কিংবা চায়ের কাপ অন না ইন সেই নিয়ে বিভ্রান্তি ।

কিন্তু দূর্দান্ত আবৃত্তি করেন বাংলায় । ভরাট গলায় :

মগ দস্যু কি এলো আরাকান থেকে --- এ এ !

বলে এমন ভলিউম তুলে দেন গলার যে পাশের বাড়ির বুড়ি লিজার সভ্য ভব্য কুকুর জোবান্নি ঘেউ ঘেউ করে ওঠে !

আরাকান থেকে --এ এ এ !-----ঘেউ ! ঘেউ ! ঘেউ ঘেউ ! ঘেউ ঘেউ ঘেউ !!

লাও ঠেলা সামলাও । এ তো আর তোমার কলকেতা নয় ! যেখানে মানুষে আর কুকুরে একসঙ্গে থাকে হাসপাতালের বেডে !

দু একবার জরিমানা হয়েছিলো অতসীদের, বাঙালী ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাসের কৃপায় । তবুও বাংলা সাহিত্যের ভূত মাথা থেকে গেলোনা । কিন্তু সবচেয়ে ধোয়া তুলসী পাতা দেখা গেলো গুরুচরণকেই । যাঁকে লোকে অশ্লীল মানুষ বলে ঘেন্না করেন ।

আর সবচেয়ে সভ্য হলেন তিনিই ? আজব দুনিয়া ! মানুষ আজও চিনলেন না অতসী, হয়ত সেইকারণেই তাঁর বড় লেখক হওয়া হলনা ! সবাইকেই এক মিষ্টি, এক ফুলে পুজো দিতে চান উনি । তবে আরো কিছু সুবিধে হয় । এই লেখকদের নিজের কাঁচা সৃষ্টিগুলি দেখান অতসী । ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা, বাহা বাহা করেন । তারপরে আরো একটু মদ টদ পেলে লেখা বার হতে থাকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় । কিন্তু একবার দেশে চলে গেলে আর টিঁকি ধরা যায়না । তখন ফোনই ধরেন না ওঁরা, ব্যস্ততার অজুহাতে । অতসীর রাগ হলেও পরের বার অন্য একজনকে আবার আঁকড়ে ধরেন । কারণ সেই বাংলা সাহিত্য !! মাথায় লেখিকা হবার ঘুণপোকা !

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যোজন ক্রোশের দূরত্ব হয়ে গেলেও বাইরে কেউ কিছু জানেনা । অতসী ঠিক বোঝেন না কেন এই অবহেলা ! তারপর তো এক অশুভ লগ্নে,

এন আর আই গিন্নি মিসেস অতসী নন্দী হারিয়ে গেলেন চিরতরে অতলান্তিকের বুকে ।

শেষ সময়ে কি মনে হয়েছিল যেই ভুলের কথা জানেনই না তার প্রায়শ্চিত্ত করার সময় হলনা ? কে জানে !

আজ তাঁর মৃত্যুর ঠিক একমাস পরে ডঃ নন্দী আবার বিয়ে করতে চলেছেন কন্যাসমা ডোরাকে । সন্তানেরা মেনে নিয়েছে । বাবার একাকীত্ব কাটলো ! আর ওদেশে বয়সের হিসেব কেউ করেনা!বাবা নিজে না খুঁজে নিলে হয়ত ওরাই বেছে দিতো । কে জানে !

- তোমাকে ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে ডোরা । লাজুক হেসে বলেই ফেলেন ।

- রিয়েলি ? রিয়েলি ডার্লিং ? ডোরা খুশিতে ঝলমল করছে । অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে অপরূপা ডোরাকে । একজন রূপসীকে বধূ বেশে এই জন্মে দেখতে পাবেন আগে তো স্বপ্নেও ভাবেন নি ডঃ নন্দী । পেত্নীর ক্লেদাক্ত যোনিপথের মধুরিমা ভোগ করেই কেটে যাবে জীবন এই ভেবেছিলেন । মধুর স্বরে বলে ওঠেন--

- ইয়েস মায় ডিয়ার ওয়াইফ !

- ওয়াইফ তো এখনো হইনি । আরো কিছুক্ষণ বাকি !

কথা শেষ হতে হতেই বেজে ওঠে চার্চের ঘন্টা, অনতিদূরে । বিয়েটা ওঁরা করবেন খ্রীষ্টান মতেই । হলের মাঝখানে থাকবে একটি বড় মোম । তার পাশে দুটি ছোট মোম । সেই ছোট দুটি নিয়ে ডোরার মা আর এদিকে ডঃ নন্দীর ভারত থেকে উড়ে যাওয়া বড়দা জ্বালাবেন একত্রে ঐ বড় মোম । তার অর্থ হল দুই পরিবারের মিলন হল । তারপরে ঘরে থাকবে আরো অনেক মোম । সেগুলি অন্যরা জ্বালিয়ে দেবেন । অর্থাৎ সবাই ওঁদের মেনে নিলেন । এক হয়ে গেলো দুটি সত্তা ।

দূরে ডোরার মায়ের গাড়ি এসে থামে । মা ছিলেন নান । একটি মিশনারি প্রতিষ্ঠানে থাকতেন । সেখানকার হেড পাদ্রী দ্বারা ধর্ষিত হয়ে অন্ত:সত্ত্বা হন । কোল আলো করে আসে ডোরা । কিন্তু জন্মের আগেই মারা যান ওর জন্মদাতা পিতা । ডোরাকে একহাতে সিঙ্গেল মাদার হিসেবে মানুষ করেন রেড ক্রশের সেবিকা, ওর মা - যিনি পরবর্ত্তী জীবনে আর পুরুষসঙ্গ করেন নি ।

আজ এই শুভদিনে তাকে ডঃ নন্দীর হাতে তুলে দিতে চলেছেন ।

ভারতীয়দের খুবই পছন্দ করে মা ও মেয়ে । বলেন : ভারত তো মাদার টিরিজার দেশ ! ভারতীয়রা আমাদের থেকে কত আলাদা, ওরা কত রক্ষণশীল, যার তার সঙ্গে বিছানায় যায়না । অন্ধ স্বামী, খঞ্জ স্বামীকে নিয়েই সুন্দরভাবে কাটিয়ে দেয় জীবন । বিশেষ করে বাঙালীরা তো ভীষণই কনসার্ভেটিভ বলে শুনেছি ---!!!

ডোরার মায়ের শেষ কথাগুলিকে ঢাকা দিতেই যেন খুব নিচু দিয়ে উড়ে যায় একটি উটকো সেস্‌না ( ছোট প্রাইভেট এরোপ্লেন) । তার ধাতব শব্দে মিলিয়ে যায় শেষের লাইন, দূর থেকে বহুদূরে !

# কাছের মানব

আন্দামান । মরিশাস । ফিজি। সিঙ্গাপুর । সেশেইলস্ ।

ষোড়শী রিমা সব সময় সমুদ্রের ধারে বেড়াতেই পছন্দ করে । দাদার সঙ্গে প্রায়ই চলে যায় সারা দুনিয়ার সাগরকূলে । রিমার বসবাস ব্যাঙ্গালোরের এক পশ অ্যাপার্টমেন্টে । ওর নেট বান্ধব অরিজিৎ বাস করে পুণায় । অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কে কাজ করে । অবসর সময় চ্যাট করে । সেখানেই আলাপ রিমার সঙ্গে । রিমা চাউড্রি । রিমাকে ওয়েব ক্যামে দেখেছে অরিজিৎ । স্বর্ণ চাঁপার মতন বর্ণ, পক্ক বিম্বোষ্ঠী, মেঘবরণ চুল । জন গ্রিশামের ডাই হার্ড ফ্যান অরিজিৎ পাইন মাত্র ত্রিশ । ডেবোনেয়ার, ইন্ট্যালিজেন্ট, লাইভলি । রিমা পার্টি অ্যানিম্যাল নয় । একটু বই টই ঘেঁষা মেয়ে । কন্ট্যাক্ট লেন্সের রং টাও ভারি সুন্দর - সমুদ্রনীল । অরিজিৎকে সে স্বপ্ন দেখায় ।

রিমা বেচারি নি:সঙ্গ । ব্যাঙ্গালোরের মতন জায়গায় একাকীত্ব নিত্যসঙ্গী । বাবা মা দাদা যে যার কাজে ব্যস্ত । এখানে লোকে লোকের সঙ্গে বেশি মেশে না । কেউ কারো ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করেনা । সবাই ছুটছে । দৌড় দৌড় দৌড় । দক্ষিণীদের নিজেদের সার্কেল আছে । ওরা অদক্ষিণীদের বিশেষ পাত্তা দেয়না । ওদের কালচারের অঙ্গ হয়ে গেলে আলাদা কথা, ভাষা বললে কাছে টানবে নয়ত একটা দূরত্ব থেকেই যাবে । সিংহভাগ রক্ষণশীল দক্ষিণীর ধারণা যে উত্তরভারতীয়রা এসেই নষ্ট করলো ওদের সংস্কৃতি ।

অথবা সামাজিক রেষারেষি চলে ।

- রিমারা স্কোডার নতুন গাড়িটা কিনেই ফেললো ? তাহলে আমাকে স্কোডা বেঁচতে হচ্ছে ।

অথবা বিল গেটস্ এসে লীলা প্যালেসে ছিলেন এবার ভাবছি ওখানেই ছেলের বার্থডে পার্টি দেবো । কে ? রিমা ওখানে জন্মদিন সেলিব্রেট করেছে ? ওহ্ শীট !

দেন আই মাস্ট গো ফর সঞ্জয় খানস্ রিসর্ট ।

এই প্রতিযোগিতা রিমাকে ক্লান্ত করে । তাই সে অবসর সময় নেটে বসে অচেনা মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করে । ইলেকট্রনিক কথাই হয়ে ওঠে এক একটি রূপকথা ।

এইভাবেই আলাপ অরিজিতের সঙ্গে । আলাপ গাঢ় হয় । অপরূপা বান্ধবীকে অরিজিৎ পরিচয় করিয়ে দেয় অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ইমেলের মাধ্যমে ।

সবাই ওর পিঠ চাপড়ে বলে- গুরু কোন মন্তরে একে বাগালে ?

- মন্তর ফন্তর কিসু না, স্রেফ চ্যাটিং । ও একা, আমিও একা কাজেই বন্ধু হয়ে গেলাম ।

- শুধু বন্ধু ----কি ? চোখ মটকে বলে অনীশ, অরিজিতের বন্ধু ।

অরিজিৎ হাসে । এত সুন্দরী ও স্মার্ট একজন বান্ধবী থাকলে কারো কারো যে ঈর্ষা হবে এতো জানা কথা ।

রিমার জন্য আজকাল অরিজিৎ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে আসে বলে জানিয়েছে। আগে সে অফিস ফেরৎ ক্লাবে যেতো। এখন সোজা বাড়ি আসে। এসেই হালকা জলখাবার খেয়ে বসে যায় চ্যাটে। আর ওদিকে সে তো থাকবেই। মুগ্ধতা ছড়াবে, বিদ্ধ করবে একরাশ প্রেম বাণে।

সারাটা দিন যেন কাটেই না, অরিজিৎ প্রতীক্ষা করে অপরাহ্ন বেলার। কখন সে আসবে *বিটস্ অ্যান্ড বাইটস্* এ - ডিজিট্যাল সিগন্যাল বেয়ে আসবে বসন্ত !

সাতষট্টির পরিমলবাবু গা ধুয়ে এসে কাঁটায় কাঁটায় ছটা থেকে চ্যাটে বসেন। তখন তিনি ষোড়শী রিমা। কলকাতার আটশো স্কোয়ার ফিট হয়ে ওঠে ব্যাঙ্গালোরের পশ অ্যাপার্টমেন্ট।

রিমা ওরফে পরিমলবাবু তো অবসর নিয়ে এখন একটি প্রাইভেট শিপিং কর্পোরেশনের ম্যানেজার। সেই সুত্রেই নানান জায়গায় যেতে হয়। বেশি যেতে হয় সাগর কিনারে। সমুদ্র ভালও বাসেন। ঢেউয়ের গর্জন, উথালপাতাল ভাব ওনার বড় প্রিয়। অবশ্য কলকাতায়ও তো ঢেউ আছে, জনসমুদ্রের ঢেউ। রোজ বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময় সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় কুপোকাৎ।

ঢেউ সামলে বাড়ি এসে পরিপাটি হয়ে ল্যাপটপ্ নিয়ে বসেন। ইয়াহু তেই বেশি চ্যাট করেন। অনেকের মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ করেন জিতের সান্নিধ্য।

অরিজিৎ ওরফে জিৎ খুব জ্ঞানী। কত কিছু জানে। এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে চারিদিকে এত হৈ চৈ জিৎ কিন্তু বলেছে যে পৃথিবী অনেক গ্লেসিয়াল এজ পেরিয়ে এসেছে। কাজেই হঠাৎ যদি প্রচন্ড ঠান্ডা হয়ে যায় পৃথিবী অবাক হবার কিছু নেই। প্রকৃতি নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা। তুরুপের তাস তার হাতে কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই। অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রোটিওমিক মেডিসিনের কনসেপ্ট আসছে। এখন থেকে জিন ম্যাপিং করে ওষুধ দেওয়া হবে। জ্বরের জন্য সবাই পেরাসিটামল নেবেন না। কেউ পেরাসিটামল কেউ অন্য কিছু। এই অন্যকিছুটা কি সেটা ঠিক করবে তার জিনের গতিপ্রকৃতি যেটা জিন ম্যাপিং থেকে জানা যাবে। অথবা উগ্রপন্থী দমনে অপরাধ বিজ্ঞান এখন ব্রেন ফিঙ্গার প্রিন্টিং টেকনোলজির কথা বলে। উগ্রপন্থীদের মস্তিস্কে কিছু চিন্তাভাবনা ঘোরে যা সাধারণ মানুষের মাথায় ঘোরে না। সেটাই নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় এই টেকনোলজির দ্বারা। এত ডেটা জিতের করায়ত্ব যে বিস্ময় জাগে।

রিমার খুব ভালো লাগে ওকে। সেই ভালোলাগা সে জানিয়েছে।

অরিজিৎ দেখা করতে চেয়েছে। রিমা ওরফে পরিমলবাবু নানান অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। সেটা তো আর সম্ভব নয়। যদিও ওয়েবক্যামে পরিমল বাবু পাশের বাড়ির মেয়ে রাইয়ের ছবি দেখিয়েছে। অরিজিৎ মুগ্ধ, কারণ রাই অসাধারণ সুন্দরী। একটু ঐশ্বর্য রাই বচ্চন টাচ আছে। যদিও নামের মিলটা একবারেই কাকতলীয়। জীবনে কম সুন্দরী দেখেনি জিৎ কিন্তু রিমার মতন কেউ না।

কথা যেন ফুরায় না ওদের। পরিমল বাবুর মজা লাগে। ভারি মজা লাগে। এই ছদ্মনামে উনি কত মানুষের খুঁটিনাটি বার করেন। অনেকসময় একজনের সঙ্গে আরেকজনের ঝগড়া লাগিয়ে দেন। কত বয়স্ক লোকেরাও এই চ্যাটে এসে শিশুসুলভ ব্যবহার করেন দেখে ওনার মনে হয় যে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বোধহয় খুবই অভাব। হার্ভার্ড, বার্কলি থেকে লিখছেন এইসব পরিচয়ে এক একজন আসেন অথচ চূড়ান্ত খিস্তাখিস্তি আরম্ভ করেন। তখন মনেই হয়না এরা সুশিক্ষিত। কেউ বামপন্থী স্টাইলে চ্যাট পাড়ায় দাদাগিরি করেন, কারো *ইলেকট্রনিক ঢেঁকরি খুলে লেন*। কেউ বর পাকড়ান, কেউ ছেলেমেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠাবেন বলে লাইন তৈরি করেন আবার কেউ নেহাতই সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন

। নিন্দুকে বলে ডলার- পাউন্ড হাতাবার মতলব । তারপর কত ডলার গরীবের পেটে যাচ্ছে আর কতটা বাম পকেটে পুরছেন সে হিসেব কে রাখেন ? অনাবাসী ভারতীয়রা দেশের বর্তমান হালহকিকৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন কাজেই দেশবাসীর দৈন্যদশার করুণ আলোচনা শুনে, দু:খ পেয়ে এই আন্তর্জালে যিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন তাকেই মোটা আর্থিক অনুদান পাঠান । সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে বসে তো ক্রিমিন্যাল রেকর্ড চেক করা সম্ভব হয়না !সমাজ সংস্কারকের কেউ কেউ অজ্ঞাতবাসী হন, শহরে থাকে দু- একটা এজেন্ট । তারাই পুরো কর্মকান্ড সামলান । আন্তর্জালে দুনম্বরী জাল বিছিয়ে টিপিক্যাল মফস্বলিয়া এস্টাইলে ছোটা সহর (শহর) ছোটা সোচ নিয়েও বিশ্বের প্রথম সারির নগরের রাঘব বোয়ালদেরও ঘায়েল করেন, অস্ত্র ? আদি ও অকৃত্রিম দরিদ্রতা ।

এর নেগেটিভ দিক হল যাঁরা প্রকৃত সমাজ সেবক তাঁরা ঢাকা পড়ে যান সন্দেহের

পুরু চাদরে ।

বিদেশে পড়তে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য অনাহুত সন্তান হয়েছে ? বিয়ে না করেই বীরপুঙ্গব কেটে পড়েছে ? চ্যাট আছে । সমগোত্রীয় কেউ নিশ্চয়ই জুটে যাবে । শুধু মাত্র বিয়ের আগে সেক্স করার পারমিশন দেয় বলে বিদেশী সমাজ খুব উচ্চমানের আর ভারতীয় রীতিনীতির সবই বস্তাপচা এই মতবাদ প্রচার করে রাতারাতি ই-সেলিব্রিটি হয়ে উঠবেন । নিজেকে দেবীত্বে উত্তীর্ণ করার পথও পাবেন । দেশ বিদেশ থেকে লোকে ইলেকট্রনিক সই চেয়ে পাঠাবে ।

জারজ আওড়াবে সমাজ শুধরাবার বাণী, নব টেন কমান্ডমেন্টস্ ধরা দেবে তারই

ইঁদুরের এক ক্লিকে । পরিমল বাবু ইতিবাচক চিন্তা করেন, তো কি হয়েছে যীশুও তো জারজ ছিলেন । অবশ্য এটাও ভোলেন না যে যীশু মহাপুরুষও ছিলেন ।

এই ই-জারজ কি পারবে মানবজাতির জন্য ক্রুসিফায়েড হতে ?

পরিমল বাবু দেখতে চান । আয় দেখি একবার নেটের বাইরে, তোর শ্রী মুখটা দেখি ।

অবশ্যি উনি এগুলো মুখ ফুটে বলেন না । জানেন সেটা বললেই লোকে ওনাকে পুরনো পন্থী বলে ব্যাঙ্গ করবে । মনের কথা মনেই চেপে রাখেন আর দু:খ পান ।

সাহেবদের ভালো জিনিসগুলো আমরা শিখিনা, ওদের সমাজের খারাপ জিনিসগুলোই চটপট রপ্ত করে নিই, আমরা তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা ।

আবার এও ভাবেন যে কেউ যদি ভালোবাসার সন্তান হন ? তাকেও কেন সমাজ হেয় করবে ? সন্তানের কি দোষ ? তাকে কি সুযোগ দেবে না মেন স্ট্রিমে আসন পেতে নেবার ?

নিষিদ্ধ ফল না হয় লোভে পড়ে খেয়েই ফেলেছে নারী --- সো হোয়াট ? খুনের আসামীদেরও তো রিফর্ম করার স্কুলে পাঠানো হয় ।

পরিমলবাবু কনফিউজ্‌ড । খুব, খুব কনফিউজড্ । আবার এটাও বোঝেন যে তার একার পক্ষে এই ঘূণ ধরা সমাজ শুধরানো সম্ভব নয় । কুমারী মায়ের অধিকার নিয়ে লড়াই করার জন্য আবার কোন মহাপুরুষের জন্ম হবে হয়ত, হু নোজস্ ?

কখনো কখনো একই ব্যাক্তি বিভিন্ন নামে আসেন, পুরুষ -নারী -অর্ধনারীশ্বর । অন্যরা না বুঝলেও রিমা অর্থাৎ পরিমলবাবু ঠিকই ধরে ফেলেন . ..বেশ উপভোগ করেন এই ইলেক্ট্রনিক কুস্তাকুস্তি । আর সবথেকে আশ্চর্য হল কিছু মানুষ এদের বিশ্বাসও করে ।

মনের কথা খুলে বলে। কেউ কেউ টাকাও হাতায়।

কানাঘুষোয় শোনা যায় একটি মেয়ে এক যুবকের কাছে নিজের খোলামেলা ছবি গচ্ছিত রেখেছিল। পরে সেই যুবক পর্ণো সাইটে ছবি তুলে দেবে বলে ব্ল্যাক মেলিং করে বহু টাকা হাতিয়েছে। অবশেষে মেয়েটি পুলিশের শরনাপন্ন হয়। আরও মজা হয়েছিল একবার। একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার চ্যাটে এক মহিলার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধায়। তারপর শাসায় সেই মহিলাকে। আসলে কম বয়সে বেশী মাইনে পাওয়া ও ভোগের দরজা পেরনো এই ইঞ্জিনীয়ারের এতই অহং বেড়ে গিয়েছিল যে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। উল্টোদিকে ছিলেন ওর কোম্পানীর এক বিগ শটের স্ত্রী। ব্যস্ ঝামেলা বাড়তে চাকরি খোয়ালো সেই মেয়ে।

পরিমলবাবু এদের দেখে ভাবেন যে একদম অপরিচিত লোকেরা কি করে অপরকে এতটা বিশ্বাস করতে পারেন? আজকাল নিজের বাঁ হাতকেও তো বিশ্বাস করা চলেনা যা যুগ পড়েছে। মানুষ কি সত্যি এত সরল হয়? নাহলে জিৎ-ই বা ওনাকে মেয়ে ভেবে এতটা বিশ্বাস করছে কেন? পুরোটাই যে ফাঁকি হতে পারে সেটা কি তার একবারও মনে হয়নি।

আজকাল জিৎ বায়না ধরেছে যে সে দেখা করবেই।

পরিমলবাবু নানান ছুঁতো নাতায় কাটিয়ে দিয়েছেন এতদিন কিন্তু এবার সে বলেছে যে দেখা না হলে আর সম্পর্ক বাড়াবে না। খুব মুস্কিল। কারণ রিমার আসল পরিচয় কেউ জেনে গেলে অনেক জায়গায় ওনার সমস্যা হবে। কাজেই ভান্ডা ফোঁড় করা চলবে না। কদিন শরীর খারাপের অজুহাতে ঘাপটি মেরে বসে ভাবছেন কি করা যায়। আজকাল একটা অদ্ভূত ব্যাপার শুরু হয়েছে। পরিমল বাবুর মাঝে মাঝে নিজেকে সত্যি এক ষোড়শী কন্যা মনে হয়। এই তো সেদিন বাজারে গিয়ে লাল লাল থোকা থোকা ফুল দেখে ভাবছিলেন যে কিনে মাথায় লাগাবেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়েছেন। ভাগ্যিস ভাবনাগুলো দেখা বা বোঝা যায়না! আসলে জিৎ ওনাকে প্রায়ই বলে - রিমা তোমার মাথায় লাল ফুল লাগালে বেশ লাগবে। আরও একদিন খুব মজা হয়েছিল। সেদিনও বেঁচে গেছেন অবশ্য। অফিসে এক টাইপিস্টের নাম রিমা। তো দুপুরে ক্যান্টিনে সবাই খাচ্ছেন এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিল - এই রিমা!

পরিমল বাবু প্রায় সাড়া দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি! তারপর ঢোঁক গিলে ম্যানেজ দেন।

আসলে এই চ্যাটিং ও কৃত্রিম জীবন একটা মোহ তৈরি করে মনে, সারাটা হৃদয়কে কেমন আচ্ছন্ন করে রাখে।

যাইহোক অনেক ভেবে টেবে পরিমল বাবু স্থির করেন যে জিতের সঙ্গে দেখা করবেন। ওকে একবার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। রিমার বাবা সেজে যাবেন। ওকে বলেই নেবেন যে রিমা ওর বাবার সঙ্গে যাবে। আর রাইকে রিমা সাজিয়ে নিয়ে যাবেন।

রাই খুব কাকু কাকু করে। জাহাজ কোম্পানীতে কাজ করেন পরিমল বাবু তাই প্রায়ই বিদেশি জিনিস জোটে রাইয়ের কপালে। ফলে সে কাকুর কথা ফেলতে পারে না।

আর ওর নিজেরও বেশ মজা লাগে এই চ্যাটের ব্যাপারটা। কাকুকে সবাই মেয়ে ভাবে! কাকু অবশ্য কাউকে বলতে বারণ করেছেন। উনি এটাকে বলেন টাইম পাস, মজার খেলা। এগুলো করলে মনটা সবুজ সতেজ থাকে বুড়িয়ে যায়না। শরীরের তো ঘন্টা বেজেই গেছে।

ওরা প্ল্যান করলো। অরিজিৎ ওরফে জিৎ আসবে ব্যাঙ্গালোর আর পরিমল বাবু রাইকে নিয়ে যাবেন ব্যাঙ্গালোর। ওখানে ইন্দিরা নগরে ওনাদের একটা অফিসের গেস্ট হাউজ আছে সেখানেই উঠবেন।

রাইয়ের বাবা মা আপত্তি করেন না। পরিমল বাবু তো ওদের পড়শী। সেই শৈশব কাল থেকে রাই ওনারই কোলে পিঠে একরকম মানুষ। উনি বিপত্নীক। একমাত্র ছেলে আছে আর্মিতে। এই সুযোগে রাইয়ের ব্যাঙ্গালোরটাও ঘোরা হয়ে যাবে। আর কিছুদিন পরে হয়ত ওকে ওখানে পড়তে যেতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং কিংবা মাইক্রো বায়োলজি অথবা বায়ো টেকনোলজি। সারা কর্ণাটকে ছড়িয়ে থাকা কলেজে বাংলা থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়তে যায়।

পাশ করে ভালো কোম্পানীতে কাজও জুটে যায়। ইনফোসিস, সত্যম, মাইন্ডট্রি, বায়োকন, উইপ্রো ইত্যাদি।

নাহয় কয়েক বছর ধানক্ষেতের সেচের জলেই স্নান করলো। নাহয় শহরের বাইরে সুদূর গ্রামে এক ধূ ধূ প্রান্তরে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন কোনো কলেজে পড়লো আর কলকাতায় এসে : আমার মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে পড়ে--বলে সোসাল স্ট্যাটাস বাড়ালো। সো হোয়াট ? বেকারত্বের থেকে তো সেগুলো ভালো। রাইকেও তার বাবা মা নিয়ম মাফিক ওখানে পাঠাবার প্ল্যান করছেন।

পরিমলবাবুর একটা গানের কথা খুব মনে হয়- নীল ডায়মন্ডের গান- *অন দা বোটস অ্যান্ড অন দা প্লেনস্ দে কাম টু অ্যামেরিকা ( ব্যাঙ্গালোর) ---*

হা হা হা ! নিজের মনেই হেসে ওঠেন রিমা রূপী সাতষট্টির পরিমল।

এখন উনিও সেই ব্যাঙ্গালোর চলেছেন বাট ফর রং রিজনস্।

যথাসময় ওরা দুজন হাজির ব্যাঙ্গালোরে, গেস্ট হাউজে। হালকা খাবার খেয়ে পরিমল বাবু গড়িয়ে পড়েন বিছানায়। রাই বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দেবদারুর ঝরাপাতার স্তুপ পেরিয়ে সামনের রাস্তায় চলমান গাড়ি আর মানুষের ঢল দেখছে নিবিষ্ট চিত্তে। এই তাহলে ব্যাঙ্গালোর ? সেই একই মাটি, একই আকাশ, একই বাতাস ! শুধু লোকগুলো বেজায় কালো।

আর হৃষ্টপুষ্ট। গুন্ডাদের মতন। মেয়েগুলো খুব শক্তপোক্ত। বাঙালীদের মতন স্বভাব লাজুক নয়। খুব ডেস্পারেট। আর কিসব ভাষায় যে কথা বলছে মনে হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় ওদের দেখা করার কথা জিতের সঙ্গে।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ডোবার প্রস্তুতি নিতে ওরাও তৈরি হয়ে নিল। একটা অটো নিল। যেতে হবে ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ রোডে। ওখানে একটি ধাবায় দেখা হবে জিতের সঙ্গে।

অল্প সময়ে পৌঁছে গেল গন্তব্যে।

শের-এ পাঞ্জাব থাবা, হ্যাঁ ধাবা নয় একেবারে থাবা। বাঘের নয় এই যা রক্ষে। ওরা নেমে এগোতেই এক পাকা গোঁফ দাঁড়ি সমৃদ্ধ ভদ্রলোক গট্‌গট্‌ করে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। খুব দাপুটে দেখেই বোঝা যায়।

-হ্যালো প্রফেসর রামমূর্তি হিয়ার, সো ইউ আর রিমা অ্যান্ড হি ইজ ইওর ফাদার !

আই অ্যাম দা চিফ সায়েন্টিস্ট অফ আর্টিফিসিয়াল ইন্ট্যালিজেন্স অ্যান্ড রোবোটিক্স ডিভিশন অফ

সি ড্যাক, পুণে।

কি বলে যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো জানিনা মিস্টার অ্যান্ড মিস চাউড্রি, আপনাদের সহযোগিতায় রোবোটিক্স গবেষণায় আমরা একটা জায়েন্ট লিপ দিতে পেরেছি । এই জন্য আপনাদের কাছে আমি ও আমার পুরো টিম কৃতজ্ঞ ।

হেসে ওঠেন পক্‌ক কেশ প্রফেসর ।

পরিমলবাবু ও রাই দুজনেই একটু ঘাবড়ে গেল । মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে । জিৎ কোথায় ? ইনি কে ? আর ওদেরকেই বা চিনলেন কি করে ? এত সাবলীল ওনার ব্যবহার যেন কতদিনের চেনা ।

ভদ্রলোক যেন অন্তর্যামী । মনের কথা বুঝতে পারেন ।

সুন্দরভাবে হেসে বলে উঠলেন - ভাবছেন জিৎ কোথায় তাই না ?

ওরা দুজনে নির্বাক । প্রফেসর বলে চলেছেন- সেই জন্যেই তো বললাম আপনারা আমাদের গবেষণাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন । এতদিন শুধু সাইবার অর্গানিজম তৈরি করতে পারতাম আমরা । কিন্তু এই প্রথম একটি এমন রোবট তৈরি হয়েছে যাতে মানুষের মতন ইমোশানস্‌, সেন্স ভরতে সক্ষম হয়েছিলাম । এবং চ্যাট লাইনে নিজস্ব দক্ষতায় ও আপনাদের মুগ্ধ করে প্রমাণ করেছে যে এরকম মানুষের মতন রোবট আমরা বানাতে পারি যে প্রোগ্রামের বাইরেও নিজের সেন্স খাটিয়ে যেকোন প্রাণীর সঙ্গে ইন্টার‍্যাক্ট করতে পারবে । এতে অনেক সুবিধে হবে । যেখানে মানুষ যেতে পারেনা কিংবা বিনা খাদ্যে যেখানে দিন কাটাতে হয় সেইসব জায়গায় এবার থেকে আমরা এদেরকেই পাঠাবো ।

সরি রিমা, রিয়েলি সরি ফর মিস গাইডিং ইউ । সরি মিস্টার চাউড্রি -

প্রফেসরের শেষ কথাগুলো আর কানে ঢুকছে না রিমা রূপী পরিমলের । চরিদিকে এক অদ্ভূত নি:স্তব্ধতা । ছদ্মনামে নেটের চ্যাট লাইনে নারী সেজে ঢোকা পরিমল আজ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হল তার কাছের মানব, মানুষী চালাকি সাইবর্গ (সাইবার অর্গানিজম) অথবা রোবট *ডেবোনেয়ার অরিজিৎ পাইনের* কাছে ।

*মাথা নিচু করে রাইবিহীন বিমর্ষ পরিমল একমনে হেঁটে চলেন পলাশ প্লাবিত পথ ধরে, সাইবার শহরের নীল দিগন্তরেখায় । বাক্সবন্দী চেতনারূপী সিগন্যালই আচ্ছন্ন করে রাখবে পরিমলকে অনন্তকাল ।।*

লেখাটি আনন্দবাজারের একটি গল্প প্রতিযোগিতার সুত্র ধরে লেখা । গল্পটি বিবেচিত হয়নি । সুত্রঃ *সাতষট্টির পরিমলবাবু গা ধুয়ে এসে কাঁটায় কাঁটায় ছটা থেকে চ্যাটে বসেন । তখন তিনি ষোড়শী রিমা ।*

# অযাচিত

ব্যাঙ্গালোর থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব । চওড়া সবুজে ঢাকা রাস্তা, মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে আছে অভিমানী পাহাড় । কোথাও ঘাসবন, ফুলের সারি । গোলাপী ফুল, নীল ফুল বেগুনি ফুল । ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি ।

বেড়াতে বেরিয়েছে টিকলি । টিকলি রায়চৌধুরী । ক্লাস ১২ দিয়েছে। উঁচু নীচ পথ । মসৃণ । খুব জোরে চলেছে গাড়ি ।

সপ্তাহে একটা দিন ওরা লং ড্রাইভে বেরোয় । ওরা পুরো পরিবারের সবাই মিলে বেরোয় । রিলায়েন্সের সি গ্রীন ও নীলে মোড়া সুললিত এ ওয়ান ধাবায় খেয়ে দেয়ে ফেরে । পথপাশে একটু উঁচু জমিতে খুব সুন্দর জায়গায় এই ধাবা । চারিদিকে পাহাড়, তার মাথায় ঘন বন আর ধাবার পেছনে গোলাপের বাগান । সব মিলিয়ে অদ্ভুত সুন্দর । দিনান্তে ওরা পৌঁছালো । ময়ূখমালি তখন ডুবতে চলেছে ঘন মেঘের অন্তরালে ।

মসলা চা ও গোবি পাকোড়া অর্ডার দিয়ে ওরা বসলো একটি টেবিল জুড়ে । পুরো পরিবার । বাবা মা বোন আর টিকলি । ধাবাটি বেশ বড় । খোলা দু দিক । একদিকে অজস্র চাকা সমৃদ্ধ দূরপাল্লার লরি সার বেঁধে রয়েছে অন্য দিকে খাটিয়া পাতা টিপিক্যাল ধাবা স্টাইলে আর বাইরের দিকে মুখ করা পানের একটি কাউন্টার । মূল কাউন্টারে মেনু কার্ড রাখা আছে । অর্ডার দিয়ে নিজেকে গিয়ে খাবার আনতে হয় । বিরাট চুল্লিতে গনগনে আগুনে মোটা গুম্ফ ওয়ালা এক দেশী শেফের দ্বারা সেঁকা হচ্ছে মোটা, পাতলা হরেক রকমের রুটি । একটা পাশে শিক কাবাব হচ্ছে । প্রচুর লোক এসেছে এই সাঁঝবেলায় । রমরম করছে ধাবা । বাইরে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে । সার বেঁধে । একটা দুধ সাদা মার্সিডিজও রয়েছে ।

আজকাল লোকে এত মার্সিডিজ কিনছে যে ওরা বাড়িতে হাসাহাসি করে যে এবার মার্সিডিজের সি -ক্লাস, ই- ক্লাস তুলে দিয়ে ঝি -ক্লাস বার করতে হবে । লোকের হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা । বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের হাতে । রিয়েল এস্টেট এর ব্যবসা করে তো লোকে রাতারাতি কোটিপতি বনে যাচ্ছে প্লাস আছে দুনম্বরী কালো টাকা । সেসবই ঢালা হয় রাশি রাশি মার্সিডিজে ।

টিকলি ভাবছিল ওরও যদি একদিন এরকম একটা গাড়ি কেনার সৌভাগ্য হয় খুব ভালো হবে।

কত জায়গায় যাবে ড্রাইভ করে করে । গাড়ি চালানোটা শিখে নেবে । ওর এক বামপন্থী কাজিন আছে । সে ওকে বলে কোনদিন পয়সা নষ্ট করবি না গরীবদের দিবি ।

- দিয়ে ?
- ওরা খুব দু:খী ।
- কিন্তু আমি সমানে দিতে থাকলে ওরা তো নড়ে বসবে না । তার চেয়ে জনসংখ্যা কন্ট্রোল করলে হয়না ?

- তুই একটা ক্ষেপি । বলে মাথার চুল গুলো এলোমেলো করে দেয় ।
- এয় চুলে হাত দেবেনা একদম দেবেনা কতদিন বলেছি না ! ঝংকার দিয়ে ওঠে টিকলি ।

চুলের ওপর ওর খুব দূর্বলতা । বিশাল বেণী দুলিয়ে হেঁটে বেড়ায় । বেণীর গোছ মোটামুটি ৩ ইঞ্চি । ঘন কালো সিল্কি । সেই বেণী দুলিয়ে বাইরে এলো টিকলি, গোলাপ বাগের কাছে । এমন সময় হঠাৎ চীৎকার -ভাগো ভাগো !

কিছু বোঝার আগেই ও দেখলো যে পারছে গাড়িতে উঠে পালাচ্ছে, মুখগুলো সাদা কাগজের মতন ফ্যাকাসে । সবাই ত্রস্ত, ভীত । মুহূর্তের ভেতরে চোখ গেলো কোণায় । একটা বিশাল আকৃতির চিতা বাঘ । প্রমাণ সাইজের । অসম্ভব তাগড়া । বেঞ্চে উঠে আবার ওটা থেকে নীচে নেমে আসছে । ভয়ে টিকলির হাত পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে গেলো । কি করবে ভেবে ওঠার আগেই কে যেন প্রায় টেনে ওকে একটা গাড়িতে তুলে নিল ।

কোথায় বাবা কোথায় মা বোন ঈশ্বরই জানেন !

গাড়ি চলেছে দ্রুতবেগে । ভেতরে তিনজন যুবক মাথায় পাগড়ি পরা আর একজন মেয়ে মুখে লাল ওড়না জড়ানো । স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে । নিজেদের মধ্যে । গাড়ি ব্যাঙ্গালোরের উল্টো দিকে ধাবমান ।

টিকলি কিংকর্তব্য বিমূঢ় । হঠাৎ সেই মেয়েটি মিষ্টি হেসে ইংলিশে বললো- জল খাবে ?

টিকলি গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ করলো । ভয়ে, বিস্ময়ে । কোথায় যাচ্ছে ওকে নিয়ে ওরা ? জল খেতে গিয়ে বোতল থেকে চলকে পড়লো । জল শেষ করে ওরা বোতলটা নির্মম ভাবে দুমরে মুচরে ফেলে দিল রাস্তায় । গাড়ির পেছনের চাকাটা ওটাকে আরো ডিফর্ম করে দিলো ।

তারপর অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে ওরা এলো এক অচিন গ্রামে । লালমাটি, তাজা বাতাস ।

অনেক বাঁশ গাছ । একটা গাছ্‌বাড়ি । বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি । লম্বা, খাড়া বাঁশের সিঁড়ি । সবুজ পাতার ছাউনি ঘরের মাথায় । বাড়ির একটা দিকে ঘন বন । কোন লোকজন থাকে বলে মনে হলনা । ওরা গাছ বাড়িতে উঠে গেলো। প্রায় হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিয়ে গেলো টিকলিকে । ওর খুব ভয় করছিল। পা পিছলে যাবার ভয় । তবুও সেই মেয়েটি ওকে এক হাতে ধরে ওপরে তুললো ।

ভেতরটা অগোছালো । গুচ্ছের নোংরা জমানো । ছেঁড়া কাগজ, ঝরা পাতার স্তুপ । তবে ঘরটা আকারে বেশ বড় । কে যে এখানে এরকম একটা বাড়ি বানিয়ে ছিলেন কে জানে !

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার । ওরা মোমবাতি জ্বালালো । সেই মেয়েটি ও দুটি ছেলে ছিল । অন্যজন গাড়ির সারথী । সে নীচে আছে, গাড়িতে । বাইরে বন থেকে ঝিঁ ঝিঁর ডাক ভেসে আসছে ।

টিকলির কেমন ভয় ভয় করছে । মেয়েটির নাম মরিয়ম । ছেলে গুলো সেলিম ও থুজা ।

মরিয়ম গাছ্‌বাড়ির জানালার ধারে রাখা একটি ছোট বাক্সের ভেতর থেকে টেনে বার করলো একটি অ্যালুমিনিয়ামে মোড়া প্যাকেট । ধোসা । আর ঝোলা থেকে বার করলো নারকেল ও

বাদাম বাটার চাটনি। এগিয়ে দিল টিকলির দিকে। ওর মুখ তখন তিতকুটে। খাবারের কোন স্পৃহা ছিলনা ওর।

তবুও খেতে হল। ওরা এমনভাবে চাইছিল যে ভয়ে ওর অবস্থা টাইট। খেয়ে নিল গপগপিয়ে কোনভাবে। তারপর ওরা চলে গেল। যাবার সময় ওকে ঐ ঘরে আটকে রেখে গেলো।

সারারাত মশার কামড়ে চোখের পাতা এক হলনা। আর টেনশন তো ছিলই। শেষে কখন যে পুবদিক রাঙা করে সুয্যিমামা উঠলো কে জানে। ওর ঝিমুনি এসেছিল শেষ রাতে। দরজা খোলার শব্দে ওর সম্বিৎ ফিরলো। একদল নতুন মুখ। সেই মেয়েটি নেই। ওরা এসেই টিকলির গায়ে হাত দিতে লাগলো। টিকলি খুব অসোয়াস্তি বোধ করতে থাকায় ওরা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করলো। দূর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলছিল ওরা। শুধু ইল্লা গোতিল্লা, হেলেভাদু, ইস্টু এইসব শব্দগুলো টিকলি বুঝতে পারছিল। সিঁটিয়ে বসেছিল সে এককোণে। বাতাসে অজানা গন্ধ। এ কি বিপদে তাকে ফেললেন বিধাতা। চোখ ফেটে জল আসছে। এরা কি কিডন্যাপার ? এরপর কি ওর বাবা মায়ের কাছ থেকে লামসাম অ্যামাউন্ট দাবী করবে ? হঠাৎ ওর গাল টিপে ধরলো এক যুবা।

বিশ্রী দাঁত বার করে হেসে উঠলো। ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠলো টিকলি। এমনসময় সিঁড়ি বেয়ে মরিয়ম প্রবেশ করলো। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো। ছেলের দল সরে দাঁড়ালো। উঠে বসলো টিকলি।

ওকে টেনে নীচে নামালো মরিয়ম। তারপর গাড়ি করে গেলো কিছুদূরে একটা ঝুপড়িতে। ওখানেই চা খেলো ওরা। সঙ্গে সাম্বার বড়া। তারপর টিকলিকে নিয়ে এলো অন্য একটি বাড়িতে। এটাও লোকালয়ের বাইরে তবে এটা পাকা বাড়ি। উঠোন, কলঘর সবই আছে। ছাদে টিন লাগানো। ঘরগুলোও তুলনা মূলকভাবে পরিস্কার।

ওরা এসে প্রবেশ করলো।

এখানেই কেটে গেল কয়েকদিন। রোজ দুপুরে আসতো মরিয়ম। আর রাতে একটি ছেলে পাশের ঘরে থাকতো তবে সে খুব ভদ্র ও গম্ভীর। উদাস চোখে চেয়ে আকাশের তারা গুনতো। রাতে ওরা সাম্বার ভাত খেতো। দিনে ইডলি বড়া। এসব বানাতো আর একটি মেয়ে, জাহানারা। সে নিজে বিকেল হলেই কেটে পড়তো। হিসেব মতন আজ সাত দিন হল টিকলি এই বাড়িতে এসেছে। আপাত শান্ত এই গৃহে কিছু অশান্ত মানব সন্তান বাস করে তা সে টের পায় কিন্তু এরা কারা তা জানেনা। এরা কি ওকে গুম করবে ? কি মতলব কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা। খানা পিনা তো মন্দের ভালো জুটছে। কথা বলার লোকও জুটেছে। ঐ জাহানারা। তবুও একটা হাহাকার ও ভয় টিকলিকে ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ। কেউ ওর ঘরে ঢুকলে ও কাঁপে। বেড়াতে বেরিয়ে কি চরম দূর্ভোগ হল ভাবা যায়না। এমন জানলে ওরা বেরোতো না। বাবা মা না জানি এতক্ষণে কি করছেন। সিনেমায় দেখা কিডন্যাপারদের মতন ওর বাসায় এরা ফোন করছে না তো !

সেদিন দুপুরে ওরা টিকলিকে নিয়ে গেল একটি ক্লাব গোছের বাড়িতে। সার দিয়ে বেঞ্চি পাতা। কে একজন আজ সভা করবেন বলে ওদের এখানে আনিয়েছেন। ওরা এই ক্লাবের সভ্য।

মিনিট পনেরো কেটে যাবার পর এলেন এক মহিলা। কালো পোশাক পরা। মাথায় কালো ওড়না জড়ানো। মুখটা দেখে চমকে উঠলো টিকলি। মহিলাও চমকে উঠেছেন। এ যে

ওদের পাড়ার নারীবাদী, পুরুষ বিদ্বেষী বিখ্যাত ফারহা দিদি । নাস্তিক, ইসলামকে গালাগালি দেওয়া ফারহা দিদি । যে নমাজ পড়েনা, ধর্ম মানেনা ।

এন আর আই ছিলেন । এখন ভারতেই থাকেন । বিদেশ থেকে এসে কর্নাটকের এক গ্রামে পড়াতেন ।

ছোট ছোট আন্ডার প্রিভিলেজড্ ছেলেমেয়েদের নিখরচায় শিক্ষা দান করতেন । বিদেশ থেকে নিয়ে আসতেন বন্ধু বান্ধবদের । তারাও অত্যাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্রতী ছিলেন গ্রামের কোরকদের । নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করে আধুনিক ইন্টেলেকচুয়াল সমাজে বাহাদুরি কোড়াতেন । শুধু অধর্ম বাদী নন উনি নারীবাদী এবং পুরুষকে ঘৃণা করা মতবাদী । তবুও অসংখ্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন বলে শোনা যায় । পাড়ায় অনেকে বিশেষ করে সো কলড ধর্মের ধ্বজাধারীরা ওনাকে র‍্যান্ডি বলেও বদনাম করে । ফারহা দিদির অবশ্য একটা যুক্তি আছেই । ওর মতে পুরুষকে পদদলিত করাই ওঁর উদ্দেশ্য । পুরুষের মতন বজ্জাজ জাত আর দুটি নেই । মেয়েদের কি ওরা অবলা পেয়েছে ? ডান্ডাবাজি করে কি ওরা জগত জয়ে নেমেছে ?

বখাটে, পার্টি করা ছোঁড়া হামিদ একবার চিল্লাচ্ছিল এই বলে যে ওরে সমাজ সংস্কারক পুরুষ বিদ্বেষী তোর একটি রাতও তো ডান্ডা ছাড়া চলে না । ফরহা দিদি অবশ্যই এদের বলেন - রুচিহীন, ছোটলোক ।

কিছুদিন এক এ বি সি ডির সঙ্গে থাকতো । এ বি সি ডি হল *অ্যামেরিকা বর্ন কনফিউজড্ দেশি* । তা এই গন্ডগ্রামে ইনি কি করছেন ? *ই এফ জি এইচ* কে তো দেখা যাচ্ছে না !

ফারহা দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো । যা বললো তা টিকলি না বুঝলেও আমরা বুঝলাম যে হিন্দু মেয়েকে র‍্যান্ডামলি ধরে এনে মানব বোমা করলে অনেক সুবিধে । প্রথমত ধরা পড়লে এদের হদিস কেউ পাবেনা দ্বিতীয়ত মারা গেলে একটা কাফের মরবে আর তৃতীয়ত ধরা পড়লে লোকে জানবে যে আজকাল হিন্দুরাও এইসব সংগঠণের সঙ্গে যুক্ত । যদিও মেয়েটি বলবে ও কিডন্যাপড্ হয়েছিল তবুও কিছু মানুষের মনে সন্দেহ ঢুকে যাবে ।

চিতা বাঘটি না এলে অত সহজে একটা মেয়েকে ধরে আনা হয়ত সম্ভব হত না। জন্তুরা মানুষের কত ভাবে যে উপকার করে ! মেয়েটি এখন ওদের হাতের পুতুল ।

টিকলিকে ওরা নিয়ে গেলো । কিছুই বুঝতে পারছে না টিকলি । ক্রমশ এক জালে জড়িয়ে পড়ছে সেটাই মালুম হচ্ছে কেবল ।

এবার তাকে আনা হল এক অন্য আবাসস্থলে । এটা কোথায় ও জানে না । উঁচু দেওয়াল । অনেকটা পুরনো দুর্গের একটা অংশ । পাহাড়ের ওপরে এই দুর্গ । পাহাড়টা ভারি অদ্ভুত, পাথর গুলো একটা যেন আরেকটার ওপর বসানো । অদৃশ্য আঠা দিয়ে লাগানো । গাছ গাছালি কম । বাদরের উপদ্রব দেখা গেল । কানাঘুষোয় শুনলো এখানে কাঁকড়া বিছের দেখাও মেলে । গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো টিকলির । মহাবিপদে পড়েছে সে । ওকে লোকগুলো নিয়ে গেল একটা ঘরে । সারা ঘরটায় পাথরের । বাদামী রং । মেঝেটা ঢালু মতন । একদিকে একটি ঘড়া রাখা । আর আছে একটি ছোট্ট ঘুলঘুলির মতন একে জানালা বলা যায়না । তবে বাইরেটা পরিস্কার দেখা যায় । নীচে শহর, অনেক বাড়ি ঘর । একটা বড় জলাশয়ও রয়েছে । খুব স্পষ্ট নয় তবে বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে লোকে নৌকা বিহার করে । হয়ত এই দীঘির সঙ্গে কোন নদীর যোগ আছে । শেষটা তো দেখা যাচ্ছে না ।

একজন এসে খাবার দিয়ে গেলো । কাঁচা টমেটো, শসা সহযোগে অসম্ভব পৃথুল ও শক্ত রুটি আর কাবলি ছোলার ট্যালট্যালে পাতলা হলুদ ঝোল । ঝোলটা খাওয়া গেলনা । বড্ড বেশি নুন দিয়েছে ।

রাতটা কাটলো ভয়ে, ভাবনায় । বাইরে পাহাড়া ছিল । এরপর দিন থেকে শুরু হল ওর মগজ ধোলাই । ওকে জগতের স্বার্থে মানব বোমা করা হবে । গায়ে বোমা বেঁধে ওকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হবে তারপর আত্মাহুতি দিতে হবে । এতে নাকি পৃথিবী থেকে অনাচার, অবিচার নির্মূল করার যুদ্ধে ও এক শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবে । ওর নাম উঠে যাবে শহীদের লিস্টে । যেমন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা আমরা জানি, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করি । সেরকম টিকলির নামও একদিন ঘরে ঘরে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে । লেখাপড়া শিখে কি হবে ? বড় জোড় একটা ভালো চাকরি, দামী গাড়ি, নামী কোন দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া এই পর্যন্তই হবে । কিন্তু ইতিহাসে নাম লেখা হবে কি ? কে চিনবে ওকে আজ থেকে ৫০ বছর পরে ? এই সাধারণ জীবন যাপনের কোন অর্থ হয় ? একটাই জীবন । যদি কিছু *করার মতন করে যেতে না পারি* বৃথা এই পদচারণা ধরিত্রীর বুকে ।

তবে কি ও উগ্রপন্থী কোন সংগঠণের কবলে পড়লো ? বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো টিকলির ।

এরা ওর কপালে জয়টিকা পড়াতে চাইছে কিন্তু সে কি টিকা না অগ্নি শলাকার স্পর্শ ? হিংসা দিয়ে এরা কোন সুখপাখি আনবে ? কোন শান্তির দুয়ার উন্মোচিত হবে ?

ওর ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতায় ও বুঝতে পারছে ও যা করতে চলেছে, চলেছেই কারণ এরা তো ওকে ছাড়বে না আর সেই মহাযুদ্ধে প্রাণ সঁপে দেওয়া কোন মহৎ কাজ আদৌ নয় ।

কিন্তু এরা যা দাবী করছে, দেশোদ্ধার, ইসলাম উদ্ধার ইত্যাদি সেটা কেন ভালো কাজ নয় ও অতশত জানে না । ও জানে এরা নিরীহ লোক মারে । আর নিরীহ লোক মেরে ফেলা অন্যায় । আর অন্যায় দিয়ে কোনদিন মহৎ কার্য হওয়া সম্ভব নয় । এরা নিজেদের সত্যর রক্ষক বলে দাবী করছে । ইসলাম ব্যাতীত অন্য সব ধর্ম নির্মূল করে দাও দুনিয়া থেকে । মজার ব্যাপার হল এই ফরহা দিদিই জনসমক্ষে নিজেকে নাস্তিক, ইসলাম বিরোধী বলে গলা ফাটায় । ওনাকে শ্রদ্ধা করতো টিকলি । তার প্রধান কারণ উনি ভালোমানুষ নিশ্চয়ই । নাহলে এত সমাজ সেবা করতেন কি ?

টিকলির পরিবার খুব বড় অস্তিবাদী । ওদের বাংলার বাড়িটি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন কালীবাড়ি । সেখানে পঞ্চমুন্ডির আসন আছে । বিরাট পুজো হয় প্রতিবছর । হিমালয় থেকে সাধুরা আসেন ।

কত অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড হয় সেই সময় । একজন সাধু এসেছিলেন উনি কথা বলতেন না । মৌনি বাবা । আরেক জন এসেছিলেন উনি খেতেন না । উনি নাকি মহাকুম্ভেও যান ।

কালী সাধক বললেই কেমন গা ছমছমানি হয় তা কিন্তু এইসব সাধুদের দেখে হয়না । বড় কোমল এঁরা ।

টিকলির বাবা বলেন নাস্তিকদের সঙ্গে ঝগড়া করো না । তাঁরা তাদের মতন আছেন, নিজেদের দর্শন মেনে ভালই আছেন । ধর্মান্ধ ও একগুঁয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসীর চেয়ে সৎ নাস্তিক অনেক ভালো । তবে যুক্তি মেনে চললেই নাস্তিক হয়না । প্রকৃত নাস্তিক হওয়া বেশ শক্ত । লোকের সস্তা হাততালি কুড়ানোর জন্য অনেকে আজকাল গালভরা যুক্তির কথা বলেন

যদিও তারা জানেন না ডিসক্রীট লজিক আর ফাজি ( Fuzzy ) লজিক বলে দুরকম লজিক আছে ।

সর্বোপরি গড ইজ নট বিয়ন্ড লজিক । অনলি দা লজিক ইজ আ হাই ক্লাস লজিক ।

ঈশ্বর চাইছেন বলেই নাস্তিকতা এই জগতে আছে । যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছে করেন, তাহলে নাস্তিককেও এমন ভেল্কি দেখাতে পারেন যাতে করে তাঁরাও ভগবৎ দর্শনের ফাইনার টাচ পেতে সক্ষম হন । বিবেকানন্দ, পল ব্রানটন কত উদাহরণ তো আছে । আর প্রকৃত ইসলাম কখনই উগ্রপন্থা প্রিচ করতে পারেনা । কোন ধর্ম গ্রন্থ শেখাতে পারেনা বিভেদ । তাহলে সেটা আর ধর্ম থাকেনা ।

আসল কোরান যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এগুলো জানেন । বাজারে যে সব কোরান গীতা চলে বেশির ভাগই তো ডিস্টর্টেড ভার্সান । প্রখ্যাত ( অথবা কুখ্যাত ) এক ধর্মগুরুর লেখা গীতা তো ভুলে ভর্তি । গীতার প্রতি ছত্রে উনি শুধু এই প্রচার করেছেন যে কৃষ্ণই সেরা দেবতা । কালীসাধনা, শিব সাধনা সব বেকার কি বাতে । আর ওনার লেখা গীতা পড়ে মনে হয় যে উনি অ -কৃষ্ণ প্রেমীদের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যেই গীতা অনুলিখন করেছেন । সুতরাং ওরিজিনাল ভার্সান না পড়ে কখনই কোন লড়াইয়ে নামা উচিৎ নয় । আজকাল তো সেটাই চোখে পড়ে বেশি । আর পড়লেই তো হয়না উপলব্ধির ব্যাপার থাকে । অনেক সিমবলিক ব্যাপার থাকে, দর্শন থাকে ।

এই কারণেই অব্রাহ্মণদের বেদ পাঠে অধিকার ছিলনা । কারণ বেদ উপলব্ধি না করতে পেরে বেদের অর্থ ডিসটর্ট করার সম্ভবনা ছিল প্রবল । তবে তার আগে জানা উচিৎ কে ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ হলেন সেই ব্যাক্তি যিনি সৃষ্টি রহস্য জানেন । নির্বাণ হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞান আছে।

এইসবই শুনেছে টিকলি ওর বাবার কাছে । ভারী ভারী তাত্ত্বিক কথা শুনেছে । ওর দাদু বেদজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন, কেমব্রিজে অধ্যাপনা করতেন । বাবা তাঁরই কাছে অনেক কিছু শিখেছেন ।

তাই ফরহা দিদির এই রূপ টিকলির কাছে এক বড় ধাক্‌কা । যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে তার পতনের ভাগিদার হওয়া বড় যন্ত্রণাদায়ক । ফারহা দিদির আপাত ভালোমানুষের মুখের আড়ালে এই বিকৃত সত্তা দেখে বড়ই বেদনার সঞ্চারণ হয়েছে টিকলির নিষ্পাপ হৃদয়ে ।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে । টিকলিকে ওরা সব বুঝিয়ে দিয়েছে কি করে ও ঢুকে যাবে বিখ্যাত সফট ওয়্যারের অফিস ক্যাম্পাসে, ইলেকট্রনিক সিটিতে । ঐ একই অফিসে ও ওর মাসতুতো দাদার সঙ্গে একবার গেছে । খুব সুন্দর অফিস । দেখার মতন । কত রকম রেস্তোরাঁ আছে । ঝকঝক তকতক একেবারে । সেই একই জায়গায় আজ এই উগ্রপন্থীর দল ওকে নিয়ে যাচ্ছে তবে ফর রং রিজনস্ ।

ওর কিছুই করার নেই । কারণ পালাতে গেলে অদৃশ্য বন্দুকের নল থেকে ছুটে আসবে বারুদ।

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে ওর ছোট, কোমল ফুলের মতন শরীর ।

দিনটা ছিল ১২ ই অগাস্ট । আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের জন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন অফিস কর্তৃপক্ষ । মেটাল ডিটেকটর আগেই ছিল । আরো কড়াকড়ি হয়েছে । মাছি গলতে পারবে না একটাও । তবুও নিরাপত্তা কর্মীর মধ্যেই আছে ফরহা দিদির লোক

আছে। তবে ফারহা দিদি বোধহয় এই দলের মাথা নয়। অন্য কেউ আছেন এর অন্তরালে। ওরা মির্জাসাহেব বলে কার কথা যেন বলাবলি করে। উনি বোধহয় বৃটেনে থাকেন।

নির্দিষ্ট সময় ওকে ওরা নামিয়ে দিয়ে যায় গেটে। এখান থেকে ও একজন নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গে তার বোন পরিচয়ে মেটাল ডিটেকটর এড়িয়ে চলে যাবে ভেতরে। আর সবাই তো ১৫ই অগাস্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ১২ই অগাস্ট অনেক শিথিল।

আরবাজ নাম সেই কর্মীর।

ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখ গেলো সবুজ গাড়ির দিকে। যাতে ওকে উঠে বসতে হবে। বড় একটা মহীন্দ্রার গাড়ি। আজ এখানে কিছু ফরেন ডেলিগেটস্ এসেছেন। বিস্ফোরণে তাদের মারার প্ল্যান হয়েছে। তাহলে ভবিষ্যতে কেউ এখানে আসতে চাইবেন না। ভারতের সফট ওয়্যার বিপ্লবে একটা বড় ধাক্কা লাগবে।

ডুপলিকেট চাবি দিয়ে খুলে নিল দরজা সেই রক্ষী। ছোট্ট টিকলি সবে ঢুকতে যাবে গাড়িতে এমন সময় কে যেন বজ্র গম্ভীর স্বরে পেছন থেকে ডেকে উঠলো- টিকলি তুই এখানে ? আমরা তোকে চারিদিকে কত খুঁজছি ? কোথায় ছিলি তুই ?

টিকলির নিজের কানকে বিশ্বাস হলনা। এতো জোনাথন কাকুর গলা, এক্স সি বি আই অফিসার।

টিকলির বাবাও তো সি বি আই তে ছিলেন অনেকদিন। পরে ছেড়ে দিয়ে নিজের এজেন্সী খুলেছেন।

বেশির ভাগ কাজ করেন সাইবার ক্রাইম নিয়ে। লোকের ইমেল পর্নো সাইটে রেজিস্টার করে দিয়ে আসা, লোককে ইমেলের মাধ্যমে হ্যারাস করা, অ্যাবিউসিভ ই- মেল লেখা, ই মেল আইডি হ্যাক করে ব্যাঙ্কের ডিটেলস হাতানো সবই দেখে ওর বাবার ফার্ম ই- জিনোম নামে কোম্পানি।

আসলে বেশির ভাগ নেট ইউজার তো জানেই না এগুলো করলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভবনা থাকে ও যায়ও। প্রতি কম্পিউটারের থাকে একটা আই পি অ্যাড্রেস। তাই দিয়েই ধরা যায় কে কোথা থেকে ই-মেলটা পাঠাচ্ছেন।

ক্রমাগত নোংরা ই মেল পাঠালে তারও ব্যবস্থা আছে। শুধু ধরার অপেক্ষা।

অনেকেই ঘুঘু দ্যাখে, ফাঁদটা চোখে পড়েনা তাই ঘুঘু ধরতে খুব দাপটের সঙ্গে এগিয়ে আসেন শেষে ধরা পড়ে লজ্জার একশেষ।

জোনাথন কাকা এখন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সীর কাজ করেন। মূলত ওরা হাই প্রোফাইল সেলিব্রিটিদের সিকিউরিটির অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন। আর এইসব বড় বড় স্বনামধন্য কোম্পানির সুরক্ষার কাজও করেন। সি বি আই তে থাকার সময় অনেক ইন্টার ন্যাশেন্যাল ক্রিমিন্যাল কে ইন্টারোগেট করেছেন স্পিরিচুয়াল পার্সপেক্টিভ থেকে এবং ফলও পেয়েছেন দ্রুত। সাউন্ডস্ ফানি কিন্তু সত্য সত্যই। এই জাঁদরেল অফিসারটি আদতে *ইন্টারন্যাশনাল কৃষ্ণা কনসাসনেস* অর্থাৎ সবার পরিচিত ইসকনের শিষ্য। ওখানে যান উনি ইটার্নাল পিসের এর জন্য। অবশ্যই ক্ষুধার্ত ভিখিরিকে পেট পুরে খাইয়ে, তার বুক ভরা আশীর্বাদ নিয়েই।কেবল গালভরা বুকনি দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ভরিয়ে মাইলেজ পেয়ে পরক্ষণেই বিলিতি মদের গ্লাসে সব টাকা ঢালতে নয়।

হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে নিয়ে এলেন জোনাথন অন্যপাশে । ততক্ষণে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে । প্রথম গুলিটা অবশ্যই করেছিল ফারহা দিদির চর ।

*গুলি থেকে বাঁচতে শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন* - চেঁচিয়ে ওঠে অজানা কোন কন্ঠস্বর ।

সেই উচ্চগ্রামও ফিকে হয়ে আসে, স্তব্ধ হয় একসময় সব আওয়াজ ।

জোনাথন ওকে নিয়ে এসেছেন একটা ঘরে । সেখানে অনেক মনিটর রয়েছে । সারা বিল্ডিংয়ের সবার মুভমেন্টস দেখা যাচ্ছে বড় স্ক্রীনে । অনেক নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছেন যাঁদের দেখে টিকলির মনে হচ্ছে এঁরা কোনদিন হাসেন নি । ওদের মধ্যে একজন এসে টিকলিকে নিয়ে গেলেন পাশের চেম্বারে । ওর জামা খুলে ফেললেন এক টান মেরে । অবশ্যই মহিলা কর্মী । নিরাভরণ টিকলির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে বস্ত্রহীনতার শরমে ।

মানব বোমা টিকলি পাথরে ডুবে যায়, ধীরে ধীরে পাথর থেকে চুলচেরা বিচারের আইনি গহ্বরে ।

# বাস্টার্ড

জয়ের কোন পিতৃ পরিচয় নেই। ওর মা বৈজয়ন্তী যখন বিদেশে পড়তে গিয়েছিল তখনই ওর জন্ম হয়। ওর বাবা ছিল ওর মায়ের ব্যাচমেট। একসঙ্গে দুজনে থাকতো তারপর একদিন ওর মা প্রেগন্যান্ট হল। বাবা বললো অ্যাবর্ট করাতে। মা রাজি হননি। শেষে বাবা ওর জন্মের আগেই ওদের ছেড়ে চলে যান। বাবার নামটা যদিও ওরা ব্যবহার করেছে সব জায়গায় ভূষণ পটবর্দ্ধন কিন্তু ও নিজেকে পিতৃহীন বলতেই বেশি ভালোবাসে। সমাজ ওকে বাস্টার্ড আখ্যা দিয়েছে।

জয়ের খুব ইচ্ছে করে মায়ের এই বদনাম সে মুছে দেবে। যদিও কি করে বাস্তবে তা সম্ভব সে জানেনা। মনে মনে ভাবে এমন কিছু সে করবে যাতে ওর খুব নাম হয় এবং একদিন ওর মা পরিচিত হবে ওর পরিচয়ে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা তো সবসময় হয়না।

কুমারী মায়ের ভারতীয় সমাজে কোন শ্রদ্ধা নেই। লোকে ব্যঙ্গ করে। মা বলেন এরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। চাকরিও ভালো জোটেনি। ডোর টু ডোর সেলসের কাজ করে করে দিন গুজরান। কয়েকটি জায়গায় দরখাস্ত দিয়েছিলেন অধ্যাপনার কিন্তু অবিবাহিতা মা শুনে কেউ ইন্টারভিউতে ডাকেনি।

মায়ের ক্ষমতা ছিল। সেলসের কাজ করে করেই একদিন নিজেই একটি ছোট ফার্ম খুললেন। সেখানে ফার্নিচার নিয়ে ডিল করা হয়। এখন বড় বাড়ি হয়েছে ওদের। বেশ কিছু বছর আগে তখনও ওরা খুব স্বচ্ছল ছিল না সেই সময় একদিন ওরা মা বেটায় মিলে গিয়েছিল একটি গয়নার দোকানে। পরণে মলিন পোষাক দেখে সেলসের ছেলেটি কম দামী কানের দুল বার করে করে দেখাচ্ছিল। তারপর এলেন এক গাড়ি থেকে নামা ধনী কাস্টমার। তিনিও দুল কিনবেন। তখন সেলসম্যান খুব মূল্যবান সব জিনিস দেখাতে লাগলো। ভীষণ দু:খ পেলো জয়।

নাহ্ এইভাবে অপমান সহ্য করা আর সম্ভব নয়। শেষে ও চরস গাঁজা হাসিসের পেডলার হল। একটা ছোট্ট প্যাকেট এদিক থেকে ওদিক পাচার করলেই অনেক টাকা। আস্তে আস্তে সে জড়িয়ে পড়লো এক শক্ত জালে।

মা কিছু জানতেন না। জানতেন পুত্র ব্যবসা করে। শুধু রাতের বেলায় দেরী করে ঘরে আসা দেখে জিজ্ঞেস করতেন - কি রে এত রাত করে কোথার থেকে এলি ?

পাকা চুলের গোছা হাত দিয়ে সরাতে সরাতে খাবার নিয়ে বসতেন। নিপুন হাতে সাজিয়ে দিতেন গরম গরম পাতলা রুটি, এগ কারি কিংবা আলুর দম। শেষ পাতে হালকা মিষ্টি।

- আমি তো এখনো বেঁচে আছি, তুই আরাম কর।

মায়ের স্নেহসিক্ত গলা শোনা যায়। ছেলে চুপ করে থাকে।

- কি এমন কাজ তোর যে এত খাটায় ?

ছেলে মৃদু হেসে বলে- নাইট শিফটে দিতে চায় আমি বলে কয়ে দিনেই করছি শুধু একটু রাত করে ফিরি।

মা কথা বাড়ান না। আজকাল ছেলের রোজগারে ওদের সংসারে অর্থের বাণ ডেকেছে।

অর্থই যেমন অনর্থম এর মূল তেমনই অর্থ না থাকাও মুস্কিল। স্বচ্ছলতা এলে মনও ভালো থাকে। আজকাল ওরা বড় বড় হোটেলে খেতে যায়। একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলের খুব ভাব হয়েছে। তা ভাব হবার বয়সই এটা।

মেয়েটি নীল নয়না। নামটিও খুব সুন্দর, সোহা।

মুসলিম মেয়ে। জয় একদিন জিজ্ঞেস করেছিল - বিধর্মী মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো মা ?

মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন - মানুষের আবার জাত কি রে ? মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে।

ছেলে যেন মায়ের এই কথাগুলো থেকে সুক্ষ্ম একটি বেদনার স্রোত বইতে দেখে।

যেটা অনুচ্চারিত রয়ে গেলো সেটা হল- মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, পিতার পরিচয়ে নয়।

জয় ভাবে কোনদিন যদি সেই বীরপুঙ্গবের দেখা পায় তাহলে এমন নাস্তানবুদ করবে যে জীবন ভোর মনে রাখবে। পকেটে হাতটা চলে যায়। পিস্তলটা সুড়সুড় করে। মনে হয় সবকটা গুলি দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিই লোকটার শরীরটা। তার মায়ের পবিত্র দেহে যে ভাগ বসিয়েছিল একদিন দানবের মতন। তারপর পশু প্রবৃত্তির মতন চলে গেছে নিজ পথে। একবারও তার দেখতে ইচ্ছে হলনা, অনাগত সন্তানকে ?

হাজার প্রশ্ন ভীড় করে মাথায়। মাথাটা টনটন করে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এইসব কথা মনে হলেই মাথার ভেতরটায় আগুন জ্বলে। ওর সহকর্মী রেহমান বলে- ভুলে যাবার চেষ্টা কর।

কিন্তু ভোলা কি এতই সহজ ?

- বাস্টার্ড, বাপের উদ্দেশ্যে গালি দিয়ে নিজেই হেসে ফেলে। এত দু:খেও। নাহ্ তার বাপ কিন্তু বাস্টার্ড নয়। এক ব্যবসাদারের ছেলে ছিল সে। শুনেছিল ওদের পৈত্রিক বাসা দিল্লী শহরে। মাঝে মাঝে ভাবে একদিন দিল্লী গেলে হয় না ? সঙ্গে লোডেড পিস্তল।

পিস্তলটা আজকাল কাজে লাগে ওর। ড্রাগ পেডলার থেকে এখন তার কাজের পরিধি বেশ বেড়েছে।

টাকাও আসছে জলের মতন। মায়ের নামে ফ্ল্যাট কিনেছে একটি পশ এলাকায়। পুণে শহরে কোরেগাঁও পার্কে

ওদের নতুন ফ্ল্যাট। রাজনীশের আশ্রম আছে ওখানেই - ওশো। ভোগবাদের দর্শন প্রচার করে যারা।

বৈদিক যুগের আগে যেই তন্ত্র ছিল তা ছিল শুদ্ধ। পরে সেই তন্ত্রে বিকৃতি আসে। আর রাজনীশের মতন গুরুরা এই তন্ত্র থেকেই বেসিক কনসেপ্ট ধার করে নিয়েছে। কাম করে, মৈথুন করে করে সেক্সের নেশা কেটে গেলে আসবে এক স্ট্যাগনেন্ট ভাব। তখন মানুষ চিন্তা করবে সে কেন এই ধরায় আবির্ভূত হয়েছে। কি তার লক্ষ্য। আসবে ধ্যান, শান্তি। সব শোনা কথা। কাম্বলে বলে ওর এক বন্ধু আছে তার কাছে। ওর বাড়িতে একটা সুন্দর সুরেলা পিয়ানো আছে। বিয়ে করেনি। একবার চাকরি ক্ষেত্রে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় চাকরি

খোয়ায় । তারপর এই উল্টো পথে চলে আসে । বাবা ও মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল কৈশোরে । কাম্বলে মানুষ ওর দাদুর কাছে । তিনিও দেহ রেখেছেন বছর খানেক আগে । এখন কাম্বলে ঝাড়া হাত পা । কাজ করে, ওশোতে যায়, মাল খায় । ব্যস । তবে ও বাস্টার্ড নয় বলে জয় ওকে যেন মনে মনে হিংসা করে । শুধু এক পিস বাপ নয় শালার একটি দাদুও ছিল ! কপাল করে জন্মেছে বটে ! জয়ের বাপের উপাধি পট্‌বর্দ্ধন ।

যদিও জয়ের মনে হয় উনি পট নয় জীবন কাহিনীর প্লট বর্দ্ধন করে গেছেন । যাক্ ওসব আজেবাজে চিন্তা করার দরকার নেই । লোকটা নির্ঘাত এতদিনে পটল তুলেছে । নাহলে কি একবার দেখা হতনা ?

আজকাল সোহার সঙ্গে বেশি দেখা হয় না । কারণটা কিছুই নয় ব্যস্ততা । এত ব্যস্ত থাকে জয় যে নিয়মমাফিক প্রেমে হাজিরা দেওয়া হয়ে ওঠেনা । সোহা অভিযোগ করে । লাভ হয়না । জয় বেশির ভাগ সময় অন্য শহরে থাকে । ওকে আজকাল সুপারি নিতে হয় বিভিন্ন লোকের । এটাই আপাতত ওর কাজ ।

গোয়া কিংবা মুম্বাইতে কিছুদিন গা ঢাকাও দিতে হয় মাঝে মাঝে ।

তবে সোহার সঙ্গে ওর শুদ্ধ সম্পর্ক । শুধু চুমু খাওয়া, হাত ধরা এইসব । ওর নিটোল দেহ থেকে নিজেকে দূরেই রেখেছে জয় । মায়ের কথা মনে হয় তাই ঠিক করেছে বিয়ে হলেই ওকে স্পর্শ করবে । সোহা ওকে পাগল বলে ক্ষেপায় । কিন্তু এই ব্যাপারে জয় একরোখা । আর তার যা কাজ তাতে লাইফ রিস্ক রয়েছে কাজেই সে কোন শরীর এর খেলায় নামতে চায়না, সে চায়না সোহা কোনভাবে পরবর্তীকালে সাফার করুক । বিয়েটি হোক তারপর যা হবার হবে । সোহা বলে- ন্যাকা, সতীপণা দেখে মরে যাই । জয় কথা বাড়ায় না, হেসে এড়িয়ে যায় ।

সেদিন ছিল শনিবার । এইসব দিনগুলোতে ওরা party করে । ও, রহমান, সোহা, কাম্বলে । ওয়াইন, ড্যান্স অ্যান্ড

এনজয় । সোহার সঙ্গে আলাপ এরকমই এক পার্টিতে । ও গোয়াতে এক সামুদ্রিক হোটেলে বেলি ড্যান্স করতো-

বাজনার তালে তালে দুলে উঠতো ওর সুললিত তনুলতা :

Hey ladies drop it down,

Just want to see you touch the ground

Don’t be shy girl go Banaza

Shake ya body like a belly dancer

সেক্সি বান্ধবীর মোমের মতন দেহ বেয়ে বেয়ে পড়ে গ্ল্যামার । জয় আর পারেনা দুর্গের প্রাচীরের অন্তরালে থাকতে । পরাজিত হয় মোহময়ী সোহার কুহকের কাছে ।

সাধারণতঃ সোহা ওর কাজে বাধা দেয়না তবে দেখা হয়না বলে মাঝে মাঝে খুব কথা শোনায়।

অবশ্য দয়িতার কাছে মধুর বকুনি শুনতে মন্দ লাগেনা ।

জয়ের দলের লিডার ওসমান ওকে একটা সুপারি দিয়েছে । ওকে যেতে হবে রাজস্থানের জয়পুর । সেখানে একটি রাজপ্রাসাদকে করা হয়েছে সেভেন স্টার হোটেল । সেখানে এক শিল্পপতি গেছেন ছুটি কাটাতে । ওনাকেই মারতে হবে । শিল্পপতিরা, ফিল্ম প্রোডিউসারেরা দিয়ে থাকেন তোলা, নিয়মিত । কিন্তু এই শিল্পপতি ওসমান ভাইয়ের হাতে কোনদিনই চায়নি টাকা দিতে । উপরন্তু পুলিস ডেকেছেন । ফলে ওসমান ওনাকে সরিয়ে দেবার ফন্দি এঁটেছে । দায়িত্ব পড়েছে জয়ের ওপর । বোধিসত্ত্ব নাম এই শিল্পপতির । অদ্ভুত নাম । কোন পদবী নেই । হয়ত ব্যবহার করেন না । এক জেনেরেশানে খুব বড় ব্যবসা করেছেন । আগে পারিবারিক কোন সাধারণ কোম্পানি ছিল সেটাকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে দিয়েছেন । মূলত করেন লিকারের ব্যবসা । নাসিকে ওনার অনেক আঙুরের ক্ষেত রয়েছে । ওয়াইন ফ্যাক্টরি আছে । আছে ফার্ম হাউস । কিন্তু ওসমান ওকে দূরে কোথাও মারতে চায় । যাতে হাতে গন্ধ না লাগে ওদের ।

এই কাজ দেওয়া হয়েছে পরম বিশ্বস্ত ও এফিসিয়েন্ট জয়ের ওপরে ।

সেজন্য সোহার জন্মদিনে ওর থাকা হবেনা । ও সোহাকে একটি ডায়মন্ড কিনে দিয়েছে । লাভ সাইন তৈরি করে চারপাশে এক গুচ্ছ ডায়মন্ড বসানো । ভারি সুন্দর । হোয়াইট গোল্ডের মধ্যে হীরের দ্যুতি যেন আরো খুলেছে ।

অভিমানিনী সোহা ভারি খুশি । মনের বরফ গলে জল মূহুর্তেই ।

সময় মতন মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে জয় হাজির হয় বিমান বন্দরে । ওসমান একটি ক্যুরিয়ারের ব্যাবসা চালায় । তাদের প্রাইভেট জেট আছে । সেই জেটে চেপে চলে যাবে ও নির্দ্বিধায় জয়পুর ।

কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবেনা । তারপর চলে যাবে হোটেলে । সন্ধ্যায় শিল্পপতি যাবেন একটি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে । হয়ত তখনই কাজ সারতে হবে । সম্ভবতঃ যেই গাড়িতে উনি যাবেন তার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে হবে জয়কে । কি করতে হবে সেটা হোটেল পাগড়িতে গেলেই জানা যাবে । সেখানে পরবর্তী কাজের নির্দেশ পাওয়া যাবে । এইভাবেই হয় । পার্ট বাই পার্ট । এটাই ওসমান ভাইয়ের স্টাইল । কোন কাজের সম্বন্ধে একবারে কিছু জানা যায়না । অল্প অল্প করে নির্দেশ আসে । তারপর কাজ হয় । জয় শুনেছে ওসমান ভাই তার কোন কর্মী কাজে বিফল হলে জ্যান্ত ছাড়েনা । মেরে ফেলে দেয় আরব সাগরে । তাই জয় ভয়ে ভয়ে থাকে । কারণ বিফলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মা ও সোহা সুরের যুগলবন্দী ।

রাজস্থানে শীতকালে মারাত্মক ঠান্ডা পড়ে কিন্তু দিনের বেলায় খুব গরম । সূর্য ডুবলেই হাড় কাঁপানো শীত ।

জয়ের ছোট্ট প্লেন এসে পৌঁছালো বিকেলবেলায় । নেমে ওদের দলের গাড়ি করে চলে এলো হোটেল পাগরিতে ।

পুরনো রাজপ্রসাদকে বানানো হয়েছে বিলাস বহুল হোটেল । চোখের ঈশারায় রূপসী স্বল্পবাস হাজির হয়ে যাচ্ছে বিলাস বহুল ঘরে । কত নামি দামী মানুষ আসছেন এদের একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্য । সোহাকেও অনেকে জ্বালিয়েছে, কিন্তু ও খুব স্ট্রিক্ট । বলে- শরীর দেখো কিন্তু ছুঁয়ো না । পুড়ে যাবে, এ হল অগ্নি শলাকা ।

তবে সোহাদের কেউ বিরক্ত করতে পারেনা । ওদের বডি গার্ড থাকে । কেউ বিরক্ত করতে গেলেই মার খাবে ওদের হাতে । ওরা শো-কেস, উইন্ডো শপিং করো কিনতে যেও না,

পাবেনা । তাই শুধু দেখেই খুশি হও । সোহা অবশ্য বলেছে বিয়ের পরে এসব ছেড়ে দেবে । ও এই লাইনে এসেছে পয়সা করার জন্য । আসলে এসেছিল বলিউডে কাজ করতে কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে যা হয় তাই হয়েছে । সি- গ্রেডের সমস্ত ছবি সাইন করে করে বোর হয়ে তারপরে নাচ্‌নী হয়েছে । এতে খাটনি কম আর চাকরির মতন বলে পয়সার অসুবিধে থাকেনা । ও আবার মাঝ বয়সী লোভী লোকেদের শয্যাসঙ্গিনী হতে একেবারে নারাজ । ওগুলোর ক্ষিদে প্রচুর কিন্তু একেবারে অকর্মণ্য । বিছানায় ধেরায় । সোহা ওর শরীর না বিকিয়ে নেচে আর জয়ের সঙ্গে প্রেম করে করে কাটায় । স্বপ্ন দেখে একদিন ওরা ঘর বাঁধবে । তখন আর ও নাচবে না । ভূমধ্যসাগরে ক্রুজ করবে । স্যুইস আল্পসে ফুলের সুবাস মেখে বিশ্রাম নেবে ।

জয়ের ডিনার খাওয়ার অভ্যাস আজকাল খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে । কারণ বিয়ার খেয়ে খেয়ে পেট ভরে যায় । তারপর রাতের খাবার খাওয়ার জায়গা থাকেনা । মা বকেন বাড়িতে ।

এখানেও ও ৬টা নাগাদ খেয়ে নিলো । ভদ্রলোককে একবার দেখেছে । নীল পোষাকে খুব ডেবোনেয়ার লাগছিল ।

জয়কে যেতে হবে বোধিসত্ত্বর গাড়ির পেছন পেছন । তারপর যেই উনি নামবেন অনুষ্ঠান মঞ্চে তখন গুলি করতে হবে । গাড়ি থেকেই গুলি চালাতে হবে । ওর গাড়ি চালাবে ওদের দলের লোক । সে হোটেলের মুখে আসবে কালো স্কোডা নিয়ে । বোধিসত্ত্ব বেরোবেন গ্রে কালারের লিমুজিনে ।

প্ল্যান্‌টা ওসমান যথারীতি জানিয়েছে এখানে আসার পর । আর ওদের একটা কোড অফ কনডাক্ট আছে সেটা হল অপারেশানের সময় মোবাইল থেকে পার্সোনাল কল করা যাবেনা । সমস্ত ফোন কল ট্র্যাক করে এই সময় ওসমানের গ্রুপ । ওসমানের একটা মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের ব্যাবসাও আছে যে !

কাজেই সোহার সঙ্গে কথা বলা যাবে না ।

ঘর থেকে বেরোলো জয় । সঙ্গে নিলো আগ্নেয়াস্ত্র । হঠাৎ একটা কোলাহলে সবাই ইতিউতি ছুটতে লাগলো ।

কি ব্যাপার? জয় কৌতুহলি । জয় উদ্‌গ্রীব । জানা গেলো শিল্পপতি বোধিসত্ত্ব হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন । সবাই অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়লো । বোধিসত্ত্ব ক্লিন শেভ করা মাথা, নেড়া বলে যাকে আর চাপ দাঁড়ি তে কেমন যেন রহস্যময় আর সবসময় কালো সানগ্লাস পড়ে থাকে । অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওনার গ্লাসটা খুলে পড়েছে প্যাসেজে । জয় দেখতে গেলো । নিছক কৌতুহল । তাছাড়া প্ল্যান চৌপাট হবার ব্যাপারও ছিল । দেখলো অনেকে মিলে ওনাকে তোলবার চেষ্টা করছে । কেউ গেলো স্ট্রেচার আনতে । এবার নিয়ে যাচ্ছে সার্ভিস লিফটের দিকে । ওনার পুরনো ও বিশ্বস্ত রাইট হ্যান্ড জন খুব ব্যস্ত পায়ে ছোটাছুটি করছে । জয়ের হঠাৎ বোধিসত্ত্বের ব্যাথাতুর মুখটা দেখে খুব কষ্ট হল । কেন সে জানেনা । মনে হল এই মানুষটাকে সে কি করে মারবে ? ওনার ভদ্রলোক বলে বেশ নাম আছে আর আজকে সামনা সামনি দেখলো খুব ডিগনিফাইড, ব্যাক্তিত্ব পূর্ণ মানুষ । চোখদুটো আগে দেখেছে একবার, সান গ্লাস খুলে মুছছিলেন । অসম্ভব গভীর আঁখিজোড়া । জয়ের কি ওর প্রতি দূর্বলতা জন্মে গেলো ? তাহলে তো চলবে না । সে ওর অমিত্র । আর এই প্রফেশনে ইমোশনের কোন মূল্যে নেই । কাজ নাহলে ওসমান ওকে ছাড়বে না ।মেরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে । নিজেকে শক্ত

করার চেষ্টা করলো জয় । এমন সময় কার যেন সেল বেজে উঠলো - চাক দে ইন্ডিয়ার সুরে । একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক ভীড় ঠেলে পাশে সরে এলেন ।

ফোন কানে চেপে দৃঢ় গলায় কার সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন । কিছু কথা ভেসে আসে, তারকা খচিত শ্যান্ডেলিয়ারের

আলোকরশ্মি গাঢ় আঁধার ভেদ করে ।

- বিজনেস টাইকুন ভুষণ পট্‌বর্দ্ধন কান্ট ডাই লাইক দিস প্লিজ ডু সাম থিং।

তারপরের কথাগুলো আর কানে গেলোনা জয়ের । নিঃস্তব্ধতা গ্রাস করে নিল ওকে । হাহাকার, বুকে উথালপাতাল, হৃদয়ে কম্পন । যাকে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে তাকে আজ স্বচক্ষে দেখে বুকের ভেতরে এরকম চাপা উত্তেজনার সাথে সাথে ভালোলাগার চোরা স্রোত বইছে কেন ?

যাকে শেষ করার সুপারি পেয়েছিল আজ মনের সমস্ত সাধ মিটিয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারতো সবকটা বুলেট তার বুকে কিন্তু পারলো না । পারলো না জয় পট্‌বর্দ্ধন । হাত কেঁপে গেলো, পা টলে গেলো । বুকে এক অসীম কষ্ট চেপে বসছে । কোনো অন্তর্শক্তি যেন চুম্বকের মতন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জন্মদাতার দিকে । বোবা হরিণ শিশুর মতন ও ধাবিত হচ্ছে ওনার দিকে । ক্রমশ জয় তলিয়ে যাছে, হারিয়ে যাচ্ছে এক অচিন ভুবনে । একটি খড় কুটো ধরে বাঁচতে চাইছে ।

যা ভাবা যায়, যা হৃদয়ে লালিতপালিত হয় তা যে বাস্তবে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে যেতে পারে জয়ের জানা ছিলনা । জয়ের সামনে এখন দুটো পথ । নিজের বাস্টার্ড অপবাদের শোধ নেওয়া অথবা সদ্য সন্তানসম্ভবা হওয়া সোহার

সন্তানকে বাস্টার্ড ভূষণে ভূষিত করা । কেন যেন সমস্ত সংস্কারের বাধ ভেঙে গেল কদিন আগে । হয়ত বেশি পান করে ফেলেছিল বলে । সম্প্রতি জানলো সোহা মা হতে চলেছে - তির্যক ভাবে হেসে সোহা বলেছিল- কি

হোলি ফাদার ? তপস্যা ভঙ্গ হল তাহলে ? তোমার প্রফেশনে এখনো কুমার আছো, তুমি কিন্তু গিনেস বুকে নাম তুলতে পারো !

গালে টোকা মেরে ওকে কাছে টেনে নিয়েছিল জয় । আসার আগের দিনই । যখন শুনলো সোহা ডেট মিস করেছে -- এই জানো আমি কিন্তু ইঞ্জেকশান নিতে খুব ভয় পাই ! ডেলিভারি হওয়ার কথা মনে হলে গা কাঁপছে ।

আচ্ছে তোমরা পুরুষরা বড্ড পাজি । সব আরামটা তোমাদের আর কষ্টগুলো আমাদের । আমি আল্লা হলে তোমাদের এই আরামের আল্‌খাল্লা খুলে নিতাম ।

জয় আবার হেসেছিল । সোহার একটা নরম সত্তা আছে । তাকে জয় কোনভাবেই নষ্ট হতে দিতে চায়না ।

লোকে ভাবে ওরা নর্তকী ওদের মন নেই, সম্ভ্রম নেই। আসলে সেরকম আদৌও নয় ।

চিন্তা গুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেলো কে যেন বলে উঠলো - ভূষণ হঠাৎ বৌদ্ধ হল কেন ? অচেনা, গম্ভীর এক কন্ঠে উত্তর এলো- অনেকদিন ধরেই ওর হার্টের সমস্যা চলছিল । তিব্বতে গিয়ে ও এক লামার সঙ্গে দেখা করে । সেখানেই শিখে

আসে মেডিটেশানের পদ্ধতি । স্ট্রেস কমানো, লাইফ স্প্যান বাড়ানোর মন্ত্র । সেই ভালোবাসা থেকেই বৌদ্ধ হওয়া, বোধিসত্ত্ব নাম নেওয়া ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে জয় নীচে । অনেকগুলো সিঁড়ি । দেখলো লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে নামলো ।

জয় হাত লাগলো ওনাকে নামানোর কাজে । পিতা ভূষণের সমস্ত সত্তা থেকে আস্তে আস্তে কালো পর্দা সরে যেতে লাগলো । জয় দেখতে পেলো ।

রিসেপশনের কাছে পৌঁছাতেই স্পষ্ট কানে ভেসে এলো টিভি চ্যানেলের নিউজ এর কিছু শব্দ - রানওয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়াতে এয়ার সাহারার একটি বিমান দূর্ঘটনার কবলে পড়েছে । ৩০ জন যাত্রী জখম হয়েছে। দুজন মারা গেছে । তার মধ্যে ছিল কুখ্যাত মফিয়া ওসমান ভাই ও তার গ্যাঙ্গের একজন । ওরা মুম্বাই থেকে দিল্লী যাচ্ছিল ।

লাফিয়ে উঠলো জয় । আনন্দে আত্মহারা সে । আশেপাশের লোকজন ওকে অদ্ভুত ভাবে দেখছে ।

জয় অন্যদিকে খুবই চিন্তিত । পিতার জন্য । উনি বাঁচবেন তো !

শিল্পপতি বোধিসত্ত্ব তো নিঃসন্তান । জয়কে কি একবার সুযোগ দেবেন না বাবা বলে ডাকার ? নিশ্চয়ই দেবেন, আজ তো উনি অনেক পরিণত, পুর্ণ কুম্ভের মতন । বুদ্ধম শরণম্ গচ্ছামির মন্ত্রের ছোঁয়ায় কেটে যাচ্ছে বাস্টার্ডের কলো মেঘ, ধীরে ধীরে, জয় স্পষ্ট দেখতে পায় ।

ওম ওম হৃদয়ে এক হতভাগ্য পুত্র রাজস্থানের হাড় কাঁপানো শীতে অমরত্বের লোভে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করে চলে ।

# ছায়া মিছিল

পার্টিশনের পরে বাংলাদেশ থেকে বে-ঘর হয়ে এপাড়ে এসে পৌঁছেছিলেন রেখা চৌধুরী ।

ওপাড়ে ছিলেন মস্ত এক পরিবারের বধূ । বিশাল জমিদারি, অন্দর মহল, বার মহল বৈঠক খানা এইসব নিয়ে এক রাজমহলের বাসিন্দা । মুসলমান প্রজারা বহুবার বলেছিল -পাইলে যান মা পাইলে যান কিন্তু সে কথা রেখা দেবী শোনেননি । নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে চট করে চলে আসা খুব সোজা নয় ।

শেষে তো আসতেই হল । যখন মুসলমান লোকেরা এসে ওদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর শুরু করে তখন ওদের পালাতেই হল । ওঁনার স্বামীর মাথা তো দাঁ দিয়ে কুপিয়ে দিয়েছিল ওরা । তখন প্রাণ বাঁচাতে তিন মেয়েকে বগলদাবা করে রাতারাতি এসে উঠলেন উত্তরবঙ্গের এই চা বাগান অঞ্চলে । এখানে একটি প্রাথমিক স্কুলে চাকুরি পেলেন । মেজ মেয়েকে নিয়ে গেলো ওর কাকা, গিরিডিতে । অন্য দুই মেয়েকে নিয়ে রয়ে গেলেন রেখা দেবী । ছোটটি খুবই ছোট তখন । বড় মেয়ে স্কুলে ভর্তি হল ।

রেখার ছোট সংসারে অভাবের শেষ ছিলনা কিন্তু নিপুন হাতে উনি সব কিছু সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতেন । প্রথমে থাকতেন একটি বেড়ার ঘরে । লাইন ঘর, কমন বারান্দা, রান্নাঘর ও বাথরুম । তা সে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হত বাথরুমে । মাঝখানে জঙ্গল । বড় বড় শাল ও শিরিষ গাছ । দু একটা বকুল গাছও ছিল । রাতের বেলা যেতে খুব অসুবিধে হত । সেজন্য যখন উনি কোয়ার্টারে শিফট করার সুযোগ পেলেন এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন । স্কুলের কোয়ার্টার । দেড়খানা ঘর ও একটি ঘেরা বারান্দা, পাশেই বাথরুম । ওনার জন্য স্বর্গ ...এত ভালো ব্যবস্থা সত্ত্বেও কেউ ওখানে থাকতে রাজি হতেন না ...ওটা খালি পড়ে ছিল । কারণটা সহজেই অনুমেয় কিছু অলৌকিক গল্প গাথা । বাড়িটিতে ছায়া মিছিল ঘোরে । কে বা কারা এই নিয়ে তর্ক চলে । স্থানীয় মানুষের ধারণা এ কোন বিদেহী আত্মা, প্রতিশোধ স্পৃহায় ঘুরে বেড়ায় । যদিও এই ভৌতিক বাড়ির কোল ঘেঁষে একটি সবুজ পাতাভরা কদমগাছে একজোড়া পক্ষী দম্পতি বাসা করে থাকতো । এটাই ব্যাতিক্রম ।

বাংলাদেশে, গ্রাম দেশের লোক বলতো জিনপরী এরা বলে ভূত । এই ঘরে জিন পরী নয় জিন দৈত্যি বসবাস করে । রেখা ওসব মানেন না । আর ঠেলার নাম বাবাজি তাই একদিন অসীম সাহসে ভর করে দুই মেয়ের হাত ধরে এলেন এই ঘরে । বেশ গুছিয়ে বসলেন । পরিপাটি করে সব সাজালেন ।

পাশেই একটি শিউলি গাছ । নীলাম্বরী পোশাকে যখন আকাশ হাসতো সেই সময় ভোরের বাতাসে শিউলির সুবাসে ঘুম ভাঙতো । মিঠে রোদে উঠোনে বসে শিউলি পাতার বড়া ভেজে খেতেন চায়ের সঙ্গে । এছাড়া দিন গড়ালে কখনো কখনো মেয়েদের রেঁধে দিতেন আদিবাসীদের হাট থেকে আনা সুস্বাদু বাদুড়ের মাংস । বুনো আমলকী পেড়ে খেতেন ।

একদিন ভোরে ফুল কুড়ানোর সময় দেখেন একটি ভীষণ লম্বা লোক হেঁটে যাচ্ছে । ভীষণ লম্বা । রেখা একটু অবাক হলেন । এই চত্বরে এত লম্বা মানুষ কেউ আছেন বলে জানা ছিলনা । চা বাগানের ছোট অঞ্চলে কেউ অদ্ভুত আকৃতির হলে সহজেই নজরে পড়তো কিন্তু ইনি একেবারেই অচেনা । যাইহোক লোকটি অদৃশ্য হল বাঁকের আড়ালে আর দৈনন্দিন কাজে রেখাও ভুলে গেলেন ওকে ।

এরপরে কিন্তু প্রায়ই ওকে দেখা যেতে লাগলো । সকাল ছেড়ে বিকেল কিংবা দুপুর অথবা সন্ধ্যে বেলাতেও লোকটি দৃশ্য হতে লাগলো । শেষকালে রেখা একদিন ধরলেন ওর এক সহকর্মিনীকে ।

অপলা নাম তার ।

- অপলা এই অঞ্চলে কি একজন ভীষণ লম্বা লোক আছে রে ? আমি প্রায়ই এরকম একজনকে আমার কোয়ার্টারের আশেপাশে ঘুরতে দেখি ।

অপলা অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে । তারপর ওর মুখটা কিরকম ফ্যাকাসে হয়ে যায়, চোখদুটো বুজে ফেলে ঢোঁক গিলে বলে - খুব মন্দ সময় আসবে এখানে । এই হলগে জিন দৈত্যি । একে দেখা গেলেই বিপদ হয় ।

স্বল্প ভাষী রেখা মৃদু হেসে বলেন - কি আবোল তাবোল বকছিস অপলা ? একটা জলজ্যান্ত মানুষকে তুই জিন বানিয়ে দিলি ? লোকটি তো কাল দুপুরে আমার হাত থেকে এক গ্লাস জল খেলো !

অপলা নির্বাক । জিন দৈত্যি রেখাদিদির কাছ থেকে জল চেয়ে খেয়েছে মানে তো সমূহ বিপদ।

কোনক্রমে সে বললো : দিদি তুমি এক্ষুনি এই ঘর ছাড়ো । তোমার ওপর নজর লেগেছে । তুমি যাবে, মেয়ে দুটোকেও মারবে । এক্ষুনি এই ঘর ছাড়ার ব্যবস্থা করো ।

রেখা ওর কথায় কান দেননা । এরকম আজগুবি গল্প অনেক শুনেছেন । গ্রাম অঞ্চলে এইসব ভূত প্রেতের গল্প খুব প্রচলিত কাহিনী । ভূত দেখার জন্য রেখা আগে বহুবার ব্যাকুল হলেও কোনদিন ভুত দেখার সৌভাগ্য কিংবা দূর্ভাগ্য হয়নি । ওঁনাদের বাংলাদেশে তো বিরাট বিরাট সব বগান ছিল আর রাতে তো সেইসব বাগান পেরিয়ে যাতায়াত করতে হত কিন্তু ভূত টুত কখনো দেখেন নি । ওগুলো মানেনও না । মনে করেন দূর্বল মনের কল্পনা এসব । যাইহোক কথা না বাড়িয়ে উনি নিজের কাজে চলে গেলেন ।

সেদিন বিকেলে আবার ঐ ভদ্রলোককে দেখলেন । হন হন করে হেঁটে চলেছেন ধান ক্ষেতের পেছনে । এই এলাকায় ধান ও চা ক্ষেত প্রায় গা ঘেঁষাঘেষি করে রয়েছে । কিছু ঘাস কেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সদ্য সদ্য কাটা ঘাস । লোকটি সেই ঘাসের স্তুপ পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো ।

রেখা ক্ষণিক নির্বাক রইলেন তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন ।

মাসখানেক পরে রেখা গেছেন মেয়ে দুটিকে রেখে শহরে একটি ট্রেনিং এ । একরাত ওদের একা থাকতে হবে । পরদিনই ফিরবেন রেখা । মেয়ে দুটির মধ্যে যে বড় তার নাম স্বপ্না সে বেশ চালাক চতুর । ছোটবোনকে সে দেখে শুনে রাখবে । মেয়েটি খুব টরটরি । সাবধান করে দিলো ওর মা । সন্ধ্যের পরে ঘরে আগল দিয়ে রাখতে বলে গেছেন রেখা । মাঝে মাঝে হায়নার উৎপাত হয় । পাশের বাড়ির লক্ষ্মী রায়প্রধাণ ও তার স্বামী ঝন্টু রায়প্রধানকে বলে গেছেন মেয়ে দুটিকে পাহারা দিতে । এলাকায় কিছু বদলোক আছে । অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা রেখা ও তার ততোধিক সুন্দরী মেয়ে দুটিকে নজর দেয় তারা, যদিও ছোটটি একেবারেই কচি । একবার রেখার পথ আটকে একজন জানতে চেয়েছিল -- আপনি কোন রেখা ? সরল না বক্র ?

- প্রয়োজনে সরল প্রয়োজনে বক্র, রেখার সপ্রতিভ উত্তর ।

লোকটি রেখা দেবীর গলার গাম্ভীর্য ও কথার ঝঙ্কারে কেটে পড়েছিল । ছিদাম সাহা নাম তার । মদের ব্যবসা করে ।

রাত প্রায় ১১টা । দরজায় ঠকঠক । অমাবস্যা আসছে, চারপাশে ঘন অন্ধকার --অন্ধকার জমাট বেঁধে কি ভূত হয় ? কে জানে ! সঙ্গে কেমন একটা শনশন হাওয়া । গায়ে যেন এসে ফুটছে হাওয়াটা যেন হাওয়া গাড়ির সওয়ারি হয়ে আসছেন কোন নিষিদ্ধ পুরীর কোটাল । ঠক ঠক ঠক-- কে হতে পারে এত রাতে ? কয়েকবার কে কে জিজ্ঞেস করার পরেও কোন উত্তর না পেয়ে স্বপ্না উঠে গেলো । দরজায় তো কোন ফাঁক নেই তাই খুলতেই হল । খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় মুখোশের মতন কালো কাপড় জড়ানো এক ব্যাক্তি ঝড়ের মতন ভেতরে ঢুকে গেলো ।

- কে কে, কে আপনি ? স্বপ্না ভীত, গলার স্বরে কাঁপুনি । কে কে --করার সাথে সাথেই সে এসে স্বপ্নার হাত ধরে টানতে লাগলো ।

- একি ! কে আপনি কি করছেন ? ছাড়ুন ছাড়ুন বলে সে ছুট্টে পালাতে গেলো । ততক্ষণে ছোট বোন উঠে পড়েছে । একজন অচেনা লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে । চেঁচিয়ে ওঠে ।

লোকটি বীর বিক্রমে এগিয়ে যায় ওর দিকে, ওকে দু হাতে তুলে ছুঁড়ে দেয় একটু দূরে । মেয়েটি কেঁদে ওঠে । জোরে । স্বপ্না ভয়ে বাইরের গভীর অন্ধকারে ছুট্টে যায় দিশেহারা হয়ে তার পা টলছে, টালমাটাল অবস্থা । কখন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল মনে নেই ।

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরতে সে ভেতরে গিয়ে দেখে যে তার বোন মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে, ওর হাত পা থেকে অল্প অল্প রক্ত চুইয়ে পড়ছে আর ওদের অঞ্চলের মদের ব্যবসায়ী ছিদাম ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে ।

স্বপ্নার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া । ভয়ে হাত পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে গেলো । এমন এক অসম্ভব কান্ড যে ওরই ঘরে কোনদিন হবে তা তো ভাবেনি ! কথা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম, গলা ধরে আসছে । বেশ কিছুটা সময় পরে রায়প্রধান বাড়ির বৌ ডাক খোঁজ করতে উপস্থিত হয় । সে এসে দেখে যে ছিদাম মরে গেছে তো বটেই কিন্তু এ এক অস্বাভাবিক মৃত্যু । যেন খুব বলশলী এক ব্যাক্তি টেনে ওকে মাঝখান থেকে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে ।

যেমন করে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে মানুষ ঠিক সেরকম ভাবে ছিদামকে ছিঁড়ে ফেলেছে । মুন্ডু ঘুরে গেছে পিঠের দিকে । মাথা সামনে, মুখ পেছনে । বিকট এক চেহারা হয়েছে ওর । একি কোন মানুষের কাজ ? এরকম দয়াহীন মৃত্যু একমাত্র তো সেই দিতে পারে বা দিয়ে থাকে । ভয়ে সবাই কম্পমান । মুখ থমথমে ওদের সবার ।

এরপরে পুলিশ আসে । কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনার কোন কুল কিনারা হয়না ।দিন পেরোতে আসেন রেখা দেবী । স্টেশান থেকেই গল্প শুনতে শুনতে এসেছেন, ঘরে এসে তাজ্জব বনে যান । একরাতের মধ্যে এ কি বিপত্তি ! মানুষ কি পারে কাউকে এইভাবে ছিঁড়ে ফেলতে ? যতই বলবান হোক না কেন এতো প্রায় অসম্ভব । মহাভারতে দু:শাসনের হাত টেনে ছিঁড়ে তার দেহ থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন ভীমদেব, পড়েছেন । মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে । চারপাশে একটা অস্বস্তিকর নি:স্তব্ধতা । গা ছমছমানি ভাব । ভরদুপুরেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ।

অপলার সাথে দেখা হলে সে অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে বলে ওঠে - বলেছিলাম না এই বাড়ি ছেড়ে দাও, তখন শুনলে না আমার কথা । আমি আগেই জানতাম এখানে জিন পরীরা ঘোরে । ওরা মানুষ মেরে ফেলে । দেখলে না ওকে কেমন টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে !

রেখা দেবী ওর কথায় কর্ণপাত করেন না । ধীরে এগিয়ে যান বড় মেয়ের দিকে । মেয়ে খুব আতঙ্কিত ওকে দেখেই বোঝা গেলো । চোখমুখে ভয়ের ছায়া । একদিনে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে সে । ও যা বললো তাই শুনে চক্ষু চড়কগাছ । ছিদাম এসে ওকে ধরে টানাটানি করছিল, ওর হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইছিলো কোন অজানায়, ছোট মেয়েকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে খাট থেকে অনেক দূরে মেঝেতে, একেবারে নিচে । হাত পাগুলো কেটে গেছে ওর । হাঁটুতে লেগেছে । যন্ত্রণায় কঁকাচ্ছিল ছোট মেয়েটি ।

অপলা কথার পিঠে কথা বললো, বললো এই এলাকায় আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল । একজন চা বাগানের ডাক্তার ছিলেন । ডাঃ দাস বলে । ওনার এক অবিবাহিত বোন ছিল ।

ডাক্তার বিয়ে করেন নি । বোনের সঙ্গে থাকতেন । একদিন শহরের হাসপাতালে কোন কাজ থাকায় ডাক্তার বাবু সেখানে যান । রাতে কোন কারণে ফিরতে পারেন নি ।

সেদিন রাতে একটি বদলোক ওনার বোনকে ধর্ষণ করে । লোকটি বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়েটিকে বিরক্ত করতো । সে ছিল স্থানীয় নেপালী মাতব্বর, চা বাগানে কাজ করতো । সাঁঝবেলায় মাতলামো করতো । মেয়েদের বিরক্ত করতো ।

ডাক্তারের রক্তাক্ত বোনটি লজ্জায় আত্মহত্যা করে । ডাক্তার ফিরে এসে এই ঘটনা দেখে খুবই ভেঙে পড়েন । পুলিশে কমপ্লেন করেও লাভ হয়না কারণ যে রেপ করেছিল তার উঁচু মহলে ভালো কানেকশান ছিল । কাজেই সে ছাড়া পেয়ে যায় । টিঁকি স্পর্শ করা যায়না । তখন ডাক্তার নিজেই আত্মহত্যা করেন দু:খে বেদনায় ।

উনি এই বাড়িটিতেই থাকতেন । পরে বাড়িটি সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করা হয় । বহুদিন যাবৎ খালি থাকার দরুণ কিছুটা গুজব বাতাসে ভাসতো । ভূতের বাড়ি, হানাবাড়ি ইত্যাদি । পরে যখন বাড়িটি মেরামৎ করা হল কেউ কেউ এলো কিন্তু বেশির ভাগই ভয়ে থাকতে চাইতো না । কারণ এই বাড়িতে আওয়াজ শোনা যায়, কাদের ফিসফিসানি, মিহি গলায় গান, অনেকে দেওয়ালে চাঁদের আলোয় ছায়ামিছিল দেখেছেন । একের পর এক ছায়া দেওয়ালে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে । সে এক অদ্ভূত কান্ড ।

হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে আলু পেঁয়াজের ঝুড়ি । রান্না ঘরে শিকল তোলা সত্ত্বেও ঘটি গড়গড় করে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে । বেড়ালের সুরে ঘরের ভেতরে কেউ ডাকছে যদিও কোন বেড়াল নেই ।

একবার এক শিক্ষকের পরিবারের একটি মেয়ে শুয়ে ছিল শোবার ঘরে, সঙ্গে পাড়ার হারীণদা । বিয়ে হয়নি কিন্তু দুজনে একসঙ্গে বাড়ির অভিভাবকদের অবর্তমানে রাত কাটাবার প্ল্যান করেছিল । মতলব এটেছিল ঐ হারীণ । শরীর শরীর খেলা খেলবে । শহরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তো । মদ খেতো, মেয়ে মানুষের সঙ্গও তো করতে হবে না হলে দুধের দাঁত ভাঙবে কি করে ? শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে যা হয় ! বিয়ের লোভ দেখিয়ে নারীদেহের মিষ্টত্ব উপভোগ করা । তারপর কেটে পরা । ইঞ্জিনীয়ারিং এর শীলমোহর লাগানো সাদা কাগজ নিয়ে নিজের নোংরা অতীত লুকিয়ে,ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের মোহগ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজে মোটা পণসহ বিয়ের পিঁড়িতে বসা ও সততা, রুচির বুলি কপচানো । ধান্দা ছিল এটা । হল কিন্তু একদম অন্যরকম ।

বিছানার তলায় রাতের বেলা কার যেন একটা মোটা লোমশ হাত এসে ছেলেটির গায়ে হাত বোলাচ্ছিল । এই হাত মানুষের হাত হতেই পারেনা ! অসম্ভব কদাকার হাত, হিমশীতল তার স্পর্শ । ছোকরাটি ভয়ে লফিয়ে উঠে বসে । মেয়েটিও লাফিয়ে খাট থেকে নেমে যায় । তখন সেই লোমশ হাত এসে ছেলেটির গলা টিপে ধরে । মেয়েটি ঝুঁকে দেখে খাটের তলায় কেউ নেই । শুধু একটি হাত । ভয়ে সে দৌড়ে বাইরে পালায় । আর ঐ ছোকরার লাশ পাওয়া যায় পরদিন ভোরে ওখানে । কেউ ওকে টেনে ছিঁড়ে দু- টুকরো করে দিয়েছে । একদম কাগজ ছিঁড়ে ফেলার মতন ।

কখনো কখনো ঐ চিকিৎসককে দেখা যায় অপরাহ্নে, খুব লম্বা গঠণ, হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলেন । অনেকেই দেখেছেন । কোন সেক্স ম্যানিয়াককে উনি নিস্তার দেন না ।

যেই ব্যাক্তি ওনার বোনকে ধর্ষণ করেছিলো সে চিকিৎসকের মৃত্যুর হপ্তাখানেক পরেই মারা যায় । তাকে রেলের গুমটির কাছে পাওয়া যায় । অস্বাভাবিক মৃত্যু । কে যেন ওকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে । দুখানা করে দিয়েছে ওর দেহ আর মুন্ডুটা ঘুরে গেছে পেছনে ।

এতো কোন মানুষের কম্মো হতেই পারেনা । তাই সন্দেহভাজন একজনই । প্রতিশোধ স্পৃহায় এই কাজ ঐ ডাক্তারই করেছেন, করেছেন অশরীরী অবস্থার আড়ালে ।

এলাকায় রটে গেলো ডাক্তার ভূতের গল্প, ভূত হলেও ভালো ভূত, মেয়েদের বিপদে পাহারা দেওয়া একজন সাচ্চা দিলের ভূত, তবুও সবাই ওকে ভয় পেতো, শত হলেও অশরীরী কিনা ! বিশেষ করে কুকর্ম করতে অভ্যস্থ নোংরা পুরুষের দল ওকে যমের মতন ভয় পেতো, এলাকায় যৌন শিকার কমে গিয়েছিলো ।

এরপর যখনই কোন অসহায় নারী এই ঘরে থেকেছে তাকে পাহারা দিয়েছেন ঐ চিকিৎসক ।

তবুও মদের ব্যাপারি ছিদাম কোন সাহসে এই কাজ করতে গেলো ?

কারণ সে এইসব বিশ্বাস করতো না । সে মনে করেছিল এ কোন বিপুল বলবান পুরুষের কাজ । হয়ত কোন জেল পালানো কয়েদি যার দেহে অসীম বল অথবা কোন মানসিক ভারসাম্যহীন

পালোয়ান এগুলো করছে । পুলিশ ধরতে পারছে না ।

নির্ভীক ছিদাম নিজের মূর্খামির জন্য এইভাবে জীবন দিল । মারা পড়লো অপ্রাকৃত পুলিশের হাতে । বেঁচে গেলো রেখার দুই সন্তান, সেই অদেখা প্রহরীর কল্যাণে, যিনি ছায়ামিছিলের অগ্রভাগে থাকেন ।

সমস্তটা দেখে শুনে রেখার মুখ থেকে শুধু একটা কথাই নি:সৃত হল : সব কথা বইতে লেখা থাকেনা, এমন ঘটনাও দুনিয়ায় ঘটে যার যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা হয়না ।

ঘটনারা ছায়ামিছিল হয়েই থেকে যায় চিরটাকাল ।

# ফিল্ম মেকার

শিল্পিতা বসু একজন স্বনামধন্য চিত্র পরিচালিকা । বেশি বাংলা ছবি করেন, হিন্দী ও করেছেন কয়েকটি । দেশে বিদেশে ওঁনার ছবি প্রদর্শিত হয়েছে । একবার অস্কারের জন্যও নমিনেশন পেয়েছিলেন । অসাধারণ ওঁনার ছবি তৈরী করার স্টাইল । দেখে মনেই হয়না যে ওটা একটা সিনেমা । কোন সেলুলেয়েড চিত্র । মনে হয় বাস্তব । গল্প বলার স্টাইল, মানানসই দু একটি গান, টেকনিক্যাল স্মার্টনেস সব মিলিয়ে দুর্ধর্ষ । জনপ্রিয় পরিচালিকা হিসেবে উনি নাম কিনেছেন, বিদুষী তো বটেই । ইন্টেলেকচুয়াল ও জনপ্রিয় একসঙ্গে দুটি মেডেল ।

- এত নাম যশ, জীবন কাটাতে অস্বস্তি হয়না তোর ? বান্ধবী জলি প্রশ্ন করে । সে ওর ছেলেবেলার বন্ধু এখন একজন বিউটি থেরাপিস্ট ।

- না, প্রথম প্রথম অসুবিধে হত কিন্তু এখন হয়না । এই জনপ্রিয়তা আমি উপভোগ করি । আমি তো লিব্রান আমাদের পাবলিসিটি, জনপ্রিয়তা ইত্যাদির দিকে আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে । আমরা রেকগ্নিশনের জন্য পাগল হয়ে উঠি ।

- তুই খুব অস্ট্রোলজি মানিস তাই না ?

মৃদু হাসিরেখা শিল্পিতার মুখে - আমি যখন খুব ছোট তখন আমাদের কুল গুরু বলেছিলেন আমি বিবাহিত জীবনে শান্তি পাবো না, ডাইভোর্স হয়েও যেতে পারে । দুটি সন্তানের মাতৃত্ব বহন করবো যার মধ্যে একটি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে জাত কিন্তু সেইজন্য নয় ওকে আমি অন্য একটা কারণে কোনদিন সমাজের সামনে আনতে পারবো না ।

চোখ থেকে দু ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে । জলি দেখতে পায় । সত্যি সব কথাই তো মিলে গেছে ।

তাহলে কেউ কেউ সত্যি পারেন ভাগ্য গণনা করতে । তবে বেশির ভাগই ভন্ড । তাই লোকের বিশ্বাস হারিয়ে গেছে ।

পরিচালিকার দুই পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল । তবে কৈশোরে আলিপুরদুয়ারে বেড়ে উঠেছিল, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই রূপের জন্যে অনেক ছেলে বিরক্ত করতো । সামনে দশটা, পেছনে দশটা চলতো রাস্তায় বেরোলে । নাম হয়েছিল মিস আলিপুরদুয়ার । যদিও সেইসময় রিটা ফারিয়া বিউটি কুইন ছিলেন কিন্তু শিল্পিতার বিউটি কনটেস্টে নামা হয়নি কোনদিন । লোকে বলতো ম্যান ইটার ।

ছেলেদের তাড়নায় বিরক্ত হয়ে শেষে বাবা ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন । সেখানেই বি এ পাশ করেন । তারপর শান্তিনিকেতনে চৈনিক সাহিত্য নিয়ে এম এ করেন । চৈনিক নাটক ছিল পি এইচ ডির বিষয় । পরে পথ বদলে ফিল্ম মেকিং শুরু করেন তবে তার আগে কিছুদিন অভিনয় করেছেন ।অভিনয়টা খুব ভালো পারেন।নায়িকা হিসেবে বাংলা ছবিতে ভালই নামডাক হয়েছিল ।

বেশির ভাগই আর্ট ফিল্ম বানান । জাতীয় পুরস্কারের তো ছয়লাপ ওঁনার ভাড়ারে । এমন একটা বিষয় নিয়ে সিনেমা বানান যে সহজেই লোকের মনে বসে যায় । লোকে নিজেকে

আইডেন্টিফাই করে চরিত্রগুলোর সঙ্গে এবং মেডেল ঢুকে যায় ওঁনার পকেটে । মোটকথা সিনেমাগুলো খুব বিশ্বাসযোগ্য । থট প্রভকিং ।

ওঁনার স্বামীর থেকে জন্মানো প্রথম পুত্র বিদেশে বাস করেন । নামটা অদ্ভুত : গোল্লু ।

আসলে সে জন্মেছিল যখন পেলে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন তখন । তাই নাম গোল্লু ।

আর অন্য সন্তান এক পৃথিবী বিখ্যাত ক্রিকেটরের সন্তান । সে স্প্যাস্টিক । থাকে একটি স্প্যাস্টিক হোমে । বিদেশে । শিল্পিতা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসেন ।

ক্রিকেটরের স্ত্রী খুব রুষ্ট ছিলেন শিল্পিতার ওপরে । পরবর্ত্তীকালে ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করেছিলেন । তবে তার আগে পাড় মাতাল হয়ে উঠেছিলেন । অভিনেত্রী শিল্পিতাকে কেমন লাগে জিজ্ঞেস করায় এক সাংবাদিক উত্তর পেয়েছিলেন : সি ইজ ড্যাম চিপ ।

খেলোয়াড়ের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিল্পিতা ওঁর সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনে চলে যান । পরে তো ভদ্রলোক মারা গেলেন । এখন একাই থাকেন পরিচালিকা ।

শান্তিনিকেতনের মেয়ে তো তাই নাচ টাচ ও শিখেছিলেন । মাঝে মাঝে নাচের শো করতেন । মাইথোলজিক্যাল শোই বেশি করতেন । দ্রৌপদী কিংবা রম্ভার নাচ অথবা সীতার দু:খ নাচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই ছিল ওঁনার নৃত্যকলার মূল বিষয় । আজকাল আর শো করেন না ।

দক্ষিণ ভারতে যখন গিয়েছিলেন একটি শ্যুটিং এর সময় তখন জেনেছিলেন যে কর্নাটকের এক গ্রামীণ নৃত্যনাট্যের দল *যক্ষগান* নামে -নাচের মাধ্যমে গ্রামে গিয়ে গিয়ে পৌরাণিক কাহিনী ব্যক্ত করেন । ওরা নাচের ও অভিনয়ের মাধ্যমে যেমন সোসাল মেসেজ দেন ... পারফর্মারের দর্শকের মধ্যে আলোড়ন তোলা --কিভাবে ? না হৃদয়স্পর্শী অভিনয় করে চরিত্রের গন্ডি ছেড়ে দর্শকের মধ্যে মিশে গিয়ে । এই অভিনেতা কিংবা নাচিয়ের সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে আসা, নাটকের মঞ্চকে বদ্ধ পরিবেশ না ধরে মানুষের মধ্যে চেতনাকে বিলিয়ে দেওয়া - দর্শকের রোমাঞ্চ জাগে, ভালোলাগে । একটা অন্যরকম অনুভূতি হয় । মনে হয় তারাও সেই নৃত্যনাট্যের একটা অংশ । এই নাচ ৪০০ বছরের পুরনো । দুটি /তিনটি ধারা আছে একটি অনেকটা কথাকলি ঘরণার । একটি পুতুল নাচ । এইসব জানার পরে সেটা নিয়ে একটা সিনেমা বানালেন শিল্পিতা এবং জাতীয় পুরস্কার পেলো সেই বাংলা ছবি । গেলো মস্কো ফিল্ম উৎসবে ।

ওঁনাকে কর্ণাটকের লোকশিল্প সংস্থা বিশেষ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানায় । উনি জলিকে নিয়ে যান । সঙ্গে জলির মেয়ে তিতির । ব্যাঙ্গালোরে একটি হোটেলে ওঁরা উঠলেন । যথাসময়ে সম্মান প্রদান করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী গজাম্মা নাইডু । রাষ্ট্রপতি সম্মানিত করেছেন, অন্য অনেক প্রেস্টিজিয়াস পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পিতা পরিচালিকা হিসেবে কাজ করার জন্য, সেগুলো সবই বেশ কিছু বছর আগেই । ওঁনার নাম আছে শিল্পী পরিচালিকা হিসেবে । ক্রিটিকরা পর্যন্ত বলেন : উনি সিনেমা বানান না, সিনেমা আঁকেন । ওঁনার পরিচালিত ছবিগুলো দেখে মনে হয় এক একটা ক্যানভাসের দূর্দান্ত স্ট্রোক । শৈল্পিক সুষমা মন্ডিত ওঁনার সিনেমা ।

ব্যাঙ্গালোর আসার পরে স্পেশাল Honour - সেদিনটা সাধারণ ভাবেই কেটে গেলো । রাতে খুব ভালো ঘুম হল । ঘুমের আগে মদ্যপান হয়েছিল । কিশোরী তিতিরও যোগ দিয়েছিলো । তারপর কিছু খোশ গল্প করে ঘুমতে চলে গেলেন ওঁরা । ফাইভ স্টারের নরম গদিতে ডুবে গেলেন মা বেটি ও তাদের সেলিব্রিটি সঙ্গিনী ।

পরের দিন সকালে উঠে কড়কড়ে টোস্ট সহ মালাই মার কে চা পান করে, বহু পরিচিত ব্যাঙ্গালোর শহরটা ঘুরে দেখলেন । তারপর দুপুরে গেলেন ৩০ কিলোমিটার দূরে মাইশোর রোডে একটি কন্নড় হোটেলে । ঠিক হোটেল নয় এটি একটি রিসর্ট । লোকরুচি নাম । এখানে একটি ফোক নাচের প্রোগ্রাম করা হচ্ছে শিল্পিতার জন্য স্পেশালি । খোলা প্রাঙ্গনে কিছু মাটির কটেজ । সেখানে বসে খাও, আনন্দ করো । অথেন্টিক কন্নড় খাবার খাওয়া হল । শিল্পিতা খেলেন থালি । পাপড়, শুকনো লঙ্কা ঘিয়ে ভাজা, রসম ( ঘরোয়া স্যুপ ) মুগের তরকারি নারকেল দিয়ে, অদ্ভুত আকৃতির রুটি, নুডুলসের মতন লম্বা সরু সরু ভাত । আরো আজব সমস্ত খাবার । এমন এক একটা ডিশ দিয়েছে যা আমরা বাঙালিরা লজ্জায় লোককে দিতে পারবো না । এরকমই কয়েকটি ডিশের সমাবেশে তৈরি হয়েছে কন্নড় থালি । আর জব্বর এক মিষ্টি আসলে ঘিয়ের পিন্ডি । খেতে খেতে শিল্পিতা ভাবছিলেন যে বাঙালি হয়ে জন্মানোটাই বেস্ট যদি খেয়ে তৃপ্তি পেতে চাও । তবে মাল্লুরাও ভালো খায় । ওর কিছু কেরালাইট ফিল্মমেকার বন্ধু আছে সেখানেই খেয়েছে । ওদের সুপার স্টার মোহনলাল তো সারাটা জীবন গাবদাগাবুস চেহারা নিয়ে ২৬ বছর ২৭০টি ছবিতে অভিনয় করে টপ হিরো হয়ে রইলেন । পদ্মশ্রীও পেয়েছেন । খেতে খুব ভালোবাসেন । উনি এখন ব্যাঙ্গালোরে একটি রেস্তোরাঁ খুলেছেন নাম : 'The Harbour Market' উনি বলেছিলেন : "It is a blessing from the Almighty. When one is performing there is a hidden energy that plays on you. It is true of anyone a cricketer, a surgeon, a master chef. Everyone works with the same tools but the Almighty chooses one person and that makes the difference between the commonplace and genius. We cannot claim any credit. The lifespan of an actor is very small; between action and cut and in that infinitesimal time frame, we are helped along by the divine."

খুব ভালোলেগেছিলো শিল্পিতার । জলিকে বলছিলেন উনি মোহনলালের কথা ।জলির চটজলদি জবাব : আমাদের সঞ্জীব কুমার তো মোটার দিকেই ছিলেন । ঋষি কাপুর তো বেশ লালটু লালটু চেহারা নিয়েই কামাল করে দিলেন । শিল্পিতা হেসে ওঠেন । এই চত্বর থেকে ওঁনারা যাবেন একটি ধাবায় । তিতিরের শিল্পিতা মাসির সঙ্গে খুব ধাবায় খাবার ইচ্ছে কিন্তু কলকাতায় মবড্ হবার ভয়ে শিল্পিতা মাসি যায়না কোথাও বিশেষ কিছু জায়গা ছাড়া । এখানে সে ভয় নেই । অতএব ওঁরা সবাই এই অনুষ্ঠান শেষ করে রওনা দিল হসুর রোডের একটি ধাবার দিকে । অনেক দূরে । তিতির দূরেই যেতে চায় । একবারে অন্যদিকে যেতে হবে, বেশ লং ড্রাইভও হবে । ড্রাইভর চালিয়ে দিল লোকাল গান । *কঙ্গালা তোলে -ই কেম্পিনালি, সুন্দর সন্ধ্যা রাগ দলি !* কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝলেও টিউন টা সুন্দর । ভালো লাগছিল । এইভাবে চলতে চলতে এসে গেলো একটি ধাবা । নাম : সৎ শ্রী আকাল ধাবা । ওঁরা সবাই নেমে দাঁড়ালেন । ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে । ছড়ানো ছেটানো চেয়ার টেবিল । বাইরে কালো কুচকুচে দানবীয় চেহারার অনেকগুলো লরি ড্রাইভার রয়েছে, কেউ খাচ্ছে কেউ নিজেদের মধ্যে হাসহাসি করছে ।

শিল্পিতারা তিনটে চেয়ার নিয়ে বসলেন । প্লাস্টিকের চেয়ার, সিমেন্টের টেবিল । প্রথমে লস্যি । মশলা টশলা দিয়ে বানানো । আইস দিয়েছে, দারুণ সুস্বাদু । তারপর ছোট ছোট কাঁচা পেঁয়াজের একটা চাটনি মতন দিল । সঙ্গে পাপড় আর লাল রঙের থক্থকে অজানা স্যুপ । খাওয়া চলতে লাগলো, সঙ্গে টুকটাক গল্প, মিঠে কথা । দেখতে দেখতে সময় ঘোড়ার পিঠে চেপে ওরা গভীর রাতের দুয়ারে পৌঁছালো । তখন রাত প্রায় দশটা । শিল্পিতাদের খাওয়া

প্রায় শেষ পর্যায় এসে গেছে । স্পেশালি বানানো এক লোকাল বিরিয়ানি খেলো । স্থানীয় লোকেদের মধ্যে অবশ্য বদনাম আছে যে এইসব জায়গায় নন ভেজ বিরিয়ানিতে স্ট্রিট ডগ অর্থাৎ কুকুরের মাংস দিয়ে দেয় । কিন্তু সেটা এদের জানার কথা নয় তাই খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলো । উল্টো দিকে অনেক অল্প বয়সী ছেলে বসে মদ্যপান করছে বহুক্ষণ ধরে । তিতিরের নাতিদীর্ঘ পোশাক দেখে কেউ টিটকারি দিল । আবার অন্য কেউ জোরে সিটি বাজালো । তিতিরের অস্বস্তি হচ্ছে । অবশ্য ছেলেদেরই বা দোষ কি ? এমন পোশাক পরেছে যে মাথা ঘুরে যাবার পক্ষে যথেষ্ট । জামাটা খোলা, বক্ষযুগল উপচে পড়ছে, এমনই প্যান্ট পরা যে পশ্চাৎ দেশ অর্ধ উন্মুক্ত, আর প্যান্টটি এতই টাইট যে মনে হচ্ছে অ্যাটম বোমের মতন ফেটে বিপত্তি ঘটাবে যে কোন সময় । লরি ড্রাইভারগুলো তুমুল হাসাহাসি করছে, হিন্দীতে খিস্তি দিচ্ছে --কেয়া বডি হ্যায় ইয়ার ! শালি কো বিস্তার পে লেটানাই পড়েগা ! ওরা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে । কেউ কেউ ওদের চারপাশে এসে ঘুর ঘুর করতে লাগলো ।

-লোকগুলো খুব উচ্ছৃংখল তো ! মেরুন লিপস্টিকের ফাঁক দিয়ে জলির বিরক্তি বেরিয়ে পড়ে।

- এদেশে কি মেয়েদের কোন স্বাধীনতা নেই ?

একদল আধুনিকার কাছে নারী স্বাধীনতার অর্থ পোশাকে স্বাধীনতা নাকি চিন্তায় স্বাধীনতা বোঝা গেলোনা । পোশাকে স্বাধীনতার অর্থ নগ্নতা নিশ্চয়ই নয় । ভারত তো কোন আইডিয়াল জগৎ লালন করেনা । উত্যক্ত করতেই থাকে নোংরা লোকগুলো । তারপর তিতিররা উঠে হাঁটা দেয় নিজেদের গাড়ির দিকে । গাড়ি স্টার্ট দিতেই পিছুধাওয়া আরম্ভ করে এক দঙ্গল ছেলে যারা আগেই ওদের উদ্দেশ্যে নোংরা গালি ছুড়ে দিচ্ছিল । ওদের সারথী স্পীড বাড়িয়ে দেয় । জোরে আরো জোরে । হাওয়ার গতিতে উড়ে যাচ্ছে ফোর্ড ফিয়েস্তা । হঠাৎ উল্টোদিকের একটি উঁচু জায়গা থেকে উড়ে এলো পাথর । তীব্র গতিতে । আসলে এখানে দুপাশে পাথুরে পাহাড় । একটার ওপরে যেন আরেকটা পাথর বসানো আলগাভাবে । কোনভাবে একটা গড়িয়ে পড়েছে,গাড়ির সামনের কাঁচটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেলো । এই অবস্থায় গাড়ি চালানো দুস্কর । বাধ্য হয়ে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিলো । একদল যুবক সদলবলে এসে তিতিরদের আক্রমণ করলো । গাড়ির দরজা খুলে ভয়ে তিতির প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলো । দৌড় দৌড় দৌড়, সবাই ছুটছেন, উর্দ্ধশ্বাসে । গাড়ির দরজা খুলে ওরা খুঁজছে তিতিরকে । দুপাশে পাথুরে পাহাড় আর গাছপালা । জনবসতি নেই । চওড়া হাইওয়ের অন্যপাশ দেখা যায়না । উঁচু উঁচু ঘন ফুলগাছে ঢাকা রাস্তার মাঝের উঁচু সিমেন্টের বেদী । গাঢ় অন্ধকার । তীরবেগে ছুটে চলেছে সবাই এমন সময় গুলির আওয়াজ । গুলি লেগেছে শিল্পিতার পিঠে । ব্যাথায় ককিয়ে ওঠেন উনি । মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত দেহ । জলি পেছন ঘুরে তাকতে গিয়েই তীরবেগে আরো একটা গুলি ছুটে এলো । কাঁধে লাগলো । তিতির দৌড়াচ্ছে, পেছনে কি হচ্ছে সে দেখার জন্য দাঁড়ালো । ওরা এসে গেছে, কাছে, ভীষণ কাছে । কদাকার লাগছে ওদের মুখগুলো । ভয়ানক । হলিউডি মুভিতে দেখা সাইকোর মতন । একটা বিশাল থাবা এসে পড়লো ওর নরম তুলতুলে ছোট্ট শরীরে । মাটিতে পড়ে গেলো সে, হিংস্র বাঘের মতন ওরা তিতিরকে ধর্ষণ করলো । ফালা ফালা করে দিল অপাপবিদ্ধ দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চরাচর । কাতরাচ্ছে তিতির, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে ওর সুন্দর মুখখানি । মানুষ না পিশাচ এরা ? কোন গ্রহের জীব ? জীব তো নাকি দানব ?

পরের দিন দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপা হল এই সংবাদ ঘটা করে । তিন তিনটে মৃত্যুসংবাদে সকলে বাক শুন্য । নীরব, শোকে পাথর । কর্ণাটক সরকার লজ্জিত, কুন্ঠিত ।

হা হুতাশ। নৃশংসতা, পাশবিকতা, পুলিশি গাফিলতি, আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বড় বড় লেকচার সব কিছুকে ছাপিয়ে ভেসে এলো বহু দূরের শহর কলকাতার -এক সৃষ্টিশীল মানুষের হাসি। হা হা হা - হো হো হো - হা হা !! লোকটির নাম আব্রাহাম, আব্রাহাম মন্ডল। জাতিতে কনভার্টেড খ্রীস্টান। দু:স্থ পরিবারের সন্তান। পাগলের মতন হাসছে সে। সঙ্গীরা নিশ্চুপ, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না তারা। তাই চুপ করে আছে।

ক্যামেরার পেছনে মোটামুটি তিনি ছিলেন জিনিয়াস। সেটা আমরা শিল্পিতার ছবিগুলো দেখেই বুঝতে পারবো। তার ক্রিয়েটিভিটির কোন জবাব নেই। অন্যদিকে দারিদ্র্য, অভাব, নিরন্ন দিন যাপনের জন্য বিকিয়ে দিয়েছিল আব্রাহাম নিজের সৃষ্টি। পয়সার জন্য আড়াল থেকে যে কাজ শুরু করেছিল সে সেই কাজ এবার বন্ধনমুক্ত হবে। মঞ্চের ওপরে ফুটে উঠবে। পাবে যোগ্য সম্মান। আত্মতৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলে সহকর্মীকে বলে উঠলো : *যাক্ বাবা আপদ গেছে। ভেবেছিলাম এই জীবনে বুঝি আর এই শুভক্ষণ আসবেই না। কপাল ভালো আমার, এবার থেকে নিজের মেধা ও ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে বানানো সিনেমাগুলো নিজের নামেই প্রচার করতে পারবো। শিল্পিতা বসু কোটি টাকা দিয়েও আমায় আর আটকাতে পারবে না। পর্দার অন্তরাল থেকে এবার আমি জনসম্মুখে আসবার সুযোগ পেলাম।* জন্ম হল এক নব পরিচালকের, *ফিল্ম মেকার আব্রাহম মন্ডল*। যার সিনেমা ক্যানভাসের ওপরে কিছু স্কেচ, যিনি সিনেমা আঁকেন, বানান না। দর্শক থেকে শুরু করে ক্রিটিকগণ পর্যন্ত বলেন : *পরিচালিকা শিল্পিতা বসুর মতন সিনেমা বানান এই নতুন পরিচালক। এক্সেপশনালি ট্যালেন্টেড, নি:সন্দেহে।*

# আশাবরী

## ১

*আশাবরী* একটি মেয়ের নাম । তার জন্ম হয়েছিল কোনো হাসপাতালে তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার জায়গায় । ওখান থেকে তুলে এনে মেয়ের মতন মানুষ করেন রুস্তম মোদী । মোদী পেশায় ডাক্তার । স্ত্রী গিরিজাও ডাক্তার । ওঁনারা ছিলেন নিঃসন্তান । তাই হঠাৎ একটি জলজ্যান্ত কন্যাসন্তান পেয়ে দুজনেই ভারি খুশি ।

*মোদী ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই শহরের মায়া কাটিয়ে দূরে অরণ্যের কাছে বসবাস করতেন। সেখান আদিবাসীদের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করে দুজনে চালাতেন।*

ডাক্তার ছিলেন সেবায় নিয়োজিত প্রাণ । রাত বিরেতে ভয়ডরকে তুচ্ছ করে সাইকেল নিয়ে চলে যেতেন অসুস্থ আদিবাসীর গৃহে । প্রথমে ওরা তো হাসপাতালে আসতে চাইতো না । খানিকটা ভয়ে খানিকটা সংস্কারে । পরে ডাক্তারের সংস্পর্শে এসে তাঁর মধুর ব্যবহারে সব জড়তা উধাও । এখন ওরা প্রয়োজনে ডাক্তারকে কলও দেয় ।

কয়েকজন ডাক্তারের পরামর্শে তাদের সন্তানদের পড়িয়েছে এবং একজন দূরে শহরে ডাক্তারিতেই ভর্তি হয়েছে ।

এই পরিবেশে বেড়ে উঠছিলো আশাবরী ।

হায়ার সেকেন্ডরীর পরে সে স্থির করলো যে বাবা মায়ের মতন ডাক্তারি কিংবা আরো একধাপ এগিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বা কম্পিউটার না পড়ে সে নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়বে । কারণ ছোটবেলা থেকে আদিবাসীদের দেখে দেখে তার মনে একটা সুন্দর ধারণা গড়ে উঠেছিল এদের সম্পর্কে । এদের চাল চলন, ধর্ম, কলা সংস্কৃতি সবই বড় ভালো লাগতো তার । আরো কত না জানি এরকম গোষ্ঠি ছড়িয়ে আছে বিশ্ব ভুবনে !

বাবা মায়ের আপত্তি ছিলনা । তাঁরা সন্তানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মানুষই নন । শুধু বলেছিলেন : যাই পড়ো ও করো পুরো প্রাণ ঢেলে করবে ।

আশাবরী মাস্টার্স করার পড়ে পিএইচ ডি করতে গেলো সুদূর দ্বীপে । পশ্চিম ভারতের উপকূল বর্ত্তী এক দ্বীপে । সেখানে আছে পুরুবা আদিম জনগোষ্ঠী ।

ওদেরকে মেনস্ট্রিম থেকে আলাদা করে রেখেছেন সরকার । এই জনগোষ্ঠী খুবই সরল ও সাদা সিধে । আধুনিক দুনিয়ার করাপশন ওদের ঠেলে দিতে পারে বিলুপ্তির পথে এই মনে করে সরকারি কর্তৃপক্ষ ওদেরকে মেনস্ট্রিম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন যদিও এই নিয়ে নৃতত্ত্বাতিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে ।

ওদের কালো কুচকুচে বরণ ভোঁতা নাক, উঁচু চোয়াল, উঁচু কপাল ।

মাথার চুল খুব কম ও কোঁকড়ানো । ওরা পোশাক পড়েনা নগ্ন থাকে । শুধু নিচের দিকে একটা পাতা জড়ানো থাকে । জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে ও ডালপালা, পাতা, কাঠ কুড়িয়ে ও

বিভিন্ন গাছে চড়ে আনন্দ করে ওদের দিন কাটে । মায়েদের সন্তান হলে ওরা পাতার কুটিরে রেখে ভেষজ দিয়ে তাকে শুশ্রুষা করে থাকে ।

সন্তান একটু বড় হলে তাকে বনজ দেবীর পুজো দিয়ে ওদের কমিউনিটিতে গ্রহণ করা হয় । অনেক সময় পিঁপড়ের বাসা থেকে ওরা খাবার নিয়ে আসে, জমানো শস্য দানা । ঐ জঙ্গলে একধরণের বড় লাল পিঁপড়ে আছে তারাই শস্য পাতি জমা করে রাখে বাসায় আর ওদের বাসার দেওয়াল একদিকে একটু নীচু হয় সেদিকটা দিয়ে ভোরের মিষ্টি আলো এসে ভরিয়ে দেয় পিপীলিকার চরাচর ।

সরকার থেকে সাহায্য আসে । ওষুধ পত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয় । দ্বীপ হলেও একটা সরু ব্রীজ ওটাকে জুড়ে ছিল মেনল্যান্ডের সঙ্গে । সেখানে সরকারি পাহারা ছিল । ব্রিজ পেরোলেই ওদের ডেরা । ব্রিজটিকে ওরা বলতো পুরুবা ব্রিজ ।

বিশেষ অনুমতি ব্যাতীত ওখানে যাওয়া যেতো না ।

আশাবরীকেও যেতে দেয়নি । শেষে যেখানে ও কাজ করতো *দেরাদুনের ফরেস্ট ইন্সটিটিউটের* এক শিক্ষক তাঁর সরকারি ক্ষমতা লাগিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে দেন ।

খুব কষ্টের সেইসব সময় । ব্রিজের অনতি দূরেই ছিল ওর ছোট্ট টিনের কুটির ।

সরকারি ব্যবস্থা । সারাটা দিন কাজ সেরে এসে ও সেখানে রাত কাটাতো ।

রাতে অনেক সময়ই না খেয়ে কাটাতে হয়েছে বিশেষ করে যদি বৃষ্টি বাদলা হত ।

তবে সব কষ্ট উধাও হয়ে যেতো পুরুবা জনগোষ্ঠির মধুর ব্যবহারে ।

লোকে ওদের অসভ্য বলে আসলে এরাও একধরণের সভ্য, পোশাকে আশাকে সভ্যতায় শেষ কথা নয় আশাবরী জানে ।

প্রথম প্রথম ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো । একটি মেয়ে একা একা এসেছে ওদের মাঝে । কেউ তো আসেনা ! সরকারের বুট জুতো পরা লোকগুলো আসে তারপর বাঘের খাঁচায় মাংস দেবার মতন করে অনাদরে খাদ্য দ্রব্য কিংবা অন্য বস্তু দিয়ে কিছু গালাগালি দিয়ে চলে যায় । হিরোম্বো বলে যে ছেলেটি আছে সেই কিছু কিছু কথা ওদেরকে শিখিয়েছে । ওই তো সরকারের লোকেদের সঙ্গে জমিয়ে বসে । খুব স্মার্ট ছেলে । ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলে । খালি গা, পরণে একটা মোটা পাতা কোমড়ে মোড়া । ও আবার বান্দু নামক একটা বাজনা বাজায় । ওটা অনেকটা আমাদের তবলার মতন । তবে আরো সরল গোছের । বাজায় পূর্ণিমা রাতে । সমুদ্রের জলে তখন মুঠো মুঠো জোছনা । দূরে পলাশ গাছের নিচে আশাবরী । দুচোখে মুগ্ধতা । রাখালের সুরে বিভোর রাজকুমারী মন ।

প্রেমে পড়ার বয়স কি এটা ? ২৮ পেরিয়েছে সে। রিসার্চের আগে বেশ কিছুদিন স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে এক পুরাতন আদিবাসী ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত ছিল । এক নৃতত্ত্ববিদের লেখা বই পড়ে পড়ে সেই লুপ্ত ভাষা সে শিখেছিল । তারপর রিসার্চে আসে ।

সেই সময় সে থাকতো কলকাতার বেহালার কাছে সেই নৃতত্ত্ববিদের মেয়ের বাড়ি ।

উনিও এই লাইনের লোক । প্রচুর বইপত্র ছিল সেখানে । সেইসময় একজন সাট্টা ডনের কুনজরে পড়ে । সুন্দরী আশাবরীকে বিরক্ত করতো লোকটি । ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতেন

না । একদিন কালীপুজোর রাতে জোর করে বাড়িতে ঢুকে সে আশাবরীকে সিঁদুর পরিয়ে দেয় । আশাবরী ঝামেলা এড়াতে ভাগ্যের পরিহাস বলেই মেনে নেয় ।

ওর পালিত পিতা পুলিশে কমপ্লেন করার কথা বললে সে বলে - যার জন্মের পরে তার মা তাকে ফেলে চলে যায় তার আর কী থাকে ? যা হবার হয়েই গেছে এখন পুলিশ ফুলিশে গেলে শান্তি নষ্ট হবে । এরা কি আর আমাকে ছাড়বে ?

তারপর ডন মাঝে মাঝে আসতো । তার বিরাট ল্যান্ডকুজারে করে ওকে পৌঁছে দিতো এখানে সেখানে । লোকে ভয়ে ওকে সমঝে চলতো । পাড়ার দোকানের মাধবদা হঠাৎ ওকে আপনি বলা শুরু করে ও জিনিস বিক্রি করে পয়সা নিতে চাইতো না । আশাবরী খুব অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলো ওঁনার আচরণের এই তারতম্য ।

উনি আঁতকে উঠে এক হাত জীভ বার করে বলেছিলেন : এমা আপনি হুজুরের স্ত্রী আপনার কাছ থেকে পয়সা নেয় কোন শালা !

এতে অবশ্যই মাধবের দোকান থেকে তোলা আদায়ের ঝক্‌কি অনেককাংশেই কমে গিয়েছিলো । যখন গুন্ডার আড়ালে সবে মানুষটাকে আবিস্কার করতে শুরু করেছে আশাবরী তখনই একদিন দুপুরে ঘরে দরজা ধাক্‌কিয়ে ঢুকে পয়েন্ট ব্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করে বিরোধী পক্ষ । বৈধব্য গ্রাস করে আশাবরীকে ।

তারপর বেশ কিছুদিন নৈ:শব্দ । শেষে শুকনো পাতার মচমচানি । বালির বুকে পায়ের ছাপ খুঁজে ফেরা । আবার অবগাহন সংসার সমুদ্রে । পি এইচ ডির চেষ্টা শুরু ।

আজ অনেকদিন পরে আবার বেজেছে হারানো সুর এক উদ্দাম আদিবাসীর সাহচার্যে লোকে যাকে বলে অসভ্য জাতির ছেলে ।

ওরা অসভ্য নয় আশাবরী অনেককে বুঝিয়েছে । শহুরে লোকেরা মানতে চায়না । রাতের আঁধারে সভ্য শহরে একা নারী হেঁটে চলে বেড়াতে পারেনা কিন্তু এই জনগোষ্ঠির দ্বীপে সে একা কত ঘুরেছে ওরা ওকে স্পর্শও করেনি বরং মুখের অস্বচ্ছ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে ওরা ওকে রক্ষা করছে বুনো জন্তু, হিংস্র সাপেদের থেকে ।

আশাবরী কৃতজ্ঞ ওদের কাছে ।

## ২

হিরোম্বোকে আস্তে আস্তে ভালোলাগতে শুরু করে । ও এত সরল ।

সরলতার ঝিলিক সে দেখেছিলো সাট্টা ডনের মধ্যেও । লোকে বিশ্বাস করবে না । তাতে কি ? রামকৃষ্ণ দেবই তো বলেছিলেন : লোক না পোক ?

তাকে অনেকেই বলেছে: তুমি আদিবাসীদের নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছো!

ও মিষ্টি হেসে উত্তর দিয়েছে : মানুষ সব জায়গায়ই এক । বদলায় শুধু সংস্কৃতি ও মুখোশ ।

সাট্টা ডনও যে সরল হতে পারে সে কথা কি বিশ্বাস করবে শহুরে দুপেয়েরা ?

সে ডন হয়েছিলো অভাবে যারা সভ্য মানুষের মুখোশ পরে বসে স্বভাবে ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটি করে তাদের কথা কেউ তো বলেনা ? কেউ গায়ে কাদা ছেটায় না !

আশাবরীর ভাবুক বলে বদনাম আছে ।

আশাবরী স্বপ্ন দেখে সে একদিন হিরোম্বোকে স্বামী রূপে পাবে । ওর বন্ধুরা বলে : তুই আস্ত পাগল । আগে একটা বিয়ে করলি সেও কেমনতর আবার একটা কী করতে চলেছিস !

ওর বাবাকে সে লিখেছে হিরোম্বো সম্পর্কে । বাবা উত্তর দেননি ।

বাবা মেয়ের সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছেন গুন্ডাকে মেনে নেওয়ার পরে পরেই ।

বাবা যেন একটু বিরক্তই ওর ওপরে । আজকাল খুব কম ইন্টার‍্যাকশান হয় ।

চিঠি পাঠাতে হলেও অনেক দূরে যেতে হয় । আর চিঠি এলেও ওকে ডাকঘরে গিয়ে নিয়ে আসতে হয় ।সেখানে যেতে হলে বাসে করে যেতে হয় ১৫ কিলোমিটার ।ওর পুরুবা ব্রিজের ডেরা থেকে ।

মেখলা জিনিসটা আশাবরীর খুব ভালো লাগে । ও আজকাল মেখলা পরে । হিরোম্বো অশুদ্ধ হিন্দীতে বলে : এটা কী পরেছিস ?

- তোদের মতন জামা ।
- আমরা তো জামা পরিনা ! পাতা পরি, তুইও পর ।
- পাতা পরলে কী হবে ?
- তোকে আরো খুবসুরৎ দেখাবে !

আশাবরী বলেও বলতে পারলো না : খুবসুরৎ দেখালে আমাকে বিয়ে করবি হিরোম্বো ?

যদিও এদের মধ্যে বিয়ের রেওয়াজ নেই । এরা লিভ ইন রিলেশনে বিশ্বাসী ।

তবে অনেক সময় একই নারী বহু পুরুষের বাহুলগ্না হতে পারে যদি সেই পুরুষ সন্তান দিতে সক্ষম না হয় । আবার উল্টোটাও চলে । এদের মধ্যে ধর্ষণ বলে কিছু নেই ।

হিরোম্বোর সীসার মতন মসৃণ দেহ, চিতার মতন ক্ষিপ্রতা ওকে মুগ্ধ করে।

হিরোম্বোকে দেখলে আজকাল বুকের ভেতরে কেমন করে । শিরশিরানি, চাপা ভালোলাগা ।

ও যখন ঘন জঙ্গলে মধু আনতে যায় আর ফিরতে দেরি হয় আশাবরী ব্যাকুল হয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করে ও কখন ফিরবে ! না ফেরা অবধি ওকে অস্থির পায়ে চলাফেরা করতে দেখা যায় । একবার বলেছিল : আমাকে নিয়ে যাবি তোর সঙ্গে ?

হিরোম্বো হেসেই খুন - তুই যাবি ? তুই তো অতটা চলতেই পারবি না । আমার মতন লাফিয়ে হাঁটতে শেখ আগে ।

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো ওর প্রস্তাব । হিরোম্বো সুধা আর পান করা হলনা সবুজ জোছনায় ।

সরকার এই জনগোষ্ঠিকে আড়াল করে রেখেছেন, সরকারি গার্ড ও অথেন্টিক মানুষ ছাড়া কেউ ঐ দ্বীপে পদার্পণ করতে পারেনা বিশ্ব সংসার এটা জানলেও রাতের আঁধারে আসে চোরাকারবারি । তারা নৌকো করে পাড়ে এসে জঙ্গল পেরিয়ে ঢোকে । এদের মধ্যেই কেউ নগ্ন পুরুবা নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে গুজব শোনা যায় ।

সত্যি করেছে, আশাবরী জানে । সে দেখেছে ঐ ধর্ষিতাকে ।

তার পা বেয়ে বেয়ে পড়ছিল টাটকা রক্ত। যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সেই কিশোরী।

প্রথম শারীরিক সম্পর্কের জ্বালা ও পাশবিকতা মিলে মিশে একাকার।

ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আশাবরীর। সভ্য সমাজের দানবীয় আচরণ ওকে অসম্ভব পীড়ন করছিল।

এরপর অনেকদিন সে লজ্জায় ওদের ধারে কাছে যেতে পারেনি। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হত তার। মনে হত সেও তো সভ্য জগতের মানুষ। ওরা কী সম্মানটাই না করে ওকে, ভালোবাসে অথচ ওরই সমাজের কেউ কী মূল্য দিল তার ?

খবরটা চেপে দেওয়া হল। তলে তলে কিন্তু চলতে লাগলো অত্যাচার।

জঙ্গলে চোরাশিকারির হামলা আর নগ্ন পুরুবা নারীর দেহ সৌন্দর্য উপভোগ ও তাকে যাতনা দেওয়া চলতেই লাগলো। একটি বদ লোক এক মেয়ের সারা শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে তারপর যোনিতে গাছের ডাল ভেঙে ঢুকিয়ে দেয়। মেয়েটি পালিয়ে যাচ্ছিলো বলে।

সংঘর্ষের সংবাদও এলো কিছু। তীর ধনুক নিয়ে চোরা শিকারির মোকাবিলা করলো কিছু পুরুবা যুবক। কয়েকজন জখম হল বন্দুকের গুলিতে।

জ্বলে উঠলো আপাত নিরীহ আদিবাসীরা। দ্বীপটি যেন এক ছাইচাপা আগুন।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো এক পুরুবা নারীর শরীরে এইডস্ ভাইরাস ধরা পড়ায়।

আশাবরীর ডাককে ক্রমাগত উপেক্ষা না করতে পেরে বাবা এসেছিলেন। ওর সঙ্গে উনিও যান পুরুবা দ্বীপে। একটি মেয়ের শারীরিক উপসর্গের কথা শুনে ডাক্তার হিসেবে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন। পরীক্ষা করানো হয় সরকারি হস্তক্ষেপে। ধরা পড়ে মারণ রোগ এইডসের জীবানু।

ক্ষেপে যায় পুরুবা গোষ্ঠী। সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর। শুরু হয় বন্দুক বনাম তীরের লড়াই। সরকার পক্ষের লোক বাদ সাধলেও তাদের পক্ষেও সর্বদা পাহারা দেওয়া সম্ভব হয়না এই বিশাল ঘন অরণ্যে ছাওয়া দ্বীপ।

*তারপর একদিন আসে সেই অমাবস্যার রাত্রি।*

ঘন অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছিলো হিরোম্বো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। এমন সময় এক চোরা শিকারির ছোরার আঘাতে প্রাণ হারায় সে। সেই সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছিল যে !

তার দেহটা ওরা ভাসিয়ে দেয় জলে। কয়েকদিন পরে সেই দেহ এসে ঠ্যাকে এক চরায়।

আশাবরী সর্বপ্রথম দেখতে পায় ওর নিখোঁজ দেহটা। রক্তে ভেসে গেছে, শুকনো রক্ত ওষ্ঠ বেয়ে পড়ছিল। পাগলের মতন কেঁদে ওঠে সে। হাউ হাউ করে। তার কান্নায় যেন হাহাকার করে ওঠে আশেপাশের বৃক্ষরাজি।

শেষ হয়ে যায় একটি অধ্যায়।

# ৩

আশাবরী এখন শুয়ে আছে এক অপরিচিতর বাড়ি । ভদ্রলোক রিটায়ার্ড কর্নেল ।

আশাবরী শহরে যাবার পথে রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল ।

তখন এই ভদ্রলোক ওকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন । ও- কে, কোথায় যাবে কিছুই জানেন না তাই সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন । এখন সে অনেকটাই সুস্থ । ভদ্রলোক অকৃতদার । আর্মি মেসেই কেটেছে জীবন । এখন কাঠের ব্যবসা করার জন্য এই দ্বীপের এক অংশে আছেন ।

আশাবরী আসলে যাচ্ছিল বাড়ি । বহুদিন পরে । ওর এই দ্বীপের কাজ যেন কতকটা শেষ হয়ে গেলো হিরোম্বোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই । ও ভেবেছিল ও পাগল হয়ে যাবে ।

এত দু:খ ওর বৈধব্যও ওকে দিতে পারেনি । অথচ পরের দিকে তো সাট্রা ডনকেও ও মন দিয়ে ফেলেছিলো ।

বাবা রমণ ম্যাগসাইসাই পেয়েছেন তাঁর নিরলস সমাজ সেবার জন্য । খবরের কাগজে তাঁর ছবি

এসেছে । সেই সুখানুভূতি ভাগ করে নিতেই তার বাড়ি যাওয়া ।

চোখ মেলে চাইলো সে । দেখলো একটি নরম তুলতুলে গদিতে শুয়ে আছে । বেশ পরিপাটি একটি ঘর । ও উঠে বসার চেষ্টা করলো । ঘাড়ে বড্ড ব্যাথা । মাথাটা নাড়াতেই ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন ।

- আপনি বিশ্রাম নিন । আপনি অসুস্থ । আমি আপনার জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলাম নাহলে আমাকে একবার জরুরি কাজে বাইরে যেতে হত ।
- নাহ্ কোথায়, মৃদু হাসার চেষ্টা করে আশাবরী । বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা মোচড় দিয়ে ওঠে । ব্যাথাটা সারাটা দেহেও ছড়িয়ে যায় । ও পা বাড়িয়ে নামার চেষ্টা করে শক্ত কাঠের মেঝেতে । মাথা টলে যায় । পড়ে যেতে গেলে ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন ।

তারপর খুব মিহিসুরে বলে ওঠেন -- আহা এরকম করলে কি যাওয়া যায় !

জীবন বয়ে চলে নিজের নিয়মে । একই স্রোতে । আশাবরীরা বেঁচে থাকে । আশাবরী মূর্চ্ছনা হয়েই ।

# ফুলবনে- গদ্য কবিতা

And I miss you -
Like the deserts miss the rain
And I miss you------!!

এফ এমের গান ভেসে আসে ।

নতুন কেনা হন্ডা অ্যাকর্ড জ্যামে আটকে । ব্যাঙ্গালোরে এমনিতেই হিম হিম হাওয়া বয়।

এ-সি অন করেনা দা হিন্দুর সিনিয়র জার্নালিস্ট মেহেক বাত্রা । মাইগ্রেনের অ্যাটাক হয় ।

বাতায়ন খোলাই থাকে । বাড়ির পথ অনেকটা ।

সিঁদুর লাল ফুলের বাহার ।

আকাশ ঢেকে গেছে । বোঝা যায়না আকাশ নীলাভ নাকি লাল ।

সিংহভাগ গাছ পত্রহীন । শুধু ফুলের সমাহার । লালের ও এত শেড হয় জানা ছিলনা মেহেকের ।

কোনোটা কমলা লাল কোনোটা গাঢ় লাল কোনোটা একেবারেই মেটে লাল ।

মেহেক অবাক হয়ে দেখে প্রকৃতির সৃজনশীলতা, আচ্ছন্ন হয় শিল্পমোহে ।

আর চোখ যায় মলিন বাস পরা এক ভিখারিনীর দিকে ।

প্রায়ই দেখে তাকে । অপরূপা । গলার এক দিকটা বিশ্রীভাবে পোড়া । চামড়া কুঁচকে গেছে ।

ভয়াবহ ।

জীর্ণ পোশাক, হাতে ভাঙা বাটি । নাকে ঝকঝক করছে একটি পেতলের নাকছাবি ।

মলিনতার মাঝে এক বিন্দু উজ্বলতা, আশা ।

মধ্যাহ্নে রাস্তায় থাকলে দেখে, পায়ে পায়ে হেঁটে সে চলেছে কবর খানার দিকে ।

এমনিতে রোজ দেখা হয় । সাঁঝবেলায় । অফিস ফেরার পথে ।

ক্লাব স্যান্ডউইচ খেতে খেতে ।

গ্ল্যামারাস ভিখারিনী লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ।

অদ্ভুত সেই চাহুনি ।

মেহেক দেখেও দেখে না ।

ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে সিলিকন নগরের দিগন্তরেখায় ।

সেদিন মেহেকের গাড়ি ছিলনা। ভরদুপুরে সে বাসে ফিরছিল।

জায়গা মতন ভিখারিনীর দেখা পেলো। রাস্তা থেকে কিছু ছুঁড়ে দেওয়া অবজ্ঞা কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে চলেছে কবরস্থানের দিকে।

মেহেক অনুসরণ করে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা কবরগুলো। মোরাম বিছানো পথ। খ্রীষ্টানদের মৃতভূমি।

মাঝে মাঝে দু একটি লম্বা ফুলের গাছ হাওয়ায় দোদুল্যমান।

গোলাপী কিংবা সাদা ফুল। নীল ফুল। দুলে দুলে বলতে চাইছে - এই মৃত্যুপুরীতে আমরাও আছি।

শবেরা একা নয়। এখানে কখনো কেউ কেউ মোমবাতি জ্বালে। এখানে সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায় না।

বনজ ঘাসের ডগায়।

বেশ দূরে একটা জারুল গাছের নীচে একটি শ্বেতশুভ্র কবর।

ভিখারিনী সেখানে বসলো। একটা আয়না বার করলো

ঝোলা থেকে। তারপর গলার সেই কুঞ্চিত চামড়া আলতো করে টেনে খুলে ফেললো- একটা প্লাস্টিকের আবরণ বোঝা গেল। সেই বীভৎস পোড়া চামড়ার নিচ থেকে নিমেষেই বেরিয়ে এলো গোলাপের পাপড়ির মতন ত্বকের জেল্লা।

মেহেক স্তব্ধ।

আর একটি বই বার করলো। নেড়েচেড়ে খুলে বসলো।

পেছন দিক থেকে ধীরে হেঁটে গিয়ে একদম কাছের একটি বেদীতে বসলো মেহেক।

ঘাসবন বলে পদসঞ্চারের আওয়াজ কর্ণকুহুর স্পর্শ করলো না চিরদু:খিনীর।

ঈনতঢ়ব ঘপ অ জতরনড়লতশ থঁ অক্ষঢ়বয়ক্ষ খভররনক্ষ.

চমকে উঠলো মেহেক।

ছায়ারও তো আলো আছে। শয়তানও সংবেদনশীল হয়।

ঘাসফুলেও বসে ভ্রমর।

মন চঞ্চল। কে এই রহস্যময়ী ?

কোন দূর্ভাগ্যের ফেরে ফুলে বিষাক্ত পরাগ ?

মেহেক অনুসন্ধানী।

মেহেক আলোর পিয়াসী।

মেহেক এগিয়ে যায়।

কিছু বিশ্লেষণ, কিছু ভাবনার বাস্তবায়ন, কিছু কল্পনার

আনাগোনা মনের আঙিনায় ।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকায় কবর কন্যা ।

জটা ধরা চুল, নোংরা বেশভূষণ, খালি পা । শুধু এক রাশ আশা ছড়ানো ঐ নাকছাবিটায় ।

মেহেক কে দেখে রমণীর পানপাতার মতন মুখে রমণীয় হাসি - দুপুরবেলায় ট্র্যাফিক খুব কম থাকে । এখানে আমি বিশ্রাম নিই । ।

মেহেক ও হাসে । জলে নেমে প্রদীপ জ্বালানোর বিফল প্রয়াসের মাঝে শব্দ গুলো হারিয়ে গেছে ।

ভিখারিনীর পাশে একটি ঝোলা রাখা । ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে বার করে আনে মণিমুক্তো ।

একগুচ্ছ পরিপাটি আধুনিক পোশাক । রূপার পায়েল । টাইটানের হাতঘড়ি ।

নকল হিরের নাকছাবি । তার দ্যুতিতে আলোময়, গাছে ঢাকা ঈষৎ অন্ধকার কবর স্থান ।

আর একজোড়া কোলাপুরি নিপুন চটি ।

এগুলো আমার সম্পত্তি - পথচারিনীর সুমিষ্ট কন্ঠস্বর রিন রিন করে ওঠে ।

মেহেক চেয়ে আছে - মৌনতা মুখর হয় ।

সব ভিক্ষে করে পাওয়া বুঝি ?

ভিক্ষা ? না না ! আমার প্রফেশন জনসেবা নেওয়া । লোকেরা আমাদের মতন অসহায় নগর কন্যাদের জন্য অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন তাতেই সব কেনা ।আমাকেও তো রোজ এই সময়টা এই রাস্তায় কাটাতে হয়, এটা আমার রুটিরুজি ।

ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ভিখারিনী । মেহেক হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় ।

বৈদেহী গঞ্জালভেজ । ১২৩, অলিভ রোড ।

শীতল হাওয়া এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে । দূরে একজোড়া ছাতিম গাছ । লাল পদ্ম ভরা একটা দিঘি । ভিখারিনি এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে । মেহেক নীরবে চেয়ে আছে পথপানে ।

আস্তে আস্তে ওর দেহরেখা মিলিয়ে যায় গাছের আবডালে ।

কার্ড হাতে কিছুক্ষণ বসলো একটা বেদীতে । তারপর ডুবে গেল চিন্তার পারাবারে ।

ভিখারিনী ডুবে গেছে বৃক্ষের কৃত্রিম আঁধারে ।

কৌতুহল, অদম্য কৌতুহল । কার্ডের ঠিকানার রেখাচিত্র ধরে মেহেক গেলো

সেই অচেনা পরীর দখিন দুয়ারে ।

শহরের দক্ষিণে, লোকালয়ের শেষ প্রান্তে ওর নিবাস ।

ঘন গাছপালা ঢাকা এক ফুল বন।

ফুলে ফুলে ঢেকে আছে পথ, চরাচর । আকাশ বাতাস ।

ঝরা পাতায় পাতায় মধুর বন মর্মর ।

কাঠ গোলাপ, জবা, পপি, ডালিয়া, কাঞ্চনের বন ।

স্যামুয়েল গঞ্জালভেজ । নেমপ্লেটে খোদাই করা ।

বাড়িটি বাংলো ধাঁচের । পুরাতন, ঈষৎ জীর্ণ ।

বড় একটা তেলরঙের শিল্পসুষমা । বাইরের দেওয়ালে আঁকা ।

মেহগনি দরজার দুধারে আইভি লতা লকলকিয়ে উঠেছে ।

বড় সবুজ সতেজ ।

মেহেক ভেতরে ঢুকে যায় ।

এক মানব সন্তান এদিকেই আসছেন ।

দেওয়াল ধরে ধরে । হাতে একটা লাঠি । বড্ড সোজা লাঠিটা ।

আর পেছনে ফুলের সাজে সেই পথচারিনী, আজ নবোঢ়া ।

জটা হীনা । একরাশ অপরাহ্নের শিশির ভেজা বকুল ছড়ানো ভ্রমর কালো অমসৃণ কবরী, ঘাড়ের কাছে ।

- মিসেস গঞ্জালভেজ ! হাঁক পাড়ে বাগানের মালাকার ।

চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ের পেছন থেকে দ্রুত পায়ে উঠে আসছে, হাতে একগুচ্ছ বনফুল ।

লাল ও চন্দনী রঙের বাঁধনি চুড়িদারে ঝলমলে মিসেস গঞ্জালভেজ ওরফে বৈদেহী র ভ্রু পল্লবে ঝিলিক । ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা ।

তাহলে ভিখারিণীর বেশ ? ধূলি ধূসর রূপ ?

ঐ যে আমার পতিকে দেখছেন, উনি দৃষ্টিহীন ।

অসম্ভব ড্রিঙ্ক করতেন, এক অমানিশায় গাড়ি দূর্ঘটনায় নিভে যায় চোখের দীপ ।

হুইস্কির নেশায় সব গেছে । শুধু থাকার মধ্যে আছে এই বাংলো খানি । তাও অর্থাভাবে বহুদিন সংস্কার না করায় প্রায় ভগ্ন দশা, জরাজীর্ণ ।

অনেক কাজের সন্ধান করেছি । কেউ আমাকে একটা ভদ্র চাকরি দেয়নি ।

কেউ কেউ দেহলতার মৌতাত নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে আমায় ।

- ভদ্রলোকেরাও ? মেহেক শুধায় ।

- কাকে ভদ্রলোক বলছেন ? বক্র হাসি মিসেস গঞ্জালভেজের ওষ্ঠে ।

টাই - কোট - প্যান্টুলুন পড়লেই কি ভদ্রলোক হয় ?

আত্মসম্মান, রুচি, বিবেক সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে, রিপুর কাছে আত্ম সমর্পণ করে ক্ষুধার্ত বন্য কুকুরের মতন আচরণ করে । শুধু দেহ নয় ভালোমানুষী তাদের খাদ্য ।

ঢিল মারলেও যায়না, তাড়া করলেও নয় । তাদের পথ ওয়ান ওয়ে । পথে শুধু আসা আছে ফেরা নেই । সেরকম ভদ্রলোকই তো বেশি !

- আপনার আত্মীয়রা ?

- ওরাই তো সবচেয়ে বড় শত্রু ! আপনাকে গিলে খাবার জন্য বসে আছে । বিশেষ করে যদি বিনা পরিশ্রমে পাওয়া রূপের জোরে একটি মালদার লোকের ঘাড়ে চেপে বসতে পারে ।

সমস্ত সুবিধে পেয়ে নিজেদের মনে করে পৃথিবীর সবচেয়ে বোদ্ধা ও চতুর । সবার কাজের, ব্যবহারের ময়না তদন্ত করার দায়িত্ব তাদেরই আওতায় পড়ে । ওপরকে অধম প্রমাণ করে নিজে উত্তম হবার প্রচেষ্টা । এরাই একযোগে ওৎ পেতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায় । তারপর নখ দন্ত বার করে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ে । আর যখন কোন সুযোগই পায়না তখন অতীত ধরে টানাটানি করে, কবে হাঁচতে গিয়ে কেশে ফেলেছিলেন, কবে নাচতে গিয়ে টেংরি ভেঙেছিলেন ।

আপনার চরিত্র হনন করা, কুৎসা রটিয়ে নাম কেনা এগুলোই এদের ধর্ম ।

আর যদি দেখে আপনি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছেন তখন সব ভুলে সারমেয়র মতন এসে পদলেহন করতেও তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা হবেনা । আত্মীয়ের সংজ্ঞা কিন্তু এরকম নয় ! এদের সঙ্গে আপনার আত্মার যোগ কোথায় ?

শিক্ষায় ছিলাম না সেরা । সাধারণ বড়ই সাধারণ মেধা ।

শেষে এই পেশায় নেমেছি ।

এই বেশ ভালো আছি ।

আমার কাজ ভিক্ষা করা ।

ওই বেশবাস আমার প্রফেশন্যাল ড্রেস ।

ভুল করেছি বলুন ?

কোন ভুল করেছি ?

লোক ঠকিয়েছি ?

পাপ করেছি ?

আকাশ নিভে আসছে । অস্তগামী সুর্যের আভায় সবুজ বনানী গাঢ় হয়ে উঠছে ।

মেহেকের হাতে ধরা সেই নেম কার্ডটি ।

হাতের চাপে মুচড়ে যাচ্ছে । মেহেক বুঝতে পারছে ।

কাগজগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছে অচিন বাগিচায় ।

কার্ডটি নিয়ে সে যে অনেক রোমান্টিকতা লালন করেছিল । রঙীন বেলায় ।

গেঁথে ছিল কুড়ানো ফুল দিয়ে

এক মালা, এক সুত্রে

মনের মানচিত্রে ।

শ্রাবণ সন্ধ্যা । বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে আউটার রিং রোড ।

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে হন্ডা অ্যাকর্ডের খোলা জানালা দিয়ে ।

মেহেক আজ নীলাম্বরী সাজে সেজেছে ।

কবরীতে জুঁইয়ের মালা ।

জ্যামে আটকে গেছে যানবাহনগুলি । রাস্তাটকে কেমন দাবার ছক বলে মনে হচ্ছে ।

বৃষ্টিভেজা স্নিগ্ধ পথ ধরে এগিয়ে আসে এক রমণী ।

মাথায় কাঠগোলাপ । পরণে মাইশোর সিল্ক । কানে ঝুমকো ।

মুঠিতে এক মধ্যবয়স্ক দৃষ্টিহীন মানুষ ।

এগিয়ে চলেছে মভ কালারের ছাতা ।

খুব মেপে পা ফেলে হাঁটছে রূপসী ।

আজও সেই গানটাই বাজাচ্ছে নাইন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের রেডিও জকি আভিভা ।

*I step off the train*
*I'm walking down your street again and past your door*
*But you don't live there any more*
*It's years since you've been there*
*But now you've disappeared somewhere like outer space*
*You've found some better place*
*And I miss you - like the deserts miss the rain*
*And I miss you - like the deserts miss the rain*
*Could you be dead?*

*ব্যাঙ্গালোর শহরে এক ভিখারি আছে যে ভদ্রলোকদেরও টাকা ধার দিতো ও ভিক্ষাকে প্রফেশান হিসেবে নিয়েছে । সেই সুত্র ধরেই এই লেখা ।*

# অভিমানিনী

*এখানে বর্ণিত আদিবাসী গোষ্ঠির ব্যবহার ও প্রথা ইত্যাদি কল্পিত।*

মেখলার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। মেখলা আমার বান্ধবী, পেশায় সাংবাদিক। যখন উগ্রপন্থী হানা হয় ও মুম্বাইয়ে ছিলো। সেই নিয়েই গল্প করতে করতে ও আরেকটি মর্মস্পর্শী কাহিনী মেলে ধরেছিলো। এখন আমরা সেই গল্পই শুনবো।

একবার ও নিজের কাজে কেরালা গিয়েছিলো। সেখানে বিশেষ কারণে থাকতে হয়েছিলো একটি চা বাগানে। দিনে ও নিজের কাজ করতো রাতে কাছেই একটি মহীন্দ্রার রিসর্টে গিয়ে ওয়াইন টোয়াইন খেতো। সারা সন্ধ্যেটা ওখানে কাটিয়ে সে ফিরে আসতো। সেখানেই দেখা হয় জঞ্জিরের সাথে। ওর আসল নাম কী কেউ জানেনা লোকে ওকে জঞ্জির বলেই ডাকে। মেয়েটি আদিবাসী।

মহীন্দ্রার রিসর্টে ও হাউজ কিপিং এর কাজ করতো। মেয়েটি চালাক চতুর ছিলো বলে সাধারণ ঘর পরিষ্কার থেকে ওকে আরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। নিজের কাজ ও নিষ্ঠাভরেই সম্পন্ন করতো। ও একা থাকতো রিসর্টের একটা ঘরে। হঠাৎ এই মহিলাটি একাকিনী হয়ে গেলো কেন ? স্বামী, সন্তান, আত্মীয় পরিজন কেউ নেই ওর। মেখলা ওর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ওকে বাড়তি টাকা দিতে গেলে ও নিলোনা। বললো রেখে দাও। আমি একা মানুষ যা পাই আমার চলে যায়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে এইভাবেই ওর সঙ্গে ভাব জমে উঠলে মেখলা জানতে পারে এক মর্মস্পর্শী ঘটনা।

জঞ্জির ছিলো এক আদিবাসী মেয়ে। ওরা পাহাড়ে থাকতো। ওদের এক আদিবাসী গোষ্ঠী ছিলো। সেই আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামটি দক্ষিণ ভারতে এক রাজ্যে।

এই জনগোষ্ঠির নাম বাংরি। এই বাংরি গোষ্ঠির মানুষেরা খুব অদ্ভুত নিয়ম মেনে চলে। খুব ছোট বয়সে ওরা মেয়েদের বিবাহ দিয়ে তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

তারপর কোনো যোগাযোগ রাখেনা। মেয়েটিকে আসলে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যৌতুক দিয়ে কিনে নেয়। তারপরে সে বিধবা হয়ে গেলে চড়া দামে ( দাম নির্ভর করে শারীরিক সুস্থতা ও জোরের ওপর ) বিক্রি করে দেয় ওদেরই আরেক ধারা আরেক শূকরপালক গোষ্ঠির কাছে। তারা যাযাবর ধরণের তবে মোটামুটি কয়েকটা পাহাড়েই ঘোরাফেরা করে। ঐ স্বামীহীনা মহিলাদের কিনে নিয়ে ওরা চাকরানীর কাজ করায় অর্থাৎ শূকর চড়ানো, প্রতিপালন করা এগুলো করায়। বড় দু:খে দিন কাটে মহিলাদের। সন্তান থাকলে তাদের কেড়ে নেয় শ্বশুরবাড়ি।

এইকমই এক মহিলা ছিল জঞ্জির। সে ছিল নি:সন্তান তাই একাই তার দু:খে সে কাতর। সন্তানশোক কী তা সে বোঝেনি।

ওকেও বেঁচে দেওয়া হয়। কিন্তু হলে কী হবে ওর ছিল একটি অনমনীয় মন। ও প্রতিবাদ করেছিলো ও শূকর পালন করার ফাঁকেই একদিন পালিয়ে যায়। পালিয়ে যায় একটি ট্রাকের পেছনে চড়ে। ট্রাক ভর্তি ছিল মাছ। মালিক ছিল মৎস্য ব্যবসায়ী।

ঘন সবুজ গাছের সারি ও উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে ভাবলো যে এই পথ যদি না ফুরায় বেশ হয়, বেশ হয় যদি ড্রাইভার ওকে কোনো কাজ খুঁজে দেয় ।

ভাবনার সঙ্গে সচরাচর বাস্তবের মিল হয়না কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেমন যেন হয়ে গেলো ।

জঞ্জিরকে দেখতে বেশ । আদিমতার মাঝে যেন একরাশ উজ্জ্বলতা ।

আর কথাবার্তাও সুন্দর বলে কিনা কে জানে তাকে ভালোবেসে ফেললো সেই মৎস্য ব্যবসায়ীর এক কর্মী । পেশাগত দিক থেকে সে জেলে । তার বসবাস কেরালার সমুদ্রতটের দিকে । মাসের অনেকটা সময় সে দলবেঁধে ট্রলার নিয়ে চলে যায় গভীর সমুদ্রে । জঞ্জির বিধবা জেনেও সে তাকে বিয়ে করে ফেললো । ছেলেটি ছিল খ্রীশ্চান ।

ধর্মান্তরিত হয়েছিলো তার পিতা । সেও আরেক জেলে ।

জঞ্জির মাঝে মাঝে যেতো ট্রলারে চড়ে গভীর সমুদ্রে । সেখানে মাছটাছ ধরা হলে আবার ফিরে আসতো । বোটম্যান্স মিল বলে একটি কনসেপ্ট মহীন্দ্রা চালু করেছিলো ওর কাছ শুনে যে জেলেরা অথেন্টিক কী জাতীয় খাবার খায় । সেটাতেই আরো শহুরে পালিশ পড়েছিলো ঠিক যতটা দেওয়া চলে ।

জঞ্জির নৌকোয় থাকতো । রাঁধা বাড়া করতো । উত্তাল সমুদ্র ওকে হাতছানি দিতো । ওর বাঁধনহারা জীবন যেন নিয়ে আসতো সমুদ্রের জলের সঙ্গে খুশির ঢেউ ওর অনভিজ্ঞ জীবনে । মনে হত ও কি বেঁচে আছে ?

একদিন বিকেলে উদাসী হাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে মনে হল ও সন্তান সম্ভবা ।

সেই সমুদ্র যাত্রা ফুরলো ও আর গেলোনা । তীরে রয়ে গেলো ।

ওর স্বামী ম্যানুয়েল একাই গেলো সেবার অন্য লোকেদের নিয়ে ।

কেরালায় ব্যাক ওয়াটার্সের কাছে ওর ঘর । নারকেলের সারি ঘিরে রেখেছে ছোট্ট কুটির । কিছু কিছু নারকেল গাছ নুয়ে পড়েছে জলে । সামনে শুকনো নারকেল রাখা । ওরা তো সব রান্নাতেই নারকেল দেয় ।

- তোর মরদ ফিরলে আমরা খুব মস্তি করবো ।
- ঠিক আছে । হেসে বললো জঞ্জির ।
- তোর মরদ তোকে খুব ভালোবাসে না রে ?
- হ্যাঁ । আবার হাসি জঞ্জিরের মিষ্টি মুখে ।
- রাতে মিঠি মিঠি বাত করে ?
- করে তো ! হেসে লুটিয়ে পড়ে জঞ্জির ।
- পুরুষ মানুষ বশ ভালই শিখেছিস দেখছি । এই নিয়ে দুটো হল তো তোর । দেখিস কারো নজর না লেগে যায় তোদের ভালোবাসায় ।

এবার আর জঞ্জির হাসেনা । মিষ্টি মুখটা গোমড়া হয়ে যায় তার ।

ওর মরদ কিন্তু সত্যি আর ফেরে না । আর ওটাই এই গল্পের টার্নিং পয়েন্ট ।

ট্রলারে করে তারা চলে গিয়েছিলো বহু দূরে । শোনা যায় পাকিস্তানের বর্ডার ক্রস করে যায় জলপথে । ফলত পাকিস্তানের নৌসেনা ওদের ধরে । তারপরে ওদের দেশের কারাগারে বন্দী করে রেখে দেয় । বলে এরা ভারতীয় গুপ্তচর । চলে পাশবিক অত্যাচার । ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে খবর আসে এদিকে । ভেঙে পড়ে জঞ্জির । একদিন সে মৃত সন্তান প্রসব করে কিন্তু স্বামী আর ফেরে না । তার ঠিক কী হল কেউ জানেনা ।

এই পর্যন্ত বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো ।

মেখলার ভারী কন্ঠস্বর আমার কানে ভেসে আসে ।

- দেখ মানুষ তো সব জায়গাই একই তবুও আমরা কেন এত ভেদাভেদ করি বলতো ? হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ্য খ্রীশ্চান ! কে বড় কে ছোট ইত্যাদি ।
- নিজেদের অহং এর জন্য আর কেন ?
- কিন্তু আমরা যারা একটু এগিয়ে তারা কি পারিনা দূর্বলদের হাতটা ধরতে ।
- পারি কিন্তু আমরা তো দিনকে দিন আরো স্বার্থপর হয়ে উঠছি ।
- হ্যাঁ তাই তো । দেখ না এই যে সমাজে এত ভেজাল, ভেজাল ওষুধ এইসব হচ্ছে এতে কি যারা করছে তাদের পরবর্ত্তী প্রজন্ম এফেক্টেড হবেনা ? তবুও তারা করেই যাচ্ছে ।
- অত বুঝলে তো সমাজে কোনো অন্যায় হতই না তাই না সেটাও ভাবার আছে ।
- তাও ঠিক ।

সন্ধ্যে নেমে আসে । গাছের ফাঁকে হারিয়ে যাওয়া সূর্যের করুণ মুখটার সঙ্গে যেন জঞ্জিরের মুখের মিল পেলাম আমি ।

স্বামীহীনা জঞ্জির এরপরে এক লোকাল ডাক্তারের বাড়ি কাজ নেয় । ভদ্রমহিলা আদিবাসী । ডক্টর টির্কি নাম ওঁনার । অবিবাহিতা । প্রাথমিক হেলথ সেন্টারের ডাক্তার । একসময় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বসনিয়াতেও সার্ভ করেছেন ।

উনি জঞ্জিরকে খুবই স্নেহ করতেন । একসময় উনি অবসর নিয়ে মহীন্দ্রার ডাক্তার হিসেবে চলে আসেন মহীন্দ্রার ঐ পাহাড়ি রিসর্টে । সেখানে জঞ্জিরকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন । ওর চটপটে ভাব, আত্ম বিশ্বাস ও মধুর ব্যবহার দেখে ওকে নিযুক্ত করেন সিনিয়র ম্যানেজার কর্মী হিসেবে । ক্রমশই সে হয়ে ওঠে সকলের চোখে মণি ।

- উগ্রহানায় পাকিস্তান মদত দেয় বলে বাজারে যে গুজব রটে তা তর্কের বিষয় কিন্তু অনেক জেলের ঘর যে তছনছ হয়ে যায় সামান্য ভুলে তার প্রমাণ জঞ্জির । তবুও জঞ্জির লড়াই করে ফিরে এসেছে মেন স্ট্রিমে । ওর কপাল মন্দ আবার ভালোও । ডাক্তার টির্কির মতন মানুষের সংস্পর্শে সে আসতে পেরেছিল বলেই আজ হারিয়ে যায়নি ।

বলে ওঠে মেখলা । আমি প্রশ্ন করি,

- এইরকম শক্ত মনের একটি মেয়ের নাম জঞ্জির কে দিয়েছে বল তো ?
- মহীন্দ্রার কোনো ম্যানেজার । ডাক্তার টির্কি ওকে কি একটা নামে ডাকতো সেটা ও আর কাউকে বলেনা । জঞ্জিরই বলে। খাতায় কলমেও ঐ নাম ।

- ওকে সরকার থেকে কোনো সাহায্য দেয়নি ?
- শুনেছি দিতে চেয়েছিলো । ও নেয়নি । ওর বক্তব্য হল সরকার আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারলে নেবো । সরকার কেন এমন আইন কানুন করেন না যাতে আমাদের মতন মানুষের ভালো হয় ? আমরাই তো সরকার নির্বাচিত করি ।

আমার যা গেছে তার মূল্য টাকার হিসেবে কোনো মানুষ করতে পারবে না ।

অশিক্ষিত একটি পিছিয়ে পড়া মেয়ের মুখে এরকম অসম্ভব বোধের কথা শুনে মেখলা যারপরনাই আহ্লাদিত হয় । ও তো সাংবাদিক । বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ঘটে তবে এই মেয়েটি অসাধারণ ।

মেখলা ওকে নিয়ে স্টোরি করতে চেয়েছিলো । ও রাজি হয়নি । অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রত্যাখান করে । বলে - আমাকে নিয়ে গল্প লিখে কী হবে ? কত বড় বড় মানুষেরা রয়েছেন ওদের নিয়ে লেখো । সবাই এই মহীন্দ্রায় আসেন । কত রাজারাজড়ারা আসেন । মাইশোরের রাণী আমাকে কাজে খুশি হয়ে এই দুল জোড়া দিয়েছিলেন ।

এক জোড়া হীরের দুল দেখায় মেখলাকে ।

- তুই এটা নিলি যে বড় ? তুই যা অভিমানী !
- নিলাম । রাণীমা বড় ভালোবেসে দিলেন যে । খাঁটি ভালোবাসা কি ফেলা যায় । অত বড় মানুষের ভালোবাসা । আমাকে কত স্নেহ করেছেন । রাজাসাহেবও খুব ভালো ।

মেখলা একজোড়া সজীব, সরল আঁখি দেখতে পায় ওর ক্ষয়ে যাওয়া মুখের আড়ালে ।

পুরো উপাখ্যানে এক তেজী মেয়ের কথা জানলেও আমার জঞ্জির নামখানি ভালো লাগেনি । যেই এই নাম দিয়ে থাকুন তাঁর ওপরে আমার একটু বিরক্তিই লাগছিলো । এরকম উদার, মুক্তমনা মেয়ে যদি জঞ্জির হয় তাহলে খোলা আকাশ কে ?

আমার ভীষণই ইচ্ছে করছিলো এই মেয়েটির সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের পরিচয় করাতে আর তার নামটি পাল্টে উজ্জ্বল এক পায়রা করে দিতে ।

আর বলা হয়নি জঞ্জির একটি নারী সুরক্ষা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো । সেখানে ও ওরই মতন হতভাগিনীদের ভরসা দিতো । পথ দেখাবার কাজ করতো ।

ঐ সংগঠনটি একটি খ্রীশ্চান সংস্থা । নাম ফরেস্ট ফ্লাওয়ার ।

ওদের মঠের হেড - যিনি একজন নান ছিলেন তিনি যখন ৬৫ বছর বয়সে একদল পাষণ্ডের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে মারা গেলেন তখন শেষকৃত্য করেছিলো তাঁর কন্যাসমা জঞ্জির ওরফে উজ্জ্বল এক পায়রা ।

# দাবানল

শোলাঙ্কিপুরম ন্যাশনাল পার্কের কর্ণধার ঋতুরাজ ভাটিয়া । তিনি পরিচিত একজন কড়া ধাঁচের বনপালক রূপেই । তাঁর মতন রাফ অ্যান্ড টাফ মানুষ আছেন বলেই চোরাকারবারিরা এই বনকে রেহাই দিয়েছে নাহলে আর পাঁচটা বনের মতন এখান থেকেও গাছ কেটে পাচার করে দিতো আর জানোয়ারের দেহাংশ বিক্রি হয়ে যেতো বাইরে বহু টাকার বিনিময়ে । কিন্তু ভাটিয়া সাহেবের দৌলতে সেসব আপাতত কিছুই হচ্ছে না ।

ভাটিয়া সাহেব অকৃতদার । সারাটা দিন কাজেই মেতে থাকেন । দিনশেষে পাশের বাড়ি ( বাড়িটা একটু দূরে, ওটা জঙ্গলের এরিয়ার বাইরে ) থেকে আসেন টম সাহেব ।

টম সাহেব ছিলেন শিক্ষক । অবসর নিয়ে এই অঞ্চলে বাড়ি কিনে বসবাস করেন । মিসেস গত হয়েছেন । তাঁর সান্ধ্য আড্ডা কাটে ভাটিয়ার সাথে -বিস্কোটি, রেড ওয়াইন আর জ্ঞান দানে । প্রচুর পড়াশোনা করেছেন ও করেন উনি । দিনের বেশির ভাগটাই কাটে বই পড়ে । কত কি জানতে পারেন ভাটিয়া ওঁনার সঙ্গে কথা বলে । জঙ্গল সম্বন্ধেও প্রচুর জ্ঞান ওঁনার । কখনো কখনো মনে হয় ভাটিয়ার থেকে বেশিই জানেন ।

আরেকটু দূরে জঙ্গলের বাইরে আছেন পরমেশ্বর । পরমেশ্বর মিশ্র । সদ্য এসেছেন । পুরনো কাঠের বাড়ি কিনে রেনোভেট করে থাকেন । মাস দুয়েক হল । এখনও সবার সঙ্গে তেমন ভাব হয়নি । জাতে ওড়িয়া । উনিও বিদ্বান মানুষ । এক্স আই আই টিয়ান । কবিতা লেখেন আর বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু নিয়ে অধ্যপনা করেন । বেশ কিছুটা দূরে উনি একটা কলেজে পড়াতে যান । নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে যান আবার বিকেলে ফিরে আসেন । খুব ভদ্র ও মার্জিত মানুষ । ছুটি ছাটার দিনে ওঁনাকে বড় একটা দেখা যায়না । ঘরেই কাটান । হয়ত বই পড়ে কিংবা বাগান করে । উনি একটু আনসোসাল । তবে পথেঘাটে দেখা হলে সদাহাস্যময় । নম্র, বিনয়ী ।

একজন প্রকৃত পন্ডিত ব্যাক্তির যেমন হওয়া উচিৎ ঠিক সেইরকম ।

ভাটিয়ার তো নানা কাজ । সকালে ও বিকেলে দুবার জঙ্গলে রাউন্ড দিতে বার হয় । এছাড়াও অফিসিয়াল টুকিটাকি কাজ তো থাকেই । সম্প্রতি এই অরণ্য নিয়ে এক আই আই টি চেন্নাই-এর ছাত্র তার পি এইচ ডির থিসিস করছিলো তাকে ডেটা দেওয়া সাক্ষাৎকার দেওয়া এসব কাজেও সময় দিতে হয় । রবিবার সাফারির জন্য খোলা থাকে । তাই সেদিনও কাজ হয় । বন্ধ থাকে বৃহস্পতিবার । সেদিন সারাটা দিন ছুটি ।

সকাল থেকে উঠেই দৌ-উ-ড় নয় । আলস্য, স্রেফ বিছানায় শুয়ে চা, বিস্কোটি ।

খোদ ইতালি থেকে টমের বন্ধুর আনা বিস্কোটি ।

আর সেদিন যদি পূর্ণিমা থাকে তাহলে তো কথাই নেই !

সেইরাতে, রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে ---

হেড়ে গলায় গেয়ে ওঠেন বাথরুম সিঙ্গার ভাটিয়া ।

থই থই জোছনায় একাকী হেঁটে বেড়ান ভাটিয়া চেনা বনপথে, অচেনা মন নিয়ে ।কখন শোনা যায় দূরে টমের বাংলো থেকে বাঁশির সুর । অপূর্ব বাঁশি বাজান টম সাহেব । বেশির ভাগই বাজান আদিবাসী সুর । ভাটিয়াও কিছুদিন বাঁশি শিখেছিলেন এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে । ভারি মধুর লাগে তখন যখন টমের আদিবাসী সুর ধুয়ে দেয় বনপথ, অলস পূর্ণিমায় ।

তাঁর কি একা লাগে ? নিজেকে সঙ্গী বিহীন মনে হয় ?

নাহ্, বিয়ে করেন নি বলে কোনো খেদ নেই তাঁর !

ভালোবেসেছিলেন এক ভারতীয় মা ও পর্তুগিজ বাবার মেয়েকে --কলেজে, যা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় নি । তারপরে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন ঘন জঙ্গলে । মেয়েটির খবর আর জানেন না । কখনো কোনো নস্টালজিক মূহুর্তে ছেঁড়া ডাইরির পাতা বার করে দেখেন পুরনো লেখাগুলি । দেখেন তার ছবি । ব্যস্ আবার ডুবে যেতে হয় কঠিন বাস্তবে । জঙ্গল, গাছ, পশু, পক্ষী, বুনোফুল, মেঠোমানুষ, বনজ মানুষ এই তো তার দৈনন্দিন জীবন এখন !

সেখানে এক শহুরে বিদেশিনী বড়ই বেমানান ।

পরমেশ্বর মিশ্র আনসোসাল । অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড । অধ্যাপক মানুষ কিনা !

তবে রুচিবান । ওঁনার বাড়ি গেছেন ভাটিয়া কয়েকবার । বেশ পরিপাটি ও সুন্দর ।

জঙ্গলের শেষ দিকে ওঁনার গৃহ । কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ।

স্থানীয় যুবক হৃৎ সিং ওঁনার সঙ্গী । সেই রাঁধে বাড়ে ।

ভাটিয়ার বেশ লাগে ওঁনাকে । কম কথার মানুষ কিন্তু যা বলেন তা খাঁটি কথা ।

উনি বলেন : আজকাল সবাই সব ব্যাপারে অপিনিয়ন দিতে পারেন কমিউনিকেশনের উন্নতির জন্য । এর যেমন ভালো দিক আছে সেরকম খারাপ দিকও আছে । কিছু ফালতু লোক নিজেদের মতামতকে সর্ব সমক্ষে পৌঁছে দিতে গিয়ে বিশ্রী কান্ড করে বসেন । ভয়েস থাকা ভালো কিন্তু দেখতে হবে সেটা ভয়েস নাকি সারমেয়র চীৎকার । তাই আমি এই নির্জনে একা জীবন কাটাই । অত কথা আমার ভালোলাগেনা ।

চুপ করে শোনেন ভাটিয়া । কখনো কখনো নানান বিষয়ের আদান প্রদান হয় ওঁনার সঙ্গে । একবার দোলপূর্ণিমায় প্রায় সারা রাত ওরা গল্পগুজব করে কাটান । কত গল্প করেন দুজনে । চারপাশে জ্যোৎস্না থই থই আর পরমেশ্বর এর মুখে কথার খই । ফরেস্ট অফিসারের সাগরেদ রেঁধেছিলো বুনো বিরিয়ানি আর কাবাব । কাবাব কাঠের বড় উনুনে করা হয়েছিলো । কায়দা করে । আর বিরিয়ানি বুনো কারণ ওতে মাংস, ডিম, আলু, সবজি সমস্ত দেওয়া হয়েছিলো আর সামান্য কেওড়ার জল ও ঘি । সমস্ত মশলা পড়েনি যা বিরিয়ানির মশলা তাই বুনো কিন্তু খেতে ভালো । খুব ভালো । তাইতো বললেন পরমেশ্বর ।

একটা হাতি কিছুদিন যাবৎ খুব বিরক্ত করছিলো আশেপাশের গ্রামের মানুষদের । তছনছ করে দিচ্ছিলো ক্ষেত খামার । বিরক্ত হয়ে গ্রামাবাসীরা ওর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় । হাতিটি পুড়ে যায় । যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে ।

ঈশ্বরের করুণা কি একেই বলে ? হঠাৎ আকাশ জুড়ে ঝমঝমাঝম ।

ওর আগুন নিভে যায় । সেই পোড়া হাতিকে নিয়ে যখন ভাটিয়া ব্যস্ত হাসপাতাল ও হস্তী বিশারদদের -অ্যানিমল রাইট অ্যাক্টিভিস্টদের জবাব দিহি করতে তখন পরমেশ্বর ওঁনাকে মেন্টাল সাপোর্ট দেন । রোজ সন্ধ্যায় এসে কথা বলে যেতেন । তাতে ভাটিয়ার হাল্কা বোধ হত । টেনশনের সময় চেনা পরিচিতর সাথে কথা বললেও ভালো লাগে । এইটা হল প্রফেসরের চরিত্রের সেন্সিটিভ দিক ।

ভাটিয়ার সকাল সন্ধ্যে কাটে অরণ্যে । কখনো জানোয়ারদের মাঝে কখনো বা আপন গৃহে । আশে পাশে আছে বেশ কিছু জনবসতি । সেখানে থাকে আদিবাসীরা ।

তাদের পরণে মোটা আধময়লা কাপড় আর মাথার চুল উসকো খুসকো ।

তারা আশেপাশে কাজ করে । একটু দূরে আছে একটি কাগজের কল । সেখানে ওরা কাজ কম্মো করে পেট চালায় । কিছু ধানক্ষেত আছে সেখানে কেউ কেউ চাষ করে । কেউ সবজি ফলায়, ফল মূলের চাষ করে ।

আবার কেউ কেউ তাদের মাটির ঘর ভাড়া দেয় । ইকো টুরিজম ।

শহরের বাবুরা সুন্দরী অর্ধ নগ্ন ললনা বেষ্টিত হয়ে সেখানে রাত কাটায় । বদলে মোটা কড়ি দেয় ! ব্যস্ ! আর কী চাই ? দরিদ্র আদিবাসীরা কড়ি পেলেই খুশি ।

তারপর শহরে তাদের ছবি যায় ।

--এই দেখো কেমন ট্রাইবাল ভিলেজে রাত কাটিয়েছি । এই দেখো বনবালার উন্মুক্ত বক্ষের শোভা । আর এই দেখো, দেখো, একটু ঝুঁকে ভালো করে দেখোনা বাপু --এটা একটা হরিণ ! আহা হা ! ছাগশিশু নয় । হরিণ ! জলজ্যান্ত হরিণ ! একে আমরা কেটে রাতে ভোজ করেছিলাম ।

দলছুট হরিণকে ধরে এনেছিলো ওরা । আমরা মোটা টাকা আর বিলিতি মদের লোভ দেখিয়ে ওদের কাছে থেকে কিনে নিয়েছি ।

তবে গেঁয়োভূত বটে ওগুলো ! আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলো হাঁ করে । আমরা কোল্ড কফি খাচ্ছিলাম । ওদের ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম - খাবি ?

৩২ পাটি বার করে বল্লো - দাও ।

তা দিলাম । খেলো । পরে জিজ্ঞেস করলাম - ওরে কেমন খেলি রে ?

মুখ ভেঁচকে বলে উঠলো-ভালই কিন্তু কপিটা আজকে একদম জুড়িয়ে গেছে গো বাবু !

রাতের বেলায় মাটির ঘর ভেদ করে ভেসে আসে শহুরে বাবু বিবিদের নির্লজ্জ শৃঙ্গারের শব্দ ।

- সেক্স করার সময় একটা কিছু খাবি তাহলে শব্দ হবেনা ।

শহুরে এক বাবু পরামর্শ দেয় অন্যকে ।

- বলা কি যায় ? এরা শত হলেও জংলী । কখন তীর ধনুক নিয়ে হানা দেয় কে জানে !!

নাহ্ ! ওরা জংলী হলেও তীর ধনুক ব্যবহার করেনা । ওরা শান্তিপ্রিয় আদিবাসী ।

শহরের মানুষ বৃথাই ডরায় ।

এই শান্তিপ্রিয় আদিবাসীদের ঘরেই হঠাৎ ভীষণ গন্ডগোল । ইদানিং তাদের ছেলেপুলেরা হারিয়ে যাচ্ছে । এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের কচি কচি নিষ্পাপ সন্তানেরা । অনেকে মনে করছে শহরের কারো কান্ড । আজকাল তো কিডনি পাচার চক্র ইত্যাদি কত কী হয়েছে । হয়ত ধরে নিয়ে গিয়ে সুদূর আরবে চালান করে দিচ্ছে । কে জানে ?

ভাটিয়ার কানেও সংবাদ পৌঁছেছে । সেও ব্যস্ত, ত্রস্ত । সে যতটা অরণ্যকে চেনে তাতে এখানে এই ধরণের ক্রাইম হওয়া অস্বাভাবিক । মোটামুটি শান্তিপ্রিয় এই এলাকা, আদিবাসীদের মতনই । এখানে তো পোচাররাও নেই । তবে ?

কাদের কীর্তি ? আর অদ্ভুত ব্যাপার হল যখন ইকো টুরিস্টরা আসেন তারপরে পরেই হারিয়ে যায় এক একটি শিশু কিংবা কিশোর ।

আজকাল এই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রামটিতে যেন এক অশুভ কালো ছায়া পড়েছে । তবে মোটামুটি লোকে ধরেই নিয়েছে এ শহরের বাবুদের কান্ড।

কিছু প্রমাণও মিলেছে । একটি কিশোরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো ওরা । সে অর্ধেক পথ গিয়ে পালিয়ে এসেছে । শহরে ভালো কাজ আছে, সেখানে গেলে আরামে থাকবে ইত্যাদি বুলি দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো ।সে কীভাবে যেন পালিয়ে এসেছে ।

এরপর থেকে সাবধান হয়ে গেছে বুনোরা । ওরা আর চাইছে না ইকো টুরিস্টরা আসুন। এদিকে ইকো টুরিজম করা কোম্পানি পড়েছে বিপদে কারণ রাতারাতি তো কটেজ নির্মাণ করা সম্ভব নয় অথচ এখন সিজন, টুরিস্টের ঢল নামবে জঙ্গলে ।

চাঁদনী রাতে চিতা জল খেতে আসে প্রাকৃতিক ঝোরায় । সেখানে যাবার জন্যে রাতটা কাটাতে হয় এক আদিবাসীর ঘরেই । সেটাই নিকটতম ।

অনেকে বলে বিশেষ করে বুনোরা যে রাতে ভূত চিতা জল খেতে আসে আর সে আক্রমণ করলে মানুষও চিতা হয়ে যায় । তবে ওসব গল্পকথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই । বনজোছনায় সবুজ অন্ধকারে কোনো এক রূপসীর কথাও শোনা যায় । সে নাকি জঙ্গলে ঘুরে বেরায় । তার মুখ সাদা ওড়নায় ঢাকা ।

ভাটিয়াও প্রথমে এসে এইসব গল্প অনেক শুনেছে কিন্তু কোনোদিন কিছু দেখেনি ।

ইকো টুরিস্টরা আসেন শহর থেকে । অনেকে আসেন বিদেশ থেকে । তাদের আবার ঘোস্ট হান্টিং এর অভিজ্ঞতা থাকায় এই রূপসীর গল্প বেশ উপভোগ করেন । তারা রূপসীকে ছুঁতে চান ।

আর চিতা বাঘের গল্পকে ওদের গল্পর সঙ্গে তুলনা করেন, Werewolves এর গল্প---

কাজেই এরকম সব ইকো টুরিস্টরা দল বেঁধে আসছেন এই সময় আদিবাসীদের এই বেয়াড়াপনা বরদাস্ত করা মুশকিল । তবে ওরা বেচারারাই বা কী করে ?

ওদেরও যে বংশের বাতিরা হারিয়ে যাচ্ছে ।

কেউ যেন বললোও : সেই ভূতনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে না তো ?

কিন্তু নাহ্ । অনেক বাচ্চাই দিনের বেলা থেকে নিঁখোজ ।

ইদানিং এখানে বৃষ্টিও বেশ কম । খরা চলেছে কিছুটা যেন । গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের তাপে চারপাশ জ্বলছে । সঙ্গে আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ঝামেলা ।

এত গরম আজকাল পড়ে যে বলার নয় । গাছপালাগুলো এক একটা যজ্ঞের কাঠের মতন । শুধু অগ্নি সংযোগের অপেক্ষায় রয়েছে । কাজেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে । টমের কাছে শুনেছে ভাটিয়া যে কোন এক বিজ্ঞানী Dr Klaus Lackner একটি গাছের নকল version আবিস্কার করতে চলেছেন যাতে করে সেই গাছ পুঁতে দিলে বাতাস শুদ্ধ হবে । কার্বন ডে অক্সাইড অ্যাবসর্ভ করে নেবে সেই নকল গোলপোস্টের আকারের পত্রবিহীন গাছ । তবে সেই গাছ এখনো থিওরিতেই আছে । বাস্তবে পদার্পণ করেনি । বাস্তবে এলে তা নাকি অরিজিন্যাল গাছের চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেবে । প্রকৃতি ঠান্ডা হবে । জগৎ জুড়ে কত কিছুই না হচ্ছে, পজিটিভ এবং নেগেটিভ যা আগে কল্পনাও করা যেতো না ।

এক মনে বসে ভাবছিলেন ভাটিয়া । সিগারেট খাওয়া ছেড়েছেন বহুদিন । ছুটির দিন বিকেলে বাংলোর বারান্দায় বসে আম পোড়ার সরবৎ নিয়ে নানান কথা ভাবছিলেন ।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো বাইকু । বাইকু এখানে কাজ করে । ফরেস্ট অফিসের বেয়ারার ।

– সাব সাব !! বাইকুর উত্তেজিত গাল শোনা গেলো ।

ওর উত্তেজিত চেহারা দেখে অঘটন আঁচ করে ভাটিয়া প্রায় এক লাফে উঠে সিঁড়ির দিকে নেমে গেলেন । কাঠের সিঁড়ি । ঈষৎ নড়বড়ে । নামার সময় যেন একটু বেশি দুলে উঠলো ।

এমন সময় বাইকু প্রায় কাছে পৌঁছে হাত পা নেড়ে বোঝাতে লাগলো যে বনে দাবানল লেগেছে । সেই আগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কত গাছপালা । পশুরা উদভ্রান্তের মতন পালাচ্ছে । চারদিকে পোড়া গন্ধে এক বিভীষিকার ছায়া পড়েছে । পালাচ্ছে আদিবাসীরাও । তাদেরও অনেকের ভিটে মাটি গেছে । আগুন ক্রমে এগিয়ে আসছে । দাউ দাউ করে জ্বলছে শুস্ক বনানী ।

কোনো মানুষের জ্বালানো আগুনে এই অগ্নিকান্ড ঘটলো নাকি এ প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন দাবানল তা কেউ এখনো জানেনা । অনেক বেয়াদপ টুরিস্ট তো আসেই । তারা হরিণকে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, ঢিল মারে অকারণে । একবার একজন একটি হরিণের পা ভেঙে দিয়েছিলো ।

একটি ছেলে সাফারির বাস থেকে নেমে রমণ রত দুই সিংহের ছবি তুলতে গিয়েছিলো । হেল্পার বাধা দেওয়াতে বিরত হয় । প্রায় পশুরাজের মুখে পড়ছিলো আর কি ! এইসমস্ত বেয়াড়া টুরিস্টের কেউ হয়ত অগ্নি সংযোগ করে পালিয়েছে । কে জানে ?

ভাটিয়া এখন রাস্তায় । দাউ দাউ করে জ্বলছে বনের একপাশ । ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক । লোকজন অসহায়ের মতন ছুটছে ।

তবে রক্ষে যে এই আগুন আর বেশি দূর এগোতে পারবে না । কারণ জঙ্গলের মাঝে আছে বিশাল নদী, কৈকেয়ী নদী । মোটামুটি চওড়া ও বালুকা বেলা সমৃদ্ধ ।

সেখানে কাঠের সেতুটি পুড়লেও জলে তো আগুন লাগবে না । আর সেতুর আগুন জল দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যাবে । অতএব সেদিক দিয়ে ভরসা যে এইপাশটা বেঁচে যাবে । অক্ষত থাকবে । পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে অন্যদিকটা ।

বিহ্বল ভাটিয়া মোবাইলে একের পর এক কল করে যাচ্ছেন । সবাই উদভ্রান্ত । সবাই হতাশ । শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে আকাশে দিকে যেখানে বাজির টুকরো মতন উড়ে উড়ে আসছে জ্বলন্ত অগ্নি কণা ও কাঠের টুকরো । মানুষ বড় অসহায় প্রকৃতির রোষের কাছে, প্রকৃতির খামখেয়ালিপণার কাছে । এক নিমেষেই পুড়ে গেলো কত গাছ, কত প্রাণ, প্রাণী ।

একেই তো আদিবাসী বাচ্চারা হারিয়ে যাচ্ছিলো এক এক করে এবারে চিরতরে চলে গেলো তাদের মায়েরাও, বাবা- কাকারাও ।

ভাটিয়া কী বলবে কি করবে বুঝতে পারছিলেন না, ঘটনার আকস্মিকতায় । চোখ বেয়ে জল পড়ছিলো যেন । রাফ অ্যান্ড টাফ কিন্তু এই মূহুর্তে অসহায় ফরেস্টারের চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা ।

সব দূর্ঘটনা কিংবা ঘটনা একটা সময় স্তব্ধ হয়ে যায় সময়ের হাত ধরে ।

কথায় বলে সব দু:খ, যন্ত্রণায় মলম লাগায় সময় । টাইম ইজ দা বেস্ট হিলার ।

কাজেই দাবানলও এক সময় খবর থেকে ইতিহাস হয়ে গেলো ।

জঙ্গলের অনেকটা পুড়ে গেলেও আরো অনেকটাই বাকি আছে, সবুজ সতেজ আছে । সেখানেই অনেকে নতুন করে ডেরা বেঁধেছে ।

শুধু একজন ছাড়া । প্রফেসর পরমেশ্বর মিশ্র ।

বিদগ্ধ, নম্র, পন্ডিত এই অধ্যাপক দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে গেছেন পশুদের মতন, কিছু কিছু আদিবাসীদের মতন । কাজেই সবাই খুবই দু:খিত, অনেকে শোক সভা করার দাবী করেছেন ভাটিয়ার কাছে ।

কিন্তু আগুন লাগলো কী করে? তার তদন্ত চলছে ।

কাউকে এখনো গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ, সন্দেহ ভাজনের তালিকায় কিছু ইয়ং টুরিস্ট আছে । হয়ত তারা খেলাচ্ছলে সিগারেট ফেলে কিংবা অগ্নি সংযোগ করে চলে গিয়েছিলো । সেই আগুন দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়েছে শুষ্ক অরণ্যে ।

কানাঘুষো চলছে । এখনও কোনো সিদ্ধান্তে কেউ আসেন নি ।।

প্রফেসর ও তাঁর ম্যান ফ্রাইডের ভস্মীভুত লাশ পাওয়া গিয়েছিলো আগে। কিছুদিন পরে পুলিশ নতুন করে তদন্তের সময় ওঁনার পুড়ে যাওয়া কাঠের বাড়ির ব্যাক ইয়ার্ড থেকে একটি গর্তর মধ্যে যা অনেকটা মাটির তলার গুহা মতন সেখান থেকে অজস্র বাচ্চার কঙ্কাল, অর্ধ ভুক্ত দেহাংশ আর হাড়গোড় আবিস্কার করেছে । সন্দেহ জনক কিছু দেখেই গর্তর কাছে পৌঁছান ওরা । প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ এরা সেইসব আদিবাসী বাচ্চারা যারা হারিয়ে যাচ্ছিলো।

খবরটা শোনার পড়ে থপ্ করে বসে পড়েছিলেন ফরেস্টার ভাটিয়া ।

কখন পেছনে এসে টমসাহেব দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করেননি । সম্বিৎ ফিরলো ওঁনার গলার আওয়াজে : ক্যানিবালিজম্ !!

বহু বুনো উপজাতি গোষ্ঠী ক্যানিবালিজম প্র্যাকটিস করলেও সভ্য মানুষের মধ্যে এই জিনিস এই প্রথম দেখলেন টম । শুনেছিলেন খাদ্যের অভাবে কিংবা ধর্মীয় কারণে অনেকে মানুষখেকো হন আর আরেকদল হন নিছক মানসিক রোগের কারণে । প্রফেসর পরমেশ্বর

মিশ্র যে শেষোক্ত দলের তা বলাই বাহুল্য । বনে এসে যেন ভদ্র মানুষ সত্যি বন্য হয়ে গেছেন । টম বিস্মিত তার চেয়েও বেশি আহত । আশ্চর্য মনুষ্য চরিত্র । আর আড়ালে প্রকৃতি নীরবে তার কাজ করে যাচ্ছে । প্রফেসরের আকস্মিক এই মৃত্যুতে তাঁরা যেমন বিচলিত হয়েছিলেন আজ যেন নিজেদের অজান্তেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন । নিশ্চিন্ত হলেন দাবানলের তান্ডবে ।

ভটিয়ার পরিচিত, নম্র, ভদ্র বন্ধুটি কবে যে মানুষ খেকো হয়ে উঠেছিলেন তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তাঁর মতন জাঁদরেল বনপালক যার ভয়ে পোচারেরা শত হস্ত দূরে থাকে শোলাঙ্কিপুরম বন থেকে ।

কি করে বাচ্চাদের ম্যানেজ করতেন প্রফেসর সেই রহস্য আর উদ্‌ঘাটিত হবে না । কারণ সেই রহস্যর কিনারা যারা করতে পারে সেই পরমেশ্বর ও তাঁর ম্যান ফ্রাইডে কেউই বাঁচে নি দাবানলের রোষ থেকে ।

# ঘাস ফুল

নোবেল জয়ী লেখিকা ডরিস লেসিংয়ের রচনা *দা গ্রাস ইজ সিঙ্গিং* এর সঙ্গে এই গল্পের কোন মিল না থাকলেও এই গানও ঘাসেরই গান।

দিনান্তে কর্পোরেট গৃহিণী কাজলী সিন্‌হা তার বিশাল অডির গাড়িতে চেপে বেড়াতে যায় শহরের একপ্রান্তে ডিফেন্স কলোনিতে। বড় বড় গাছ আকাশের সঙ্গে কথা বলছে। চওড়া রাস্তা, সবুজ ঝরা পাতায় মোড়া মোলায়েম পথ। স্থানীয় মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের কেনাকাটা ও গল্পগুজব তার চেনা কর্পোরেট জগত থেকে অনেকটাই আলাদা। কত অল্পেই এরা খুশি হয় কিংবা হতে পারে। দোকানির সঙ্গে দরকষাকষি করে জিনিস কিনছে, শালাপাতার প্লেটে গরম সবুজ মটরের ঘুগনি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, লঙ্কার চপ খাচ্ছে, কেউ কেউ নরম ঘাসের ওপরে বসে সময় কাটাচ্ছেন, কেউ বা বাচ্চাদের খেলাচ্ছেন।

কাজলী ওর দুনিয়াটার সঙ্গে তুলনা করে। সেখানে এত মেকিপণা যে মাঝে মাঝে ও হাঁপিয়ে ওঠে। ওরা এসব কল্পনাই করতে পারেনা। ওরা ইম্পোর্টেড সোফা ছাড়া বসার কথা ভাবতেই পারেনা। দামী প্লেট ছেড়ে শালপাতার প্লেটে খাবার কথাও ভাবতে পারেনা। আর পথের ধারের ঘুগনি ? ইমপসিবেল ! মারা পড়বে যে !

ওদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সেক্স। নিজের অথবা পরস্ত্রীর সঙ্গে।

ওরা মোটা হয়ে গেলে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে বলে শাসায়।

উল্টোদিকে স্ত্রীরা স্বামীর অবর্তমানে তাঁর কলিগের সঙ্গে বিছানায় যায়।

ওকে অনেকেই বলে : কি এত দূরে গাড়ির তেল পুড়িয়ে ঘুরতে যাও ? মিডিল ক্লাসদের আখড়া একটা। বেশি ওখানে গেলে নিজেও ওরকম হয়ে যাবে।

ওটা একটা লাইফ হল ?

কাজলীর কিন্তু ভালোলাগে। একটু খোলা বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে। ওর কাছে মানুষের পরিচয় মনুষ্যত্বে। কে মিডিল ক্লাস আর কে বড়লোক ও এইভাবে ভাবেনা।

একটা বড় দেবদারু গাছের নিচে একটি চায়ের স্টল। সেখানে ধাবাই চায়ে অর্থাৎ পাঞ্জাবী স্টাইলের চা পাওয়া যায়। কাজলীকে অত বড় গাড়িটা থেকে রোজ নামতে দেখে ওকে চায়ের দোকানী বেশ সমীহ করে। কাছে গেলেই বসার জায়গা দেয়: বসুন মেমসাব বসুন, এই তুই একটু সর, জ্যাকি হাট হাট উধার যাকে বইঠ, হুস-হুস - হুস কাউয়া কাহিকা !

দোকানীর এই আতিথ্য বেশ উপভোগ করে কাজলী। কি আর খায় সামান্য চা আর সঙ্গে ওদের হোম মেড সিঙারা। কলকাতার বাইরে একমাত্র কে সি দাসের সিঙারা ব্যাতীত এই একটা জায়গার সিঙারা ওর ভালো লাগে। অন্য গুলো খুব খারাপ, কোন স্বাদ নেই। কোথাও কোথাও মশলার পিন্ডি তো কোথাও সেদ্ধ আলুর পিন্ডি। এখানে বেশ সুন্দর

করে বানায় আর যত্ন করে। বেশ পরিস্কারও। আর একটা বস্তু মেলে, সেটি হল লোকাল পিৎজা। পাউরুটির ওপরে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ ও লঙ্কা কুচি দিয়ে তেলে নাড়া একটা শুকনো সবজি ছড়ানো, সামান্য মাখন দিয়ে আটকানো। বেশ ভালো খেতে। ওর বন্ধুরা

বলেঃ এইসব দোকানে খাস না ফুড পয়জন হয়ে যাবে । হাসলে গজ দাঁত বেরিয়ে ওকে ভীষণ মিষ্টি দেখায় । ও মিষ্টি হেসে বলে : ইমিউনিটি বাড়া । আকাশে, বাতাসে এত বিষণ, শুধু দোকান পাল্টে বাঁচতে পারবি না ।

কেউ বোঝে কেউ বোঝেনা । কেউ টিটকারি দেয় । অবশ্যই ভদ্রভাবে । তারপর বলে দেয় ধুস্ আমি তো মজা করছিলাম ।

আজকাল ও লোকের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে কে মনরাখা কথা বলছে ।

যখন দেখে মেকি কথা বলছে ও মগজের সুইচ অফ করে দেয় ।

ওরা অন্যমনস্ক দেখলে ভাবে ভাবুক তাই অন্য কিছু ভাবছিল । দু একটা ইংরেজি গালি দেয় । আড়ালে বলে : দুনিয়ার যত ছোটলোকের সঙ্গে কাজলীর ভাব । কি করে তুই অনায়াসে ঐ ভিখারির মাথায় হাতটা দিলি ? তোর কি উকুনের ভয়ও নেই ।

কাজলী হেসে বলে : আমার মাথায় তো চুলই নেই, বয়কাট, উকুন হবে কি করে ?

আর সুক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে উকুনও তো সেই মহাজাগতিক চেতনার ক্ষুদ্র সংস্করণ ।

জুলজিস্টরা ওদের নিয়ে কাজ করেন কিনা ? কৈ ওদের তো ঘেন্না করেনা !

আর্মানি, নাইকে, Christian Dior ব্যবহারকারি ভদ্রমহিলারা মুখে বলেঃ তুই খুব সংবেদনশীল - আড়ালে বলে ও একটা আঁতেল ।

এই অঞ্চলে রাস্তাঘাট সাফাই রাখার দায়িত্ব ডিফেন্সের তরফে । তাই দুবেলা রাস্তা ঝাঁট পড়ে । একদল মহিলা রঙীন পোশাকে ঝুড়ি নিয়ে ঝাঁটা নিয়ে লেগে পড়ে কাজে ।

নাকে ইয়া বড় নাকছাবি, কানে ঝুমকো, কারো কারো কানে একের বেশি দুল, কান প্রায় কেটে বেরিয়ে আসছে । গলায় বড় রূপা কিংবা সস্তার মেটালের হার । পায়ে নুপূর, পায়ের আঙট । এই বোধহয় ওদের সাজের জায়গা । তাই প্রাণভরে সেজে এসেছে । এই জায়গাই ওদের সব গহনা প্রদর্শনের শো কেস ।

কাজলী নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে । কোনই গয়না নেই ওর । কানে মুক্তো পরতো সেটাও খুলে রেখেছে । স্বামী চান ও লোহা পডুক তাই ওটা বাঁ হাতে আছে ।

স্বামীকে ও বলেছিলো : নারীবাদীরা তো বলে ওটা শৃংখল । তোমার মনে হয়না ?

তুমি আমাকে বন্দিনী করতে চাও নাকি বিয়ং আ মর্ডান এজ সি টি ও ( চিফ টেকনিক্যাল অফিসার ) অফ আ ট্রুলি মাল্টিন্যাশেনাল কোম্পানি ?

ওর স্বামী প্রদোষ হাসে । হেসে বলে : তোমরা মেয়েরা সবাই যদি পুরুষদের ওপরে ক্ষেপে থাকো তাহলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মগুলো তো বদলাতে হয় ।

ওটাকে শৃংখল না ভেবে যদি আমার পরশ ভাবা যায় যে আমি আছি বলেই ওটা তুমি পরে আছো । আমি সবসময় তোমাকে ছুঁয়ে আছি ----

বেশ লাগে কাজলীর, আসলে ও আদ্যপ্রান্ত রোমান্টিক এক নারী । তাই নারীবাদীদের পুরুষ খেদিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাহায্যে প্রজেনি বাড়াও এই থিওরিতে ও একবারেই

বিশ্বাসী নয় । ওর নরম তুলতুলে সত্তাকে ও কঠিন পৌরুষ্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলতেই বেশি ভালোবাসে । ভালোবাসে নির্ভর করতে, প্রেম নির্ভর, দাসত্ব কখনই নয় ।

ওর মর্ডান বান্ধবীদের সঙ্গে এই নিয়ে তর্কও হয় । অনেকে ওকে পুরুষের স্লেভ আখ্যাও দিয়েছে । ও কিছুতেই বোঝাতে পারেনা যে এই দুনিয়াই কেউ কারো স্লেভ নয় কিন্তু সকলেই কোন না কোনভাবে অন্যের ওপরে নির্ভরশীল ।

সে পুরুষ নারীর ওপর আবার নারী পুরুষের ওপরও হতে পারে !

এককাপ চা খেয়েও আজ শরীরটা গরম হলনা । আজ একটু শীতল আমেজ বাতাসে ।

তবে রোদের মিঠে পরশও আছে । ও আরেকখানা চা অর্ডার দিলো । দোকানী বালরাজ হেসে বললো : যতখুশি চা খান ম্যাডাম এতো আপনারই দুকান ।

কাজলী পাল্টা হাসি দেয় । পাশে একটি লোক ডাব নিয়ে বসেছে আজ কদিন ধরে দেখছে । ভীষণ দু:স্থ, চেহারা দেখলেই বোঝা যায় । শার্টের নিচের দিকের একটা অংশ প্রায় নেই । ময়লা ধুতি গোছের কিছু জড়ানো । কালো কুচকুচে বরণ । ক্ষীণ ও অশক্ত দেহ কিন্তুর চিতার মতন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একের পর এক ডাব কেটে চলেছে ।

কাজলী খেতে চাইলে ওকে বিনাপয়সাই দিয়ে দিচ্ছিল ।

- জী আপ রোজ রোজ ইহা বইঠতে হ্যায় - হে হে !

- - তো কেয়া হুয়া ?

- উস দিন আপনে মেরা চায়ে কা পয়সা দে দিয়া । ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বাক্যালাপ চলে ।

সেদিন দিয়ে দিয়েছিল বটে । মানুষটাকে রোজ দেখে । ওর মায়া হয় । তাই দিয়েছিল কিন্তু তার পরিবর্তে ও যে আজন্মর জন্য ওকে ফ্রি খরিদ্দার করে নেবে

ও ভাবতেও পারছে না । অথচ ওর বন্ধু মহলে, যারা অনেক টাকার মালিক, টাকা রাখার জায়গা নেই, সপ্তাহান্তে বাজার করতে সিঙ্গাপুর যায়, মালেশিয়া যায় তারা ওর ট্রাইবাল আর্টের ওপর লেখা বই ফ্রীতে পড়তে চায় ও একটি গরীব শিল্পীদের জন্য বুটিক চালায় জেনেও এক পয়সাও উপুর হস্ত করেনা । অথচ এক্সিবিশন দেখে মজা নেবার বেলায় কোন খামতি নেই । এটা হচ্ছেনা কেন সেটা করা যায় এইসব মতামত জ্ঞাপন করার বেলায় কখনো পিছপা হননা তারা ।

কত দরিদ্র অথচ দক্ষ শিল্পী আছেন দেশে । ওর সংস্থা তাঁদেরই সাহায্য করে ।

ও তো দেখেছে এক বেশ নামডাক ওয়ালা শিল্পী মানুষের চেহারা ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে ট্রেস করে পোর্ট্রেট বানিয়ে অনেক টাকা কামাচ্ছেন । এই শিল্পী কেবল ফটো দেখে আঁকেন । কেউ লাইভ পোর্ট্রেট বানাতে এলে তাঁর একটি ফটো তুলে নেন । বলেন ফটো দেখে আঁকবেন । তারপর জচ্চুরি । আর্ট বাজারেও বেশ নাম করেছেন ।

অথচ ওর পরিচিত দরিদ্র শিল্পীরা অনেক বেশি ট্যালেন্টেড । শুধু ওঁরা একটা হাত ধরতে চায় ।

মানুষের মনটাই আসল । বাইরের চকমকে পোশাক কিংবা দেহবল্লরীর অন্তরালে আত্মাটাই মানুষের পরিচয় । এই সিদ্ধান্তে সে উপনীত ডাবওয়ালা, চা ওয়ালাদের দেখে । অনেকেই বলেন : পয়সার হিসেব সবাই করে, সবারই পয়সার দরকার ।

কিন্তু ওর মনে হয় : এই দরিদ্র ডাবওয়ালার পয়সার দরকার নেই ? আর চা ওয়ালার ? এদের চেয়েও পয়সার দরকার অন্যদের বেশি ? যারা টাকা সমুদ্রে অবগাহন করে ক্রমাগত ভেসে বেড়াচ্ছে ? ও দেখেছে যে যত ধনী সে যেন তত কিপটে । এক পয়সা না খসিয়ে কি করে ষোলোআনা উশুল করতে হয় তার জন্য যেন সদাব্যস্ত । বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বিদেশের গল্প না করে কোথায় কত পয়সা বাঁচিয়েছে, কোথায় কত টাকা ফাঁকি দিয়েছে সেইসব গল্প বড় গলা করে করতে থাকে ।

একবার ও মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিল : তোমাদের লজ্জা করেনা ? তোমরা নিয়ম মানো না কেন ? যদি নাই মানবে তাহলে নিয়ম হয়েছে কেন ? কোন নিয়ম না মেনে মেনে দেশের তো আজ এই হাল করেছো । আমরা উচ্চ উপার্জনকারীরা যে এই এত আয়কর দিই তা কোথায়- গরীবেরা যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে । একটা শ্রেণির হাতে অঢেল পয়সা । দু নম্বরী কালো টাকা । ফাইভ স্টারে খেতে গিয়ে টয়লেট থেকে পাঞ্জাবি তুলে পায়জামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বেরোচ্ছে এই তাদের রুচি ও শালীনতার ছিরি । কাজেই রাতারাতি এত টাকা কিভাবে হচ্ছে সেই প্রশ্ন না করাই ভালো ।

আরেকজনকে বলে --দেশের জন্যে তো কেউ কিছু করেনা ? আর এই হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্য । অথচ ভোটের সময় তো এদের দুয়ারে এসে নাকে খত দিতে লজ্জা করেনা তোমাদেরই কারো কারো ।

আসলে যাকে বলছিল কাজলী তাঁর রাজনৈতিক একটা দিক আছে । অম্বরীশ নাম তাঁর । তিনি এম পির জন্য ইলেকশন লড়েছিলেন জনতা পার্টির টিকিটে । হেরে গেছেন ।

ট্রাইবাল আর্টের বই লেখার সময় এঁনার সাহায্য নিয়ে ওঁকে যেতে হয়েছিল কিছু দূর্গম স্থানে, যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে সক্ষম নন । সেই থেকে পরিচয় । রাজনীতির শীলমোহর থাকলে এদেশে সবই সম্ভব ।

--ঐ যে হতদরিদ্র ডাবওয়ালাটা, ওর কাছ থেকে ডাব কিনে খাবার সময় ধোপদস্তুর জামা পরে দাঁড়াতে তোমাদের মাথা নত হয়না ?

মনে হয়না ও-ও তো আমারই মতন মানুষ, ওরও তো বাঁচার অধিকার আছে ।

আমার কি রাইট আছে ওর মুখের খাবার কেড়ে নেবার ? কে দিয়েছে আমাকে সেই অধিকার ? অথচ প্রতিটি মূহুর্ত আমি সেই কাজই করছি, শুধু তাই নয় নিজের আত্মজদেরও তাই শেখাচ্ছি । কিছু মানুষ নিজের ঘর গোছাতে গিয়ে অন্যের গ্রাসটাও কেড়ে নিচ্ছে । নেতা হয়ে অন্যদের ন্যাতা বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি ।

এইসব মানসিক সংলাপ ভাবছিল কাজলী, চমকে উঠলো মিহি সুরে : মেমসাব জরা উধার যা কে বইঠিয়ে ।

চোখ তুলে তাকালো । একটি ঝাড়ুদারনি । রোজ দেখা কেউ নয় । নতুন মুখ ।

পরণে সবুজ শাড়ি হাঁটুর একটু নিচে অবধি জড়ানো । কচি কলাপাতা রংয়ের ব্লাউজ ।

চুলে রূপার একটি লম্বা ছোট ছোট ঘন্টা বসানো চেন লাগানো । ঝাড়ু দেবার সময় তার মিষ্টি রুম ঝুম আওয়াজ শোনা যায় । পায়ে নূপুর । হাতে কয়েক গাছি কাঁচের চুড়ি ।

মলিনতার মাঝে এক অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য ওর হলুদ গাঁদা রঙের পোশাকে আশাকে ।

চেহারায় একটা ঢলঢলে ভাব । বিবাহিতা কিনা বোঝার উপায় নেই । এক মুখ হাসি নিয়ে একমনে শুকনো পাতাগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে তুলে নিচ্ছে ওর ঝুড়িতে ।

আবার একটু অংশ ঝাড়ু দিচ্ছে, আবার পাতা তুলে নিচ্ছে । চোখোচোখি হতেই হেসে উঠছে । সাধারণ মেয়ে একটি, মাতিয়ে দিয়েছে কাজলীর আজকের বিকেল ।

ইচ্ছে হচ্ছে ওকে লেন্সে ধরতে । ওর চলন বলন, ওর ভঙ্গিমা, ওর লাবণী ।

কেন এমনটা হয় কাজলী জানেনা । কোন কোন মানুষের সঙ্গ ওর বড় ভালোলাগে ।

হোক না সে এক ঘাস পোকাই । মনে হয় যেন কত জন্ম ধরে তাকে চেনে সে ।

একটু সহচার্য, একটু কথাই ওকে অমূল্য রতনের সন্ধান দিতে পারে ।

- এই তেরা নাম কেয়া হ্যায় রে ? আগ বাড়িয়ে প্রশ্নটা আলতো করে ছুড়ে দেয় ।

মেয়েটি লুফে নেয় । মিষ্টি হেসে বলে : চাঁদনী আছে গো মেমসাব ।

- কি বললি ? চাঁদনী ? কাজলী নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না ।

কারণ ওর মনে হয়েছিল যে এর নাম চাঁদনী হলেই সব থেকে বেশি মানাবে ।

আশ্চর্য তো ! ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার । চাঁদনী চাঁদনী - ওরে আমার চাঁদনী !

একবার ছোটবেলায় ও পশ্চিমে নিজের মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো ।

সেখানে একটি ছেলেকে দেখে ওর মনে হয়েছিল যে এর নাম হতে পারে কালাচাঁদ কারণ সে একটি ছড়া পড়েছিল - কালাচাঁদ রায়রা বলে ।

ওমা খানিক বাদে সত্যি দেখে এর নাম কালাচাঁদ । লোকে বিশ্বাস করেনি। বাচ্চার কল্পনা বলে ভুলে গেছে । ওকে মিথ্যে বাদীও ভেবেছে অনেকে । কিন্তু আজ ?

- তুমি নিশ্চয়ই তখন শ্রীদেবীর চাঁদনী সিনেমাটার কথা ভাবছিলে, নাহলে --

- চুপ করো তো, প্রদোষকে বকে দেয় কাজলী । তোমাদের সবকিছুতেই এই যুক্তি খোঁজার প্রচেষ্টায় আমি হাঁপিয়ে উঠি । জীবনকে জীবনের খাতেও বইতে দেওয়া উচিৎ । কিছু কিছু জিনিস রহস্যময় হয়েই থাকুক না ! একটু শিথিলতা, হিসেব না মেলা --- অধরা ও অপ্রাপনীয়তার প্রতিই তো আমাদের চির আকর্ষণ । কেবল যুক্তি খুঁজতে গিয়ে একদিন দেখবে তোমরা রোবট হয়ে গেছো !

- তখন তুমিও রোবট হবে । রোবটের বৌ তো আর মানুষ থাকবে না ।

বলে হা হা হা করে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে ওর ভালোমানুষ স্বামী ।

প্রদোষ খুব হাসতে পারে, প্রদোষ সহজেই অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে ।

অচেনা মানুষকে সাহায্য করতে ওর কোন জুড়ি নেই । কাজলী দেখতে পায় আকরিক মানুষ আজও আছে । প্রদোষকে খনি থেকেই তুলে আনা, একটুও ভেজাল লাগেনি তাতে । এই বিষাক্ত দুনিয়া পারেনি তাকে একটুও বিষময় করতে । পারেনি কর্পোরেট দুনিয়ার করাপশনও । আর ঐ চাঁদনী । ও খুব সরল । খুব প্রাণবন্ত । অভাবের মধ্যে লালিত হয়েও এত সারল্য না দেখলে ঠিক যেন বিশ্বাস হয়না ।

দক্ষিণীরা তো খুব হীরে প্রেমী, হীরে পরে তাই কাজলী ওকে একদিন একটা হায়দ্রাবাদী পার্লসের দুল দিলো । ও কিন্তু নিলো না । কাজলী বললো- তুই গয়না পরতে ভালোবাসিস তাই কিনে এনেছি ।

চাঁদনী হেসে বলে- ওটা তুমি রেখে দাও । তোমার ছেলের বৌকে দিও ।

- দূর পাগলী কোথাকার ! আমার ছেলেই নেই তো ছেলের বৌ !
- তবে তোমার বুঝি মেয়ে ? শুধু একটা মেয়ে ? না দুটো মেয়ে ? না তিনটে মেয়ে বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে সে আপন মনে, ঘাসের বনে ।

একটু গলাটা ঝেড়ে নিয়ে কাজলী যা বহুবার বহুজনকে বলে এসেছে তাই আবার বলে- আমার কোনটাই নেই । এই বেশ ভালো আছি রে !

সরল চোখে ঝিলিক, আবার প্রাণ খোলা হাসি পরক্ষণেই চন্দ্রগ্রহণ ।

চাঁদনীর মুখে মেঘ - সেকি আজকাল তো কত চিকিৎসে বেরিয়েছে । ছেলে বানিয়ে ফেলো ।

- ফেলে ?
- ছেলের বৌ হবে ।
- আর ঐ মুক্তো পরবে ? তোর মুক্তো পরানোর জন্য আমাকে এখন ছেলে বানাতে হবে ?
- হ্যাঁ গো ঐ গাণেশ ডাক্তার বাবু তো মানুষ বানায় । বলে দূরে আঙুল দেখায় ।
- পুতুল টুতুলের ব্যবসা করে নাকি গোবর গণেশ ? ছেলে বার্বি ডল ?
- আরে না গো, মানুষ ছেলে বানায় । আর উনি গাণেশ ডাক্তার, গোবার নয় ।

কাজলী অবাক হয় । ভদ্রলোক কি লুকিয়ে ক্লোনিং এর চেষ্টা করছেন নাকি ?

খোঁজ নিতে হবে । এরকম একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিতে পারলে ওর নামও হতে পারে । হা হা হা ! আজকাল তো জন সমক্ষে নাম এলেই বিখ্যাত । বিশেষ কোন কাজের প্রয়োজন হয়না তার জন্য !

- কোথায় থাকেন তোর সিদ্ধিদাতা মানুষ বানানোর কারিগর ?
- লালবিল্‌লা জানো না ? বাজারের একদম শেষে ঐ বড় কাঁঠাল গাছটার নিচে ।

লালভিলা দেখেছে কাজলী । একটা বেশ বড় সড় ভিলা । লাল রংয়ের ।

বাড়িটাকে লোকে লালবিল্‌লা বা ভিলা বললেও ওটার নাম কিন্তু পাঞ্চজন্য ।

পঞ্চজন নামে অসুরের অস্থি দিয়ে তৈরি কৃষ্ণের শঙ্খ ।

যাতায়াতের পথে বাড়িটি বহুবার সে দেখেছে। ভাবলো এবার একবার ঢুঁ মারবে।

দেখাই যাক না ! তার না লাগলেও অন্য কারো কোন কাজে লাগতে পারে। ইনফর্মেশন সব সময় নিয়ে রাখা উচিৎ। ভদ্রলোক গাইনিও হতে পারেন। হয়ত আর্টিফিয়াল উপায়ে সন্তান উৎপাদনের চেম্বার ওটি। অশিক্ষিত চাঁদনীর কাছে মানুষ বানানোর কারিগর।

আজকাল আর চাঁদনী বিকেলে ঝাড় দিতে আসেনা। অন্য মেয়েরা কাজটা করে। খোঁজ নিয়েও জানতে পারেনি সে কেন আসেনা। কেউ বলতে পারেনা। কাজলী ভাবে হয়ত শরীর খারাপ কিংবা কোথাও গেছে। সে স্থির করে ইতিমধ্যে একদিন ওখানে হানা দেবে। লালভিলাটায় ঘুরে আসা যাক। পুতুল বানাবার কারিগরকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চায়। বাড়িতে প্রদোষকেও বলেছে। প্রদোষ মজা করে বলে ওঠে - ভালই হবে আমার গিনেজ বুকে নাম উঠবে সবচেয়ে বৃদ্ধা মায়ের স্বামী হবার দৌলতে। বলেই আবার স্বভাব সিদ্ধ হা হা হাসিতে মেতে ওঠে।

তারপর বলে - সত্যি তোমার এলেম আছে। একটা সাধারণ মেয়ে যে রাস্তা ঝাঁট দেয়

সে কি বললো না বললো সেটা দেখতে চললে তুমি অচেনা এক ব্যাক্তির বাড়ি।

পারোও বটে !

কিছুটা হাসি তামাশা কাজলীও করে তারপর প্রদোষ বেরিয়ে গেলে কি মনে করে সে

একটি বই খুলে বসে। কিছুক্ষণ পড়েও। বইটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে লেখা।

নানান তথ্য পায়। নানা জিনিস জানতে পারে।

বেলা বাড়লে দৈনন্দিন কাজ সেরে সে চলে যায় বৈকালিক ভ্রমণে। একটু আগেই যায় আজ। ব্যাঙ্গালোরে পর পর বেশ কিছু ব্লাস্ট হবার দরুণ আজকাল ডিফেন্স কলোনিতে খুব কড়া পাহারা। যদিও খুব বড় গাড়ি নিয়ে গেলে ওরা রেয়াৎ করে।

ঝট করে ধরেনা কারণ কোন বিগশটের গাড়ি যাচ্ছে শেষে ধরলে হ্যারাস করবে ওদের তাই। আর কাজলীর গাড়ির নম্বরটা তো ওরা চেনে। তবুও বেলা বাড়লে কি হবে সেই ঝঞ্ঝাট এড়াতে ও তাড়াতাড়িই যায়। প্রথমে চা খেয়ে পাঞ্চজন্যে হানা দেয়। গেট খোলাই ছিল।

সুন্দর বাগান ভেতরে একটু অগোছালো যদিও। ফুলের সারি। মাঝে মাঝে কিছু ক্যাকটাসও চোখে পড়লো। ফুলের মধ্যে যেন ইচ্ছে করেই ওগুলো গুঁজে দেওয়া হয়েছে। ভারি মনোরম লাগছে। আর গাছের সারি এমন ভাবে রয়েছে যেন মিনি ফরেস্ট। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে ভেতরে এতখানি জায়গা।

বাড়িটা লাল হলেও মিষ্টি লাল রঙ। অনেকটা পোড়া মাটির ছাঁচে তৈরি।

অফ হোয়াইট বর্ডার দেওয়া। চওড়া বারান্দা।

একটা মিঠে সুর ভেসে আসছে, খুব ক্ষীণ। ও ইতস্তত করে এমন সময় একটি লোক ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। চাকর শ্রেণির। ওকে দেখে একটু অবাক চোখে তাকায়। ও এগিয়ে গিয়ে বলে যে ও একটু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লোকটি ওকে ভেতরে নিয়ে যায়।

ভেতরে ঢুকে ও আরো অবাক। সার দিয়ে চার পাঁচটা চেয়ার রাখা। সেখানে ও

দেখে অনেক রুগী বসে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে স্নায়বিক কিংবা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন

রুগী । আর সুরের লহরী তুলছেন দু একজন গায়ক । শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ।

ডাক্তার যেন ওর অপেক্ষায় ছিলেন । এগিয়ে এলেন, প্রৌঢ় চিকিৎসক ।

পরণে গাউন আর মাথার সব চুল সাদা । মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ।

এসে বললেন : মিউজিক থেরাপি দেখতে এসেছেন তাই না ? আসুন আসুন দেখুন চমৎকার । বলেই যাঁরা গাইছিলেন হাত তুলে তাঁদের থামতে বলেন ।

তারপর কাজলীকে একটি চেয়ার দিয়ে নিজেও বসেন । বসে হাঁক পাড়েন :

চাঁদনী ও চাঁদনী । কাজলীকে অবাক করে দিয়ে ঝাড়ুদারনি চাঁদনী গুটি গুটি পায়ে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করে ।

আজকেও ও সমান উজ্জ্বল । অন্তরের সৌন্দর্য্যে ।

আজ ও নীল বসনা সুন্দরী । ডাক্তার ওকে বললেন - তুই গানটা ধর । এখানে তোর প্রয়োজন।

ডিফেন্স কলোনীর রাস্তা ঝাঁট দেওয়া মেয়ে চাঁদনী অপুর্ব গলায় গান ধরলো ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত । অসাধারণ গায়কী, মধুর কন্ঠ ।

কি রাগ এটা ? রাগিনী নয় তো ? গানটা তো ও চেনে না !

নিশ্চল, আপাত স্থবির রুগীরা আস্তে আস্তে যেন সচল । দুলছেন । ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে দুলে দুলে ---- হাসছেন, মাথা নাড়াচ্ছেন, অবগাহন করছেন নির্মল সপ্ত সুরের সাগরে । বাতাস বিহীন ঘরেও দোলা যায় ; দুলছে চাঁদনী নাম্নী ঘাসফুলও! সঙ্গীতের জাদুতে এক অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে গেছে কাজলীর মনেও । হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে এক ব্রহ্ম কমল । কাজলী ডুবে যাচ্ছে সুরের জগতে, ছন্দের দোলায় হারিয়ে ফেলছে চারপাশের বস্তু জগৎ ।

তা না না দ্রিম দ্রিম -তা না না দ্রিম--না দ্রিম তা না না না --

চাঁদনী গাইছে । ওর সারা শরীর গাইছে, আকাশ গাইছে বাতাস গাইছে - আস্তে আস্তে চাঁদনীর দেহটা একফালি চাঁদ হয়ে অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে ।

আর তথাকথিত স্থবির রুগীরা যারা অচল তারা এবার যেন নিজেরাই গলা মেলাবেন এতটাই প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যে, ঐ সঙ্গীতের মূর্ছনায় !

*তা না না দ্রিম দ্রিম -তা না না দ্রিম*

কাজলীর মনে পড়ছে ওর বাবার কথা । বাবা খুব ভালো গান গাইতেন । সবাই বলতেন শান্তিদেব ঘোষ । জীবনের বেশিরভাগটাই কাটিয়েছেন সমাজ সেবা করে । ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ হিসেবে চিহ্নিত লোধা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন উনিই ।

ওরা তাঁকে ঈশ্বরের মতন ভক্তি করতো । লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাই কাজলীর প্রিয় লেখিকা । উনিও বাবার মতনই আদিবাসি সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন । বাবা ছিলেন প্রচার বিমুখ মাস্টার মশাই সত্যেন বোসের মতনই । বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের ছাত্র বাবা শেষ জীবনে আলঝাইমার্সে আক্রান্ত হয়ে স্মৃতি শক্তি হারান । একদিন যিনি কঠিন

কঠিন ম্যাথেমেটিক্যাল ইকুয়েশন সলভ করতেন শেষ জীবনে তিনি দু আর তিনে কত হয় বলতে পারতেন না । ছেলে মেয়েদের, স্ত্রীকে চিনতে পারতেন না । তবুও গান করতে বললে : এ পরবাসে রবে কে অথবা নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর - নির্ভুল গাইতেন ।

একটা শব্দও ভুল হত না । তাই দেখে নিউরোলজিস্ট ডাঃ সুরেশ চৌবে বলেছিলেন : মিউজিক ইজ এম্‌বেডেড্‌ ইন হিজ সোল । গুড মিউজিক ইজ সামথিং বিয়ন্ড আওয়ার সেন্সেস।

আজ এখানে এসে বাবার কথা ভীষণ মনে পড়ছে । বাবাকে যদি এখানে একবার আনা যেতো, যদি একবার শোনানো যেতো সবুজ মেয়ে, দু:খী মেয়ে চাঁদনীর গান, একবার - শুধু একটি বার ! কত স্নায়বিক রুগীর তো প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এখানে !

মানুষ গড়ার কারিগর ডাক্তার গণেশ রামমূর্তির কন্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো ।

- জানেন তো প্রমাণ করা আছে যে সুর পারে নানান রোগের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু ও স্মৃতি শক্তি হারানো রুগীদের মধ্যেও আনন্দ লহরী তুলতে । বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পরীক্ষা করে । অনুভবের আগেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে যায় চরাচরে । মস্তিকের গহ্বরে । আর সুর ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে সুশিল্পীর পরশে । আমি এই গবেষণা নিয়ে বেশ কিছু পেপার পাবলিশ করেছি আন্তর্জাতিক জার্নালে ।

কাজলী তো দুপুরে এরকমই একটা বই পড়ছিল । শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপরে ।

এই জাতীয় তথ্যই ওখানে দেওয়া ছিল । অবাক কান্ড । বাস্তব অভিজ্ঞতা যে আজই হয়ে যাবে কল্পনাতেও আসেনি ।

এতদিন ও জানতো বিঠোফেন, মোৎজার্ট, শুবার্ট, আমজাদ আলি খাঁ, শিব কুমার শর্মা এঁনারাই সুরের জাদুকর । আজ দেখছে সুরের অন্য ধরণের জাদুকরও হন, যাঁরা সঙ্গীতের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন সুপ্ত সত্ত্বাকে, মাতিয়ে দেন স্নায়বিক রুগীর স্তব্ধ ভুবন । তাই বোধহয় চাঁদনী এত হাসতে পারে ।এত কষ্টেও এত আনন্দে ভাসতে পারে ।

তোর যে সুর আছে রে চাঁদনী --- সুর আছে --সুরের ঐশ্বর্যেই তুই এত ঐশ্বরিক ।

পাঞ্চজন্যে শঙ্খ আলোড়িত হচ্ছে মিঠে তানে । গানের এখন বিস্তার হচ্ছে । হালকা বাদ্য যন্ত্র, সারেঙ্গীটা বাজছে । মোহময় পরিবেশ । মায়াবী সবুজ জগৎ । শুকনো পাতারা কাঁপছে ।

ভীষণ কাঁপছে ---- ভীষণ ----

ধীরে ধীরে রাশি রাশি ঝরাপাতা সরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে --সরে গিয়ে কাজলীর দু চোখ ঢেকে যাচ্ছে স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় ।

# মোমের আলো

কেকার জন্ম প্রায় চল্লিশ বছর আগে । আগে সে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতো এখন অবসর নিয়েছে । কেকা সেনের কাজ হাল প্লাঁশেত করা ।

সে অর্থ এর বিনিময়ে আত্মা নামায় ও মানুষের নানান কৌতুহলের অবসান করা ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া হল তার রুটিন কাজ ।

শহরের অনতিদূরে তার নিকেতন । শহর হল উটি, উটাকামুন্ড, দক্ষিণের শৈল শহর । আগে প্রচুর সাহেব থাকতেন । এখন তাঁদের সংখ্যা কম কেউ কেউ বাড়ি বেঁচে চলে গেছেন । সেরকম'ই একটি বাড়ি কিনে কেকা একা থাকে ।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বাগান । সেকেল ভিলা । নাম রেজারেকশান ।

রেজারেকাশানের সামনে টিউলিপ বাগিচা । হয়ত মালিক সুদূর নেদারল্যান্ডস থেকে এনেছিলেন, কে জানে ? সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আজ আর কেউ জীবিত নেই এখানে । এখানে জীবিত ব্যাক্তি কেকা আর তার ক্লায়েন্ট । বাকিরা সবাই মৃত !

বেশির ভাগ আসে মধ্য বয়স্ক ও বৃদ্ধরা । সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে কিংবা স্বামী বিয়োগ হয়েছে এরকম মানুষ-ও অনেক আসেন । তারা প্রয়াত সংগীর সংগে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী । বৃদ্ধারা আসেন অকালে মৃত সন্তান সন্ততি কিংবা নাতি নাতনীর সংগে যোগাযোগ করতে । অনেক সময় হয় অনেক সময় শূণ্য হাতে ফিরে যান ।

মোমের আলোয় কেকার হাত আঁকিবুকি কেটে চলে সাদা কাগজে ।

কখনো মানুষের নিঁখুত মুখ, কখনো কোনো বাড়ির চিত্র আঁকা হয়ে যায় নিজের থেকে কারণ কেকার আঁকার হাত চিরকাল'ই খারাপ । সে সাদা কাগজে সোজা লাইন টানতে পর্যন্ত পারেনা । তারই হাতে ট্রান্স এর সময় আঁকা হয়ে চলেছে নিঁখুত চিত্র । সেটা দেখতেও অনেকে আসেন । নিছক কৌতুহল ।

একবার এক ক্লায়েন্ট এসেছিলেন বিগত পত্নীর সাথে মিলিত হতে ।

ভদ্রলোকের পরিবার তার বিবাহের আয়োজন করেছিলো । কিন্তু তিনি রাজি ছিলেন না বলে এসেছিলেন বিগত স্ত্রীর পরামর্শ নিতে । তার স্ত্রী পত্রপাট না করে দেন ।

বলেন- এই বিয়ে হলে তোমার পরিবারে ভাঙন ধরবে ।

ভদ্রলোক সেইমত এগিয়ে যান কিন্তু পরিবারের চাপের কাছে নত হতে বাধ্য হন ।

কিছুদিন পরেই গোলমাল শুরু হয় ও দেখা যায় যে নববিবাহিতা বধূ

সংসারে যথেষ্ট গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছে যার জন্য ভদ্রলোকের পরিবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় ।

ফলে গেল প্রাক্তন স্ত্রীর কথা !

এসেছিল একটি মেয়ে। নাম তার শবরী।

শবরী ঘোষ। মেয়েটি একটি দূর্ঘটনায় কোমায় চলে যায়। মাথায় চোট লেগেছিল তাই অনেক দিন কোমায় থাকার পরে একদিন মারা যায়। সবাই এটা জানলেও মেয়েটির স্পিরিট এসে জানায় যে তাকে খুন করা হয়েছিল। করেছিল ডাক্তার। কারণ তাকে হাসপাতালে রাখতে প্রচুর খরচ হচ্ছিল যা তার দাদারা দিতে চাইছিল না পরের দিকে কিন্তু ইউথেনেশিয়া ভারতে ইলিগ্যাল হ'ওয়ায় কিচু করা যাচ্ছিল না। শেষে ডাক্তারের পরামর্শ মতন কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের নল খুলে নিলে মেয়েটি মারা যায়। রিপোর্ট এ বলা হয় যে বডি রেস্পন্ড করছিল না। এইভাবে হঠাৎ তাকে মৃত্যু মুকে ঠেলে দেওয়াতে সে খুব বিমর্ষ বোঝা গেলো প্লাঁশেত করে।

তার বান্ধবী মানসিক শান্তি পেলেও খুনের কিনারা করতে পারেনি লোকবল ও অর্থবল না থাকায়। আর আইন তো ভূত প্রেতে বিশ্বাস রাখেনা !

তবু জানাতো গেল যে এটা আসলে খুন !

এসেছিল লেখিকা সলমা বানুর আত্মা। বিতর্ক সৃষ্টিকারী রচনার জন্য উনি গৃহবন্দী ছিলেন। ইসলাম ধর্ম নিয়ে কিছু কুরুচিকর মন্তব্য করায় উনি লোকের চক্ষুশূল হন।

বহুকাল এই দেশ সেই দেশ ঘুরে একটি গুপ্ত জায়গায় ঘাঁটি গাড়েন। কিন্তু একদিন মারা যান হার্ট অ্যাটাকে। জনগণ তাই জানে। কিন্তু নাস্তিক লেখিকা সলমার আত্মা এসে জানান দেন যে তাঁকে আসলে সিক্রেট এজেন্ট দিয়ে খুন করিয়েছে একটি দেশের হর্তা কর্তাগণ।

এমন ওষুধ আছে যা প্রয়োগ করলে বাহ্যিক দিক থেকে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ বলে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারেন আসলে তা খুন। সলমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চরমে উঠতে পারে বলে কেকা এই তথ্য পাঁচ কান করেনি।

এসেছিলেন এক নামী শিল্পী। আঁকা হয় এক মহার্ঘ্য পোর্ট্রেট। নিচে স'ই হয়ে যায় :

গ্রেগরি। সেই শিল্পীর নাম। কেকা চমকিত। তার ড্রয়িং রুমে বাঁধানো আছে সেই ছবি।

এমনিতেই কেকার পসার ভালো। তাই আগের চাকরিটি ছেড়েছে। এখন নিয়মিত আত্মা নামায়। ও খুব ভালো মিডিয়াম। সন্ধ্যার পরে শুরু হয় আত্মা অবতরণ।

কত গল্প কত ব্যাথা কত কাহিনী জমাট বেঁধে আছে এই রেজারেকশান বাংলোয়।

কেউ জানে কেউ জানেনা, তাদের জানার কোনো উপায় নেই !

রবার্ট গোমেজের কাজ প্যারা সাইকোলাজি নিয়ে। দেশে বিদেশে বহু ঘুরেছেন, বহু মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, অথেন্টিসিটি চেক করে লিপিবদ্ধ করেছেন সাইকিক জার্নালে, ব'ইতে। সেরকম এক ব'ইয়ের নাম দা ডেড এন্ড। এই ব'ইতে উনি কেকার কথা লিখেছেন।

কেকা জন্ম থেকে সাইকিক। এখন পুরো দস্তুর পাকা মিডিয়াম।

ব'ইটি হট কেকের মতন বাজারে বিকোতে সুদূর অ্যারারাট জনপদ থেকে এসেছে ডেরেক। ডেরেক ম্যাকমিলান। কেকার সংগে আলাপ করতে চায় সে।

এক ঢাল সোনালী লম্বা চুল পনিটেল করা। সমুদ্র নীল চোখ। লম্বাটে মুখ সদা হাস্যময়।

ডেরেক উটি শহরে এসে এক হোটেলে উঠলো। দু একদিন কুনুরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে চা বাগান অঞ্চলে ঘুরে, ভালো মন্দ খেয়েটেয়ে অবশেষে গেলো কেকা দর্শনে। আগেই ইমেলে যোগাযোগ করে এসেছিল। দিন ক্ষণ স্থির করাই ছিল।

ডেরেক এমনিতে স্কেপটিক। শুধু ব'ই পড়ে উৎসাহ পেয়ে এসেছিল জানতে যে সত্যিই এরকম হয় নাকি সবটাই বুজরুকি ! ইচ্ছে ছিল নিজের মতন করে কিছু প্রশ্ন করবে কেকাকে। সেই মতন প্রশ্ন রেডি করেও এনেছিল।

সাঁঝে চলে গেলো রেজারেকশানে। টিউলিপ বাগান পেরিয়ে উঁচু কাঠের বাংলো। ঘোরানো সিঁড়ি, মোটা কার্পেট, মেহগনি কাঠের আসাবাব।

বাড়িটায় একটা স্পুকি বাতাস আছে বলে মনে হল সাহসী, স্কেপটিক ডেরেকের ও।

একটা কালো কুচকুচে বেড়াল যা এইসব বিষয় নিয়ে বানানো সিনেমায় দেখা যায় সেরকম বেড়াল জুল জুল চোখে চেয়ে ছিল।

ঝপাং করে সোফা থেকে মেঝেতে হঠাৎ এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে ডেরেক একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলো কাঠের একটা আসবাবের সাথে।

ভেতার থেকে ভারী গলা ভেসে এলো :

- ওয়েলকাম মিস্টার ম্যাকমিলান। ওয়েলকাম। আমি জানতাম তুমি আসবে।

আজকে তোমার সাথে প্রথম আলাপ বলে আমি সব বাতি কেমন নিভিয়ে রেখেছি দেখো !

তুমি ভয় পাচ্ছো না তো ?

ডেরেক প্রথম সাক্ষাৎকারের রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ভয়ের কথায় একটু বিষম খেলো। তবুও হেসে বললো : নাহ! ভয়ের কি আছে ? কিন্তু আপনি কোথায় ? দেখা যাচ্ছে না তো !

সত্যি তো দেখা যাবে কী করে ? ঘরের আলো তো ক্ষীণ।

মোম জ্বলছে কটি। তাও খুব সামান্য আলো। বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে কটি মোম। আর মোমের আলোয় দেখা যাচ্ছে কেকার অবয়ব। সাধারণ নারীদের তুলনায় বেশ লম্বা।

স্লিম। গায়ের রং বোঝার উপায় নেই। চুল খোলা। মরাল গ্রীবা।

ক্ষীণকটি। যেন ভাসমান তরী। দুলছে আর দুলছে।

ভেসে এলো হাসনুহানার সুবাস। হয়ত বাগানে গাছ আছে।

ডেরেককে কেকা আগেই জানিয়ে দিলো যে আজ তার বাড়িতে উনুন জ্বলছে না।

ফায়ার প্লেসেও কাঠ নেই। তাই চা কফি দিতে সে অক্ষম। অতিথি এসেছেন সুদূর বিদেশ থেকে কিন্তু এই অভদ্রতা তাকে করতে হচ্ছে কারণ সে একাকিনী এখানে থাকে আর শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায়, জ্বরে কাহিল হ'ওয়ায় গাড়ি চালিয়ে শহরে যেতে পারেনি ফুয়েল আনতে। ডেরেক যেন কিছু মনে না করেন।

কী মনে করবে ডেরেক? এরকম সোজা সাপটা আর্তির পরে কিছু মনে করা যায় কি?

কিছু কথা হল। দুজনের মধ্যে। অনেক কিছুর জানার আছে ডেরেকের।

সত্যি ভূত প্রেত এসব হয় কিনা। পরজন্ম, আত্মা, আত্মার বিশ্লেষণ ইত্যাদি জানার বড়'ই আগ্রহ ডেরেকের। কিছু জানা হল তবে সিংহ ভাগ তোলা র'ইলো অন্য একদিনের জন্য। কেকা বললো- তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। নতুন জায়গা তাই গাঢ় অন্ধকারে অসুবিধে হতে পারে। অন্যদিন এসো, ফোন করে এসো, জমিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে আর আমি সুস্থ হয়ে যাবো ততদিনে কাজেই তোমায় আমি চাইনিজ কিংবা লেবানিজ রান্না করে খাওয়াবো সেদিন।

ডেরেক খুশি হল আরেক দিনের আমন্ত্রণে। আরো বেশি সময় মানে আরো কথা আরো প্রশ্ন আরো উত্তর! অত'এব আজ গাত্রোত্থান করা যাক।

দেবদারু পাতায় ছাওয়া পথ ধরে সে এগিয়ে গেলো গেটের দিকে। কেকা সি অফ করে দিলো ঘর থেকেই। সে অসুস্থ বলে ডেরেক কিছু মনেও করলো না।

দুদিন পরে আবার এলো ডেরেক রেজারেকশানে। আজো রাত, অমানিশা।

আজ তাকে নামিয়ে দিয়ে গেলো হোটেলের গাড়ি। সেই মোমের আলোয় ভরা ঘর।

হালকা শীতল বাতাস। মায়াবী রাত, নিশুতি রাত।

মেঘের আস্তরণ বাড়িটার চারদিকে। ঠিক কোনো হলিউডের ভৌতিক সিনেমার মতন পরিবেশ। আজ আত্মা নামাবে কিনা কেকা কিছু বলেনি তবে মনে হয় আজ সুস্থ আছে যখন তখন একটা সুযোগ হবে ভুত দেখার এবং প্রেতলোকে পাড়ি জমানোর।

ডেরেক ঘরে ঢুকতেই কেকা মোমের আলো কমিয়ে দিলো। অর্থাৎ কটি মোম নিভিয়ে দিলো। বললো : ভূতেরা ছায়া মানুষ, কম আলোয় জমবে বেশ।

ডেরেক উত্তর দেয় না। চুপ করে অপেক্ষা করে আছে পরের ঘটনার।

ঘরে অনেক ব ই রাখা আর একটা পচা গন্ধ যেন নাকে এসে লাগছে। কোথা থেকে আসছে কে জানে! জানালা দরজা খোলা হয়নি নাকি সারাদিন!

নাকে রুমাল চাপে ডেরেক।

- এটা ওদের গন্ধ! ওদের শরীরের গন্ধ। বলে ওঠে কেকা।

ডেরেক মনে মনে ভাবে - ভালো গন্ধ ব'ইকি! পচা গন্ধ, আলোহীন পরিবেশ নাহলে আর ভূত! ধ্যুৎ! জমে উঠেছে। সব ঠিকঠাক চলছে। এখন বাবাজিরা এলেই হয়!

না জানি আজ কে আসে!

ঢং করে দেওয়াল ঘড়িতে বেজে উঠলো আটটা। এই বাড়ির সবকিছুই ভূতুড়ে।

ঘড়ির আওয়াজটাও পর্যন্ত। কেমন ভ্যাপসা ভেতরটা আজ।

মোমের ক্ষীণ আলোয় ছায়া পড়লো কেকার ঘরের দেওয়ালে।

সেই এক'ই গড়ন। ধীরে হাঁটছে। গতি দেখে মনে হয় মরালী !

হাতে টি-পট। ঘরে ঢুকলো সে। আজ নীল বসনা সুন্দরী। সুন্দরীই তো ! ডেরেকের চোখে ভারতীয় নারীরা সবাই সুন্দরী। কি সুন্দর তাদের গায়ের রং ! গমের মতন মসৃণ চামড়া। ঢলঢলে ভাব। আয়ত আঁখি।দারুণ লাগে তার। চোখে ঝিলমিল লেগে যায়।

টেবিলে টি- পট রাখার আগেই কোথার থেকে জুটলো এসে সেই মার্জারটি। কালো বদন। কালো আঁখি। লম্ফ দিয়ে চলে গেলো ঘরের অন্য দিকে। কেকা ততক্ষণে এসে গেছে টেবলের কাছে। নিচু হয়ে টি-পট রাখতে যেতেই লাফিয় উঠলো ডেরেক ভয়ে !

শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেলো শীতল স্রোত ! ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া তার ! সে যে নন বিলিভার এরপরেও কি কাউকে বলতে পারবে ?

এ সত্যিই কেকা তো ? নকি অন্য কোনো প্রেতিনী !

টি-পট হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কংকাল। পরণে নীল গাউন। গলায় জ্বল জ্বল করছে চুণীর হার !

- কেকা কেকা হোয়্যার আর ইউ ? হোয়্যার আর ইউ ?

শুধু এইটুকুই গলা দিয়ে বার হল। ভেসে এলো কেকার হাসি :

হা হা হা হা হা --- অট্টহাস্য। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দেয় সেই হাসি !

যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে তার কন্ঠস্বর -- ডেরেক ডেরেক আই অ্যাম হিয়ার, আই অ্যাম এভরি হোয়্যার। কান্ট ইউ ফিল মি ?

ডেরেকের অবস্থা সঙ্গীন। ভয়ে হাত পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে।

- বাট কেকা ইউ ওয়্যার সাপোজড টু বি হিয়ার ইন দিস রুম !

- ইয়েস আই অ্যাম হিয়ার অনলি ! কান্ট ইউ সি ?

- নো ! আই কান্ট, চোখ কচলে বলে ওঠে ডেরেক।

- হাউ ক্যান ইউ সি মি ? আই অ্যাম আ স্পিরিট নাও !

- স্পিরিট ? নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করে ওঠে সে। স্পিরিট ? ডোন্ট ফুল মি। ইউ ডিল উইথ স্পিরিট আই নো।

তুমি নিজে কি করে স্পিরিট হতে পারো ?

- কেন পারিনা ডেরেক ? আমার মরণ নেই নাকি ?

আমি কি অমর ? বলেই হা হা হা করে হেসে ওঠে সে !

ডেরেক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সে এসেছিল আত্মা নামা দেখতে। হঠাৎ কী হয়ে গেলো ?

- কেকা তুমি বলেছিলে আজ ডিনার করতে আর নানান আলোচনা করবে পরলোক নিয়ে সেরকম বলেছিলে। হঠাৎ স্পিরিট হয়ে গেলে কীভাবে ?

আর ইউ জোকিং ?

এবারে বিষাদের সুর বাতাসে ভেসে আসে ।

মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে যায় কেকার স্বর । থেমে যায় হাসি ।

সে বলে ওঠে - আরো কিছুদিন আগে এলে দেখতে পেতে জল জ্যান্ত কেকাকে । আজ পাবেনা । কারণ সে আর বেঁচে নেই । সোয়াইন ফ্লুতে নিমেষের মধ্যে মারা গেছে সে ।

তার পচা লাশটা পাশের ঘরে পরে আছে । হয়ত তুমি পুলিশে খবর দেবে কিংবা অন্য কেউ । কেকা কথা দিয়ে কথা রাখেনা এরকম আজ অবধি হয়নি । তোমার বেলায় কেকা হেরে গেলো ! কী করবে সে বলো ? তার তো দেহে আর অস্থি মজ্জা নেই !

এবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো অশরিরি নারী । বিখ্যাত মিডিয়াম কেকা সেন । এতদিন যার কাজ ছিল মানুষের সাথে পরলোকের যোগাযোগ স্থাপন করানো । আজ সে নিজেই একটি আত্মা ।

- তুমি বিফল ভেবোনা নিজেকে কারণ তোমার প্রশ্নের উত্তর তো তুমি পেয়ে গেছো তাই না ? তুমি জানতে এসেচিলে এগুলো বুজরুকি কিনা ! এখানো কি মনে হয় এগুলো বুজরুকি ?

ডেরেক ?

আর ডেরেক ! ডেরেক তখন পোঁ পা দৌড় দিয়েছে গেট খুলে গাঢ অন্ধকারে, পাহাড়ী পথে । পেছন থেকেই কে যেন বলে উঠলো : আমার চা কেমন লাগলো ডেরেক বললে না তো !

ডেরেক আরো জোরে দৌড়াতে আরম্ভ করলো । বুঝিবা পা পিছলে যায় !

পাথরে আঘাত খেয়ে পরেও গেলো ! তুললো উল্টো দিক থেকে আসা জিপের সারথি । এলাকার পুলিশ অফিসার । মোটামুটি কিছু হিন্টস দিতেই উনি বললেন : আমিও ওদিকেই যাচ্ছিলাম, আজ একটু আগে পুলিশ স্টেশানে ফোন করে এক ভদ্র মহিলা জানিয়েছেন যে রেজারেকশানে কেউ মারা গেছেন সোয়াইন ফ্লুতে । রাজ্যের সর্ব প্রথম মৃত্যু । আমি তার'ও তদারকি করতে বার হয়েছি !

চলুন আপনাকে আগে শহরে পৌঁছে দিই । নাকি আমাকে পথ চিনিয়ে ওখানে নিয়ে যাবেন ?

- ন-ওওনা, কোন ক্রমে বলে ওঠে অসীম সাহসী ডেরেক । তারপর জিপে উঠে অফিসারের হাতটা চেপে ধরে বসে, ভয়ে নাকি রক্ত মাংস পরীক্ষা করতে বোঝা যায়না !

বার বার'ই তার মনে হতে থাকে পেছন পেছন আসছে কেকার ছায়া শরীর ।

তাকে ছায়াগ্রাস করতে !

# জান্তব

- ভালুকের নাচ দেখেছিস কখনো ? শ্রাবণ আকাশের তরল হিন্দোল মেখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় এক যুবতী । উত্তরে মেঘমন্দ্রিত স্বরে আরেক মেঘ সুন্দরী বলে ওঠে :

ভালুক এক্সপার্ট কার্তিক সত্যনারায়ণ লিখেছেন যে ভাল্লুক কখনো নাচে না ।

উনি যা বলেছেন তাই পড়ে শোনাচ্ছি :

Bears aren't trained to dance at all ! The bear cubs are kidnapped by ruthless poachers after killing their mothers. Their teeth are knocked out and claws chopped off . As the cubs scream in pain a red hot iron needle is inserted into their delicate muzzle through which a rope is passed . The wound is kept raw deliberately staying infected and often bleeding . When the rope is pulled up the bear finds it unbearable and stands up on it's hind legs which people see as dancing.

-যাহ্ ! একি সত্যি নাকি ? চমকে ওঠে ঐশী । ঐশী রায় । স্কুল শিক্ষিকা ।

পুরনো খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে করুণ ভাবে হেসে ওঠে সোহিনী । সোহিনী ধর । ঐশীর বান্ধবী ।

- মানুষ হয়ে জন্মানো কঠিন, কিন্তু মনুষ্যত্ব ধরে রাখা আরো কঠিন । ব্যথিত ঐশী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ।

দুই বন্ধু মিলে কাজ করে একটি গরীব বাচ্চাদের জন্য স্কুলে । ওরা পড়ায় । স্কুলটা চালায় একটি জঙ্গলের জন্য কাজ করা এন জি ও ওয়াইল্ড বিস্ট । দক্ষিণ ভারতের ঘন বনে এই এন জি ও । ওখানে একটি রামকৃষ্ণ মিশন আছে । মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী দেবানন্দ মহারাজ ওদের স্কুলের প্রধাণ শিক্ষক । ভদ্রলোক খুব ফিলোসফিক্যাল কথা বলেন । শুনতে খুব ভালো লাগে । ভোগ বাদের যুগে তো দর্শনটাই মিসিং । আসলে ঐশী ও সোহিনী দুজনেই ওয়েল এডুকেটেড ও দুই হাই প্রোফাইল কর্পোরেট এক্সিকিউটিভের বৌ । অঢেল অর্থ, বিলাসিতা, প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেমন বন্দিনী রাজকন্যার মতন লাগতো ওদের । শেষে ভাবলো ওদের অর্থবল ও সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিজেদের শ্রমের সঙ্গে মিলিয়ে যদি কোন ভালো কাজ করা যায় । স্বামীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন । সৃষ্টি হল একটি স্কুল -কুঁড়ি । যুক্ত হল একটি এন জি ও ওয়াইল্ড বিস্টের সঙ্গে যারা ঐ অঞ্চলে আগে থেকেই কাজ করতো বনজ মানুষদের জন্য । পুষ্পিত হল কুঁড়ি ।

সহজ সরলভাবে এখানে শিক্ষাদান করা হয় ।

কলকাতার বাঙালী পন্ডিত, গলা পর্যন্ত ভর্তি ইগো অথচ রবীন্দ্রনাথ পিসে নোবেল পেয়েছেন তাই জানেন এবং সেটা নিয়ে তর্ক করেন, এতদিন ভুল জেনে এসেছেন সেটা স্বীকার করার সৎ সাহসটুকুও নেই এরকম সুশিক্ষককে ছেঁটে ফেলে ওঁরা নিয়ে এসেছে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যাক্তিদের ।গালভরা জ্ঞানের লেকচার দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে, অনেক হাতিতালি কুড়ান ছাত্রছাত্রীদের

অথচ বাড়িতে কন্যা পুত্রের মধ্যে ভেদাভেদ শুরু করেন এমন পন্ডিত শিক্ষক শিক্ষিকা চাইনা। বরং যাঁদের হৃদয় আছে, শুষ্কং কাষ্ঠং পান্ডিত্যের বীজ যাঁরা রোপণ করবেন না কচি কচি মনে তাঁরা স্বাগতম্ । ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া কিংবা কতগুলো সাদা কাগজ শিক্ষার সংজ্ঞা নয় এমনই একঝাঁক শিক্ষক এখানে পড়ান। মিসেস ভারতী পরাঞ্জাপে তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে। ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন বেশ বোঝা যায়। আগে স্বামীর ব্যবসায় ছিলেন। স্বামী মারা যাবার পর ব্যবসা চলছে নিজের মতন উনি অবসর কাটান সমাজ সেবা করে। সত্যি অনেক ভালো কাজ করছেন। লোকের উপকার করছেন। কথাবার্তাও খুব সুন্দর। নম্র, বিনয়ী।

ঐশীর খুব ভালো লাগে ওনাকে। ওনার সান্নিধ্য বেশ উপভোগ্য।

একদিন ওরা একসঙ্গে একটি ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণে গেলো। মুলিপাণি ন্যাশনাল পার্ক। সেটা ওদের স্কুলের কাছেই। মূলত এখানকার বনজ মানুষদের নিয়েই চলে স্কুল। বড় এলাকা। পার্কের আন্ডারে ২২ টি রিজার্ভ ফরেস্ট আছে। শাল, সেগুন, ইউক্যালিপ্টাস, দেবদারু ইত্যাদি গাছে ভর্তি। কেউ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে কেউ নিজেদের মধ্যে ঢলাঢলি করছে। এছাড়াও টাইগার সাফারি, লায়ন সাফারি, বিয়ার সাফারি ইত্যাদি হয়। সকাল বেলা জঙ্গলের খাঁচা ঘেরা মিনিবাসে মানুষের দলগুলোকে ভরে নিয়ে যাওয়া হয় অসভ্য রাজ্যে। জানোয়ার খাঁচা ভর্তি মানুষ দেখে। তবে পাত্তা দেয়না। ওরা ওদের রাজকীয় চালে চলে। মানুষ যেমন ওদের দেখে আদিখ্যেতা আরম্ভ করে ওরা কিন্তু তা করেনা। ওরা জানে হোয়্যার টু ড্র দা লাইন।

ঐশীরাও গেলো। মিসেস পরাঞ্জাপেও গেলেন। ঐশী ও পরাঞ্জাপে পশাপাশি বসেছিল। গাড়িটা মিনিবাস। বসার সীটগুলো বেশ সরু। দুজনের বসতে কষ্ট হচ্ছিল। তার মধ্যে ভিনদেশীরা ক্যামেরা বার করে পট পট ছবি তুলছে তখন ওদের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ছে। বেশ বিরক্তিকর ব্যাপার। মুখ ভেচকে বসেছিলেন পরাঞ্জাপে। এক এক করে এক একটি এরিয়ায় ঢুকছে গাড়ি। সেইসব জায়গার প্রাণীর দেখা মিলছে। আসলে এরিয়া ভাগ করা আছে। লায়ন, টাইগার, বিয়ার ইত্যাদি। যেমন কোথাও ভাল্লুক শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে, ওটা ভাল্লুকের এরিয়া। কোথাও সিংহী খেলা করছে, সিংহ অন্যপাশে বসে রাজকীয় হাই তুলছে। চিতাগুলো দল বেঁধে ঝুলে আছে পাথরের ওপরে। হিপোটা গলা বাড়িয়ে ওর কুৎসিত মুখ বার করে মানুষ দেখছে। কিন্তু প্রতিটি জানোয়ারই অত্যন্ত সভ্য। এদের দেখে মনে হয় এই যে আমরা প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছি তার কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে ? এরা শুধু খিদে পেলে নড়েচড়ে বসে। বাকি সময় রিল্যাক্স করে। এমনও তো বলা যায়না যে আমরা এদের চেয়ে উন্নত কোন জাত। প্রকৃতি যেই বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে তা তো আমরা ধ্বংসের কাজেই বেশি ব্যবহার করছি।

-এদের আমরা অসভ্য বলি বটে হয়ত নিজেরাই সভ্য নই বলে। নিজেদের ইন্সিকিউরিটি ঢাকতে দৌড়ে গিয়ে ওদের আগেই চিমটি কেটে বসি, বলে ওঠে ঐশী। ভারী গলায় মিসেস পরাঞ্জাপে সায় দেন।

সাফারি শেষে আসা হল বাঘের গুহার কাছে। গুহা থেকে বেরিয়ে একটি ডোরাকাটা বাঘ এসে বসলো গাছের ঘন ছায়ায়। গদাই লস্করি চালে। কেমন জুল্‌জুল করে চেয়ে আছে সভ্য মানুষের দিকে। হয়ত এটা দেখতেই রোজ সকালে এসে বসে এই চত্বরে। তারপর বিরাট হাই তুলে ঘুমের দেশে পাড়ি জমায়।

ওরাও সংবেদনশীল হয়, ওরাও মন বোঝে -ঐশী খবরের কাগজে পড়েছিল যে একবার উটি শহরে এক রাস্তাতে একটি কুকুর ছানা প্রচন্ড ঠান্ডায় কাঁপছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল তুমুল। পাহাড় শুনশান। চারদিকে শীতল বাতাস। ঠকঠক করে কাঁপে মানুষ। কিছু কিছু দোকান খোলা ছিল

। কুকুরটিও ঠক্ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দোকানের দিকে এগিয়ে আসে । ওর মাকে কোন গাড়ি চাপা দিয়ে গিয়েছিল । ও অনাথ হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল । হঠাৎ দোকানীরা দেখলো একটি বাঁদর ওকে কোলে তুলে নিয়ে সোজা পাশের কার্নিশ বেয়ে ওপরে উঠে গেলো । তারপর থেকে লোকে দেখতে লাগলো যে ঐ বাঁদরটাই ওকে লালন পালন করছে মায়ের মতন ।

-অদ্ভুত ঘটনা তাই না মিসেস পরাঞ্জাপে ? মনুষ্যত্ব কেও হার মানায় এই জান্তব আচরণ - ঐশী বলে ওঠে ।

মিসেস পরাঞ্জাপে একটা কথাও বলেন না । হঠাৎ কেমন চুপ মেরে যান । পরিবেশ ভারী লাগে ঐশীর ।

এক সময় সাফারি শেষ হয় । ঐশী বুঝতে পারেনা উনি হঠাৎ এরকম নীরব হয়ে গেলেন কেন । হয়ত কোন কুকুর টুকুর পুষেছিলেন ! কোন ঘটনা মনে পড়ে গেছে । পোষা জিনিস মারা গেলে বড্ড কষ্ট হয় । ওরাও তো ভালোবাসে, সেটা আনকন্ডিশনাল লাভ, কৃতজ্ঞ হয়, প্রভুভক্ত হয় তাই হয়ত মণিবের দু:খও বেশী ।

বাস থেকে নেমে হঠাৎ গম্ভীর মুখ করে উনি বলে ওঠেন - চল ঐ ক্যান্টিনে বসি । যাবে ? একটু সময় হবে ?

ঐশী সম্মতি জানায় ঘাড় নেড়ে । স্কুলের অন্যরা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে অনেক । আর এখন বাড়ি গিয়েই হবে কি ? সন্ধ্যায় একটা পার্টি আছে অবশ্য মিসেস জোনস্ এর । সেটাই যেতেই হবে ।

ঘন বনের ছায়ায় এই ক্যান্টিন । চা, সিঙাড়া ছাড়াও পাওয়া যায় বুনো পাহাড়ি লঙ্কার চপ, বেশ খেতে । ওরা অর্ডার দিয়ে বসলো বেঞ্চে । একটা কুকুর এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে । মিসেস পরাঞ্জাপে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলেন । সে খেলো না । চলে গেলো ।

- দেখো ওরাও কেমন চুজি হয়ে গেছে । বলেন মিসেস পরাঞ্জাপে । মৃদু হাসে ঐশীও ।

ফরেস্ট অফিসার ওনার রুটিন মাফিক ফরেস্ট রাউন্ড সেরে ফিরছেন অফিসে । জলপাই জীপ থেকে টেনে নামালেন পৃথুল দেহ । কে বলবে আই এফ এস পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে কত বডি ফিটনেস লাগে ! মদ গিলে গিলে মেদের আস্তরণে ঢেকে গেছে সমস্ত হাড্ডি । চোরা কারবারীরা মাঝে মাঝে দৌড় ঝাঁপ করায় বটে তবে সেটা নেহাতি বজ্জাত কারবারী হলে । নাহলে ওরা সাধারণতঃ সেলাম ঠুকেই যায় । সব কটা সেলাম করে গেলেই বাঁচা যায় এই শরীর নিয়ে এতো ছুটোছুটি পোষায় ? কে বলে এই জঙ্গলে হাতি নেই ? শুধুই বাঘ সিংহ ?

--এবার জলহস্তীরা দলবেঁধে ওনাকে দেখতে আসবে - দুষ্টু হাসি ঐশীর মুখে ।

মিসেস ভারতী পরাঞ্জাপে হাসেন না । চুপ করে থাকেন । কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে নিজেই বলে ওঠেন - আমার কিছু কথা ছিল ঐশী, শুনবে ? তোমরা আমায় যেরকম ভাবো আমি সেরকম নই । আমার জীবন আমার জান্তব সত্ত্বার গল্প শুনতে চাও ? কাউকে বলে আমিও একটু হালকা হই !

গল্প শুনতে কে না চায় ? ঐশী তাই সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লো । বেশ রহস্য রহস্য গন্ধ আসছে যে । উনি গলা ঝেড়ে শুরু করলেন ।

নহ মাতা নহ কন্যা

নহ বধূ সুন্দরী রূপসী --

- আপনি বাংলা জানেন ? চমকে উঠেছে ঐশী, কৌতুহলী চোখে চেয়ে থাকে । যদিও ঐশী তেমন বাংলা সাহিত্য ইদানিং পড়েনা তার কারণ সাহিত্যে আজকাল এত পান্ডিত্যের ছড়াছড়ি, অঙ্ক, দ্যাখনদারি যা ওর কাছে মনে হয় হৃদয়ের ভরাডুবি । আর যেখানে হৃদয়ের কারবার নেই সেখানে ঐশীর মতন ঐশ্বরিক সত্ত্বার জায়গা নেই ।

- হ্যাঁ । আমি আদতে বাঙালি । বলে ওঠেন মিসেস পরাঞ্জাপে ।

আমি অবাঙালীকে বিয়ে করেছি । একজনের মুগ্ধ চোখে ছিলাম উর্বশী । এই কবিতাটি উনিই আমাকে আবৃত্তি করে শোনাতেন । অবাঙালী হলেও ভালো বাংলা জানতেন । ১৪টি ভাষায় সাবলীল ছিলেন । বিয়ে হয়েছিল ওনারই সঙ্গে, পরাঞ্জাপে ওনার পদবী । মিডিয়া ব্যারন । আমি তখন একটু আধটু লিখতাম । ওনার সঙ্গে আলাপ প্রেস ক্লাবে । বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রী খুব অসুস্থ, ক্যান্সারের টার্মিনাল পেশেন্ট । উনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন । স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন । একটি সন্তান ছিল । ছোট্ট একটি মেয়ে । সেই সময় আমরা একে অপরের খুব কাছে চলে আসি । উনি হয়ে ওঠেন আমার কাছের মানুষ । উনি আমাকে যতটা পছন্দ করতেন আমি তার চেয়ে অনেক বেশি ওনাকে ভালোবাসতাম ।

আকাশে যখন আগুন লাগতো আমরা হাত ধরে হেঁটে যেতাম সবুজে ঢাকা কোন পথে । এলোমেলো কথা হত, পরস্পরের সঙ্গ বেশি উপভোগ করতাম । বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমারা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম । ধীরে ধীরে ওনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি । এতটাই যে ওনার সঙ্গে দেখা নাহলে থাকতে পারতাম না ।

এরপর একদিন ওনার পত্নী বিয়োগ হল । খুব ভেঙে পড়লেন । আমরা আরো কাছে চলে এলাম । ওনার বাড়ি যাতায়াত শুরু করলাম । এক শুভ লগ্নে আমরা বিয়ে করলাম ।

বিয়ের পর বুঝলাম উনিও আমাকে খুবই ভালোবেসেছেন । আমি সন্তান চাইলাম, উনি বললেন- সেটা সম্ভব নয় কারণ তাহলে মেয়ের সঙ্গে অবিচার হবে । তার প্রতি আমি হয়ত এখনকার মতন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে নাও পারতে পারি । আমরা দুজনেই কি দুজনের জন্য এনাফ নই ?

মুখে কিছু বললাম না । আমার নারী মন কিন্তু ধোঁয়ায় ঢেকে গেলো । নারীর পুর্ণতা তো মাতৃত্বে, সবাই বলেন । দেখো না প্রকৃতি ফলে ফুলে কি সুন্দর ভরে ওঠে, হেসে ওঠে । নারী তো প্রকৃতি । আর আমি বঞ্চিত হব এই সৌভাগ্য থেকে ? বিশেষ করে যাকে ভালোবেসে জীবন সাথী রূপে পেয়েছি তার সন্তান পাবো না ? এই যন্ত্রণা যে কি বেদনাদায়ক যে ভুগেছে সেই জানে । একটা লড়াই চলতে থাকে নিজের সঙ্গে । আমার ভালো আমি আর মন্দ আমির মধ্যে । কে কাকে টক্কর দেয় সেটাই দেখার । ওর মেয়েকে আমি আমার মেয়ে বলে কোনদিন মানতে পারিনি । লোকসমক্ষেও আমি ওকে *আমার স্বামীর মেয়ে* বলে অ্যাড্রেস করতাম । ও খুব ছোট ছিল কিছু বুঝতো না তাই কোন অভিযোগও ছিলনা । আদর করে ওকে সবাই আকু বলে ডাকতো । ও কিন্তু আমাকে মা বলেই সম্বোধন করতো । গলা জড়িয়ে ধরতো মাঝে মাঝে আমি অন্তরে জ্বলতাম । কারণ ওরই জন্য আমার আত্মজ কোনদিন ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ পাবেনা এই জগতে ।

দিন কেটে যেতে লাগলো । আমিও মনে মনে এক দু:সহ জ্বালায় জ্বলতে লাগলাম ।

তারপর এলো সেই দিন। আমরা উত্তর ভারতের এক জঙ্গলে বেড়াতে গেলাম সপরিবারে। ঠিক এরকমই এক সাফারিতে সেবার আমরা গিয়েছিলাম। বাস ভর্তি মানুষ। সবাই উত্তেজিত নতুন অ্যাডভেঞ্চারের আশায়। পুরনো দিনের অস্টিন গাড়ির মতন দেখতে সেই বাসগুলো। সার দেওয়া সীট। কিন্তু জানালায় কোন জাল ছিলনা, শুধু রড দেওয়া ছিল। ফাঁকা ফাঁকা রড।

বাঘের বসতির কাছে যখন আমরা পৌঁছাই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে উত্তেজনায়। বিরাট একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। মাংসাশী। লোভী চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। সবাই চেঁচাচ্ছে। কারণ বাঘ বনানীর কোলে মুক্ত হলেও বন্দী। আমরা তো সবাই বাসের ভেতরে, আমার স্বামীর মেয়েও জানালা দিয়ে গলা বাড়ায়। এই সুযোগ। কি যে হয়ে গেলো ঐশী জানিনা, আমার পাশবিক আমিটা যেন হঠাৎ জেগে উঠলো। ভীড়ের মধ্যে আমি আলতো করে ওকে ঠেলে নিচে ফেলে দিই। জানালায় জাল না থাকায় ও বাসের লোকের চাপে ও সহজেই গড়িয়ে নীচে চলে যায়। ভিড়, উল্লাস, চেঁচামেচিতে লোকের চোখ এড়িয়ে যায় এই ঘটনা।

নিমেষের মধ্যেই ম্যান ইটার খুবলে নিলো ওর ছোট্ট শরীর। কিন্তু ততক্ষণে আমি চোখ ঢেকে ফেলেছি।

হয়ত ইন্সটিংক্টটে। এরপর থেকে ওরা বাসগুলোর জানালায় লোহার জাল দেওয়া শুরু করে।

সবাই জানলো এটা দূর্ঘটনা কিন্তু আমি তারপর থেকে বুকে এক পাষাণ নিয়ে বেঁচে আছি ঐশী। জীবনে কোন সাফারিতে যেতে পারিনি আর। এমনকি অ্যাফ্রিকায় গিয়েও। স্বামী ভেবেছেন আমি আকুর ঘটনাটা ভুলতে পারিনি।

মন খুলে কোনদিন কাউকে বলতে পারিনি এই কথা আজ তোমায় সব খুলে বললাম। অনেক দিন পরে আজ জীবনের অপরাহ্ন রেখায় দাঁড়িয়ে তোমার একান্ত অনুরোধে এই সাফারিতে এসে মনে হল তোমায় সব বলা যায়। কেন মনে হল তা জানিনা। সবসময় সব কাজের যুক্তি খুঁজে পাইনা। তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চাইলে দিতে পারো। যদিও আমার প্রাপ্য শাস্তি আমি মনে হয় পেয়েই গেছি। ভেবেছিলাম ওকে সরিয়ে দিলেই আমি সুখি হব। আমার স্বামী চেয়েছিলেন আবার পিতা হতে কিন্তু একটি জটিল স্ত্রী রোগের শিকার হলাম আমি, ডাক্তার জানালেন আমি কোনদিন মা হতে পারবো না ; Infertility আমায় গ্রাস করলো।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মিসেস পারঞ্জাপে। তারপর হাউ হাউ করে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। আকাশ বাতাস যেন কেঁদে উঠছে মিসেস ভারতী পরাঞ্জাপের সঙ্গে করুণ সুরে।

আশেপাশের সবাই অপ্রস্তুত একজন বয়স্ক মহিলাকে এইভাবে পাবলিক্লি কাঁদতে দেখে।

ঐশী অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওনার দিকে। রুচিশীলা, বিদূষী এই বিদগ্ধ মানবীর দিকে। ওর সব কিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, বড্ড জান্তব লাগছে চারপাশ। মানবিক জান্তব। জঙ্গলমহলে, এক বর্ষণমন্দ্রিত অস্বস্তিকর দুপুরে।

# করবী

সফল পার্সোনেল ম্যানেজার করবী মন্ডলের মা বাজারে সবজি বিক্রী করতেন। ওর ছোটবোন ছবি আর ও করবী মায়ের সঙ্গে থাকতো রেল লাইনের ধারে একটা ঝুপড়িতে। ইট দিয়ে তৈরী, মাথায় টালি সেই বাড়ির। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। কিন্তু মা বলতেন রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মাথা উঁচু করে হাঁটবে। কোনদিন কারো কাছে মাথা নোয়াবে না। চেষ্টা করবে অন্যায় না করার।

ওর বাবাকে ওদের তেমন মনে নেই। খুব ছোট বেলায় দেখেছে। শুনেছে সুন্দরবনের দিকে ওদের বাসা ছিল। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। নানান চাষ হত, ছোট একটা মুদি খানা ছিল, এছাড়াও ওর বাবা জঙ্গলে মধু আনতে যেতেন। সেই যাত্রা সবসময় মধুময় হতনা। একদিন বাঘের পেটে চলে যান।

বাবার অবর্তমানে আত্মীয়দের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। গ্রাস করতে থাকে ওদের জমি, দোকান ইত্যাদি। আসে অভাব। খেয়োখেয়ি থেকে বাঁচতে ওর মা একদিন ওদের হাত ধরে একদল সৎ লোকের সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। কিছুদিন এর তার বাড়ি ডোমেস্টিক হেল্পের কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে সবজির ব্যবসা শুরু করেন। ওদের গ্রামের যে সব লোক ওর মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গিরিজা পিসি বলে এক বৃদ্ধা ছিলেন। সম্পর্কে মায়ের পাড়াতুতো পিসি হন। বাল বিধবা। একাই থাকতেন। তাই আদরের বোনঝি, ডাক খোঁজ করা পাতানো বোনঝি র সঙ্গে চলে আসেন কলকাতা। তিনি ওদের সঙ্গে আমৃত্যু ছিলেন। মায়ের মা হয়ে, গার্ডিয়ান হয়ে।

মায়ের রুচি ছিল। ছোট্ট ঘরটা ছিমছাম সাজানো ছিল। পুর্ণিমার রাতে আকাশে চাঁদ উঠলে মা এক চিলতে উঠোনে পা ছড়িয়ে চাঁদের মধুরিমায় অবগাহন করতেন। ওদের গ্রামের বাড়ির পাশে একটি পুষ্পিত করবী ফুলের গাছ ছিল। মায়ের বড় প্রিয়। সেই ভালোবাসাই মেয়ের নাম দিয়েছে করবী।

মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় করবী পড়াশোনা করে। স্কলারশিপ নিয়ে ম্যানেজমেন্টের উচ্চ শিক্ষা নেয়। ছোটবোন ছবি তো হারিয়ে গেছিলো। বারোভূতের মেলা থেকে একদিন সে নিঁখোজ হয়ে যায়। বহু বছর পরে তাকে পাওয়া যায়। কোলে ছেলে, হাওড়া স্টেশানে দেখা পায় ওদের এক পরিচিত। ছবিকে উত্তর প্রদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে এক বৃদ্ধ জমিদার ওকে রক্ষিতা করে রাখে। ক্রমে সুন্দরী ছবির কোল আলো করে আসে একটি পুত্র সন্তান। তারপর একদিন ছবি বেপাত্তা হয়ে যায় ওর মালিকের সাতমহলা বাড়ি থেকে।

কলকাতায় অবশ্য ওকে বেশিদিন রাখা যায়নি। আবার একদিন কোথায় হারিয়ে গেলো ছেলেকে ফেলে। সেই ছেলেকে তো করবীর মা লালন পালন করলো। এখন সে করবীর সঙ্গে থাকে। মা গত হয়েছেন বহুদিন। করবী এখন একটি কোম্পানির লেবার অফিসার। মাঝে মাঝে ঘেরাও হয়।

তখন দুই ছেলে মিলে মা ও মাসির জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। ওর নিজের ছেলে তো ইভ্যালিড। পঙ্গু। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে। স্বামী বরুণ ওর ম্যানেজমেন্ট ক্লাসের সহপাঠী ছিল। করবী বরুণের চেয়ে বেশী ব্রিলিয়ান্ট ছিল। পিটার ড্রাকার, এনশক্ষভ উতঁষর এর তাত্ত্বিক আলোচনা এত সুন্দরভাবে রিয়ল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতো করবী যে মাস্টার মশাইদের প্রিয়

ছিল । অনেকেই জিজ্ঞেস করতেন ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কি । যখন শুনতেন ও খুব সাধারণ ঘর থেকে এসেছে ওরা অবাক হতেন । ও বলতো ওর মা বাজারে সবজি বিক্রী করতেন । মায়ের কাছেই কিছু বেসিক লেভেল ম্যানেজমেন্টের পাঠ নিয়েছে । প্রফেসররা আরো উৎসাহ দিতেন।

এখন লালুপ্রসাদকে দেখতে আসছেন বিদেশি ম্যানেজমেন্ট ছাত্ররা । এরকম কত শত লালুপ্রসাদ ছড়িয়ে আছেন গলির আনাচে কানাচে কে জানে । করবী যেহেতু জীবনের একটা সময় নিম্নবর্গের মানুষের সংস্পর্শে কাটিয়েছিল তাই কর্মজীবনে প্রবেশের পরে সে অচিরেই সফলতা পেলো । লেবার অফিসার হিসেবে করবী শুধু তাদের মালকিন নয় কাছের মানুষও বটে । গরীব, অসহায়, শ্রমিক মানুষজনের সুখদু:খ সে অন্তর দিয়ে অনুভব করতো । হৃদয়ের বড্ড কাছাকাছি যে তাদের বাস ।

পরবর্ত্তী জীবনে করবী অবশ্য অনেক ভালো চাকরির অফার পেয়েও নেয়নি । বরুণের জন্য স্যাক্রিফায়েস করতে হয় ওকে কারণ বরুণ খুব মেধাবী ছিলনা তাই হাই ফাই অফার কোনদিনই জোটেনি ওর কপালে । ম্যানেজার হিসেবেও ওর অ্যাপ্রোচ ছিল অটোক্র্যাটিক । আধুনিক দুনিয়ায় ম্যানেজার হিসেবে সফল হবার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ ।

বেশি মাইনের চাকরি করলে বরুণের হীনমন্যতা জন্মাতে পারে মনে করে সে নিজের একটা লো প্রোফাইল মেন্টেন করতো । বরুণের পরিবার অবশ্যই খুব ভালো ছিল । ভালোবাসার জন্য করবীও এই বলিদান দিয়েছিল । কিন্তু আখেরে লোকসানই হল । কিছু কিছু ভুল শুধরানো যায়না । মেনে নিতেই হয় ।

বিয়ের পর বেশ সুখেই কাটলো কিছুদিন । তারপর একদিন ওকে আর ওর পঙ্গু পুত্রকে হেলায় ফেলে বরুণ অন্য নারীতে গেলো । একাকিনী করবীর জীবন হয়ে উঠলো দু:সহ ।

তবু ছবি আর ওর নিজের ছেলের জন্য ওকে বাঁচতে হল । জীবন তো নিজের খাতে বয়েই যায় । থামতে জানেনা ।

আগে অন্যদের কাগুজে ডাইভোর্সের কথা শুনে নিজে বিশ্বাস করতো একটি বিচ্ছেদ মানেই সব শেষ নয় বন্ধুত্ব রাখা চলে কিন্তু আজ বুঝেছে যা ভাবা সহজ তা বাস্তব জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করা তত সহজ নয় ।

বাস্তব পথ ভাবনা পথের মতন মসৃণ নয় ।

ছেলেরা বড় হল । ওর ছেলের নাম জোজো । ছবির ছেলে টোটো । জোজোকে ও পড়িয়েছে । সে এখন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে আর ছবির ছেলে বি এস সি করে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে । হতভাগ্য ছবিটা যে কোথায় হারিয়ে গেলো !

নিজে দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে বলেই হয়ত করবীর সমাজসেবা করার একটা প্রবণতা ছিল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে কিছু কিছু চ্যারিটি করতো । পরে অবসর নিয়ে আদিবাসী সমাজের জন্য কাজ করবে স্থির করে চলে আসে এক পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে একটি*এন জি ওর* ম্যানেজার হিসেবে । দুটি পাতা এই এন জি ও টির নাম । ওর নিজস্ব দুটি পাতা অর্থাৎ ওর ছেলেরা ( বোনপো কে ও ছেলে বলে ) যে যার কাজে ব্যস্ত । এখন করবী একাই থাকে ছোট্ট পাহাড়ি এলাকা ঝালরে । ঝালরে আছে অনগ্রসর উপজাতি মাশো । এদের মধ্যে কুসংস্কার, অশিক্ষা ছাড়াও আছে দলীয় সংঘর্ষ । এদের দুই ধরণের ধর্ম বিশ্বাস । একদল নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী অন্যদল সাকার । সেই নিয়েই চলে লড়াই । এছাড়া অতিরিক্ত মদ খেয়ে

মাতলামো করে সর্বস্ব খুইয়ে অনেক সময় এরা সমাজের যাতনা হয়ে ওঠে । এদের হাতে কলমে কিছু শিক্ষা দান, শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসার প্রসার সর্বোপরি একটি সুস্থ জীবনের হদিস দেওয়াই এই এন জি ওটির উদ্দেশ্য ।

করবী দায়িত্ব নিয়ে দেখলো এলাকায় একজন ফাদার আছেন । সবাই তাকে বড়ই শ্রদ্ধা করে ।

ভদ্রলোক সমাজ সেবা করেন । এমন কি আহত পশুদের পর্যন্ত সেবা করায় ব্রতী ।

কাছেই তো অরণ্য । হাতির পাল আসে প্রায়ই । এসেই তচনচ করে ফেলে শস্য ক্ষেত । বনজ মানুষেরা রেগে যায় । হাতি বধের প্ল্যান করে । ফাদার ফ্রেড এদেরকে বুঝিয়েছেন যে হাতির সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠেব না । বরং এমন কিছু করো যাতে হাতি এসে উৎপাত না করে ।

এরপর থেকে ওরা জঙ্গলের ধারে শস্য জমা করে রাখতো যেগুলো তেমন যুৎসই নয় এবং হাতির দল অতি উৎসাহে তাই খেয়ে ফিরে যেতো । একবার একটি বাচ্চা হাতি গাড্ঢায় পড়ে যায় । পালের গোদা হাতি তুলতে না পেরে ফেলে চলে যায় । তখন এই ফাদারের কেরামতিতেই সেই ছানাটি পুনরায় উঠে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয় ।

স্থানীয় এক মন্দিরে এক হাতি ছিল । বাচ্চা হাতি । জঙ্গল থেকে ধরে আনা । ওকে ঠিক মতন খেতে না দিয়ে ও প্রচুর পরিশ্রম করিয়ে প্রায় মেরে ফেলছিল মন্দির কতৃপক্ষ। ফাদার বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ওনার অনুরোধ শুনেছেন মন্দিরের পূজারী শ্রেণী । ছেড়ে দিয়েছেন হস্তী শাবকটিকে উমুক্ত বনে । প্রকৃতির কোলে । সচরাচর এমন ঘটনা ঘটে না । ধর্মীয় গুরুদের ভেতরে ইগোর ক্ল্যাশ আরম্ভ হয়ে যায় ।

ফাদারকে সবাই অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন । আগে একজন সাহেব ছিলেন ফাদার অ্যান্টনি । উনি এসেছিলেন সুদূর ইউরোপ থেকে মিশনারি হিসেবে । ওনার কাজ ছিলো স্থানীয় আদিবাসীদের সুখ দু:খ দেখা । তবে উনি তলায় তলায় ধর্মান্তরিত করার কাজে ব্রতী ছিলেন । সমাজ সেবার বকলমে উনি খ্রীস্টধর্ম প্রিচ করতেন । কেউ খ্রীস্টান না হতে চাইলে তাকে কোন সুবিধে দেওয়া হতনা ওনার তরফ থেকে । এইভাবে বেশ কিছু কাল চলার পরে একদিন আদিবাসীরা ওনাকে ঘর থেকে টেনে বের করে পিটিয়ে মেরে ফেলতে উদ্যত হয় । তখন এই ভারতীয় ফাদার ফ্রেড যিনি সদ্য এসেছিলেন এই গ্রামে উনিই বাঁচান অ্যান্টনিকে ।

- কি করছো তোমরা ? কারো সঙ্গে মতের মিল নাহলেই কি তাকে শেষ করে দিতে হবে ? ওকে তোমরা ক্ষমা করে দাও । ক্ষমাই পরম ধর্ম । আর যদি ক্ষমা নাই করতে পারো তাহলে তোমাদের ধর্ম নিয়ে কেন গর্ব করছো ? সব ধর্ম কি ক্ষমা শেখায় না ?

ওরা ফাদার ফ্রেডের অনুরাগী হয়ে পড়ে । উনি আসীন হন স্থানীয় ছোট্ট চার্চের মাথা হয়ে ।

ফ্রেডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ওনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হল করবীর ।

করবীর ঘরটি একটি ছোট বাড়ি, সামনে একটু বাগান । সেখানে আশ্চর্যজনক ভাবে একটি করবী গাছ রয়েছে । বেশ কিছু ফুল চোখে পড়লো । খিলখিল করে হাসছে । হাঁটু সমান সবুজ সবুজ অজানা কিছু ফুলগাছ তাতে সাদা সাদা বুটি বুটি ফুল ফুটে আছে । একটা পাখি রোজ এসে বসে করবী গাছের ডালে । আপন মনে গান গায় । খুব ভালো লাগে ওর গান শুনতে । জীবন যুদ্ধে এতগুলো বছর কেটে গেছে কখনো এইভাবে পাখির গান শোনার অবকাশ হয়নি । সামান্য অথচ সুক্ষ্ম এই বস্তুগুলোই আজকাল তাকে বেশি আকর্ষণ করে ।

আদিবাসীদের দিয়ে হাতের কাজ করানো ও তাই বিক্রী করা এন জি ও টির একটি অন্যতম আয়ের উৎস । সেই অর্থ ব্যয় হয় অন্য সেক্টরে । করবী দেখলো যে সূচী শিল্পে যারা পারদর্শী তারা প্রধানত এই কাজ করে কিন্তু তাদের একটা সময় বেঁধে দেওয়া হয় বলে চাপের জন্য সব সময় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়না । নিয়মটা পাল্টে দিল করবী । যখন যেমন মন চায় সেই রকম সৃষ্টি করো । একটি প্লাস্টিকের চ্যাপ্টা পেপার ওয়েট গোছের বস্তুর ভেতরে ভরে দিল সুন্দর রং বেরং এর নুড়ি ।তৈরি হল এক অনবদ্য জিনিস । বাঁশ পাতা বুনে বুনে মাদুর, তালপাতার অপরূপ পুতুল, বাঁশের মাথা ছেঁটে সুচারু মোমদানি এইসব সৃষ্টি দিয়ে বিজ্ঞাপন করা হল, বিকিকিনি বাড়ালো করবী । কাঠের গায়ে খোদাই করে অনবদ্য এক দেবীর মূর্তি দেখে কে বলবে শিল্পী ও ভাস্করদের আমরা শ্রদ্ধা করি বটে তবে আর্টিসানরা কিছুই কম যাননা । সৃষ্টিশীল দুনিয়ায় সৃজনীই আসল, ফর্মাল ট্রেনিং তাতে ধার দেয় মাত্র ।

আদিবাসি নাচ ও গানের সিডি করে বিক্রী করলো এক বিদেশী টিভি চ্যানেলকে চড়া দামে ।

গানের আসর হত ৪০ কিলোমিটার দূরের শহরে । খোপায় ফুল গুঁজে কোমর দোলাতো আধুনিকারাও । ক্রমশ এই সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠলো শিক্ষিত সমাজে ।

নানান জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগলো । করবীর নামও ছড়ালো সফল দলনেত্রী হিসেবে ।

- এত তাড়াতাড়ি আপনি এত কাজ করে ফেললেন এতো খুবই গর্বের কথা । কত সহজে আপনি আমাদের সংস্থাকে একটা হাইটে তুলে দিয়েছেন । লোকেরা আমাদের সম্ভ্রম করছে, আগেও তো অনেক মানুষ এসেছেন কিন্তু আপনার মতন এত সাফল্যের রাস্তা কেউ দেখাতে পারেন নি ।

ভারী গলায় বলে উঠলেন সংস্থার ম্যানেজার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ কুন্ডু । করবী হেসে ওঠে গালে টোল ফেলে - সবই মঙ্গলময়ের কৃপা ।

- আচ্ছা আপনাকে একটা ব্যাক্তিগত প্রশ্ন করবো ?

- নিশ্চয় ।

- আপনার স্বামী কি ইহলোক ত্যাগ করেছেন ?

কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে তারপর মৃদু হেসে করবী বলে ওঠে- ছিল তো, কিন্তু অনেকদিন কোন যোগাযোগ নেই । বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আজ অনেক বছর । বলে ঘুরে দাঁড়ায় করবী জানালার দিকে মুখ করে, হয়ত চোখের কোণে চিকচিক করে ওঠা জলবিন্দু লুকাতে ।

কুন্ডু বাবু আর কথা বাড়ান না । প্রসঙ্গান্তরে চলে যান । করবী বুঝতে পারে ওকে নিয়ে এদের অসম্ভব কৌতুহল রয়েছে । ও যেমন শ্রদ্ধেয়া তেমনই এক কুহেলী ওদের কাছে । এক ধোঁয়াশা । সেই ধোঁয়ার অন্য পাশে কি আছে তা দেখার জন্যই কুন্ডুবাবুর এই অসতর্ক প্রশ্ন ।

আর সতর্ক উত্তরাবলি ঝরে পড়ে করবীর বেদনাক্লিষ্ট উচ্চারণে ।

বর্ষায় বন মাতাল । বন ময়ূরী পেখম মেলে ভুবন ভোলানো রূপে মাতিয়েছে চরাচর । নব কোরকে সজ্জিত গাছ । ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে দুলছে চিকন পাতা । পাতা বেয়ে জলের ধারা পড়ছে ।

আজ এখানে বর্ষা বরণ উৎসব । নাচ হবে গান হবে খানাপিনা হবে । *মজা হবেক, কেবল লেশা হবেক লাই !*

মেয়েরা সুসজ্জিত বাহারি পোশাকে । ছেলেরা ধামসা মাদল নিয়ে প্রস্তুত সুরেলা অনুষ্ঠানের জন্য ।

করবী আজ সেজেছে ময়ূরকন্ঠী রঙে । সুন্দর নিপাট শাড়ি পরেছে । গলায়, কানে, হাতে গয়না ।

কেন যেন আজ বিয়ের বেনারসিটাই পড়লো । ভাঁজে ভাঁজে একটু ফুটো হয়ে গেছে । পোকায় কাটা তবুও ।

তবুও ওটাই বেছে নিল । আর কলকাতা শহরে তো এই রং পরা যাবে না এই বয়সে, লোকে হাসবে ।

এই অচিন রঙীন দেশে কেউ ওকে চেনে না । এই সুযোগ ।

সুন্দর করে সাজলো অস্তরাগের করবী, দেয়া ডাকা এই নিবিড় ঘন নীল দিবসে ।

আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী,

তুমি সুর্য ওঠা ভোর আমার আর তারায় ভরা রাতি ---

খুব মিঠে সুরে গেয়ে ওঠে বনবালা সোহলি । রুচিশীল । সুন্দর লাল নীল আল্পনা দেওয়া ওর মাটির ঘরের নিকানো দাওয়া । চাঁদের আলোয় বসে আদিবাসী কবি মুরুং এর লেখা কবিতা পাঠ করে । এই বাংলা গান শিখেছে এক কর্মীর কাছে । দিনের বেলা পিঠে ঝোলা নিয়ে বনে যায় কাঠ কুড়াতে ।

করবী একটু আগেই এলো অনুষ্ঠান মঞ্চে । মোটামুটি অনেক লোক জড়ো হয়েছে । কচিকাঁচা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর যুবক যুবতীরা তো আছে ।

করবী নিজের আসনে বসতে যাবে এমন সময় কুন্ডু বাবু হন্তদন্ত হয়ে এলেন - ম্যাডাম একটু এদিকে আসবেন ?

- কেন ? করবীর সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা ।
- ফাদার ফ্রেড এসেছেন একটু দেখা করবেন না ?

করবী দেখা করতে চায়, ওঁনার কথা এত শুনেছে কিন্তু আলাপ করার সৌভাগ্য হয়নি । এই গভীর মানুষটির সান্নিধ্যে আসা ভাগ্যের ব্যাপার । হ্যাঁ ভাগ্য মানে করবী । ভাগ্যের জোর না থাকলে আজ ও এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতো না আবার একই সঙ্গে ভাগ্যের পরিহাসে ওর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় অধ্যায়ের ওপর নির্মম ভাবে এক কালো পর্দা পড়ে যেতনা । ফাদার ফ্রেডের মতন মানুষ আজও দুনিয়ায় আছেন বলেই পৃথিবী ঘুরছে । নাহলে কবেই স্তব্ধ হয়ে যেতো এই রথ । দুনিয়া বদলে গেলেও গভীরতা পার্সোনিফাইড আজও দেখা যায় ।

ঘাসের চটি ফটফটিয়ে দ্রুত পদচারণায় ঢুকে গেলো করবী অফিস ঘরে যেখানে ফাদার আছেন।

বাতাসে সোঁদা গন্ধ । আকাশ থেকে চুইয়ে পড়ছে মেঘ । আজন্ম প্রকৃতিপ্রেমী করবীকে বেলাশেষেও দূরন্ত করে ডাকছে বৃষ্টিদিন, চঞ্চল হয়ে উঠেছে হিয়া ।

নিজেকে সামলে নিয়ে ঢুকে যায় ঘরে । মুখটা যথারীতি সিরিয়াস করে ভেতরে গেল ।

ভারী খদ্দরের পর্দা খুব একটা নড়লো না । কাউকে দেখা গেলনা । কোথায় উনি ? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যাবার আগে ভেসে এলো গম্ভীর অথচ খুব পরিচিত একটা কন্ঠস্বর - তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারো করবী ?

চমকে ফিরে তাকালো করবী । ফাদার ফ্রেডের মুখটা খসে পড়ে পক্ক কেশ বরুণের লোল চর্ম মুখটা ভেসে উঠলো বর্ষা বরণ উৎসবের পর্দায় । নিজের অজান্তেই এক অদেখা বর্শায় ফালাফালা হয়ে গেল করবীর সমস্ত হৃদয় ।

আরেক বর্ষার রাতে করবীর ছিল বাইরে কাজ । ওর বাড়িতে ছিল ছবি, তার পুত্র ও করবীর পুত্র জোজো । ছবি চিরকালই একটু ক্ষেপি । অঝোর বৃষ্টিধারায় সে বাইরে বেরিয়ে ভিজে এলো । মাথা থেকে চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে । পাতলা শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেপটে গেলো । জলে ভিজে সুগঠিত দেহ প্রস্ফুটিত হল । সেই নিপুন দেহের নিরাবরণ আকর্ষণ এড়াতে পারেনি সদ্য অফিস ফেরৎ বরুণ । ছেলেরা তখন অঘোরে ঘুমিয়ে পাশের ঘরে । চূর্ণ বিচূর্ণ হল সমস্ত সংস্কার । লাজ লজ্জার বাঁধন টুটে গেলো । মিলিত হল ওরা ।

উত্তর প্রদেশে এক বয়সের ভারে ন্যুব্জ জমিদারকে অকাতরে চাঁদ ফেরি করা অপ্সরা লুন্ঠিত হল বৃষ্টি লগ্নে । জলে অঢেল বিষ জেনেও জলমগ্ন হতেই থাকলো বারবার । বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পায় সে কি আর তপস্যা করে ? বরুণ ও ভুলে গেলো সব । উদ্দাম এক জলকন্যা, কোন এক রম্ভা কিংবা মেণকা হরণ করলো তার নিষ্পাপ পৌরুষ ।

যার ওপর এতদিন শুধু করবীরই অধিকার ছিল । মিলিত হতে হতে এক সময় নেশা ধরে গেলো ।

সেই মৌতাতে ওরা দুজনে আলাদা আলাদাভাবে কোন নীল নির্জনে পাড়ি জমালো অচিন দেশে। কৃষ্ণচূড়ারা রক্তিম হল, আকাশ কালো মুখ করে পরকীয়ায় আপত্তি জানালো ও এক সময় বৃষ্টি হয়ে ভেঙে পড়লো তবুও ছবির রূপ যৌবন উচ্ছলতায় অবগাহন করা বরুণ ফিরেও তাকালো না ।

এরপর ঘটনা খুবই সাধারণ । ছবি তো বেপাত্তা হলই, কেউ জানেনা কেন । কেউ চুলচেরা বিচারে গেলোনা কারণ সে আগেও পলাতকা ছিল । তারপর একদিন বরুণও হারিয়ে গেলো করবী, জোজো ওদের জীবন থেকে ।

চিঠি লিখে রেখে গেলো সে অন্যত্র ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছে । তাই ঘর ছাড়ছে মনোমোহিনীর সঙ্গে ।

কেউ দুয়ে দুয়ে চার করার কথা ভাবলো না, সন্দেহও করলো না ।

হল যুগের অবসান ।

অন্য এক তিথিতে, সবুজ আঁধারে আবার দেখা হল করবী ও বরুণ, দুজনের । গহীন অরণ্যে । অরণ্য মিথ্যা বলেনা । অরণ্যর আদিমতা মানুষকে তার বিস্মৃত সারল্য ফিরিয়ে দেয় । উড়ে যায় সযত্নে লালিত মুখোশ । ধরা দেয় ফাদার ফ্রেড রূপী বরুণ । তার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার কাছে ।

দু দিন পরে ফ্রেডের সঙ্গে করবী যায় এক অন্য লোকালয়ে । নির্জনতায় ডুব দিয়েছে সেই এলাকা । বড় একা বড় হাহাকারের জালে জড়ানো । জঙ্গল ও নদী পেরিয়ে এক জীর্ণ বাড়ি ।

সেখানে করবী দেখতে পায় একটি লোহার গরাদ । লৌহকপাটের ওপাশে চেন দিয়ে বাঁধা একটি অতি আপন মুখ । শুন্য দৃষ্টি মেলে জেগে আছে দুটি চোখ ।

চেয়ে আছে মানসিক ভারসাম্যহীনা ছবি । তার আঁখি যুগল কি ক্ষমা ভিক্ষা করছে ? বোঝার উপায় নেই করবীর কারণ সেই চোখের ভাষা বড় ঘোলাটে । সেই কথামালা পড়া যায়না ।

প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়া গ্রাস করেছে ছবিকে । চারপাশে সে করবীকে দেখতে পায় -ওকে কেবলই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে করবী, দোষারোপ করছে, ঘৃণার দৃষ্টিতে ভরিয়ে দিচ্ছে ওর অন্তর । এটাই রোগের উপসর্গই।

করবী হীন বনান্তর শুধুই বোবা হয়ে চেয়ে থাকে ।

সমস্তটা জেনে করবীর বুকটা কেঁপে ওঠে । কষ্টে, ব্যাথায়, হতাশায় ।

বোঝা যায়না ফাদার ফ্রেডের এই রূপান্তর কি নিছক পরোপকারের জন্য ধর্মান্তরিত হওয়া নাকি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, চিত্তশুদ্ধি, সততা আত্তিকরণের অমৃত পথে চলার সৎ প্রচেষ্টা ।

বুনো বাতাস মেঘলা আকাশে ছড়িয়ে দেয় শত শত প্রশ্নের ইন্দ্রধনু ।

সেই রামধনুর নাগাল পাওয়া যায় না ।

# ডাইনি লছিমা

মেয়েটি অনেক কিছু দেখতে পেতো । বর্তমানের গন্ডি ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ, অনাগত ভবিষ্যৎ । সুদূরের অনেক ছবি, চলমান চিত্র । কখনো কখনো বলে ফেলতো । তাতেই কাল হল ।

গোটা ৩০ ঘর নিয়ে এই গাঁ শালিকবাড়ি । উত্তরবঙ্গের পাহাড় একপাশে রেখে গড়ে উঠেছে এই জনবসতি । এদের মূল জীবিকা চাষ বাস আর পুজো পাঠ । কিছু ফার্ম হাউজ আছে । সেখানে কমলালেবু কিংবা চা চাষ হয় । আর আছে কঙ্গনা নদীর বিশাল পাহাড়ি চর । সেই চরে সবুজ, নীল জলের ঢেউ এসে খেলা করে, ছোট ছোট রঙীন মাছ ভেসে বেড়ায় । আর নদীর জল বরফ শীতল । অসম্ভব ঠান্ডা । সেই চরায় বসে সময় কাটায় সুন্দরী যুবতী পাহাড়ি মেয়ে লছিমা । যার ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা আছে ।

স্বপ্ন দ্যাখে কিংবা মাথায় একটা চিন্তার স্রোত খেলে বেড়ায় । কারো কথা খুব গভীর ভাবে ভাবলে সে এসে হাজির হয় ।

বহুবছর ধরেই এটা হয়ে আসছে । যখন পরিবারের অন্যলোকেরা জীবিত ছিল সেই দূর্ঘটনার পূর্বে তখন ওর স্বপ্নের কথা শুনলে ওরা ভয়ে ভয়ে থাকতো এবং শেষ পর্যন্ত সেটা ফলেও যেতো ।

একদিন তো ওর বাবা মা আর যমজ ভাই ও বোন গেলো শিলিগুড়ি । একটি ট্রেকারে করে ওরা রওনা দিলো ।

হঠাৎ লছিমার সেই বিশেষ দৃষ্টি শক্তি এলো, ও দেখলো ট্রেকার গড়িয়ে খাদে পড়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে ওর প্রিয়জনেরা এক অতল গহ্বরে । বাঁচাও বাঁচাও, সে কি করুণ আর্তি !

এক ঝলক দেখার পরেই চীৎকার করে ওঠে সে । পাগলের মতন ঘর থেকে বেড়িয়ে ইতিউতি ছোটাছুটি করতে থাকে । আশে পাশের লোকেরা ওকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু ততক্ষণে দেখা যায় একটি ট্রেকারের খালাসী দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে :

লছিমা, লছিমা তেরি বাপু ওর মা, গলা ধরে আসে লোকটির । লছিমা ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়েছে ।

মাটিতে লুটাচ্ছে ওর নিথর দেহ । সবুজ শিথিল পোশাকের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে গোলাপী তুলতুলে দেহ । লোকেরা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ।

সেই শুরু । লোক জানাজানির । তারপর থেকে ও একাই থাকতো । একটি পুরুষ মানুষ ওর আশে পাশে ঘুরঘুর করতো । এলাকার মাতব্বর । লোকটি বিবাহিত । তবে পরকীয়া করতে সিদ্ধহস্ত । বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে তারপর টাকা পয়সা দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে দিয়েছে । লোকটি স্থানীয় নেপালী রাজনৈতিক পার্টির সদস্য ।

তবে কি জানি কি কারণে লছিমাকে নজর দিলেও ভয় পায় । ওর সঙ্গে জবরদস্তি করতে পারে না ।

একদিন এক জোড়া কপোত কপোতী এলো এই কুঞ্জবনে । স্বামী স্ত্রী । খুব ভাব দুজনের । পাহাড়িয়া পথে হাত ধরা ধরি করে ঘুরে বেড়ায়, হিহি করে হাসে, একে অন্যের গায়ে ঢলে

পড়ে । অকারণে গান গায়, কোমড় দুলিয়ে নাচে । লছিমা রোজ ওদের দেখে । লছিমা কমলা ক্ষেতে কাজ করে । টুকটাক হিসেবের কাজ । পড়েছিল তো, ১২ ক্লাস পাশ করেছিল । তারপর বিয়ের দেখাশোনা শুরু হল । কিন্তু বাবা মা অসময়ে মারা যাওয়ায় বিয়ের ফুল ফুটলো না । এখন কাজ করে আর গান গায়, পাহাড়ি গান, লোক সঙ্গীত । সেই কপোত কপোতী জোড়া ওর কাছে এলো, মেয়ে গান শিখতে চায়, বলে -- দিদি তুমি তো কত সুন্দর সুরে কি একটা গান করো--

আমাকে শেখাবে ?

লছিমা বলেঃ শিখে কি করবি ? শহরে গেলেই তো ভুলে যাবি । মেয়েটি হেসে কয় - না না ভুলবো না । তুমি শিখাও । ক্রমাগত আবদার আসে, ও লছিমার পেছন পেছন ঘুরঘুর করে । বলে, গান শিখাও না গো, আমার বরকে শোনাবো ।

এইভাবে কিছুদিন উত্যক্ত করার পরে লছিমা একদিন বলে ফেললো - গান শিখে লাভ নেই । শহরে গিয়ে তোদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে । লছিমার কথায় মেয়েটি চমকে গেলো, তারপরে বললো : কি বলছো কি তুমি ? জানো আমার স্বামী আমাকে কত ভালোবাসেন ? লছিমা কিন্তু নিজের কথায় অটল । বলে : তোদের দুজনের জীবনেই অন্য কেউ আছে । সেটা শহরে গিয়ে জানতে পারবি তোরা দুজনেই তখনই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ।

ভারি এসেছেন আমার বাকসিদ্ধা রে ! মেয়েটি রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলো ।

আর আসেনি ।

সত্যি সেরকমই হল । শহরে ফিরে দুজনে দুজনের কাজে যথারীতি ডুবে গেলো । তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ।

একদিন দুজন দুজনের গুপ্ত সাইবার প্রেমিক ও প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলো । এবং গিয়ে দেখলো অদেখা সুখ দু:খের সাথী আসলে ওরা দুজনেই । এরপরে কি বিয়ে টেঁকে ? অতএব ডাইভোর্স । লছিমার কথা ফলে গেলো ।

আরেকবার হয়েছিল ।সেবার ওদের গ্রামে । ওদের ক্ষেতের মালিকের ছোটছেলের ক্যান্সার হয়েছিল । রক্ত রোগ । ডাক্তার বললেন বোন মেরো ট্রান্সপ্ল্যান্ট করাতে । করানো হল । লছিমা একদিন সাহেবের খাস ভৃত্যকে বলে ফেললো : সাহেব বেকার এত টাকা খরচ করে ওকে সারালেন । এ ছেলে তো ক্যান্সারে মরবে না, গুলিতে মরবে ।

ভৃত্য লছিমার এই বিশেষ দৃষ্টির কথা জানতো । দৌড়ে গিয়ে সাহেবকে ইনফর্ম করলো । সাহেব লছিমাকে

তলব করলেন । লছিমা গেলো । ভারী পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ভেসে এলো জলদ গম্ভীর কন্ঠ : তুই কি করে জানলি রে লছিমা এমন হবে ? তুই নাকি এসব বলে লোককে ভয় দেখাস ? কত টাকা চাস ?

লছিমা খুব মৃদু স্বরে বলে ওঠে : সাহেব আমি যা দেখি তাই বলি, এ আমার টাকা আমদানির পথ নয় ।

আপনার ছেলে আমার ছোট ভাইয়ের মতন তাই আমি এই কথা বলেছি । আপনি সাবধান হোন ।

ইগো, মানুষের ইগো। এক সামান্য অশিক্ষিত মেয়ে সাবধান করছে অর্চাডের মালিককে ? হজম করা সম্ভব নয়। তাই মালিক ওকেই সাবধান করে দিলেন : ফের যদি এরকম বলেছিস তোর জীভ টেনে ছিঁড়ে নেবো।

এখন বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। লছিমা অপ্রস্তুত হয়ে চলে আসে।

যথারীতি কয়েকদিন পরে হল এক ঘটনা। কমলা বাগিচার মালিকের পাশেই থাকতেন এক আর্মির ব্রিগেডিয়ার।

ওঁনারও ফার্ম ছিল। একদিন অস্তরাগে মালিকের সেই ছেলে ব্রিগেডিয়ারের বাগানে খেলার ছলে ঢুকেছিল। যখন বেরোতে যাবে অল্প আলোয় ব্রিগেডিয়ার দেখতে না পেয়ে হাঁক পাড়লেন : কে ?

ছেলেটি মিনমিন করে উত্তর দিলো : আমি তোতন। সাঁঝবেলায় হুইস্কির নেশায় ব্রিগেডিয়ার কি শুনলেন কে জানে

ভেবে বসলেন চোর। পিস্তল বার করে শুট করলেন পায়ে। সেইসময় পকেট থেকে খেলনা পড়ে যাওয়ায় তুলতে নিচু হল তোতন এবং গুলি লাগলো পিঠে। চীৎকার করে লুটিয়ে পড়লো। ব্রিগেডিয়ার সাহেব দৌড়ে এলেন এসে দেখলেন কি ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। তোতনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু ততক্ষণে শেষ নি:শ্বাস পড়ে গেছে।

লছিমার বদনাম হল লোকের ক্ষতিকারী মহিলা হিসেবে, যার কথায় বিষ আছে। যে টাকা আদায়ের জন্য এইসব করে। ওর মালিক সেদিন টাকা দেয়নি বলে ছেলেটি মারা গেলো। এইসব।

চাকরি গেলো উপরন্তু একঘরে হল।

হাতের ভালো কাজ জানতো লছিমা, স্কুলে ক্রাফ্ট এর কাজ ভালো শিখেছিল। ছোট ছোট হাতে গড়া মূর্তি কিংবা শো পিস বানিয়ে নিয়ে বিকিকিনি করতে লাগলো। বেশির ভাগ খদ্দের হত টুরিস্ট আর তারা ভিনদেশী। কিছুটা ভবঘুরে। একবার এক দম্পতি এলো ওখানে। পুরো দুটো দিন কাটালো লছিমার কুটিরে। রুচিশীল বাড়িখানি। সামনে যত্ন করে লাগানো ফুলের দল। ফুলের চাষ হয়েছে। নিটোল মোরাম বিছানো রাস্তা। উঁচু উঁচু কয়েকটা দেবদারু ও পাইন গাছ। কাঠের বাড়ি। সেখানেই ঐ ভ্রমণরত দম্পতি কয়েকদিন কাটালেন, অথেন্টিক উত্তর পুর্ব ভারতীয় ঘরে কাটাবেন বলে। বেশ আনন্দ হল। লছিমা সাঁঝের বেলায় গান গাইতো। ওরা শুনতো। তারিফ করতো। অসাধারণ গলা ছিল তার। জন্ম থেকেই সুর ও তালের জ্ঞান অতুলনীয়। বিদেশিরা যাবার সময় মোটা বকশিস দিতো।

পরে ওরাই আরো অনেক বন্ধুদের ঐ জায়গার কথা বললো।লছিমার ভালই ইনকাম হত।

অবসরে সে কঙ্গনা নদীতীরে বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবতো তার জীবনের কথা। কিভাবে কি হয়ে গেলো।

তার তো আজ এইভাবে সর্বসান্ত হবার কথা নয়। সবই তো ছিল। বিয়েও হয়ে যেতো বাপ মা জীবিত থাকলে।

ঐ বিশেষ দৃষ্টিই হল কাল। সেতো নিজের জীবনে ওটা ডেকে আনেনি। ওটা প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতা।

তার মা বহুবার বারণ করেছিলেন যে সে যেন এগুলো কারো সঙ্গে আলোচনা না করে কিন্তু সে চুপ করে থাকতে পারতো না, বলে ফেলতো । ফলত ধীরে ধীরে তার পরিণাম স্বরূপ জুটলো লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ।

লছিমা গানের দিকে ঝুঁকে পড়লো । আজকাল লোক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সে ভজনও গায় । সন্ধ্যে বেলা কিছু পূর্ব পরিচিত মানুষ আসে তার কাছে গান শুনতে । সাহেবেরাও অনেকে থাকে ।

একটি শুটিং পার্টি এসেছিল । হিন্দী ছবির শুটিং--- ছ্টমাই কি ব্লেসিংস্ । এই নাম ঐ ছবির । বেশ শুটিং চললো । মাঝে মাঝে ওরা লছিমার সঙ্গে গপ্‌পো জুড়ে দিতো । রাতে গান শুনতে আসতো ।একটা শটে ওকে ঢোকালোও, বেশ যোগিনী সাজিয়ে । ভালই হল লছিমার কিছু টাকা আমদানী তো হল ।

ওরা শুনেছিল লছিমার ভিশন হয় । একদিন কথা প্রসঙ্গে লছিমা জিজ্ঞেস করেই বসলো, সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে এই দৃষ্টির জন্য তোমাদের ভয় লাগেনা । শুনে খুব হেসেছিল ওরা সকলে । তারপর হাসি থামিয়ে পরিচালক মহাশয় বলেছিলেন, আমরা চরিত্র নিয়ে খেলা করি, সব চরিত্রই আমাদের কাল্টিভেট করতে হয় । কোন পর্দা আমরা তৈরি করিনা বুঝলে ?

এরপরে শুটিং পার্টির নায়িকা একদিন রাতে এসে লছিমাকে ধরলো ।

- শুনেছি তুমি ফিউচার বলতে পারো । বলতো আমার যে এই বিবাহিত ডাইরেক্টরের সঙ্গে প্রেম চলছে সেখানে কি আমি ঘর বাঁধতে পারবো ? আমি খুব অসুখী জানো, আমি কি করবো ? ওর স্ত্রী ওকে ছাড়বে না । আমি রোজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ছি, কি করি বলতো ?

লছিমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো । ও দেখতে পেলো মেয়েটির সামনে অনেক বাধা । সেই ডিরেক্টরকে সে অত সহজে পাবেনা । ওর বিশেষ দৃষ্টি শক্তি দিয়ে দেখলো : একটি মেয়ে একটি পাথরের রাস্তা দিয়ে চলেছে, পা দিয়ে রক্ত ঝরছে, পা মুড়ে বসে পড়লো । উঠছে না । তারপর যখন কেউ তুললো তখন সে দিব্যি গটগট করে এগিয়ে যাচ্ছে আর রাস্তাটি ওর পেছনে পেছনে আসছে, রাস্তাটি ফুলে মোড়া ।

তাই স্পষ্ট করে বলে দিল নায়িকা বসুধা কে । বলে দিল : সাহস করে এগিয়ে যাও, দেখবে জীবন তোমার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে । আর যদি বসে পড়ো, হাল ছেড়ে দাও তাহলে জানবে তোমার সব শেষ ।

নায়িকা মনে বল নিয়ে এগিয়ে যাবার অঙ্গিকার করে মোটা বকশিস লছিমার হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলো ।

যেই মাতব্বর লোকটি লছিমাকে বিরক্ত করতো ওর নাম গোমা । জাতিতে ভুটিয়া । খুব রাফ লোক । মদে চূর থাকে অনেক সময় । মুখ থেকে দেশি মদের গন্ধ বেরোয় । তার উৎপাত যেন বেড়ে গেছে । লছিমার চাকরি যাবার পর থেকে সে বড্ড ছোঁক ছোঁক আরম্ভ করেছে । একদিন লছিমা দু কথা শুনিয়ে দিল ।

লোকটি পার্টির ক্যাডার । পেছনে রাজনৈতিক চাঁইয়েরা রয়েছেন । লোকে ওকে সমীহ করে ভয় পায় । আর লছিমার চাকরি যতদিন ছিল লোকের একটা ভয় ছিল ওর মালিককে কারণ উনি এই এলাকার নামী ব্যবসায়ী ও এই অঞ্চল বর্ধিষ্ণু হবার পেছনে ওঁনার ভূমিকা

অনস্বীকার্য । কিন্তু যবে থেকে কাজ গেছে লছিমার মাথার ওপর থেকে সেই ছাতা সরে গেছে । তাই সে একাকিনী বলে অনেকের লোভের শিকার হতে পারে ।

তবুও আজ অবধি সেরকম কোন বিপদ দোরগোঁড়ায় আসেনি ।

ইতিমধ্যে একদিন যামিনী বলে এক যুবতী বিধবার বাড়ি রাতে অতিথির আছিলায় ঢুকে পর পর দশজন মিলে তাকে ধর্ষণ করে । মহিলাটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যায় । চারিদিকে হৈ চৈ । নেতা মহলে লম্ফ ঝম্ফ । কে করলো এমন নৃশংস কাজ ।

পুলিশ গরু খোঁজা খুঁজছে আসামীকে । চারিদিকে একটা সাজ সাজ রব ।

--*কালপ্রিট যত আলোকবর্ষ দূরেই অবস্থান করুক না কেন আইন তাকে শাস্তি দেবেই । নিরীহ অসহায় বিধবার ওপর এহেন পাশবিক অত্যাচার অসহনীয় । আইন ক্ষমা করবে না দোষীদের ।*

নেতা তিলক প্রসাদের পাশে বসা গোমার গমগমে গলা মাইকে ভেসে আসে ।

বেশ কিছু দূরে তখন নিজের হাতে তৈরি পুতুলের বিকিকিনির মেলা গোচ্ছাছিল লছিমা । ঘরে ফেরার পালা এবার । মাঝে মাঝে জীবন দু:সহ লাগে । এমন এমন জিনিস সে বুঝতে পারে যাতে করে জীবনে বাঁচার মাধুর্য্যটাই নষ্ট হয়ে যায় । যা লুকানো, যা পর্দার আড়ালে তা আড়ালে থাকাই বোধহয় ভালো । জীবনের আরেক নামই তো রহস্য । সেই রহস্যময়তা হারিয়ে গেলে জীবনটা নিরামিষ, ম্যাড় ম্যাড়ে হয়ে যায় । প্রকৃতি সবাইকে এইজন্য ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা দেয়না । তাকেও না দিলেই ভালো হত । জীবন তার কাছে হয়ে উঠেছে যন্ত্রণা । এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য সে নিজে হয়ে গেছে বিশেষভাবে দু:খী । তার পরিবারের মৃত্যু যদি সে না দেখতো তাহলে হয়ত সেটাকে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে অসুবিধে হত না । কিন্তু সে তো দেখেছে গাড়িতে ব্রেক খুলে নিয়েছিল গোমার দল । গাড়ি তলিয়ে গিয়েছিল গভীর খাদে । গোমা ভেবেছিল ওদের এইভাবে মেরে ফেলে লছিমাকে বাগে আনবে ।

আর যেমন এখন সে জানে এই পুলিশ যাদের এতো খুঁজছে তারা আসলে গোমার দল । গোমাই পাণ্ডা ।

কিন্তু কি করবে সে ? তার তো হাত পা বাঁধা । প্রমাণ ছাড়া আইন তার কথা শুনবে না ।

একটি বাচ্চা ছেলে আছে ওর পাশের দোকানে বসে । ওটা চা, স্ন্যাক্সের ছোট লোকাল দোকান ।

ছেলেটির নাম ফুজিয়া । লছিমা ফুজিয়াকে ডেকে বললো : জানিস ফুজিয়া এই যে তোদের গোমা ভাই এত লেকচার মারছে, এত সহানুভূতি দেখাচ্ছে আসলে ঐ কালপ্রিট । ঐ করেছে ঐ জঘন্য কাজ ।

ফুজিয়া জানে লছিমার ভিশন আসে, এই অঞ্চলের সবাই জানে । এই কথাগুলো যেন এক চরম উত্তেজনার জন্ম দিল ফুজিয়ার মনে । বয়স কম । ঐ ঘটনা নিয়ে এলাকা উত্তাল । পেটে কথা রাখা সহজ নয় ।

কথা চলে গেলো এদিক ওদিক এবং শেষ অবধি যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হল ।

গোমা জেনে গেলো এই সংবাদ । অসম্ভব রেগে গেলো লছিমার ওপর । প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠলো ।

ততক্ষণে কানাঘুষোতে হয়ত খবর অনেকদূর ছড়িয়ে গেছে এইভেবে সে স্থির করলো কিছু করা দরকার।

হন হন করে হাঁটা লাগলো পার্টির সদর দপ্তরে। চললো আলাপ, আলোচনা।

কিছুদিনের মধ্যেই একদিন রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় ডাইনি অপবাদে লছিমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। তার অপরাধ : সে ছিল অভিশপ্ত। তার কথায় বিষ, দৃষ্টিতেও অঢেল বিষ। সে যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়! নিজের পরিবারকে খেয়েছে, মালিকের ছেলেকে খেয়েছে, এখন ঐ বিধবার করুণ পরিণতির দায়ও তার ঘাড়েই চাপালো গোমার দল। সে আছে তাই অনেকে নেই, সে আছে তাই অনেকে চলে যাচ্ছে এই ধরিত্রি ছেড়ে।

অনেকের জীবনাকাশে ঘনিয়ে আসছে আঁধার। এসব যুক্তি দেখালো ওরা অযৌক্তিকের দল। কেউ প্রতিবাদ করলো না। করার সাহস নেই। আগুনে ভস্মিভূত হয়ে পুড়ে মারা গেল এক নারী বিনা দোষে। কুসংস্কারের বশে।

৬ মাস পরে মুম্বাইয়ের এক বিলাস বহুল অ্যাপার্টমেন্টের উচ্চতলে এক সুসজ্জিত হলে বসে আছে এক নবাগতা মেয়ে। সামনেই এক বড় ডাইরেক্টরের একটি ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে এই নবাগতা যুবতী একটি পাহাড়ি লোকসঙ্গীত গাইবে। বড় ভালো গলা এর। ডাইরেক্টরের স্ত্রী একসময়ে এর সাহায্য নিয়েই জীবনের নানা ওঠাপড়া, ঝড় সামলেছেন। আজ তাই ইনি এদের কাছের মানুষ। স্ত্রী, যিনি নিজেও নায়িকা বড় ভালোবাসেন অলৌকিক শক্তিধারী তার এই লছিমা দিদিকে। ভাগ্যিস তাকে তাদের ঠিকানা দিয়ে এসেছিল মুম্বাই আসার আগে! নাহলে কি যে হত! ভিশনই তো বাঁচিয়ে দিলো লছিমাকে। ও তো দেখেছিল এবার ওর পালা। গোমা সদলবলে ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। তাই সেই রাতে সে পালিয়ে গিয়েছিল পেছনের দরজা দিয়ে। কালো ঘাগরার ওপর আপাদ মস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়ে কিছু সম্বল ও টাকাপয়সা নিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে শেষ বাস

ধরে চলে এসেছিল শিলিগুড়ি। তারপর বলিউড নগরে। বাকিটা ইতিহাস।

# মৌনিবাবা

কেরালা সবুজের দেশ । সবুজের কত রকমের শেড হয় তা দেখতে হলে কেরালা যেতে হবেই একবার । সেখানে পাহাড়ি শহর মুন্নারের একপাশে মৌনিবাবার বিশাল আশ্রম ।

পেস্তা, এলাচ বাগান, দুপাশে সবুজ, রূপালি ঝর্ণা সব মিলিয়ে নয়নাভিরাম । পাহাড়ের মাথাগুলো পেস্তা রংয়ের, দিনের অনেকটা সময় মৌনিবাবার আশ্রম কুয়াশায় ঢাকা থাকে ।

মৌনিবাবা হিমালয়ে তপস্যা করেছিলেন । উনি মৌন ব্রত নিয়েছেন তাই কথা বলেন না । কদাচিৎ কেউ ওঁনাকে কথা বলতে দেখেছেন । চোখের দৃষ্টি খুবই শান্ত কিন্তু তেজোদৃপ্ত । একবার ভক্তের দিকে চাইলেই মন বড় শান্ত হয়ে যায় । কত মানুষ এই আশ্রমে আসেন, দেশ বিদেশ থেকে । তাদের মধ্যে হিন্দু ব্যাতীত খ্রীস্টান, মুসলমান, পার্শি, জৈন সবরকমই আছে । আশ্রমে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা তাও বিনামুল্যে । কিছু কটেজ আছে, গ্রামীণ ধাঁচের সেখানে আগে থেকে বুক করে এসে বিনামূল্যে থাকা যায় । অনেকেই আসেন, থাকেন, উপভোগ করেন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের মেলবন্ধন । থাকেন বেশি বিদেশীরাই ।

লোলিটা এরকমই একজন, জন্ম সুত্রে খ্রীষ্টান । সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছে ।

ভারত তো আধ্যাত্মবাদের দেশ । অনেক পড়েছে সেই বিষয়ে । তারপর রবার্ট আর ওর ছাড়াছাড়ির পর যে ওর তিন নম্বর স্বামী ছিল ও খুব ভেঙে পড়েছিলো তখনই এক কেরালাইট বান্ধবী জানায় মৌনিবাবার কথা। একটু শান্তির খোঁজে ঠিকানা নিয়ে সোজা হাজির হয় লোলিটা এই মুন্নারে । ভীষণ ভালোলাগে ওর এই নিরিবিলি গহীন সবুজ ।

আশ্রমেই নিজেদের অর্গানিক ফার্মিং আছে । বিভিন্ন চাষবাস হয় সেখানে । নিজেদের খাদ্য শস্য ওখান থেকেই আসে আর শহরেও চালান হয় । এই আশ্রমে বেশিরভাগই অনাথ ও পঙ্গু ছেলেমেয়েরা বসবাস করে তাদের আলাদা বাড়ি আছে । তারা হাতের কাজ করে । সেইসব হস্তশিল্প শহরে বিক্রী হয় । সেই টাকায় আশ্রম চলে । আরো অসে ডোনেশন । বিদেশী ভক্তরা মোটা ডোনেশন দেন । দেন বড় বড় শিল্পপতিরাও । সিনেমার লোকেরা । বিদেশে ওঁনার আশ্রমের শাখা আছে । সেখানেও উনি যান তবে কথা বলতে কেউ দেখেনি । লিখিত নির্দেশ দিয়ে থাকেন । ওঁনার শিক্ষাকে বলা হয়

মোক্ষ দর্শন বা মোক্সা ফিলোসফি ।

মৌনিবাবার লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা । গেরুয়া বসন । উজ্জ্বল চোখ । উন্নত খড়্গের মতন নাসিকা । লোলিটা খুব শান্তি পায় এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে । চিন্তাযুক্ত মনটা উড়ে যায় মহাশুন্যে । ভারহীনতার পরশে অনাবিল আনন্দ হয় । দিনের অনেকটা সময় কাটায় লোলিটা ধ্যান করে । মোক্স সাধনা । মৌনিবাবা ভক্তিমার্গ ও যোগ দুটো মিলিয়ে

সাধনা করেন ।

আশ্রমের নিজেদের গোশালা আছে সেখানে লোলিটা গরুর দুধ দোয়ানোটাও শিখে নিয়েছে । ভীষণ মজা । সকালে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে ফল পাড়তে যায় । এই ফলাবাগিচা আশ্রমের হলেও বাইরে থেকে মহিলারা এসে ফল পাড়ার কাজ করে । তারাই আবার সন্ধ্যায় কাজের পরে মেডিটেশন হলে বসে ধ্যান করে । মৌনিবাবার সান্নিধ্যে । প্রকৃতির সন্তান ওরা, ওরা

অনেক বেশি খোলামেলা, ওদের জেট জীবনের চিন্তাগুলো নেই । তাই যেন তাড়াতাড়ি শিখে নেয় ধ্যান আর পাড়ি দেয় মহাআনন্দের বুকে । ভক্তদের কাছে উনি - বাবা । সবাই বাবা বলেই ডাকে । যখন পশুপক্ষীদের সঙ্গে মৌন আলাপে মাতেন তখন তারাও যেন কি এক অপার্থিব আনন্দে অবগাহন করে তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই । ওদের চোখ কথা বলে । কে বলে ওরা মানুষের চেয়ে অধম? মানুষ বোধহয় ওদের অধম ভেবে নিজেদের উত্তম ভাবতে ভালোবাসে ।

এই আশ্রমে গাছেরাও হাসে, আনন্দে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ে । সে এক অনুভবের বস্তু, লিখে বোঝানো যায়না ।

কাছেই তো জঙ্গল । সেখানে বুনো পশুর মধ্যে চিতাও আছে । মাঝে মাঝে আশ্রমের ফার্ম হাউজে ঢুকে পড়ে । তখন স্থানীয় জনগণ সেই চিতাকে ধরার ফাঁদ পাতে ।

আসে ফরেস্ট অফিসার, চিতাকে ঘুম পাড়িয়ে তুলে নিয়ে যায় । তো একবার চিতা ঢুকেছে । তখন বাবা আশ্রমে ছিলেন । চিতাটি ওদের ঘরের সামনেই বেশ বড় সড় মার্জারের মতন বসেছে, থাবা বাগিয়ে । মাঝেমাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে জুল্‌জুল করে ওদেরকে দেখছিলো । মৌনীবাবা দরজা খুলে বার হলেন । বাবার সহকারি অ্যান্থনির তো আঅারাম খাঁচা ছাড়া ! চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রাণীটি কেমন ঝিমিয়ে পড়লো । বাবা তামিল ভাষায় স্নেহমাখা কন্ঠে বললেন - পোড়া, পোড়া ( যা, যা )

চিতাটি উঠে মাথা নিচু করে চলে গেলো । লোলিটা ইউরোপে বসে শুনলে বিশ্বাস করতো না । কিন্তু এই ঘটনা ঘটার সময় সে আশ্রমে ছিল ।

সিদ্ধযোগী মৌনিবাবার সান্নিধ্যে বেশ কিছু ক্যান্সার রুগী সুস্থ হয়ে গেছে । তাদের ম্যালিগন্যান্সি উধাও । এই রুগীদের মধ্যে এক প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীও আছেন । উনি গাইয়ে । তার গলার ক্যান্সার সেরে গেছে । অবশ্য তার যে ক্যান্সার ছিল সেটা পাবলিক আইয়ের বাইরে ছিল । এখন উনি দিব্যি আগের মতন গান করেন ।

বাবা জলপোড়া তেলপোড়া কিছু ব্যবহার করেন না । ওনার ওষুধ, ধ্যান ও যোগাসন । নি:শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া । বেশ কিছু জগৎ বিখ্যাত চিকিৎসক ওনার শিষ্য । কেউ কেউ ওঁনার কাছে যোগ শিখে পাশ্চাত্য জগতে তার প্রসারে ব্রতী হয়েছেন ।

প্রাণায়ম ও প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দিয়ে বাবা রোগ সারান । নিজের আয়ুর্বেদ ওষুধ করখানাও আছে । কেরালা এমনিতেই প্রাচীন আয়ুর্বেদের ভান্ডার ।

ওদের চিকিৎসা পদ্ধতিও বেশ উন্নত । বাবার আশ্রমেও সেরকমই হয় ।

দিনটা শুরু হয় মঙ্গলারতি ও প্রার্থনা দিয়ে । তারপরে দিন গড়াতে শুরু হয় নানাবিধ আশ্রমের কাজকম্মো । একবার এখানে এলে মনটা শান্তিতে ছেয়ে যায় ।

বাবার একটি বদনাম আছে । স্থানীয় লোকে বলে বাবা মাঝে মাঝে লোকাল মার্কেটে গিয়ে এর তার দোকন থেকে জিনিস চুরি করে আনেন ।

প্রথমে ঝামেলা হলেও পরে দেখা যেতো যে সেই দোকনির বিক্রি হঠাৎই খুব বেড়ে গেছে ও আর্থিক উন্নতি হয়েছে । তাই পরের দিকে বাবাকে কেউ কিছু বলতো না বরং অপেক্ষা করে থাকতো কখন বাবার পুণ্য হাতের ছোঁয়ায় দোকান হয়ে উঠবে সোনার তরী ।

ইন্ট্রেস্টিং, ইন্ট্রেস্টিং - বলে ওঠে জন । জন ওয়েন । সে এসেছে আমেরিকা থেকে । আমেরিকায় একজন ভারতীয় সার্জেনের কাছে শুনেছিল বিপসনা মেডিটেশনের কথা । এই মেডিটেশন পদ্ধতিতে লোকে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ও দিনে একটিবার মাত্র খাবার পায় । কারো সঙ্গে কথা বলে না । সারাটা দিন কথা না বলে থাকলে আস্তে আস্তে ক্ষিদে কমে যায় । শেষে মোটেই ক্ষিদে পায় না ।

শুনে জন খুব ইম্প্রেসড্ হয়ে এসেছিল ভারতে । হয়ত পেলেও পাওয়া যাবে অমূল্য রতন । তারপর শিকড়ের খোঁজে চলতে চলতে এই মৌনিবাবার আশ্রমে ।

বাবাকে নিয়ে তথ্যচিত্র বানাবে সে । সঙ্গে কিছু চেলাচামুন্ডা আসাতে যারা স্পিরিচুয়াল ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়, একদিন সামান্য ঝামেলা হল ওদেরকে নিয়েই ।

ওরা আশ্রম কম্পাউন্ডে বসে গাঁজা খাচ্ছিল । বাবা কড়া নির্দেশ দেন ওদের বের করে দেবার । ওরা ঘাড় ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয় কিন্তু মাস কয়েক পরে আশ্রমে পুলিশ রেড করে । প্রথমে কিছুই পায় না । তারপর দফায় দফায় রেড্ চলতে থাকে এবং পর্ণো সিডি, ড্রাগস্ ও অস্ত্রশস্ত্র পায় । লাইসেন্স বিহীন রিভলবার ইত্যাদি ।

শুরু হয় তান্ডব । বাবার চরিত্র নিয়েও টানাটানি হয় । জানা যায় অনাথ শিশুদের অনেকেই বাবার যৌন শিকার, পেদোফিলিয়া । একটি শিশু প্রতিবাদ করেছিলো- তুমি আমার হিসি করার জায়গায় সুড়সুড়ি দিচ্ছো কেন বাবা ?

বাবা নাকি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন - ওগুলো তো অবোধ চামড়া তাই ওখানেও মাঝে মাঝে আরাম দিতে হয় তাহলে ওরাও আনন্দে থাকে । শরীর সুস্থ থাকে । আমরা তো আনন্দে অবগাহন করবো সোনা !

তারপর থেকে শিশুটি নাকি নিজেই ঐ কম্মোটি করতো আনন্দে অবগাহন করার ও শরীর সুস্থ রাখার জন্যে ।

যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে কয়েকটি শিশু সাক্ষীও দেয় টিভি ক্যমেরার সামনে । জন খুব হতাশ হয় --- এটা কি করে হচ্ছে কিছুতেই ওর বোধগম্য হয়না । ও যতটুকু বাবাকে দেখেছে তাতে ওর কখনো মনে হয়নি যে লোকটি এত নোংরা । বাবার সান্নিধ্যে সবসময় ওর মনে এক প্রশান্তি খেলা করতো যার জন্য ও ওঁনাকে নিয়ে তথ্যচিত্র বানানোর পরিকল্পনা করে । কিন্তু হঠাৎ সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেলো ।

বাবার পুরনো শিষ্য শিষ্যারা হতবাক । তাদের মধ্যে অনেক নামীধামী মানুষও আছেন । তাদের কখনো মনে হয়নি যে মৌনিবাবা এরকম উদ্ভট চরিত্রের কোন মানুষ । তার বিকৃত লালসার শিকর তারই আশ্রিত অসহায় মানুষেরা, শিশুরা ।

তারা সবসময় ওনাকে স্নেহশীল, কোমল, মমতাময় অথচ দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবেই দেখেছে । ওনাকে মহাপুরুষই ভেবে এসেছে কিন্তু সেটা যে ছিল মুখোশ তা কি করে জানবে ?

আস্তে আস্তে আশ্রম ফাঁকা হতে শুরু করে । অনেক ভক্তই চলে যায় । অনেকে আশার আলো দেখার আশায় রয়ে যায় । যাদের বাবার সঙ্গে বেশি অ্যাটাচমেন্ট ছিল তারা মনে মনে খুব দু:খ পায় । মানুষ যখন কাউকে ধরে বাঁচতে চায় তখন যদি দেখে সেটি শক্ত লাঠি নয় সাপের লেজ সে তো মূর্চ্ছা যাবেই । খবরের কাগজে আজকাল হেডিং হিসেবে এই গল্পই ছাপা হচ্ছে । তবুও কোনো কোনো শিষ্য আজও বিশ্বাস করে যে বাবা নিস্কাম । যদিও তারা সংখ্যায় খুবই

কম। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে একদিন পরমেশ্বর মুখ তুলে চাইবেন এবং বাবা সসম্মানে মুক্তি পাবেন।

এখন শুধু দেখার যে ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দেন কিনা।

লোলিটা তো একজন নারী, তার তো ইন্টিউশন আছে কিন্তু তারও মনে হয়নি বাবা খুব মন্দ মানুষ। অথচ হাঙ্গেরি থেকে এসেছে কায়া, কায়া টিভি চ্যানেলকে বলেছে যে বাবা ওকে ধর্ষণ করেছেন এবং এখন সে বাবার সন্তানের মা হতে চলেছে এছাড়াও ওকে দিয়ে নাকি পর্ণো মুভিতে অভিনয় করাবার প্ল্যান করেছিলেন বাবা।

ওকে পর্ণো স্টার বানাবার মতলবে মোটা টাকা নিয়েছিলেন এক পর্ণো পরিচালকের কাছ থেকে যে বাবার শিষ্য। এই অভিযোগের হাত ধরেই তো শুরু হয় গোলমাল।

আজ ট্রায়াল শুরু হয়েছে। কোর্ট থেকে হুকুম দিয়েছে ডি এন এ পরীক্ষা হবে। দেখা হবে সন্তানের পিতা সত্যি মৌনিবাবা কিনা। মৌনিবাবা কিন্তু এত হৈচৈ, গোলমাল, নিন্দে মন্দ সত্ত্বেও একদম চুপ। একটাও কথা বলেন নি। তার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিমাও অটল। চোখ থেকে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে, লাল নীল অপার্থিব আলো। কোন পাল্টা দোষারোপ নেই, প্রতিবাদ নেই, কোন ঝড় নেই। যেন এক শান্ত সমাহিত সমাধিস্থ মানুষ। বাবার ঈষৎ পক্ক গোঁফ দাড়ি সমৃদ্ধ মুখখানা আগের চেয়েও অনেক বেশি কোমল। বাবার মুখের বেশির ভাগটাই তো দাঁড়ি গোঁফে ঢাকা। পুরো মুখখানা কেউ সেভাবে কোনদিন দেখেনি। বাবা শুধু মৌনি নন রহস্যময়ও বটে।

ট্রায়াল শুরু হল। সেদিন ডি এন এ টেস্টের রেজাল্ট কোর্টে পেশ করা হবে। লোকে লোকারণ্য। মিডিয়ার লোক, সাধারণ উৎসাহী মানুষজন ও ভক্তের দল। তার মধ্যে খাঁটি ভেজাল দুই ধরণের ভক্তই আছে। যথাসময় শুরু হল সেশন। আইনি মারপ্যাঁচের পর জজের কাছে পেশ করা হল রিপোর্ট। সারা হল জুড়ে উত্তেজনার আগুনে ছাইচাপা দেওয়া যেন। ৮৫ শতাংশ নিশ্চিত ও খুশি এইভেবে যে বাবাই দায়ী বাকিরা কেউ আশবাদী কেউ নিরপেক্ষ। একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে এমনই নিঃস্তব্ধতা চারিদিকে। এমন সময় ঘোষিত হল বিধান। জজ সাহেব রায় দিলেন - উত্তেজনায় ফেটে পড়লো হলের জনতা। এরকম কিম্ভুত কিমাকার কেস জজ সাহেবও বোধকরি তাঁর লম্বা আইনি জীবনে কোনদিন দেখেন নি। কি রায় দেবেন উনি ? কি বলবেন ?

কি করে বলবেন ? তবুও দ্বিধা কাটিয় কঠোর ও বজ্র গম্ভীর কন্ঠে ঘোষিত হল রায়। মৌনিবাবা আজও আগের মতনই শান্ত, স্তব্ধ, নীরব। সন্ন্যাসী রাজা সিনেমায় দেখা কোর্টের দৃশ্যে যেমন হাত দুটো জুড়ে বসেছিলেন উত্তমকুমার সেরকম ভাবে বসে আছেন মৌনিবাবা। মেডিক্যাল রিপোর্ট বলছে- মৌনিবাবা নপুংসক।

***

উটির চা বাগান অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন বাবা। চার ভাইবোন। বাবা নপুংসক। ঘরোয়া ভাবে দাইমার হাতে জন্ম হওয়ায় বাড়িতেই বড় হচ্ছিল ছোট্ট সম্মুগম্ কিন্তু মা ব্যাতীত পরিবারের অন্যানরা ওকে দূর ছাই করতো। মায়ের কাছে সন্তান তো আদরের হবেই তা সে যেমনই হোক। বিশেষ করে লোক জানাজানি হলে ওর বোনেদের বিয়ে দিতে সমস্যা হবে সেইকারণে সবাই চাইতো সে নিজের রাস্তা দেখুক অর্থাৎ নিজের কমিউনিটিতে চলে যাক।

বাবা একদিন অপমান সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে গেলেন । উটি শহরে কিঞ্চিৎ ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে একটি চায়ের দোকানে ঢোকেন । সেখানে চা পানের সময় পাশে বসা এক বৃদ্ধ ব্যাক্তি হঠাৎ বলে ওঠেন - বেটা তোর বাড়ির সবাই তোকে খুব আঘাত করেছে তাইনা তুই লিঙ্গহীন বলে ? তোর বুকের ভেতরে ক্ষতটা আমি দেখতে পাচ্ছি রে, তুই ভেঙে পড়িস না, সমাজ তোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও ভগবান তোকে কোলে নেবেন । যাবি আমার সঙ্গে ? মুরুগনের মন্দিরে ?

বাবা হতচকিত । এই ব্যাক্তিকে আগে কোনদিন দেখেননি অথচ ইনি ওর সম্বন্ধে সব খবর জানলেন কিভাবে ? লোকটির কথার মধ্যে কিন্তু কোন বিদ্রুপ কিংবা ছলচাতুরির আভাস নেই, বড়ই হৃদয়স্পর্শী সেই আলাপন এমন করে তো কেউ ওকে বলেনি কোনদিন চিরটাকাল ও শুনে এসেছে ও অভিশপ্ত, অযোগ্য, ঘৃণ্য, পাপী ।

কিন্তু ও-ও তাহলে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ?

একবার বাবার মনে হল যে বাতাসেরও তো কান আছে, কোনভাবে হয়ত এর কানেও পৌঁছে গেছে ওর দু:খ্যের কাহিনী কিন্তু তাতেই বা কি ? উনি তো ভালো কথাই বলছেন ! আর এখন বাবা কিইবা করতে পারে ? হয় ওকে ফিরে যেতে হবে ওদের হিজড়া দলের কাছে, সেখানে কিভাবে ওরা থাকে সেও এক বিভীষিকা কারণ বাবা তো কোনদিন ওখানে থাকেইনি ! ছোটবেলা থেকে নিজেদের চা বাগানে সে মানুষ । স্বচ্ছলতার কোন অভাব তো ছিলনা, অপমান থাকলেও । বদলে এনার সঙ্গে গিয়ে দেখা যেতে পারে ইনি ঠিক কি চাইছেন । তারপর কোন বদ মতলব দেখলে কিংবা না পোষালে চলে যাবে হিজড়া দলের কাছে ।

সম্মতিসুচক ঘাড় নাড়েন বাবা । ঐ ব্যাক্তি বাবাকে নিয়ে যান ঘন মুদুমালাই জঙ্গলের ভেতরে এক মন্দিরে । পুরনো মন্দির । পাথরের গঠণ । শাল তমাল পলাশে ঢাকা কষ্টি পাথরের মূর্তি, মুরুগনের, অর্থাৎ কার্তিকের । মূর্তিটি এখানেই মাটি খুড়ে পাওয়া গিয়েছিল । স্বপ্নাদেশ পাওয়া । মন্দিরের পাশে একটি হাতি ঘোরা ফেরা করছিল । জংলী হাতি । বাবা লক্ষ্য করলেন যে এই জংলী পশুটি কিন্তু ঐ ব্যাক্তি যাকে এখন বাবা সোয়ামিজি বলতে শুরু করেছেন তার বশ । অদ্ভুত ব্যাপার । পরে বাঘ এলো, সে নিরামিষাশী অথচ বুনো । আজব ব্যাপার স্যাপার । বাবা খুবই পুলকিত হলেন। জীবনের এই দিকটা তাঁর আদৌ জানা ছিলনা । জানা ছিলনা যে তথাকথিত সমাজের বাইরেও জীবন আছে এবং সেখানেও চলে আলোছায়ার খেলা । জানতে পারলেন যে ভগবান রমণ মহর্ষি যখন প্রাচীন দক্ষিণী পাহাড় অরুনাচলে সাধনা করতেন তখন পাহাড়ের ওপরের ধাপ থেকে এক বয়স্ক সাধু নিচে পাথর ফেলতেন মহর্ষিকে মেরে ফেলার জন্যে । কিন্তু মহর্ষির গভীর সাধনা হেতু কোন কিছুতেই কোন তারতম্য হয়নি । কাজেই মৌনিবাবা অর্থাৎ সেইসময়ের সম্মুগম স্থির করলেন তিনিও সাধনার পথই বেছে নেবেন । নিজেকে দৃঢ় করবেন তারপর সেই আলোয় ভরিয়ে দেবেন বিশ্ব ভুবন ।

সোয়ামিজি কিছুদিন বাবাকে আধ্যাত্মবাদের টুকিটাকি শিখিয়ে তারপর গভীর সাধনার জন্যে পাঠিয়ে দেন হিমালয়ে । ফিরে এসে এক অন্য মানুষ তখন, বাবা । দীক্ষিত বাবা গেরুয়া পড়ে নিলেন সন্ন্যাস । হলেন মৌনিবাবা । খুললেন আশ্রম । চলতে লাগলো সেবা ও সাধনা ।

ভালো কাজ করতে গেলে কিছু মন্দ মানুষও জুটে যায় । কেষ্টর দুনিয়ায় তো সবরকম জীবই আছে । তারা কাদা ঘাঁটতে ভালোবাসে । শকুনের মতন তাদের দৃষ্টি কেবল ভাগাড়ে । নোংরা ঘেঁটেই তাদের আনন্দ তার মধ্যে যদি সে জীবনে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে তো নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অপপ্রয়োগেও ব্রতী হয় । এরকমই কিছু মানুষ বাবার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে

পড়েন এইধরণের লোকেরা সাধারণত: একটি বিপক্ষকে দাঁড় করায় তারপর কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করে এক্ষেত্রে অবশ্য তেমন হয়নি । আরো সহজ রাস্তা তারা নিয়েছে । ঘোট পাকাতে থাকে তারা, দলবাজি, নোংরা রাজনীতি করে ফাঁসিয়ে দেয় বাবাকে । শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় শত্রু । বাবা অবশ্য বলেন কেউ তার শত্রু নন । কেউ কেউ অবুঝ । দলের পান্ডা সেই মহিলা নাম যার কায়া সেই তো প্রথম আলোড়ন তোলে ।

যা বললে পাবলিক ভালো খাবে তাই দিয়েই হয় শুরু । যৌন নিপীড়ন ।

তারপর ছোট ছোট বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে সাক্ষী দেওয়ানো । বাবা এই করেছে বাবা সেই করেছে --- !

বাবার মুক্তির লাভের পর প্রকৃত শিষ্যরা যারপরনাই খুশি হন । আশ্রমে সসম্মানে ফিরে আসার পরে বাবা কথা বলেছিলেন । সেই প্রথম ওঁনাকে অনেকে কথা বলতে দেখেন । বলেছিলেন - কায়া কাজটা তুই ভালো করিসনি । তোরা যেকোন বিষয়ের একটা দিক দেখিস, আমরা ৩৬০ ডিগ্রী দেখতে পাই । এর ফল ভালো হবেনা । আমি করলেও প্রকৃতি তোকে ক্ষমা করবে না । নিজের কর্মফল তোকে ভুগতে হবে ।

এরপরে শিষ্যদের দিকে ফিরে বলেন- কোন কাজ করার আগে তোমরা মনে রাখবে সেই কাজ তোমাতে এসেই শেষ হবে । মহাবিশ্বকে যা দেবে সেও তোমাকে তাই ফিরিয়ে দেবে অনেকটা সমুদ্রের মতন । কাজটা বৃত্ত । তাই বৃত্ত রচনার আগে খেয়াল রাখবে নাহলে ভুগতে হবে । কোন খারাপ চিন্তা, ঈর্ষা, রাগ সবকিছুরই নেগেটিভ ফল আছে তাই সব সময় চেষ্টা করবে পরিচ্ছন্ন চিন্তা করতে মনকে শুদ্ধ রাখতে ।

নাহলে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়বে এমন কর্মের কঠিন বন্ধনে যার ফল মারাত্মক ।

ইংল্যান্ড থেকে এসেছে অ্যালবার্ট । এমন ঘটনা চাক্ষুষ করার পরে ও শুধু বলতে পেরেছিলো: আ বিউটিফুল ট্রান্সফর্মেশন ফ্রম আ সাব হিউম্যান টু সুপার হিউম্যান।

মৌনিবাবা এরপরে আশ্রমের ভার কিছু বিশ্বস্ত শিষ্যের হাতে দিয়ে আবার চলে যান হিমালয়ে । হয়ত আরো গভীর সাধনার জন্য ।

আর হাঙ্গেরির নীলনয়না, স্বর্ণকেশী কায়ার পরবর্ত্তী জীবন কাটে মুন্নারের পথে পথে পাগলিনীর বেশে, তার সারা গায়ে নিজ বিষ্ঠা মাখা । মুখ থেকে ঝরছে অসহায় পাগলা কুকুরের মতন লালা ।

টিভি চ্যানেল মুন্নারে আজও আসে তবে মৌনিবাবার কাছে নয়, কায়া নাম্নী ছায়াভূতকে দেখার জন্য ।

**Note ::: স্ক্যান্ডেল-স্নিক্ত ,এক বিখ্যাত বাবাজীর- নপুংসক রূপে কোর্টে আত্মপ্রকাশের বহুবছর আগেই এই গল্প রচিত । এই গল্পটি ক্যালিফোর্নিয়ার ভিন্নমত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো ।**

# নাগ ভৈরব

নিম্নবর্গের যুবক ঝন্টুর নাম লোকে দিয়েছে স্নেক ঝান্টু । সাধারণ পোস্ট অফিসের ক্লার্ক । কিন্তু ওর একটা নেশা আছে সেটা মারাত্মক নেশা । সাপ ধরার নেশা । সাপেদের সঙ্গে কাটাতে ওর বিন্দুমাত্র ভয় বা ভাবনা হয়না । ছোট্ট শহর আজিমপুর পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা । কাজে কাজেই সাপের উৎপাত ভয়ানক ।

যেকোন সময় লোকের বসত বাড়িতে সাপ ঢুকে পড়ে ফলে আতঙ্ক তাদের নিত্যসঙ্গী । কিন্তু ঝন্টু এলেই সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে । পুরনো একটি ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট নিয়ে তার জাল খুলে মুখে একটা কাপড় দিয়ে ব্যাগের মতন বানিয়ে ভেতরে ও যেকোন সাপকে অনায়াসে পুরে ফেলে । তারপর তাকে ছেড়ে দেয় জঙ্গলে । মুক্ত হয়ে সেও ভারি খুশি । জ্বলে ওঠে সর্পমণি । প্রাকৃত ব্যাপার স্যাপার গুলো বেশি ভালোলাগে ঝন্টুর । ওরা তো বনের জীব । মানুষ যদি ঘরবাড়ি বানিয়ে বানিয়ে ওদের গৃহহীন করে তাহলে ওরাই বা যায় কোথায় ? সাপ ধরার বিনিময়ে ঝন্টু কোন টাকা নেয় না । সাপেদের ও ভালোবাসে । ওরা তার বন্ধু ।

- সাপের মতন প্রাণী কি করে বন্ধু হয়রে ? অবাক চোখে প্রশ্ন করে নিশীথ, ঝন্টুর সহকর্মী । ঝন্টু বলে- সাপেরা নিরীহ, ওদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক হল মানুষ ।

তনুজার গা ভরা রূপ । ছেলেবেলা থেকে সুন্দর সুন্দর শুনে শুনে মাথা ধরে গেছে । আয়নার সামনের মেয়েটিকে দেখে আজকাল বড় অচেনা মনে হয় । ওরা শুধু রূপ দেখে, মেয়েটিকে কেউ চিনলো না । কোনারক দেখতে গিয়ে এক বন্ধুকে বলেই বসলো - আমি কি কোনারকের থেকেও সুন্দর রে ? বন্ধু মুচকি মুচকি হাসে । বন্ধু নীলির ধারণা সুন্দরী মেয়েরা একটু পাগলি হয় । খালি রূপের প্রশংসা শুনতে চায় । কিন্তু এই ধরণের তুলনা ও আগে কখনো শোনে নি । কোন উত্তর দেবার আগেই তনুজা বলে ওঠে - দেখ না, ওরা তো ভ্রমণার্থী কিন্তু কিভাবে হা করে আমাকে গিলছে ! তা সত্যি, লোকেরা কোনারক ছেড়ে ওকেই দেখছে । দেখার মতন সৌন্দর্য্য বৈ কি । পটল চেরা ঘন পল্লবে ছাওয়া আঁখি, টিকলো নাক গোলাপের মতন গায়ের রং মানানসই দেহলতা, এক ঢাল কালো চুল । অসামান্যা । এই রূপ কি একজনকে দেবার ?

তবুও সব হিসেব বদলে একদিন একজনই এই রূপের ভাগীদার হল । ভৈরব মুখোপাধ্যায় । সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার । টাকার কুমির নাহলেও যথেষ্ট স্বচ্ছল । মধ্যবিত্ত পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই । বিয়ে হয়ে গেলো । ভৈরব প্রথম রাত থেকেই একটু পসেসিভ বলে মনে হল তনুজার । অত মাথা ঘামায়নি তখন । ভেবেছিল সুন্দরী বৌ পেয়ে এমন আচরণ করছে । পরে দেখলো ওর পসেসিভনেসটা কেমন বাড়াবাড়িতে পরিণত হচ্ছে । কোন ছেলে বন্ধুর দিকে তাকানো চলবে না । কোন পুরুষ ওদের বাড়ি এলে ও ভেতরের ঘরেই কাটাবে ইত্যাদি । দমবন্ধ হয়ে আসতো । একদিন সব বাঁধ ভেঙে গেলো । কৈফিয়ৎ চাইলো তনুজা । ভৈরব নির্লজ্জের মতন বললো- আজকাল যা সব কান্ড হচ্ছে তাতে তোমাকে বার করতে ভয় পাই । কম রূপ নিয়ে তো জন্মাও নি !

তনুজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি ভাবে । আসলে ভাবছিল যে রূপকি তার অভিশাপ ?

আবার রূপ না থাকলেও তো বিপদ। ওরই তো এক বান্ধবী দেখতে বেশ খারাপ ছিল । অবশ্য ভালো পরিবার বলে ভালই বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বিরাট শেভরলে অপ্সরা করে যখন বরের পাশে বসে যেতো লোকে হাসাহাসি করতো । বলতো- দেখ, ঝিয়ের সঙ্গে প্রেম করছে । হয়ত

রূপের অল্টার্নেটিভ যা যেমন ব্যাক্তিত্ব, স্মার্টনেস, ইন্টেলেকচুয়াল কথাবার্তা সেসব মেয়েটির মধ্যে মিসিং ছিল । তাই মানুষ হাসতো । অন্তরের রূপ দেখার ক্ষমতা কি সবার থাকে ? কিছু লোক যেমন প্রচার করে যে কোন মেয়েকে সৌন্দর্য্যের প্রতীক কিংবা সেক্সি ভাবতে গেলে তাকে নগ্নরূপেই দেখতে হবে নয়ত বিশেষ ভাবে অপরূপা হতে হবে আর নাহলেই সে সুন্দরই নয়, আকর্ষক নয় এ কেমন হিসেব তনুজা বোঝেনা ।

- আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না ? তনুজা অভিমানী ।

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস অবিশ্বাসের গন্ডী থাকেনা । সব মিলে মিশে যায় ।

তনুজা এই অদ্ভুত জবাব শুনে আর কথা বাড়ায় না ।

ঘটনাগুলো এক এক করে বলে যায় ভৈরব । ওর কোন মধ্যবয়স্ক কলিগের বৌ পালিয়েছে হাঁটুর বয়সী ছেলের সঙ্গে, সে ছেলে ওদের বাড়িতে আসতো ভদ্রলোকের ভাই হিসেবে, মহিলা ওকে ভাই বলতো হাতে রাখীও বেঁধেছিল একবার । অথবা কোন বন্ধুর বৌ বিউটি পার্লারে যেতো সেখানে ফেসিয়ালের সময় তো চোখ বন্ধ থাকে তো সেইসময় দেখতো কে বুকে হাত বোলাচ্ছে । প্রথমে বোঝেনি । পরে একদিন চোখটা আধখোলা করে দেখলো এক ষন্ডা মার্কা পুরুষ ওর বুকে হাত বোলাচ্ছে । লাফ দিয়ে উঠলো ।

চেঁচামেচি করতেই লোক জড়ো হল । জানা গেলো এটাও বিউটি পার্লারের উপরি ইনকাম ।

ফেসিয়ালের সময় পাশের সাইবার কাফে থেকে কিছু কামুক লোক এসে টাকার বিনিময়ে মেয়েদের দেহে হাত বুলিয়ে যায় । ওদের নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করে ।

আর ছিল ভৈরবের নিজের মাসিমা । মেসো কাজ করতেন জাহাজে । তিনি যখন ভয়েজে যেতেন মাসিমা অন্য পুরুষের বাহুলগ্না হয়ে রেস্তোরাঁতে খেতে যেতেন ভৈরব দেখেছে । এছাড়াও ওর কোম্পানিতে এক বিগ মহিলা বস একবার ভৈরবকে অফার দিয়েছিল তার সঙ্গে মরিশাসে যাবার । ভদ্রমহিলা বিবাহিতা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে পটে না তার । ভৈরব অবাক হয়েছিল ভীষণ । ঘেন্না লেগেছিল । পরে চাকরিটা ছেড়ে দেয় ।

এইসব নানান ঘটনার ঘনঘটা দেখে ভৈরব আর রূপসী বৌকে ঘর থেকে বেরোতে দেয়না । উপরন্তু অফিস যাবার সময় তালা মেরে রেখে যায় বাইরে থেকে ।

এইভাবেই দিন কেটে যায় । তনুজা কাঁদে । ঘরের মধ্যে গুমরে মরে ওর আত্মা । এ কোথায় বিয়ে হল তার ? প্রথম প্রথম বই পড়তো পরে আর ভালোলাগতো না । সে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর করেছিল, এই জায়গায় আসবে বিয়ের পরে জেনে ভেবেছিল প্রত্ন নিয়ে কাজ করবে । এখানে অনেক প্রাচীন গুহা ও শতাব্দী পুরনো মন্দির আছে । কিন্তু সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো । কোল জুড়ে যে একটি উজ্জ্বল জোতিষ্ক আসবে তারও কোনই সম্ভাবনা নেই । ভৈরব সতর্কতা অবলম্বন করতো কারণ সে সন্তান চায়না । সন্তান হতে গেলে তো হাসপাতালে কিংবা নার্সিং হোমে কাটাতে হবে । এই অঞ্চলে একটাই হাসপাতাল । সেখানে লেডি ডাক্তর নেই । আর আজকাল ডাক্তারগুলো যা হ্যাংলা । রোগিনীকে তো ওরা রোগী ভাবেনা ভাবে মহিলা । আর গুপ্ত গুপ্ত জায়গায় চলে চিকিৎসার নামে অ্যাডভেঞ্চার ! ভৈরব তো রিস্ক নিতে পারেনা !! অতএব নো বাচ্চা কাচ্চা ।

ভৈরবের আবার ব্রাহ্মণ বলে খুব গর্ব । মুখোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান তো ! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । খুব অহঙ্কার । অন্যদের বড় হেয় করে । কায়স্থরাই মানুষের পর্যায় পড়েনা তো বৈশ্য আর শুদ্র !

তনুজার পিতা, ভৈরবরা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকূল দেখেই বিয়েটা অ্যারেঞ্জ করেছিলেন । ওরা গাঙ্গুলী ।

তাই উচ্চকূল ও ধনী পাত্র সহজেই পিতার পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে চলে এলো ।

ভৈরবের পিতা ছিল উকিল । মুম্বাইয়ের কাছে উল্লাসনগরে প্র্যাকটিশ করতেন । উনিও একটু ক্ষ্যাপাটে ছিলেন । স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ লেগেই থাকতো । স্ত্রী ছিলেন কায়স্থ ঘরের । প্রেম করে বিয়ে সেই যুগেই । এবং ঝগড়ার পরে রেগে গিয়ে নিজের মুত্র জমিয়ে স্ত্রীকে খাওয়াতেন । বলতেন- কায়েতের বাচ্চা কোথাকার !

শালা ব্রাহ্মণের মুত খা স্বগ্‌গে যাবি ।

তনুজা শুনে চমকে উঠেছিল । এরকম আন সিভিলাইজড্ মানুষ জীবনে দেখেনি । অথচ ভদ্রলোক বলেই সমাজে পরিচিত এরা । নাহলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ আসতো না । আর হ্যাঁ নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে ভৈরব মেশে না । বাড়িতে ডাকার প্রশ্নই নেই । অফিসেও একবার কোন এক সাহার ছেলে তার বিয়েতে নেমতন্ন করতে আসায় চটে গিয়েছিল । বৌকে এসে বলেছিল - ব্যাটা অকুলীন সাহা কোথাকার ! ও ভাবলো কি করে ওর বাড়ি আমি যাবো ? ওরা বিষ্ঠা থেকে পয়সা তোলে ! ছোটলোক ! এগুলো কিছু জানে না, বোঝে না, এগুলোর কোন মনুষ্যত্ব আছে !ওরা হল - ডিসগ্রেস টু সোসাইটি ।

তনুজা যেটা বলেও বলতে পারলো না তা হল - তুমি ব্রাহ্মণ হয়েও কোন ভদ্রলোক ? আর সাহারা যদি বিষ্ঠা থেকে পয়সা তোলেও তো ওখানে তোমরাই বা পয়সা রাখো কেন ?

বিষাদকন্যা একাকিনী কাঁদে । বন্ধ দুয়ার রুদ্ধ বাতায়ন এক ফালি চাঁদের আলো এসে লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরের লালাভ মেঝেতে । ভেন্টিলেটরের পথ বেয়ে ।

ঝন্টু এত সাপ ধরেছে যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ওকে নিয়ে তথ্য চিত্র করেছে । মজার ব্যাপার হল ও কিন্তু এই মারণ খেলা থেকে কোন রোজগার করেনা অথচ লাইফ রিস্ক আছে । তাই আরো নাম ছাড়িয়ে পড়েছে । আজকাল কার স্বার্থপর জগতে যেখানে লোকে একগ্লাস জল খাইয়েও টাকা চায় সেখানে এইরকম একটি চরিত্র সত্যি বিরল মাপের, কাল্টিভেট করার মতনই বটে । তবে প্রচুর সাপের দংশনও ওকে হজম করতে হয়েছে । অনেক সময় সাপের কামড়ে ওর ঝিম ধরেছে । ওষুধ দিয়ে সেরেছে । দেহে ওর এমন অ্যালার্জি হয়েছে যে এর পরে কোন সাপের কামড়ে ওর মৃত্যু হবে । ওষুধে কাজ হবেনা । এমনই বিধান দিয়েছেন চিকিৎসক । তাই আজকাল ও সাপ ধরেনা । আসলে ওর স্ত্রী ওকে সাপ ধরতে দেয়না । ওকে দিয়ে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে ও আর কোনদিন যদি সাপ ধরার কথা স্বপ্নেও ভাবে স্ত্রীর মরা মুখে দেখবে । ছোটজাতের এই সর্প প্রেমী মানুষটি হেসে কথা দিয়েছে ওর গৃহ বেদেনীকে ।

তাকে লোকে বলে serpent-catcher যদিও সে পেশাগত ভাবে herpetologist. নয় ।

ঝন্টুর পরিবারে কেউ বেদে ছিল কিনা ও জানেনা তবে ও কিন্তু এক বেদের কাছ থেকেই সাপ ধরা শিখেছিল । মেলায় আলাপ হয়েছিল এক বেদের সঙ্গে । নিষাদ নাম তার । যাযাবর । বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সাপ খেলা দেখতো । ভয়ানক সব সাপ ওর সুরের তালে তালে অঙ্গ দোলাতো । ওরা তো সর্প নয় এক একটি নৃত্যরত চেতনা । সেই নাগপাশে বাঁধা পড়েছে ঝন্টূর অরণ্য প্রবণ মন । সর্প বিজ্ঞানীরা যতই বলুক সাপ এই পারেনা সেই পারেনা ঝন্টু জানে সাপ সব পারে । ওরা তার সখা । ওর ভাষা বোঝে । আসলে সবার তো সব চোখ

খোলে না তাই সবাই সব কিছু দেখতে পায়না । অথচ না দেখতে পাওয়াকে স্বীকার করতে ওদের আত্মসমানে লাগে । তাই গায়ের জোরে অস্বীকার করে । সবার অনুভূতি তো এক রকম নয় কেউ কম বোঝে, কেউ বেশি বোঝে । তাই তামাম দুনিয়াকে কখনই এক নিয়মে বাঁধা যায়না । ঝন্টু অবশ্য এইসব নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করেনা । সে চুপচাপ নিজের কাজ করে যায় । বেয়াড়া কোন সাপ হলে হয়ত ছোবল খায় । তাতে কি ? বন্ধুরাও তো শত্রুতা করে কখনো কখনো !

সেদিন ছিল নাগ পঞ্চমী । এইসব দিনে সাপের পুজো হয় এই চত্বরে ।

এছাড়া আকাশ পরিস্কার থাকলে দূরের নীল পাহাড়ের ছায়া পড়ে প্রাকৃতিক দীঘিতে । লোকে বলে কালো দিঘী । নাম কালো হলেও জল কিন্তু ভীষণ স্বচ্ছ । সেই অনাবিল সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে ঝন্টু মাঝে মাঝে যায় পাহাড়ের পাদদেশে । সে অনেক দূর । আজ একবার যাবে । তার আগেই পড়ে সর্প দেব স্থান । আসলে সবুজ অন্ধকার পেরিয়ে একটি শতাব্দী পুরাতন বটগাছ রয়েছে । তারই খোলে আছে একটি কোটর । বিশাল । ঘরের মতন । ওর ভেতরে একটি বেদী । সেখানেই রয়েছে একটি মস্ত বড় সাপের অবয়ব । লাল সিন্দুরে লেপা, হলুদ গাঁদা আর সাদা সাদা ফুলে ঢাকা । ধূপের সুগন্ধে রচিত হচ্ছে এক একটি মনসামঙ্গল কাব্য ।

গহীন বন মাঝে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকা এক একটি পাথরের সাপের ফণাকে সিন্দুর লাগিয়ে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দেয় ওরা, তার সামনে চলে মন্ত্রপাঠ, পুজো । হোম যজ্ঞ । লোকে বলে রাতের বেলায় একটা সাপ আসে সব পুজো চত্বরে । কিন্তু ঝন্টু সেটা বিশ্বাস করেনা । কারণ সে জানে এইসব কুসংস্কার । আর সাপেরা অত লোক ভালোবাসেনা । ওরা একা একা কাটাতেই পছন্দ করে । কখন হয়ত চলে এলো লোকালয়ে । কিন্তু তার মানে এই নয় ওরা লোকালয় ভালোবাসে । ওরা খুব লাজুক । ঝন্টুর মনে হয় । হাতে গরুড় রেখা থাকলে ভালো serpent-catcher হয় বলে যে প্রবাদ আছে ও তা মানে না ।

ওর হাতে অবশ্যই আছে ।

ঝন্টুকে দেখে পুরোহিত এগিয়ে এলেন । সে তো এই এলাকার সেলিব্রিটি । প্রসাদ খেয়ে যেতে যেন না ভোলে স্মরণ করিয়ে দিলেন । কচিকাঁচারা রঙীন পোশাকে মেতে উঠেছে । কেউ ভেপু বাজাচ্ছে কেউ সাপের মতন অদ্ভুত একটা পোশাক পরে নাচছে । স্নেক চাচাকে দেখে হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিক ।

ঝন্টু পকেট থেকে বার করে ওদের লজেন্স দেয় । কারো গাল টিপে দেয় । ভেসে আসে স্তব কোটর গর্ভ থেকে, ওরা মাথা নিচু করে প্রণতি জানায় ।

প্রায় দিনান্তে পুজোপাঠ শেষে ঝান্টু প্রসাদ খেয়ে নেয় । সে অব্রাহ্মণ, নিচু জাত হলেও পুজারী তাকে বিশেষ খাতির করে । মন্দিরের ভেতরে সর্পবিগ্রহের কাছে সে যাবার অনুমতি পায়, বিগ্রহকে ছুঁয়ে দেখতে পারে, সবাই পারেনা । সে সাপ ধরা ছেড়ে দিয়েছে । আজকাল সেই কাজটা করে এলাকার বনবিভাগের কর্মীগণ । কারণ সাপ তো বেরোয় প্রায়ই । সে তো কারো নিষেধ মানতে জানেনা !

প্রসাদে মুগের হালুয়া আর পায়েস খেলো । একটু ঘিয়ে ভাজা কোন সন্দেশ গোছের প্রসাদও খেলো ।

বাড়ির জন্যেও নিল । নিলো একগুচ্ছ সুগন্ধী ফুল । প্রসাদী ফুল । পরিবারের মঙ্গলার্থে ।

আকাশ ভেঙে আসছে । হয়ত বৃষ্টি হবে । এইতো বৃষ্টি মাস । প্রকৃতি কেমন স্নান করে নেয় এই সময়ে । গাছ্পালা, লতাপাতা, পথঘাট কেমন ধুয়ে সতেজ হয়ে ওঠে । অস্তরাগের আকাশ আজ কালো । লালিমা চুরি করে নিয়েছে খেয়ালি মেঘ । প্রফুল্ল চিত্তে সার্পেন্ট ক্যাচার গৃহপানে পা বাড়ায় ।

রোজকার মতনই ভৈরব বৌকে তালা বন্ধ করে দূরের কোন শহরে গেছে । তার অফিসিয়াল কাজ আছে । এই এলাকায় তাদের যেই অফিসটা রয়েছে সেটা এমন অঞ্চলে থাকার কথা নয় কিন্তু যেহেতু কোম্পানীর মালিক এই এলাকার ছেলে তাই এখানে একটা অফিসের ব্রাঞ্চ খুলেছেন । যাতে লোকাল প্রতিভাবানেরা সুযোগ পায় । মূল অফিস ৩৫ কিলোমিটার দূরে বড় শহরে । আরো অনেক শাখাপ্রশাখা রয়েছে । ভৈরবকে সপ্তাহে দুবার যেতে হয় মূল অফিসে । এখানে কোডিং হয় ওখানে পোকা বাছা মানে ডিবাগিং । ভৈরব এই অফিসে বসলেও ঐ অফিসেও ওর অনেক জুনিয়ার আছে যারা ওর আন্ডারে কাজ করে । আজকাল গ্লোবালাইজেশনের যুগে তো একটা বিশেষ অঞ্চলে অফিস বলে কোন কনসেপ্ট হয়না । কেউ হয়ত কাজ করছেন মুম্বাইতে কোন অফিসে অথচ তার বস রয়েছেন নিউ জার্সিতে । তাকেই সে রিপোর্ট করে । এরকমই হচ্ছে আজকাল ।

ভৈরবের ফেরার সময় হয়নি । হয়ত রাত হবে । নিজের গাড়ি নিয়ে গেছে । মাত্র তো ৩৫ কিলোমিটর দূরত্ব ।

দিনশেষে রাঙা মুকুলের মতন অপরাহ্নের আলো তার কুহক বিছিয়ে বিদায় ভিক্ষা করছে । একাকিনী তনুজা একটা বই নিয়ে বসে । মনসংযোগ করতে খুব অসুবিধে হয় । হঠাৎ একটা হিস হিস শব্দে চমকে ওঠে !

ড্রেসিং টেবিলের পায়ের কাছে একটা প্রমাণ সাইজের সা--প ! কেউটে না শঙ্কচূড় সে জানেনা । সে সাপ চেননা । আর এইসময় সাপ বিশারদ নাহলে কারো বুকের পাটা হবেনা সাপের জাত খোঁজার ।

বিশাল ল্যাজ্টা দেখা যাচ্ছে । আতঙ্কিত তনুজা সিঁটিয়ে যায়, ভয়ে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে ।

ঘর থেকে বেরনোর উপায় নেই । কারণ দরজার কাছেই সাপটা পুরো রাস্তা জুড়ে রয়েছে । আর বাইরে তো তালা মারা । অবশ্য দরজার উল্টোদিকে একটা খোলা জানালা আছে । যদি কপাল ভালো হয় ও হয়ত নিজেই জানালা বেয়ে পালাবে । কিন্তু ও কি করবে সে কে জানে ? সাত পাঁচ ভাবছে সে । হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে ।

এমন সময় ও দেখতে পায় একটি লোক এদিকেই আসছে । চীৎকার করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তনুজা ।

- বাঁচান, বাঁচান, সাপ, সাপ আমাকে মেরে ফেলবে !

সাপ শুনেই যেন লোকটি বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এলো জানালা পাশে ।

শুধালো - কি হয়েছে ?

কম্পিত কণ্ঠে নিজের সুরক্ষা ভিক্ষা করলো তনুজা । লোকটি বললো- দাঁড়ান, ভয় পাবেন না, আমি আসছি । আপনার কাছে কি বালিশের কোন কভার মানে খোলটা আছে ?

তনুজা বিছানা থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে বালিশের কভারটা খুলে নিলো । লোকটি একটু দূরে গিয়ে একজন পথচারীর সঙ্গে কি কথোপথন সেরে এলো । এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূর্বোধ্য ভাষায় কিসব বললো । সাপটি দু একবার দুলে উঠলো । ইতিমধ্যে সেই পথচারি একটা পুরনো নেট ছেঁড়া ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের নিয়ে এসে হাজির হল । প্রথম লোকটি বড় বড় শিক দেওয়া জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেই র‍্যাকেটের মধ্যে বালিশের কভারটা পুরে একটা প্রজাপতি ধরার নেট মতন বানিয়ে সাপটাকে অনেক কষ্টে প্রলোভন দেখাতে লাগলো ।

সাপটি হেলেদুলে এগিয়ে গেলো । আবার পিছিয়ে এলো । কুন্ডলী পাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ । আবার উঠে এগিয়ে গেলো । এইভাবে বেশ খানিকটা সময় কাটার পর লোকটি ওকে ধরতে সক্ষম হল । কিন্তু তার মূল্য দিতে হল তাকে । সাপটি ঐ কাপড়ের বাক্সবন্দী হবার আগেই দিল এক ছোবল । কোনক্রমে মুখটা বন্ধ করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে ছোটজাতের মানুষ ঝন্টু । শেষবারের মতন । লোকজন ততক্ষণে জড়ো হয়েছে চারপাশে ।

সাপ তো কাপড়ের বাক্স বন্দী । ঝন্টু ভূমিতলে লুটাচ্ছে । যন্ত্রণায় ওর মুখ বিকৃত লাগছে ।

মুখ দিয়ে লালার মতন কি বেরোচ্ছে । তনুজা চীৎকার করে ওদের বলে ওকে ডাক্তার খানায় নিয়ে যেতে । কিন্তু মাধব বলে যে লোকটি জালবিহীন ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট এনে দিয়েছিল সে খুব হতাশ গলায় জানায় --

- কোন লাভ নেই ম্যাডাম, Snake venom এ এতবার সে আক্রান্ত হয়েছে এর আগে যে তার দেহ বিষময় হয়ে উঠেছে, অ্যালার্জি হয়ে গেছে সব ওষুধে । আর কোন ওষুধ তার দেহে কাজ করবে না বলে চিকিৎসক ওকে বারণ করেছিলেন সাপ ধরতে । সে তার স্ত্রীকে এই মর্মে কথা দিয়েছিল । সাপ ধরা ছেড়ে দিয়েছিল । আজ নাগ পঞ্চমীর দিন ঘরে ফেরার প্রতিশ্রুতি নিয়েই সে গিয়েছিল সর্প মন্দিরে । কিন্তু ফেরার পথে অবলা নারীর কান্না শুনে সে তার শপথ ভঙ্গ করেছে । স্ত্রীর কাছে আর ফেরা হলনা তার । সর্প অভিযান শেষে সুস্থ দেহে প্রত্যাবর্তন এই তো ছিল তার সাফল্যের চিহ্ন যে চিহ্ন আজ ধূলায় মিশে গেলো ইতিহাস হয়ে গেলো বিষাক্ত সাপের অন্তিম ছোবলে ।

আঁধার গাঢ় হয়ে আসে । ওকে অন্যরা ধরাধরি করে তুলছে । নিয়ে যাচ্ছে তার বাড়ির দিকে ।

পরদিন ঊষালগ্নে পোস্ট অফিসের ক্লার্ক, ছোটজাতের এক যুবকের গৃহকোণে কান্নার রোল । পতিব্রতা স্ত্রী আছড়ে পড়েছে স্বামীর দেহের ওপর । শাপ শাপান্ত করছে সেই অদেখা মহিলাকে যার জন্য আজ সে ছত্রহীন ।

*আর যোজন খানেক দূরে সদ্য ঝন্টুর গৃহ থেকে নিজ ঘরে ফেরা এক উচ্চজাতের ব্রাহ্মণ সন্তান তার স্ত্রীকে বলছে- ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট । লোকটির আন-কালচার্ড বৌটা তোমাকে এমন শাপ শাপান্ত করছিল যেন তুমি ইচ্ছে করেই সাপটাকে ডেকে এনেছিলে । ছোটলোক আর কাকে বলে !*

# প্রবাহ

মাইশোরে রাজসী আগেও এসেছে কিন্তু চামুন্ডী হিলসে যাওয়া হয়নি । শহরটা ক্রস করার সময় দেখেছে কয়েকবার কিন্তু পথভুল করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি । এবার গেলো । আসলে এবার এসেছে একটি কাজে । এই অঞ্চলেই একটি অন্য সুউচ্চ পাহাড়ে সে আস্তানা গেড়েছে একজন ফসিল বিশেষজ্ঞ হিসেবে । এক নামজাদা paleontologist এর কাছে কাজ করেছে সে । এখানে এসেছে কিছু ডাইনোসারের ডিম পরীক্ষা করার কাজে । বহু বছরের পুরনো । (Cretaceous period, 146 million to 65 million years ago) সেগুলো নিয়ে একটু গবেষণা করবে । আর কিছু প্রত্নচিহ্ন রয়েছে এই পাহাড়ের আনাচে কানাচে সেগুলো পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য । আদিম জনগোষ্ঠির কিছু পদচিহ্ন আছে ।

সে আগেও এখানে এসেছিল তাই স্থানীয় মানুষ তাকে চেনে । এখানে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে । ওরা বলে স্বয়ম্ভু মন্দির । সেখানে এক পুরোহিত আছেন । লোকাল প্রিস্ট । ভদ্রলোক নিজের সুন্দরী মেয়ে বছর ১৫ বয়সের হৈমবতীর সঙ্গে থাকতেন ।

রাজসী তাকে কয়েকবার দেখেছে । সুন্দরী বটে, তবে হৈমবতী না হয়ে নাম হওয়া উচিৎ ছিল লজ্জাবতী । সবসময় লাজে নত । মুখটা তুলে চাইতে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে !

এই যাত্রায় রাজসী চামুন্ডী হিলস ঘুরে গেলো । বেশ ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে । ঘন সবুজের কোলে অনেক উঁচুতে পাথরের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলে মন্দির । ভেতরে গিয়ে দর্শন সেরে এলো । তারপরে নিচে এসে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে সবুজ গাছের ছায়ায় বসলো । দুরে আকাশে দিনশেষের লাল আভা ছড়ানো । মনটা উদাস লাগে ।

জীবনটা টানার দায় একারই । সঙ্গী নেই, পায়নি । মনের মতন সঙ্গী পাওয়া আজকাল বড়ই দুষ্কর ।

চোখে যত দেখা যায় তত কি আর মনে ধরে ? কারো সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার পরেই বেরিয়ে পড়ে আসল রূপ । অথবা এমন একটা কিছু ধরা পরে যা তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব । কাজেই পাকা সম্পর্ক একটাও হয়নি । সে আজও একা । একাকিনী জীবন পথের পথিক । সময়টা কেটে যায় কাজে কাজে, তারপর অবসরে কবিতা লেখা কিংবা ভ্রমণ, এই যেমন আজ এসেছে চামুন্ডী হিলসে। মাইশোর শহর থেকে চামুন্ডী হিলসে আসার পথটিও খুব সুন্দর । গাছে গাছে ঘেরা । সবুজ, শ্যামল, চওড়া রাস্তা একটু পুরাকালের ছোঁয়া । সে অতীত খুড়তে ভালোবাসে । তার কাজই তো অতীত নিয়ে ।

কবে কার কোন জীবাশ্ম চিপে নির্যাস বার করা খুব সহজ নয় । পাথরেও প্রাণ আছে আর তার কাজ হল সেই প্রাণ খুঁজে বার করা ।

ফসিল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে প্রাণের রূপকার ।

সেদিন নিজের বাসস্থানে ফিরে এক কাপ ধূমায়িত ফিল্টার কফি নিয়ে বসলো । এখানে এসে সে ফিল্টার কফির ভক্ত হয়ে উঠেছে । বানানোটা শিখে নিয়েছে । এই কফি ছেঁকে খায় । অনেকটা চায়ের মতন । খেতে বেশ ভালো । একটা কড়া গন্ধ আছে ।

সঙ্গে কিছু মুচমুচে বিস্কুট । জমে উঠলো । একটা বই নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে দরজায় টোকা । উঠে গিয়ে দরজা খুললো ।

এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে । অচেনা মানুষ । চোখে মুখে একটা সৌম্য কান্তি । চুল গুলো বেশির ভাগই পাকা । চশমা, পুরু ফ্রেমের ।

ঈষৎ হেসে বললেন- আমি কাছেই থাকি, উল্টো দিকের পাহাড়ে । আপনাকে কয়েকবার দেখেছি এই বাংলোতে । ভাবলাম আলাপ করি । আপনি কি কোন বিশেষ কাজে এসেছেন ? ভদ্রলোক চশমাটা খুলে মুছলেন । চোখ দুটো দেখতে পেলো সে । অসম্ভব গভীর -যেন তলিয়ে যাবে । রাজসী অত্যন্ত নম্রভাবে জানালো তার কথা । ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন । বলেন কি ? ডাইনোসরের ডিম্ব ? আর অশ্বডিম্ব ? সেটা খুঁজে দেখেছেন কি ? বলেই আবার উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন ।

জোকস্ অ্যাপার্ট, আপনি তো খুব কৃতী মানুষ দেখছি, ভালো ভালো খুব ভালো, এরকম একজন বিদুষী নারীর সংস্পর্শে আসাও ভাগ্যের ব্যাপার । আসলে আমার বিদুষীর ডেফিনেশনটা একটু অন্য রকম বুঝলেন আপনি সেই সংজ্ঞায় সুন্দর ভাবে ফিট করে গেছেন । অনেক শুভেচ্ছা রইলো ।

রাজসী প্রসঙ্গ পাল্টে বলে উঠলো- ভেতরে আসুন না, একটু কফি খান ।

- কফি আমি খাইনা, আমি দুগ্ধপোষ্য শিশুই রয়ে গেছি, রোজ বড় বড় দু গ্লাস দুধ খেতে অভ্যস্থ । বন্ধুরা হাসাহাসি করে, বলেই হা হা হা করে হেসে ওঠেন ।

রাজসী বলে- আসুন আপনাকে খুব সুস্বাদু দুধ খাওয়াবো, মিল্ক শেক । স্ট্র বেরি মিল্ক শেক।

ভদ্রলোক সোফায় বসলেন । ঘরের কোণায় রাখা একগুচ্ছ ভোরের ফুল, একটু যেন ঝরে গেছে । কিন্তু মৃদু সুগন্ধ রয়ে গেছে ।

রাজসী মিল্ক শেক নিয়ে এসে বসলো । ভদ্রলোক খুব তৃপ্তি করে খেলেন আর চলে যাবার সময় বার বার প্রশংসা করতে করতে গেলেন । খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন । রাজসী জিজ্ঞেস করলো - আপনার পেশা কি ? ভূতাত্ত্বিক ?

উনি হেসে বললেন- না, ধরতে পারেন নি । আমি একজন পুওর সায়ন্টিস্ট । গবেষণার কাজে এখানে আছি ।

আমার গবেষণার বিষয়টা খুব অদ্ভুত কিনা তাই এই নির্জনতায় ডুব দিয়েছি ।

- আপনি তো চমৎকার কথা বলেন, মনেই হয়না আপনি বিজ্ঞানী, মনে হয় আপনি কবি ।

- হা হা হা, তা বলতে পারেন । অন্তরে তো আমরা সবাই কবি তাই না ? ওকে বাই আবার দেখা হবে, বলেই হনহন করে পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন গাছের অন্তরালে । রাজসী কিন্তু এঁনাকে আগের যাত্রায় দেখেনি, এরকম একজন বোদ্ধা ও বিচক্ষণ মানুষ এই অঞ্চলে অবস্থান করছেন তাও জানতো না ।

পরদিন সকালে রাজসী গেলো মন্দিরে । পুরোহিতের সঙ্গে গল্প গুজব করলো । প্রসাদ খেলো । পুরোহিত বললেন যে এই অঞ্চলে এতদিন ঐ পদচিহ্নগুলো অনাদরে পড়ে ছিল ।

ওরা ভাবতো এগুলো কোন অশুভ শক্তির পায়ের ছাপ কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে এগুলো আদিম মানবের পায়ের চিহ্ন । কত মানুষ তো ছিল কিন্তু তারা কেমন ছিল ? সে কি জানা যায় ?

পুরোহিত প্রশ্ন করেন । রাজসী মিষ্টি হেসে বলে : কেন যাবে না ? নিশ্চয়ই যায় । আমাদের কাজ তো সেটাই খুঁজে বার করা ।

লজ্জাবতী এলো । ওরফে হৈমবতী । চা নিয়ে এলো । কিছু কথা হল । বড় সুন্দর মেয়েটি তবে লাজনম্রা ।

চোখ নত করেই আছে ।

- ওকে কি পড়ায় বা কাজে দিয়েছেন পুরোহিত মশাই ?
- আপাততঃ ও ঘরেই আছে, ঘরের কাজই করছে । পরে ভেবে দেখবো কি কাজে দেওয়া যায় । কিছু প্রাথমিক পড়া শোনা আমিই শিখিয়েছি । বাইরে যেতে দিইনা । দিনকাল তো ভালো নয় । বড় সরল মেয়েটা । এবার বিয়েটাই দেবো ভাবছি ।

রাজসী হেসে ওঠে । আমাদের দেশে মেয়ে হয়ে জন্মালে সবার আগে মধ্যবিত্ত বাবা মায়েরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন । যেন বিয়েটা একান্তই জরুরী । কৈ রাজসী তো এখনও বিয়ে করেনি ? তাতে কি ? কি অসুবিধে হচ্ছে ওর ? অবশ্য বয়স বেড়ে গেলে হয়ত একা লাগতে পারে সে দেখা যাবে খন ।

সকালে পেটপুরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সে চলে যায় লোকেশনে । কাজ করে । সেখানেই লাঞ্চ খায় । লাঞ্চ বাড়ি থেকে প্যাক করে নিয়ে যায়, চৌকিদারকে বলা আছে, ওর বৌ গরম গরম ইডলি সুস্বাদু টমেটো /নারকেলের চাটনি সহ কিংবা মশলা ধোসা ভেতরে সর্ষে ফোড়ন ও ছোলার ডাল ছিটিয়ে আলুর তরকারি পুরে ধোসা বানানো অথবা সুজির পোলাও এসবই নিয়ে যায় Food Carrier এ করে ।

চৌকিদারের বৌ রুক্মিনী বেশ করিৎকর্মা । একসঙ্গে তিনটে সন্তান হয়েছে তার । আগে নি:সন্তান ছিল । ভাইয়ের এক ছেলেকে পৌষ্য করে নিয়েছিল । সে যখন বেশ বড় এই ১০/ ১২ বছরের তখন রুক্মিনীর কোল আলো করে এলো তিনজোড়া সন্তান । সবই চিকিৎসা বিজ্ঞানের কারসাজি । ওরা খুশি এই ঘর ভরা বাচ্চা নিয়ে । সময় কেটে যায় রাজসীর ও । যখন কাজ থাকে না ওদের কাছে কত মজার মজার গল্প শোনে । কোন পাহাড়ে কি হয়েছে কোথায় একটা পাখির ছানা ডানা ভেঙে ঝর্ণায় পড়ে গিয়েছিল ওরা বাঁচিয়েছে । কোথায় অন্ধকার বনতলে ছায়াভূত ঘোরে, কোথায় টিং টিং করে ঘন্টার মতন পোকা ডেকে চলে এক নাগাড়ে সমস্ত ওদের নখদর্পণে । ওরা যে প্রকৃতির সন্তান । এই এলাকায় বেড়ে উঠছে সব সংবাদ তো জানবেই । রাজসী ওদের জিজ্ঞেস করলো ডাইনোর ডিমের সম্বন্ধে । ওরা হেসেই খুন । ঐ ডিম ওরা দেখেছে এখানকার সবাই দেখেছে । বহু বছর ধরে এই এলাকার মানুষ ঐ এগুলোর কথা জানে । ওরা ভাবতো এগুলো একধরণের পাথর । পরে paleontologist- রা আসল সত্য আবিষ্কার করেছেন । জায়গাটা একটু বিখ্যাত হয়েছে মিডিয়ার দৌলতে । জীবনের আরেক নামই তো প্রবাহ । তাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে ডাইনো স্টেগো, সেই আদিম গোষ্ঠী । প্রবাহে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে হয়ত মানুষও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই ধরিত্রী থেকে । কে জানে ? কাউকে অবশ্যই ও এগুলো

বলে না । এগুলো ওর পার্সোনাল অপিনিয়ন । লোকে শুনলে ওকে পেসিমিস্টিক ভাবতে পারে ।

কিছু অতি উৎসাহী ভ্রমণার্থী এখানে ঘুরে গেছেন । রাজসী অবশ্য অন্তরালেই আছে । মিডিয়া ওর টিঁকি ছুঁতে পারেনি এখনো । ও প্রচার বিমুখ, কোন ভালো কাজ করে নিজের ঢাক নিজেই পেটালে যে কাজের গুরুত্ব কমে যায় সেটা ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে । আজকাল তো প্রচারেরই যুগ । ওর নন বেঙ্গালি বন্ধুরা বলে : নিজের কথা নিজে না বললে লোকে জানবে কি করে ?

তাও ঠিক কিন্তু রাজসীর মনে হয় কাজ যদি খুব ইউনিক হয় সমাজ একদিন না একদিন তাকে স্বীকৃতি দেবেই । এটা একান্তই ওর বিশ্বাস । কাজেই ও সংবাদ মাধ্যম থেকে দূরেই থাকে । অথচ এই আদিম জনগোষ্ঠির পদচিহ্ন আবিস্কারের কৃতিত্ব নিয়ে ও একজন সেলিব্রিটি হতে পারে অচিরেই । কিন্তু ও আড়ালেই থাকতে ভালোবাসে ।

সেই প্রফেসর ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার মোলাকাৎ হল । ভদ্রলোক ওকে নিজের বাড়িতে ডাকলেন । সেদিন ছিল রবিবার । ওরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলো । তারপর টুকিটাকি কথায় জানা গেলো ভদ্রলোক একজন বায়োটেকনোলজিস্ট । এখানে নিভৃতে কিছু গবেষণার কাজ করছেন । বিভিন্ন প্রজাতির মিলনে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করা ওঁনার নেশা ও পেশা দুই-ই । রাজসী মজা করেই বললো- আপনি আর নতুন কি করছেন, সুকুমার রায় তো কবেই লিখে গেছেন- হাঁস প্লাস সজারু ইজ ইকুয়াল টু হাঁসজারু । সেরকমই আপনি নতুন পশু তৈরি করছেন- ঘাসে আছে ভিটামিন তাই খেয়ে গরু ভেড়া অশ্ব বহাল তবিয়তে আছে এসব তো আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি !

ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন । বললেন- বাঙালীর বুদ্ধি, ঠিক মাথা খাটিয়ে বার করেছে ।

বাঙালী অলস কিন্তু গুণের শেষ নেই তো ! আমার জীবনে আমি দেশের মধ্যে যতবার প্লেনে চেপেছি তাতে একমাত্র ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত বলে একজন পাইলটকে দেখেছি যিনি অসাধারণ প্লেন চালান । ল্যান্ডিং এর সময় মনেই হল না যে ল্যান্ড করলাম, স্মুথ ল্যান্ডিং যেন আস্তে করে বসে পড়লাম রানওয়ের কোলে । উনি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট ছিলেন । এছাড়া যতবার ল্যান্ড করেছি অন্যান্য প্লেনে প্রত্যেকবার মনে হয়েছে ঝড় নতুবা ঝঞ্ঝা তো বটেই । বাঙালীর ক্ষমতা আছে করলে করতে পারে ।

রাজসী হেসেছে কারণ ঠিক এর বিপরীত কথা ওর শোনা আছে । বলেছিলেন এয়ারফোর্সের খুব সিনিয়র এক অফিসার । উনি বলেছিলেন যে বাঙালীর দৈহিক গঠণে এমন কিছু ঘাটতি আছে যাতে ওরা ভালো পাইলট হতে পারেনা ।

যাইহোক ও আর কথা বাড়ালো না । এই বিষয়ে জানে কম । শুধু কিছু অপিনিয়ন শুনেছে তাই আর মাথা ঘামালো না । ভদ্রলোক খুব যত্ন করে খাবার বানিয়েছেন । স্যান্ড উইচ, স্ক্রাম্বেল এগ, স্যুপ । মনে হল পাকা শেফ ।

রাজসী খেলো । প্রশংসা করলো । তারপর জানতে চাইলো - আপনার বর্তমান গবেষণা কি নিয়ে ?

- হিউম্যান ক্লোনিং ।

- এই গবেষণায় সফল হলে সমাজের কি উপকার কিংবা অপকার হবে বলে আপনার মনে হয় ?

- বিজ্ঞান দুষ্ট হাতে পড়লে নানাবিধ অপকার হতে পারে, কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না । কে কিভাবে মিসইউজ করবে বলা মুস্কিল । কোন ক্রাইম করে এই ক্লোনকে অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে । উপকার তো অনেক । এদের দেহ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে অন্য সুস্থ শরীরে বসিয়ে জীবন দান করা যায়, এদের এমন জায়গায় পাঠানো চলে যেখানে মানুষের যাওয়া প্রয়োজন কম্পিউটার দ্বারা কার্য সম্পূর্ণ হবেনা কিন্তু মানুষ যেতে সক্ষম না । আবার আরেকটা চরম দিক আছে সেটা হল এই চেতনার সামাজিক পরিচয় কি হবে ? এর তো একটা মন আছে সেই মন যদি কিছু আশা করে তখন তার কি হবে ? তারপর একটু দম নিয়ে বললেন - আমরা চেষ্টা করছি তবে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আইন একে সমর্থণ জানায় নি । তাই আমি এখানে আত্মগোপন করে আমার গবেষণা চালাচ্ছি । যদি সফল হই তখন এথিক্যাল ব্যাপারগুলো ভেবে দেখা যাবে । আমি শুধু দেখতে চাই আমি মানুষ বানাতে পারি কিনা । তারপর বানানো বন্ধ করে দিলেই হল । সেরকম হলে ফর্মুলা ডেস্ট্রয় করে দিলেই হল । তবুও আত্মতুষ্টির জন্যই আমি নিভৃতে এই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি ।

রাজসী বাইরে বেরিয়ে এলো । এবার সে বাড়ি যাবে । অনেক বেলা হয়েছে । ভদ্রলোকের একফালি সবজির বাগান আছে । সেদিকে চেয়ে দেখলো একটা অদ্ভুত ফুল ফুটেছে নিচেটা লাউয়ের মতন ওপরটা অনেকটা মল্লিকা ফুলের মতন । ঈষৎ সাদা বরণ, নীচটা হালকা সবুজ । ও চেঁচিয়ে উঠলো : লাউ মল্লিকা , লাউ মল্লিকা ফুল ফুটেছে আপনার বাগিচায় ।

ভদ্রলোক হো হো হো করে খুব হাসলেন তারপর বললেন : জানেন তো বায়োটেকনোলজিস্টরা শুধু বিজ্ঞানী নন এক একজন শিল্পীও বটে । আপনার এস্থেটিক সেন্স না থাকলে আপনি সুন্দর সৃষ্টি করবেন কি করে ? দেখুন তো লাউয়ের ওপরে মল্লিকা ফুলটি কেমন মানিয়েছে, যদি ওটা আকারে বেখাপ্পা , লম্বা, সাদা বুটিওয়ালা বেগুনের ওপরে হত কেমন বিশ্রী লাগতো তাই না ? তাই আমি বলি আমরা স্পিসিস বানাই না স্পিসিস স্কাল্পট করি ।

আবার হো হো করে প্রাণখুলে হেসে উঠলেন । প্রত্যুতরে মিষ্টি হেসে বিদায় ভিক্ষা করলো রাজসী ।

ঘরে এসে ফ্রেস হয়ে নিলো । হালকা সবুজ রঙের পোশাকে এলো খোঁপায় একটা মল্লিকা লাগালো । ওদের এই বাংলাটার চারপাশে তো অঢেল জমি । ঢালু জমি । বেশির ভাগই আকাশছোঁয়া বৃক্ষ তবে ফুলবনের দেখাও মেলে । পাহাড়ি ফুল ।

বড় অনাদরে ফুটে আছে ।

সেখানে গোলাপ আছে, বনমল্লিকা আছে, জবা আছে আর আছে সবুজ সতেজ বাঁশ ঝাড় । বাংলোর পেছন দিকটা খাদ । দূরের শহরের রাস্তা দেখা যায় ওদিক দিয়ে । আজ রুক্মিনী লাঞ্চে মুর্গা রেঁধেছে । কারি পাতা, সর্ষে, নারকেল দিয়ে চমৎকার এক মুর্গা ।

একটু ঝাল ঝাল, তেল তেল, অসাধারণ খেতে । আগে ও নারকেল দিয়ে রান্না করা মুর্গী খায়নি । এবার খেয়ে দেখলো । খুবই সুস্বাদু । চিংড়ি মাছ নারকেল দিয়ে রেঁধে খাবেন ম্যাডাম ভালো লাগে- রুক্মিনীর রিনরিনে গলার স্বর ভেসে আসে পাহাড়িয়া বাতাসে ।

- জানি, রাজসী বলে ওঠে । আমরা বাঙালীরা ওরকম একটা রান্না করি, ওটাকে বলে চিংড়ি মাছের মালাইকারি ।

রুক্মিনী অবাক চোখে তাকায় । হয়ত ভেবেছিল এটা ওদের পেটেন্ট নেওয়া কিন্তু ও বেচারি তো জানে না যে ইডলি যে ইডলি সেই ইডলিও উত্তরবঙ্গে খাওয়া হয়, নামটা ভিন্ন আর গুড়ের সঙ্গে খাওয়া হয় ।

অনেকটা আমাদের চিতই পিঠের মতন । খুঁজলে হয়ত বঙ্গ সংস্কৃতিতে ধোসার দোসরও পাওয়া যাবে ।

ওরা তো আদতে ঢাকার লোক । ভাগ্যের ফেরে আজ এইপাড়ে । ওদের বাড়িতে তো সব রকম খাওয়ার চল আছে । এক শাকেরই কত ভ্যারাইটি, ভেটকি মাছের ফ্লেস বার করে নিয়ে ঝাল ঝাল করে নেড়ে লাউ পাতার ভেতরে পুরে বড়া বানিয়ে খাওয়া আরো কত রকমের খাবার খেয়েছে ঠাকুমার দৌলতে । মা এইদেশী, এত রান্না জানেন না ।

বাঙালদের তো রীতিমতন খাওয়ার জন্য বদনাম আছে কিন্তু বাঙাল মেয়েরা যে বৃটিশ আমলেও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়তেন সে খবর আর কজন রাখে ? ওর ঠাকুর্দার মামীমা তো ছিলেন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রী । যে রাঁধে সে তো চুলও বাঁধে ।

খাওয়া শেষ করে একটা সিয়েস্তা দিয়ে নিল রাজসী । দুপুরে ঘুম আসেনা তবুও আজ ভরপেট খেয়ে চোখটা লেগে এসেছিলো । সাধারণতঃ ও বাড়িতে থাকলে দুপুরে অল্প খায় । হেভি ব্রেকফাস্ট, হাল্কা লাঞ্চ আরো হালকা ডিনার এবং সেটি সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে এই হল তার খাদ্য তালিকা ।

- ওরে বাবা তুই তো পাক্কা আমেরিক্যান হয়ে গেছিস রে ! বলে উঠেছিল ওর সহকর্মী নীনা ।
- সময় মতন ও পরিমান মতন খেলে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে । আর শরীর ভালো না থাকলে কাজ করবো কি করে ?

রাজসী সাবধানী । নিজের নিয়মনিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দেখায় । ঘুম ভাঙলো অপরাহ্নে । সুর্য পালাই পালাই করছে,আকাশে ঢেলে আবীর ছড়িয়েছে । পাখিরা শিস দিতে দিতে বাসায় ফিরছে ।

বিছানা ছেড়ে উঠে আড়ামোড়া ভেঙে সে মেঝেতে পা দিল । রুক্মিনী - করে হাঁক দিতেই চৌকিদার এলো । তারপর মুচমুচে বিস্কুট সহযোগে এলো চা । বেশ আয়েষ করে এক চুমুক দিল । দূরে মন্দিরে ঘন্টা বেজে উঠলো, সন্ধ্যারতির ।

চা শেষ করে রাজসী পরিপাটি হয়ে সেজে নিলো । ভাবলো একবার মন্দির হয়ে একটু শহরে যাবে । কিছু কেনাকাটা আছে ।

যেমন ভাবা সেরকম কাজ । পেঁয়াজি রং এর মাইশোর সিল্ক পরলো । গাঢ় সবুজ পাড় । মাথায় এলো খোঁপা, কানে চুনী ।

সেজে গুজে সে বেরোলো । মন্দিরের দিকে গিয়ে প্রণাম সেরে পুরোহিত মহাশয়ের আজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চপ্রদীপের শিখা থেকে আগুনের তাপ নিয়ে মাথায় ঠেকালো । দেখলো ওঁনার কন্যা হৈমবতী দূরে দাঁড়িয়ে কিসব কাজ করছে । মনে হয় মালা গাঁথছে ।

রাজসী বললো- আপনার মেয়ে খুব লক্ষ্মীমন্ত । ওর একটা বিয়েই দিয়ে দিন বরং । ঘরের কাজে খুব পটু । সুন্দর গুছিয়ে সংসার করতে পারবে । বলে একটু হাসলো । তারপর বললো- আচ্ছা ঐদিকে যে এক বিজ্ঞান সাধক থাকেন তাঁকে চেনেন ?

পুরোহিত কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে বলে উঠলেন - খুব ভালো করে চিনি । ওঁনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আবার উল্টোদিকে উনি আমায় এমন এক ফ্যাসাদে ফেলেছেন যে বলার নয় ।

রাজসী অবাক চোখে চায়, ঠিক বুঝে উঠতে পারেন উনি কি বলতে চাইছেন ।

নিঝুম সন্ধ্যায় চারপাশ নিঃস্তব্ধ । পাহাড়ের আদিমতা ছাপিয়ে ঝিঁ ঝিঁর ডাক প্রকট হচ্ছে । কেমন আদিবাসীদের কোন বাজনার মতন শোনাচ্ছে । মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পুরোহিত বলে চলেছেন- আপনি প্রথম থেকেই যে হৈমকে দেখেছেন সে আসল হৈম নয় ।

-চমকে ওঠে রাজসী - মানে ? ঠিক বুঝলাম না ! কি বলছেন আপনি ? আপনার কি যমজ মেয়ে ছিল ? হারিয়ে গিয়েছিল ? এ মেয়ে সেই মেয়ে ?

পুরোহিত বলেন -- না না, এ কোন গল্প নয় তবে গল্পের মতনই লাগে শুনতে । আমার মেয়ে হৈম অনেক আগেই মারা গেছে । তখন ঐ বিজ্ঞানসাধক এসে এই ঈশ্বর সাধকের কাছে মিনতি করেন যাতে আমি আমার মেয়ের দেহটা পুড়িয়ে ফেলে নষ্ট না করে ওঁনার সাধনার জন্য দান করি । প্রথমে আমি রাজি হইনি কিন্তু উনি যখন পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে বললেন আমি আর না করতে পারলাম না। এই মেয়েটি আদতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এক মানবী । হৈমর শরীরের কি সমস্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দিয়ে যাকে উনি বলেন ডি এন এ, সেসব দিয়ে উনি গবেষণাগারে এই মেয়েকে তৈরি করেছেন । সেই পুরাণে ব্রহ্মার নাভী পদ্ম থেকে উদ্ভুত হলেন দেবী - পড়েছেন কিনা ? তারপর এই মেয়ে বেড়ে উঠেছে স্বাভাবিক ভাবে । কিন্তু এই গবেষণা এখনো গুপ্ত রাখা হয়েছে ।প্রথমতঃ আইনি ঝামেলার জন্য দ্বিতীয়ত এখনো জানা যায় নি এই মেয়ে বাঁচবে কিনা, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ হতে পারবে কিনা । তার জন্য একে বাইরের জগতের মোকাবিলা করতে হবে । তবেই প্রমাণ হবে যে নকল মানুষ তৈরি করা সম্ভব ।

আর মা বিজ্ঞানের আড়ালে যে সত্য আছে সেখানে তো মানুষ ডাকিনী বিদ্যে দিয়ে হুবহু আরেকটি মানুষ তৈরি করতে পারে ।

গলার স্বর, হাঁটা, চাউনি সব এক হয় । কিন্তু সেই মানুষ স্থায়ী হয়না । আসল মানুষের কোন সমস্যায় বিদ্যে লুপ্ত হলে নকল মানুষটিও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ।

রাজসী কথা হারিয়ে ফেলেছে । চেক চেক শার্ট পরা, মুখে অঢেল হাসি লেগে থাকা প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানী তো ওকে এটা বলেন নি ! হয়ত এখনো পরীক্ষা স্টেজে আছে কে জানে !

এ তো এক চমৎকার । হিউম্যান ক্লোনিং ! মানুষের ঈশ্বরত্ব লাভ ! উহ্ ! দারুণ রোমাঞ্চ হচ্ছে । মানুষ কিনা না পারে তাহলে ! মানুষ সব পারে ।

এসব ভাবতে ভাবতেই যেন অনেক দুর থেকে ভেসে এলো পুরোহিত মশাইয়ের দীর্ঘশ্বাস মেশানো কন্ঠস্বর :::::

হতাশ গলায় উনি যা বললেন তার সারমর্ম হল - বিজ্ঞানী গবেষণাগারে যতই পরীক্ষা করুন আর মানুষ বানবার ছাঁচে ঢেলে এক নতুন হৈমবতীকে তাঁর কোলে ফিরিয়ে দিন কিন্তু

বাপের চোখ তো ! নাক চোখ মুখ দেহ মিললেও এই মেয়ে কিন্তু তার মেয়ে নয় । খোলস এক মানুষ ভিন্ন । যদিও সে কথা উনি বিজ্ঞানীকে বলেন নি কিন্তু মনে মনে জানেন এ এক মিথ্যে । জগৎ কি বলবে বা বিজ্ঞান কি বলবে সেসব উনি জানেন না । উনি শুধু জানেন এ তার হৈম নয়, হৈমকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না । এ অন্য কোন চেতনা । মানুষ শুধু মানুষ বানাতে পারে চেতনা বানাতে পারেনা । মানুষ পারেনা প্রকৃতিকে টেক্‌কা দিতে । সে প্রকৃতির হাতের পুতুল ।

এক জীবনে যেমন মানুষ বাঁধা নয়, তার অনেক জন্ম, অনেক জীবন আছে, তাই কোন জন্মের কুকর্মের ফলে এই জন্মে শিশু অবস্থায় হৈমর মৃত্যু হয় । অথবা তার কর্ম শেষ হয়ে গেছে !

যে হৈম গেছে তাকে একমাত্র প্রকৃতিই ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে দিতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত কোন মানুষ নয় !

*বাতাসের মসৃণ প্রবাহে মন্দির-প্রদীপ এর হলুদ শিখাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, ঘন অন্ধকারে । পাথরের আড়ালে হেসে ওঠে রূপার চাকতির মতন অবিনশ্বর চাঁদ । বহু শতাব্দী ধরেই তো এইভাবে হাসছে সে ! আজও বুঝি চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, আবার নতুন সুরে !*

# পূর্বাইয়া

গোধূলি বোস এখন বিলেতে আছে রিসার্চের কাজ নিয়ে । ওর কলেজের বিল্ডিং গুলো পাহাড়ের চূড়ায় । নীচে হালকা জঙ্গল, হরিণ ও ভেড়া ঘুরে বেড়ায় ইতিউতি । সেখানেই একটি কাঠের বিশাল বাড়িতে থাকেন এক দম্পতি । নি:সন্তান । ওনাদের একমাত্র প্যাশান গল্প করা ও শোনা । গোধূলির সঙ্গে আলাপ শপিং মলে । তারপর প্রায়ই গোধূলি ওনাদের বাড়ি যেতো । ওরা বলেছিলেন : যদি তুমি আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় এসে গল্প বলে শোনাও আমরা তোমাকে এর জন্য মাইনে দেবো । গোধূলি অবশ্য রাজি হয়নি । তবে ও সাঁঝবেলায় সময় বার করে যেতো ওনাদের সঙ্গদান করতে । নানান দেশের গল্প শুনতো । নানান গল্প বলতো ।

ওনারা বেশি করে ভারতের গল্প শুনতে চাইতেন । ভালো লাগতো বিভিন্ন প্রদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে ।

মিজোদের গল্প, মিশমিদের গল্প, মধুবনী চিত্রের গল্প, দেবদাসীর কাহিনি কত কি ওনারা শুনতেন । মুগ্ধ হয়ে যেতেন । একটা সময় গোধূলি লাইব্রেরিতে গিয়ে রীতিমতন পড়াশোনা করে ওদের গল্প শোনাতো ।

খাওয়া দাওয়াও ভালই জুটতো । ভদ্র মহিলা অর্থাৎ মিসেস ফ্লাওয়ার অনেক কিছু বানাতেন । এই ভিন দেশী মেয়েটিকে নিজের কন্যাসন্তানের মতনই ভালোবাসতেন । মিস্টার ফ্লাওয়ারও খুব প্যাম্পার করতেন ওকে ।

নিজের হারানো পরিবারের কথা মনে পড়তো ওর । বাবা শৈশবে মারা যান । মা ওর বিয়ের পরে বৃন্দাবন

চলে যান । ওঁনারা বৈষ্ণব ছিলেন । দিদিমাও ৩০ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বৃন্দাবন ধামেই বাকি জীবন কাটান । ১০১ বছর বেঁচে ছিলেন উনি । গোধূলির দেখা সবচেয়ে বয়স্ক মানব সন্তান এই দিদিমা ।

বিয়ে হয়েছিল এক সহপাঠির সাথে । একসঙ্গে এম এস সি পড়তো ওরা । ভদ্র সভ্য ছেলে বিনায়ক বিয়ের পরেই কেমন বদলে যায় । জাপানে কিছু কাল ছিল । ওখানে কাজের পরে কোন সোসাল লাইফ না থাকায় প্রচুর মদ খেতো । শেষে মদ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ে । দেশে ফিরেও সেই অভ্যাস চলতে থাকে । তার হাত ধরে আসে বৌ পেটানো ।

মার খেয়ে খেয়ে চোখের তলায় কালি পড়ে গেছিলো । শেষে বিচ্ছেদের আবেদন এবং ডাইভোর্সের পরে বিলেতে চলে আসা । গোধুলির এই গল্প শুনে মিসেস ফ্লাওয়ার বলে ওঠেন - আজও তাহলে ভারত একই রকম আছে ?

বিশেষ কিছুই পাল্টায়নি দেখছি । আমরা যখন ওখানে ছিলাম তখনও অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা শুনেছিলাম । তোমরা মেয়েরা প্রতিবাদ করোনা কেন ?

চমকে ওঠে গোধূলি । এতদিন জানতো এঁনারা কখনো ভারতে যাননি । কত খুঁটি নাটি বিষয়ে ওঁনাদের বলেছে সে । আগে গেছেন জানলে !

-জানো আমাদের একটা ছেলে ছিল - মিসেস ফ্লাওয়ারের গলায় মুখ ফেরায় গোধূলি । এটাও চমক ওর কাছে ।

মারা গেছে । অনেক বছর আগে । খুব ভালো তবলা বাজাতো ।

- তাই ? ভারতেই শিখেছিলো ? মিন মিন করে ওঠে ওর বিস্মিত গলা ।

মৃদু হাসলেন মিসেস ফ্লাওয়ার । বড় করুণ সেই হাসি । তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন

-নাহ্, ওর জন্মের পর আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম এখানেই । পরে একবার ভারতে যাই, সেও ওরই জন্য ।

যখন ও হাঁটতে শিখলো তখন শুরু হল তবলা বাজানো । আমাদের এক পড়শী ছিলেন ভারতীয় । তাঁর বাড়িতেই প্রথম তবলা দেখে আমার ছেলে ডায়লান । এত সুন্দর বাজাতো যে লোকে অবাক হয়ে যেতো । অবাক তো ছিলাম আমরাও । কিন্তু এই ঘটনার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেতাম না । ওকে এনকারেজ করতাম । এমন কি এখানকার ইন্ডিয়ান স্টোরে অর্ডার দিয়ে একটি তবলা আনিয়েছিলাম ।

শুধু তবলাই নয়, সেতার ও বাঁশিও বাজাতে পারতো সে ।

একবার এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী এলেন এখানে সুদূর পাকিস্তান থেকে । ওঁনার অনুষ্ঠানে আমরাও গিয়েছিলাম । কোন কারণে সেইদিন তবলচি না আসায় আয়োজকেরা মহা সমস্যায় পড়ে যান । তখন একজন ওঁনাদের আমার পুত্রের কথা বলেন । ওঁরা হেসে ফেলেছিলেন প্রথমে । কিন্তু গানের আসরের সময় হয়ে যাওয়ায় ও সঙ্গত করার লোক না থাকায় স্থির হয় ডায়লান কাজ চালাবে, ততক্ষণে ওঁরা অন্য কোন দক্ষ তবলচি যোগাড় করে আনবেন । চারিদিকে খোঁজ খোঁজ ।

এদিকে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল । শুনশান হল । স্টেজে এসে বসলেন ওস্তাদজি ।

শুরু হল তবলার বোল । নিপুন হাতে অত্যন্ত সুললিত ছন্দে বেজে ওঠে তা না না ধুন ।

ধে গে তে টে না কে ধি না-- ধুন তানা ধেরে ধেরে তানা না ধেরে তা না না না ---

তালের লহরী বয়ে চলে নিঃস্তব্ধ কনসার্ট হলে । সকলে বাকরুদ্ধ ।

কে বলবে ও এতটুকু এক ছেলে ? এতই ছেলে মানুষ যে তবলা অবধি হাত পৌঁছানোর জন্য একটা কুশনের ওপরে ওকে বসতে হয়েছে । কোন রকমে হাত দুটি পেয়েছে তবলা- বায়ার নাগাল ।

অথচ সুর ঢালতেই সেই বোল হয়ে উঠছে গীতি কাব্য ।

অসাধারণ - অসাধারণ ! হাততালিতে ফেটে পড়লো হল । মুগ্ধ ওস্তাদজির চোখের পলক পড়েনা ।

এ যে অসম্ভব । এই এত্তটুকু এক বাচ্চার এ কি কেরামতি ? এক জন্মে তো এই জিনিস অসম্ভব !

- আপনাদের ছেলে প্রডিজি, বলে ওঠেন ওস্তাদ জি ।

- কিন্তু ও তো কোনদিন তবলা শেখেই নি আগে, মিস্টার ফ্লাওয়ার মনে করিয়ে দেন ।

- সেই জন্যই তো ও জিনিয়াস । তালিম নিয়ে এরকম দক্ষ হাতে বাজাতে তো অনেকেই পারেন ।

মিস্টার ফ্লাওয়ার কি বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে যান । মিসেস ফ্লাওয়ার নীরবতা ভাঙেন অন্য এক গল্প শুনিয়ে । যেই ঘটনাকে ওঁরা এতদিন কল্পনা ভেবে বন্দী করে রেখেছিলেন নিজেদের মনের মাঝে ।

ডায়লান অনেক দিন আগেই বলেছে যে ও আগের জন্মে ইন্ডিয়াতে থাকতো । মধ্যপ্রদেশে ছিল ওর বাড়ি । সেখানে এক রাজপরিবারের সঙ্গীত শালায় তবলা বাজাতো ডায়লান। ওর মা ও বাবা দুজনেই গাইয়ে ছিলেন । মা ছাড়াও দুই দিদি ছিল যাঁরা তাকে খুবই ভালোবাসতো । কৈশোরে এক ভরা বর্ষায় সে জলে ডুবে মারা যায় । কাছের পাহাড়ি নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় ।

এই গল্প শুনে মিসেস ফ্লাওয়ার হেসেই খুন । ছেলে তবলা না বাজিয়ে লেখালেখি করলে বেশ হত । এত চমৎকার কল্পনা শক্তির অধিকারী যে তাঁর নিজেরই ছেলে ভেবেই ভদ্রমহিলা খুশি । তাই এই ঘটনাকে ওর সরল মনের কল্পকথা ভেবেই মিস্টার ও মিসেস ফ্লাওয়ার উড়িয়ে দিয়েছিলেন এতদিন । কিন্তু ওস্তাদজির *এক জন্মে* কথাটা কানে যেতেই ওঁনাকে ওঁরা সব খুলে বলেন ।

ওস্তাদজি শুনেই পরামর্শ দিলেন ছেলেকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যেতে । প্রয়োজন হলে উনিই সমস্ত সাহায্য করবেন ।

মিস্টার ফ্লাওয়ার বাড়ি এসে ভাবতে বসলেন ।

- ডায়লান, ডায়লান ! ছুটে এলো ডায়লান ।

- বলো তো কোথায় তোমার বাড়ি ছিল আগের জন্মে ।

- ইন্ডিয়া ড্যাড !

- আর ইউ ক্রেজি ?

- নো ড্যাড, আই নো দা প্লেস । আই ক্যান শো ইউ ।

এরপর প্লেনের টিকিট যোগাড় হল । তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং ওরা এসে নামলো ডেহ্লি এয়ারপোর্টে ।

ছোট ছেলেকে বগলদাবা করে অসম্ভব ভীড় রাস্তায় পা রাখলেন ফ্লাওয়ার দম্পতি । গরু, মোষ, কুকুর, ছাগল পিপড়ে হস্তী সবাইকে পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছালেন হোটেলে । ঘিঞ্জি একটা এরিয়া । বেশির ভাগই

মুসলমান মানুষজন । কারো কারো গৃহকোণ থেকে ভেসে আসছে ছমছম বাজে রে পায়েলিয়া

তার সঙ্গে যখন তান হচ্ছে ডায়লানের হাত কেঁপে উঠছে, সঙ্গের ব্যাগে সে তবলা বাজাচ্ছে । চোখ মুখ অসম্ভব খুশি খুশি । যেন কোন এক অচিন দেশ থেকে এসে পড়েছে নিজ নিকেতনে।

কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে ওরা এলো মধ্যপ্রদেশে । পুরনো কেল্লা ঘেরা এক প্রত্ন শহরে । রাণী রূপমতী ও বাজ বাহাদুরের প্রেম নগর মান্ডুর কাছেই এই স্থান । মান্ডুতে হিন্দোলা মহল দেখে উচ্ছ্বসিত তাদের পুত্র ।

যেন তার কত চেনা । ডায়লান ছুটে বেরাচ্ছে । ভগ্ন, শ্যাওলা ধরা প্রাচীরে সে এক দুরন্ত অতীত ।

প্রতিটি অস্তিত্বকে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে । টলমলে পায়ে, এক মুখ হাসি নিয়ে কি যে বলছে ওর বাবা মায়ের বোধগম্য হচ্ছে না -- হিন্দী । শুদ্ধ হিন্দী বলছে সাহেবের বাচ্চা । অবাক কান্ড!

প্রথমে আয়ডেন্টিফাই করে এক ভ্রমণার্থী ।

- তোমাদের ছেলে তো ফ্লুয়েন্ট হিন্দি বলছে । গুড গুড । খুব খুশী ভারতীয় বাদামী চামড়া ।

মিস্টার ও মিসেস ফ্লাওয়ার কি বলবেন ভেবে পাননা ।

যেই ডায়লান কোনদিন ব্রেড পর্যন্ত খেতো না সে গপগপ মোটা রুটি গিলছে । সঙ্গে সোয়াবিনের সবজি ।

আর গুনগুন করে গানও গাইছে । কি একটা - লম্বি জুদাই, হায় রে রব্বা বড়ি লম্বি জুদাই-ই-ই !

বাবা মায়ের শুধু অবাক হবার পালা ।

মান্ডুর রূপসী রাণী রূপমতী ছিলেন মহিলা কবি । প্রাসাদের একটি বিশেষ স্থান থেকে উনি ভক্তিমতী হয়ে নর্মদা নদীকে প্রণাম জানাতেন । জায়গাটা চিনিয়ে দিল ডায়লান । মান্ডু নরেশ বাজ বাহাদুর একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রজা পালন ছেড়ে বেশি মনোযোগ দেন গান, কবিতা ইত্যাদিতে । রাণী রূপমতী ছিলেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়া । দুজনের প্রেমগাঁথা নিয়েই ঐ অঞ্চলের গাইয়েরা আজ বাঁধেন ফোক সং । সাহেব দম্পতি মুগ্ধ তাদের পুত্রের ঐতিহাসিক জ্ঞান দেখে । পুত্র অবশ্য বলে এইসব সে আগের জন্ম থেকেই জানে । পরে টুরিস্ট গাইডও একই গল্প শোনান । এই জন্মের পিতামাতা বিমূঢ় ।

এরপর ওঁরা খোঁজখবর নিয়ে পৌঁছান ডায়লানের সেই বহু কথিত বাসায় । মা মৃতা প্রায় ২৫ বছর । দিদিরা আছেন । তাঁরাও অতি বৃদ্ধা । এক দিদির হদিস বার করা গেলো । ডায়লান তাঁর কাছে দূর্বোধ্য ভাষায় অনেক আব্দার করলো । ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিল । মহিলাও খুব স্নেহের সঙ্গে ডায়লানের সাথে আলপাচারিতা চালাচ্ছিলেন । এরপরে আর বিশ্বাস করার উপায় ছিলনা যে ওর এতদিন যাবৎ বলে আসা একবর্ণ কথাও অসত্য ।

পশ্চিমের এক দম্পতির কোলে আপন ভ্রাতার পুনর্জন্ম দেখে বর্ষীয়ান দিদিও অবাক ।

জানা গেলো তাঁর ভাই অসম্ভব ভালো তবলা বাজাতো । শিখেছিল পিতামহের কাছে । দক্ষতা দেখে গানের সময় বাবা ওকে সঙ্গত করতে দিতেন । অনেক আশা ছিল ওদের এই ভাইকে নিয়ে । প্রথম সারির তবলা বাদক হবে একদিন । কিন্তু ভবিতব্য এড়ানো মুস্কিল । বাকিটা ডায়লান আগেই বলেছে । খোলস ছাড়ার গল্প । খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় না জানা গেলেও *আসে যায়* যে সেটা নিয়ে আর কোন দ্বন্দ নেই ফ্লাওয়ার দম্পতির মনে ।

ওর বাড়ি ঘুরে দেখলো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্লাওয়ার । নিজের বাবা মা কে যদিও চিনতেই পারছিল না তাঁদের সন্তান । পুরাতন দিদিই বেশি আপন । ওদের সঙ্গেই খেলছে, হাসছে, উঠছে বসছে দেখে মিসেস ফ্লাওয়ার ওঁনার স্বামীকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন - ও ফিরবে তো ?

হেসে উঠলেন মিস্টার ফ্লাওয়ার । হা হা হা হা হা -- আই এম সিওর ইউ আর জেলাস ।

সত্যি কিন্তু ফিরলো না ছেলে । কে ভেবেছিল নিয়তির এই নিষ্ঠুর ফলাফল মাথা পেতে নিতে হবে ?

ফেরার আগেই গাই গুঁই করছিল ডায়লান । ভারতীয় নাম যার আসমান ।

আসমান হারিয়ে গেলো আসমানে । শুধু এক রাতের জ্বরে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো । ডাক্তার জানালেন দূর্লভ এক ভাইরাসের কবলে পড়েছে ছেলে । লাখে একজনের হয় এই অসুখ । আর হলে বাঁচানো যায়না । খুব খারাপ ধরণের এক ব্রেন ফিভার । ইহলোক ত্যাগ করলো আদরের ডায়লান । শেষ শয্যায় ওরা ওর সঙ্গে তবলা দিতে চেয়েছিলেন । ওর সমাধিতে সেই মতন ওর বাদ্যযন্ত্র তবলাটি দিয়ে দেওয়া হয় । তবে ওর দেহ ওঁনারা নিয়ে আসেন বিলেতে । এখানেই ওর সমাধি ।

কাহিনী শেষ করে থামলেন মিসেস ফ্লাওয়ার । এমন জানলে যেতেন না ইন্ডিয়া । কিংবা না গেলেও খুব সুখকর কিছু হত কিনা তাও তর্ক সাপেক্ষ । যেই অতীত তাঁদের একমাত্র সন্তানের পিছু ধাওয়া করছিল তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া ছিলনা সহজ । মানুষ তো এক একটা চিন্তার বান্ডিল - বান্ডিল অফ থটস্ ।

দেহ যায় তবুও মন না যায় । সেই মনই টেনে আনে কোন কোন সত্তাকে তার লুপ্ত অতীতে ।

মিস্টার ফ্লাওয়ার এক পেগ ডিংক দিলেন গোধূলিকে । গোধূলি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলো । আজকাল সেও মাঝে মাঝে ওয়াইন ইত্যাদি খায় । মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে । এই জাতীয় গল্প সে আশা করেনি । সিনেমার মতন চমকপ্রদ গল্প । এদিকে রাতও বেড়েছে, গুড নাইট জানিয়ে চলে আসে নিজের বাড়ি । না খেয়েই শুয়ে পড়ে । মাথার ভেতর ঘুরছে ডায়লানের রি -ইনকার্নেশনের কথা । কত না আজব ঘটনা ঘটে এই জগতে । বিশাল এই ধরিত্রীর কতটুকু জানি আমরা ? পাশ্চাত্যর এক প্রবীণ যুগলের কাছে পূর্বাইয়া স্মৃতি সততই দুঃখের ।

রবিবার এখানে সব বাজার বন্ধ থাকে । পরদিন ছিল ওর কলেজে একটা হলিডে । বাজারে গেলো । এটা সেটা কিনে গেলো চিকেন কাউন্টারে । একটা বিশেষ মূর্গীর পদ খেতে খুব ভালোবাসে ও ।

সেটা বানায় ধনে পাতা দিয়ে । ইন্ডিয়ান স্টোর থেকে কিনে আনে ধনেপাতা । সেখানে ভালো মাছও জোটে । একবার তো একটা রুই মাছ কিনে এনেছিল সেটা এতই অসাধারণ যে দেশে থাকতে জীবনে অত ভালো রুই খায়নি ।

এবার গেলো দার্জিলিং চায়ের দিকে । এই নেশাটাও জব্বর । ভারতে কোথায় আর সেরকম ভালো দার্জিলিং চা মেলে ? সব ভালো চা তো এদিকেই পাচার হয়ে আসে । দেশে থাকাকালীন লপচুও পান করতে পারতো না । একজন চায়ের দষশশষভড়ড়নয়ক্ষ হিসেবে সে বোঝে যে আজকাল লপচুতেও গন্ধ থাকেনা । তবে এখানে এসে খুব সুন্দর চা পেয়েছে ।

ওর প্রাক্তন স্বামী প্রচন্ড চা প্রেমী ছিল । দার্জিলিং চা ভালোবাসতো । কত সময় ওরা দক্ষিণাপণের ডলিজ থেকে ভালো চা কিনে এনেছে একসঙ্গে । ডলিজ কি এখনো কলকাতায়

আছে ? আসলে ডলি রায় নিজে টি টেস্টার ছিলেন বলেই হয়ত ভালো চায়ের কদর বোঝেন। চমকে উঠলো পরিচিত কন্ঠস্বরে।

- কেমন আছো গোধূম ?

এই নামে তো একজনই ডাকতো ! পেছন ফিরে তাকায় । মেরুদন্ড দিয়ে বয়ে যায় ভালোলাগার চোরা স্রোত ।

তারপর কিছু মোহনের বাঁশি শোনা। কিছু রুক্ষ বাস্তব। জানা গেল আবার বিয়ে করেছে সে। পত্নী ফার ইস্টের মেয়ে । ছোট্ট চোখ, বোঁচা নাক, আপেলের মতন রঙ । এখন ওরা ফার ইস্টের এক দ্বীপে বাস করে ।

মনে পড়ে যায় জাপান থেকে ফেরার পর জানতে চেয়েছিল গোধূলি - আচ্ছা ওরা পুরো চারপাশ দেখতে পায় ?

আরো বললো সে- তাদের একটি সন্তান হয়েছে। নাম রেখেছে সোহন। ওর চিকিৎসার জন্যই ফার ইস্ট থেকে এখানে এসেছে।

- কেন কি হয়েছে ওর ?

- মেমারিতে কোন প্রবলেম হয়েছে । সব ভুল হয়ে যায় । খুব দুরন্ত, কোন কাজে মন দিতে পারেনা । লোকাল ডাক্তার কিছু ডিটেক্ট করতে পারেন নি । আমারও এখানে একটা সেমিনার আছে তাই ভাবলাম সুযোগ ছাড়ি কেন । আর হ্যাঁ আশ্চর্য জনক ভাবে যেকোন বস্তুতেই ও তবলা বাজাবার চেষ্টা করে আর বলে মধ্যপ্রদেশের মান্ডূর কাছে এক স্থানে নাকি ও আগে থাকতো----

গোধূলি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর কেমন ঝিম ধরানো মানুষের মতন মাথায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ে মেঝেতে। ওর অবস্থা দেখে আরো কয়েকজন এগিয়ে আসেন।

- তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে গোধুম ?

শুনতে পেলনা গোধূম । কারণ সে তখন পাড়ি দিয়েছে মিস্টার ফ্লাওয়ারের গত রাতের বলা কাহিনীর পটভূমিতে । যেখানে ডায়লানের সমাধি থেকে তবলা হাতে উঠে আসছে এক দামাল কিশোর, টল মল পায়ে সোজা গোধূলির দিকে ।

নোট : তবলা বাদকের এই প্রতিভা সম্বন্ধীয় ঘটনা টি একটি গল্পে পড়েছিলাম, সত্য ঘটনা বলে লেখা ছিলো। এখানে গল্পটি আমার তৈরি তবে মূল ঘটনাটি সত্য।

# ডানা

## ১

অমলার সকালটা কাটে গাছেদের সঙ্গে। বাগানে জল দেওয়া, আগাছা ছেঁটে ফেলা, ঝরাপাতা পরিষ্কার করা ও পাখিদের দানাপানি দিতে দিতেই বেলা গড়িয়ে যায়। প্রতিটি গাছকে ছুঁয়ে আছে তার মমতা, নিপুন হাতের ছোঁয়ায় কাননে চিরবসন্ত। কুসুমকলিরা কথা বলে। জীবনের সায়াহ্নে এসে, অখন্ড অবসর যাপনের যতগুলো উপায় আছে তার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যে কাটানো সকালটা সবচেয়ে মনোরম। বেশ ঠান্ডার রেশ থাকে এইসময়। ব্যাঙ্গালোরে শহরে। লোকে বলে এয়ার কন্ডিশনড সিটি। দশবছর আগেও ফ্যান চালাতে হতনা। ফ্রিজ লাগতো না। এখন লোকসংখ্যা বাড়ায় গরম বেড়ে গেছে। এছাড়া আছে বইয়ে পড়া গ্লোবাল ওয়ার্মিং। গ্রহের সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি। তুষারশৃঙ্গ গলে যাচ্ছে, মেরু অঞ্চলে বরফের আস্তরণ কমছে। কে জানে শেষে হয়ত পুরাণে পড়া মহাপ্লাবনের মতন সারা পৃথিবী বন্যার কবলে পড়বে !

কলকাতা থেকে বহুদূরে এই শহরে অমলা প্রথম আসেন বছর কয়েক আগে। ছেলে, বৌমা ও নাতিদের সঙ্গে। বেড়াতেই এসেছিলেন, বৌমা ও নাতিদের ইন্ডিয়া দেখাতে এনেছিল ছেলে। তখনই ভালোলেগে যায় ব্যাঙ্গালোর। সবচেয়ে ভালো লাগে স্বাধীনতা। কেউ তাকে চেনে না। কোথাও মবড্ হবার ভয় নেই। কেউ অটোগ্রাফের খাতা বাড়াচ্ছে না। ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াও। সেই কৈশোরের মতন যখন কেউ তাঁকে চিনতো না।

ছোট্ট এক মফ:স্বলের মেয়ে ছিলেন উনি। তখনো রূপালি পর্দার একনম্বর নায়িকা হয়ে ওঠেন নি। বারান্দায় বসে মিঠে রোদে আচার খেতেন, গলির মোড়ে চিনেবাদাম, ছোলা ভাজা। আর দুপুরবেলা নন্দীবাড়ির তালপুকুরে পা ডুবিয়ে বসতেন। তারপরে বেশ কিছু শাপলা শালুক তুলে আনতেন। নন্দী ঠাকুমা খুব বকতেন -- আগে বলবি তো ! শিবুকে দিয়ে তুলিয়ে রাখতাম। এই ঠা ঠা রোদে কেউ শাপলা তুলতে যায় ?

ছুট্টে পালিয়ে যেতেন অমলা। হাওয়ায় ছড়িয়ে যেত তার মেঘবরণ চুলের সুগন্ধ। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। পটলচেরা চোখ, টিকালো নাক, গোলাপী ওষ্ঠ।

যদিও কেউ তখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই মেয়ে একদিন বাংলা চলচ্চিত্রের নায়িকা হবেন। শুধু নায়িকা নন একেবারে পয়লা নম্বর নায়িকা। রূপ তো ছিলই সঙ্গে অভিনয় করার সাবলীলতা ওনাকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। বাংলা ও বোম্বের সমস্ত লিডিং হিরোদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অসম্ভব ব্যাক্তিত্ব সম্পন্না এই অভিনেত্রী কিন্তু প্রথম থেকেই নিজের চারিপাশে একটা কুয়াশা তৈরি করে রেখেছিলেন। স্বামী খুব অল্পবয়সে মারা যাওয়ার পরে একমাত্র পুত্রকে নিয়ে কলকাতা থেকে বোম্বে চলে যান কাজের তাগিদে। ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। আজ সে একজন প্রথম সারির অনকোলজিস্ট। পরবাসেই রয়ে গেল।

খ্যাতির শিখরে থাকতে থাকতেই স্বেচ্ছা অবসর। বোম্বে তখনো মুম্বাই হয়নি। সেই বোম্বে থেকে কলকাতা গমন। একা একা দিব্যি কেটে যাচ্ছিল কলকাতায়। তারপর ব্যাঙ্গালোর মনে ধরায় এখানেই একটা বাংলো কিনে রয়ে গেলেন। সামনে বিরাট বাগান। অনেক

পর্ণমোচী গাছ । রং বাহারি ফুল, পাখপাখালির ডাক । মোরাম বিছানো এই দৃষ্টিনন্দন বাংলোয় অমলা থাকেন এক মালায়লি রাঁধুনি ও নেপালী দারোয়ানের সঙ্গে । এছাড়া এক এজেন্ট আছেন । তাকে সেক্রেটারি বলাই বোধহয় বেশি ভালো । দীর্ঘ ৩৫ বছরের সঙ্গী হরিবিষ্ণু অসম্ভব কর্মঠ । এই বয়সেও নিপুন হাতে বাইরের জগৎ সামলান । নিষ্ঠা, সততা, মানবিকতা এই শব্দগুলো এখনো তার অভিধান থেকে মুছে যায়নি । উনি অকৃতদার । অমলা তার মনিবের চেয়েও বেশি ভগিনী । ক্যারিয়ারের তুঙ্গে সমস্ত ঝামেলা সামলেছেন দক্ষ হাতে । আজও সামলাচ্ছেন । চিরকালই শিল্পের টানে অমলা কাজ করতেন । পতিদেবের ছিল বিশাল পৈত্রিক ব্যবসা । অর্থের জন্যে তাঁর কাজ না করলেও চলতো । বেছে বেছে ভালো চিত্রনাট্য ছাড়া কাজ করতেন না । শেষদিকে যশ, খ্যাতি ভারী পাথরের মতন মনে হত । তাই অন্তরালে চলে আসা । আত্মগোপন করা ।

ছায়াচিত্রের সঙ্গে আর কোনই যোগাযোগ নেই তার । বহু স্বনামধন্য পরিচালক বা ব্যানার তাঁকে লোভনীয় অফার দিয়েছেন যা যেকোন চিত্রাভিনেত্রীর কাছেই পরম আকর্ষনীয় । তবু তাকে টলানো যায়নি । তিনি আপন মন বিহারিনী । নিজের তৈরি স্বপ্নের জগতে ডুব দিতেই বেশি ভালবাসেন । জিরাফের মতন দাঁড়িয়ে বেশ ভালো করে দেখে নিয়েছেন চারিপাশটা । এখন বাস্তব জগতে ঘাসফুল হয়েই বাঁচতে চান । নরম রোদ মেখে, ঝিরিঝিরি বাতাসে দুলতে চান । একটু আড়াল চান, পর্দা চান ।

তাঁর বাগানে কত পাখি আসে । বড় পাত্রে জল রাখা থাকে, কিচিরমিচির করে জল খায় । দানা খুটে খায় । খেলা করে । দুরন্ত পায়ে সারা লনে ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায় । গানে গানে ভরিয়ে দেয় অমলার ছোট্ট ভুবন । এত পাখির মধ্যে একটি ছোট্ট পাখিকে উনি বড় ভালোবাসেন । নাম না জানা পাখি । ভারি রং চঙে । স্বপ্নালু দুটো চোখ । অমলার হাতে এসে বসে, চোখে চোখ রাখে । মৌনতাও যে একধরণের কথোপকথন অমলা বুঝতে পারেন । যখন সূর্যদেব পালিয়ে যান তখন ওরা একমুহূর্তও অপেক্ষা করেনা । যে যার ঘর পানে পা বাড়ায় । কে জানে সেখানে হয়ত অপেক্ষা করে আছে একটি কচিমুখ । ওদেরও সংসার আছে । শান্তির নীড় আছে । তাঁর ভালোবাসার পাখিটি রোজ একবার রুটিন করে দেখা দেয় । ওদের সময়জ্ঞান দেখে উনি অবাক হন। পাখিদেরও নিজেদের জগতে ঘড়ি আছে তাহলে ! অমলা মজা পান । ছোট্ট পাখিটা যখন গান গায় কি যেন একটা মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যান উনি । ওর খুদে চোখের দৃষ্টি অমলাকে মনে পড়িয়ে দেয় ছেলেবেলার কথা । তাদের বাড়ির পাশে ছোট্ট জঙ্গলে, নানান গাছে পাখির বাসা ছিল । অমলা তাঁর বন্ধুদের সাথে ওখানে খেলতে যেতেন, অনেকে বাসা ভেঙে দিয়ে ডিম নিয়ে পালাতো । ডিমটাও অনেক সময় ভেঙে দিত । অমলা ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন । কেন এইভাবে তারা পাখিগুলোকে কষ্ট দিচ্ছে ? কিন্তু কেউ শুনতো না ।

আর ওঁর মণিকাকা ছিলেন মস্ত শিকারী । বন্দুকবাজ । পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসে নদীর চড়ে কত পাখি মারতেন । সবাই কত বাহবা দিত । অমলা ছাড়া । ওঁর খুব কষ্ট হত । বুকের ভেতরে যন্ত্রণা হত । কাউকে বলতে পারতেন না । বললে সকলে হাসবে যে !

## ২

বাগানের পশ্চিমে আছে একটি ডালিম গাছ । তারই পাশে ফুলের ঝাড় । বিশেষ করে ঐ পাখিটা ফুলের ঝাড়ে, বেড়ার ওপরে বসে । অচেনা সুরে গান গায় । তিড়িং বিড়িং করে লাফায় । অমলা কাছে গেলেই মিষ্টি সুরে ডেকে তাঁর কাঁধে এসে বসে । ওকে না দেখলে

চিন্তা হয় । রূপালি পর্দার মোহময়ী নায়িকা যার হাসির দাম লক্ষ টাকা যাকে একটু ছোঁয়ার জন্য কত ভক্ত বিনিদ্র রজনী যাপন করেন কত রথী মহারথী শোভনতা ভুলে যার পায়ে সব বিলিয়ে দিতে চান সেই অমলা গুপ্তর হাতে মাথায় অবলীলায় এসে বসছে খেলা করছে একটা সামান্য পাখি ? এ যে অভাবনীয় । তার ডানা থেকে চুইয়ে পড়ছে সোনালি রোদ্দুর, আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে অমলাকে তার ছোট্ট শরীরটা । বুকের মিহি লোমে আলোর ঝিলমিল । এই তো সেদিন একটা টিভি চ্যানেল থেকে ওনার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন একদল মানুষ । উনি রাজি হননি । চ্যানেল কর্তারা বিরক্ত । নতুন প্রজন্মকে কি কিছুই দেবার নেই এই দাদাসাহেব ফালকে পাওয়া লেজেন্ডারি অভিনেত্রীর ?

-- না, নেই । অমলার কঠিন জবাব । লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরাকে উনি অনেক পেছনে ফেলে এসেছেন । দূরত্ব অনেক বেশি । আর ফিরে যাবার কোনই সম্ভবনা নেই । নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, একটি দ্বীপের মতন । এক অনতিক্রমনীয় বাঁধা যেন তাকে ঘিরে আছে । অমলা আজ এক দূর্গের বাসিন্দা । সেই দূর্গের দেওয়াল টপকে কেউ তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না। কেউ না । আজ তাঁর মনের টুকরো সংলাপ, হাসির অংশীদার তাঁর বাগানের গাছেরা, পাখিরা। তাঁর সবটুকু ভুবনে ছড়িয়ে আছে এক সবুজ আলো, স্নিগ্ধ সবুজ আলো ।

ইদানিং বাগানের ফলগুলোতে বড্ড পোকা ধরেছে । কিছুতেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছেনা । পেঁপে, ডালিম, পেয়ারা, কাঁঠাল গাছগুলো ফলবতী হলে ফল খাওয়া যায় । পেঁপেগুলো কি সুন্দর সতেজ হয় । কাঁঠালের সুবাসে ড্রয়িংরুম মো মো করে । ওদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে । অমলা চিন্তিত। হরিবিষ্ণু বললেন যে আজকাল বাজারে অনেক ভালো ভালো উন্নতমানের কীটনাশক মেলে। কিনে এনে স্প্রে করে দিলে সব পোকা চলে যাবে । শুনে অমলা ভারি খুশি হলেন । আজ কদিন ধরে যেন রাতে ঘুম হচ্ছিলো না । একটা ছটফটানি মনের ভেতরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। উৎকন্ঠা, বিষন্নতা, একটু কষ্টও । গাছগুলি যে তাঁর সন্তান। হরিবিষ্ণু গুমোটদিনে এক ঝলক টাটকা বাতাস নিয়ে এলেন । তারপরে একদিন লোক ডেকে সব স্প্রে করানো হল ।

কিছুদিন পরে অমলা এক বিকেলে তার ড্রয়িংরুমে বসে কফিপান করছেন হঠাৎ ওর রাঁধুনি দৌড়ে এলো । চোখে মুখে উত্তেজনা ।

- কি হয়েছে পঙ্কজম ? এরকম হাঁপাচ্ছো কেন ?

- ম্যাডাম, ম্যাডাম সেই পাখিটা !

- কোন পাখিটা ?

- যে আপনার বড় বন্ধু ম্যাডাম, ও ও না ---

- ও কি ? পঙ্কজম ? ও কোথায় ?

পঙ্কজমের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না । শুধু আঙুল তুলে বাগানের দিকে দেখায় ।

অমলা ছুট্টে যান । তারপর এক বেদনাক্লিষ্ট মূহুর্ত । কঁকিয়ে ওঠেন অমলা, ঝরাপাতার ওপরে একটি লোমের বলের মতন পড়ে আছে ওর ছোট্ট দেহখানি । থমকে দাঁড়িয়ে যান, পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে । হাত দিয়ে ছুঁতে চান কিন্তু পারেন না । জোড়া চোখের দৃষ্টি বড় করুণ । ঠোঁট কামড়ে বুকের ব্যাথা চেপে রাখতে চান কিন্তু দু চোখের দৃষ্টি ধুয়ে বৃষ্টি নামে, অঝোর ধারায় । শিল্পীর সংবেদনশীল মন ফুঁপিয়ে ওঠে।

# ৩

জীবনের সুদীর্ঘ পথচলার শেষে এক নির্মল ভালবাসা এরকম রক্তাক্ত হয়ে গেল কেন ? কেন সবটুকু উষ্ণতা বরফের চাইয়ের মতন শক্ত হয়ে উঠলো ? কেন ? অমলা অনুসন্ধিৎসু । এই দু:সহ যন্ত্রণার ভারবহন সম্ভবপর না । এক পশুচিকিৎসকের শরনাপন্ন হলেন উনি । জানা গেল বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে পাখিটির । সেই বিষ ঢুকেছে কীটনাশক থেকে । বিষণ কেড়ে নিয়েছে অমলার অমল পৃথিবী থেকে এক টুকরো স্বপ্নময় অধ্যায় । সভ্যতার কালো হাত গ্রাস করেছে নিরাপরাধ পাখিটিকে । এবং শুধু সেইই নয় এরকম কত পাখি হারিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের অতল গহ্বরে । তাদের ক্ষুদ্র জীবনে নেমে আসছে যবনিকা, মানুষের জীবন প্রলম্বিত করার প্রয়াসে । তাই ওয়াইল্ড লাইফ টক্সিকোলজি এক নতুন গবেষণার বিষয় । আজকাল ইন্সট্যান্টের যুগে দ্রুত ফল পাবার জন্যে আমরা অনেক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করি যা পরিবেশ ও প্রাণীকুলের সমূহ ক্ষতি করে । ইকো ফ্রেন্ডলি উপায়ে যদি পোকামাকড় দমন করা যায় তা হবে পৃথিবী ও প্রজাতির পক্ষে অনেক বেশি মঙ্গলদায়ক । অমলার বাড়ির কাছেই আছে একটি এন জি ও । নাম গ্রীন লিপ । এরা পরিবেশ রক্ষা নিয়েই কাজ করে । কিন্তু সামর্থ্য কম, লোকবল নেই । প্রচারের অন্তরালে থাকায় এদের মহৎ প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ । জনসাধারণের কাছে এরা পৌঁছতে পারছেন না ।

এক সুন্দর সকালে হরিবিষ্ণুকে দিয়ে একটি আবেদন পত্র আনলেন । সংস্থার প্রচারের দায়িত্ব নিতে, আর্থিক সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন । এতদিন নরম বিছানায় ডুবে থাকা শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে আবার দাঁড় করালেন বিখ্যাত অভিনেত্রী অমলা গুপ্ত ।

আবার প্রচারের আলোয়, ক্যামেরার সামনে । এবার পরিবেশবিদের ভূমিকায় ।

# সাগ্নিক সপ্তপদী

যাক বাবা বাঁচা গেল ! মনে হচ্ছিল ট্রেনটা ধরতেই পারবে না । বহুক্ষণ যেতে হবে এদিকে কম্পার্টমেন্ট প্রায় ফাঁকা ।একজন সঙ্গী পেলে মন্দ হতনা । কি আর করা যাবে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে পা তুলে বেশ আরাম করে বসলো তুঙ্গা ; তুঙ্গভদ্রা সেন ।

বাবা ছিলেন ঐতিহাসিক । শখ করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন তুঙ্গভদ্রা - প্রাচীন নদী । মেয়ে যাতে চিরকাল উচ্ছল,প্রাণবন্ত থাকে এই ছিল বাবার আশা । নদীর ঢেউ তার জীবনে কখনো শ্যাওলা জমতে দেবে না । কিন্তু ভবিতব্য কি এড়ানো যায় ? তুঙ্গার জীবন আজ ঢেউহীন । অনেকটা দীঘির জল যেন । টলটল করছে, কিন্তু সীমাবদ্ধ ।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক উঠলেন । পাশের কুপে বসলেন । পেছনে চা ওয়ালা উঠলো । তুঙ্গা ডাক দিল । ‘এই চা !-

জিঞ্জার টি ! বেশ ভালোলাগলো ।

ইতিমধ্যে ট্রেন চলতে শুরু করেছে । তুঙ্গা একটি ম্যগাজিন খুলে বসলো । বাইরে গোধুলি । আকাশে হালকা মেঘের আভাস । বৃষ্টি হবে কি ? ও বৃষ্টি খুব ভালবাসে । বর্ষা ওর প্রিয় ঋতু। ঘন নীলাঞ্জন দিবস,সোঁদামাটির গন্ধ, প্রথম কদমফুল ওকে রোমান্টিক করে দেয় ।

পরের স্টেশান শিবাজীনগর । ও যাবে মুম্বাই । সেখান থেকে প্লেন ধরে যাবে গুয়াহাটি । প্রায় একবছর পর বাড়ি যাচ্ছে তুঙ্গা । সামনেই পুজো । এইসময় যা একটু ছুটি পায় । বাবা মা অনেক আশায় পথ চেয়ে আছেন । একমাত্র মেয়ে ঘরে ফিরবে । দেখতে দেখতে শিবাজীনগর চলে এলো । নতুন কোন যাত্রী এই কামরায় এলো না । ট্রেন এগিয়ে চল্‌লো । পরের স্টেশান খড়্‌কি । ট্রেন খড়্‌কি স্টেশানে প্রবেশ করতেই বেশ কিছু হকার ট্রেনের দিকে ছুটে এলো । একজন স্যুট পরিহিত ভদ্রলোকের সাথে এক হকারের বাক্ - বিতন্ডা শুরু হল । কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক সেই হকারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে সোজা তুঙ্গার সামনের সিটে এসে বসলেন । তুঙ্গা আবার ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখল । সৌরভ গাঙ্গুলী বেশ ভালোভাবে দল পরিচালনা করছেন ও একজন সফল অধিনায়ক হিসাবে রেকর্ড বুকে নাম তুলেছেন । এই নিয়েই একটি প্রবন্ধ পড়ছিল । হঠাৎ একটি ভারী কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল ।

-- ম্যাডাম ! এগুলো কি আপনার লাগেজ ? সিটের ওপরে রাখা ব্যাগ ও স্যুটকেসটি দেখিয়ে সামনের ভদ্রলোক হিন্দীতে প্রশ্নটি করলেন। এগুলো যদি ঐপাশে রাখেন তাহলে আমি আমার ব্যাগেজগুলো ঠিক ভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি । তুঙ্গা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো । সেই মুখ, সেই চোখ সেই কপাল, এমনকি গালের জড়ুলটা অবিকল সেইরকম । এতক্ষণ সে ভদ্রলোকের মুখখানি ভাল করে দেখেইনি । কিন্তু তা কি করে সম্ভব ! তাকে তো শেষ দেখেছিল একটি মানসিক হাসপাতালে । লোহার গরাদের ওপাশে । যার দেওয়া সিন্দুর নিয়ে অনেক আশায় ও স্বপ্নমাখা চোখে ঘর করতে গিয়েছিল সম্পূর্ণ অচেনা শহর নাসিকে ।

বিয়ের দিন কয়েক পরেই গোলমাল শুরু । প্রথমটায় কিছুই বোঝেনি তুঙ্গা । ভেবেছিল মানসিক চাপে শরীর দুর্বল । বিয়ের ধকল তো কম না । কিন্তু একদিন রাতে খুব বাড়াবাড়ি হল । মাঝরাতে হঠাৎ কার যেন প্রচন্ড জোরে এক লাথিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় । প্রায় লাফিয়ে উঠে বেড স্যুইচ অন করে তুঙ্গা । দেখে তার স্বামীর চোখ মুখ সব পাল্টে গেছে । প্রচন্ড হিংস্র ভাবে তুঙ্গার কণ্ঠরোধ করতে এগিয়ে আসছে সে। ভয়ার্ত চোখে তুঙ্গা ঘরের দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে । উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে। পেছনে নেড়িকুকুরের দল । একটি বাড়ির ভেতর আলো জ্বলতে দেখে তার বারান্দায় উঠে পড়ে । জোরে জোরে দরজা ধাক্কাতে থাকে --- খুলুন খুলুন আমাকে ও মেরে ফেলবে ।

কতক্ষণ দরজা ধাক্কেছিল জানে না, হুঁশ ফিরল দরজা খোলার পর । এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ।

----কি ব্যাপার কি হয়েছে আপনার ? তুঙ্গা পেছন ফিরে অন্ধকারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে -- ঐ যে সে আসছে ! আমাকে মেরে ফেলবে । বলে ভদ্রলোক ও মহিলাকে ঠেলে ঝড়ের মত ভেতরে ঢুকে যায় । এরপর কিছু মনে নেই । জ্ঞান ফেরার পর দেখেছিল একটি ঘরে সে শুয়ে আছে, তাকে ঘিরে আছে বেশ কিছু অচেনা মুখ ও দুজন পুলিশ ।

বাড়িতে খবর দিয়েছিল পুলিশ । বাবা ও দাদা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যায় । এর কিছুদিন পর, তার শ্বশুরমশাই তাদের বাড়িতে এসে তুঙ্গার বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । বলেন যে তার ছেলের মাথার অসুখ হয়েছিল ঠিকই তবে চিকিৎসায় সেরে যায় । তাই ওরা বিয়ের সময় এটা উল্লেখ করেননি । কিন্তু ওটা যে আবার রিল্যাপ্স করবে সেটা ওরা বোঝেননি । ঘটনার সময় শ্বশুরমশাই সস্ত্রীক বেনারস গিয়েছিলেন । বিয়ের আগে শুনেছিল পাত্র বেনারসে একটি ব্যবসা করে । পৈত্রিক ব্যবসা । তাদের বেনারসের ব্রাঞ্চটির মালিক পাত্র ।

---কি ব্যাপার ? আপনি তো দেখছি কোন কথাই বলছেন না । ঘন্টা চারেকের রাস্তা, এইভাবে বোবা হয়ে থাকা যায় নাকি ? বলে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন । হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওনাকে । মাথা নিচু করে তুঙ্গা বললো, আমি মুম্বাই থেকে গুয়াহাটি যাব । সামনে পুজো । আমার বাবা-মা আছেন ওখানে । ভদ্রলোক বললেন --- এই তো দিব্যি কথা ফুটেছে মুখে । আমিও গুয়াহাটি যাব । আমি একটি ব্যবসা করি । গুয়াহাটিতে আমাদের একটি ব্রাঞ্চ খোলা হবে তার তদারকি করতেই আমার ওখানে যাওয়া । পুজোটা আমার আর বাবা-মার সাথে কাটানো হবে না । আমার বাবা-মা নাসিকে থাকেন । বলে আবার সুন্দরভাবে হাসলেন। ও হ্যাঁ দেখুন কেমন লোক আমি । এত কথা বলে ফেললাম অথচ নিজের নামটাই বলা হয়নি। আমি অরিত্র দাসগুপ্ত ।

আমি তুঙ্গভদ্রা সেন । পেশায় ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার । পুণায় একটি অর্গানাইজেশনে কাজ করি ।

---তুঙ্গভদ্রা ? নিজের মনে খানিকটা যেন বিড়বিড় করেন উনি ।

তারপরে একগাল হেসে বলেন--- আপনিও বাঙ্গালী ? বা: ! বেশ-বেশ । তা স্যান্ডুইচ খাবেন? চিকেন স্যান্ডুইচ । মাথা নাড়ল তুঙ্গা । অরিত্র একটি কাগজের প্লেটে করে দুখানি স্যান্ডুইচ এগিয়ে দিল । ----বাইরের খাবার খাওয়া বাড়ির লোক একদম পছন্দ

করে না, কি ব্যাপার ? আপনি আবার দেখি চুপ করে গেলেন ?

---না, এমনিই । ভাবছিলাম বাড়ির কথা । অনেকদিন পর যাচ্ছি তো ।

---ও তাই বলুন । আমি ভাবলাম আমার সঙ্গটা আপনার ঠিক ভাল লাগছে না, লোকে বলে আমি নিরস, কাঠখোট্টা । আবার সেই সুন্দর হাসি তার মুখে ।

----ওরা মনে হয় ঠিক বলেন না । আপনার হাসিটা এত সুন্দর, আপনি নিরস হবেন কেন?

----তা যা বলেছেন । কিন্তু সে কথা ওদের বোঝায় কে ?

একটি স্টেশনে এসে ট্রেনটি দাঁড়ায় । চা ওয়ালা ওঠে । ওরা চা খায়।

---আপনার স্বামী কি করেন ? অযাচিত প্রশ্ন ।

---বিজনেস । সপ্রতিভভাবে বলে ওঠে তুঙ্গা ।

---তাই বুঝি ? আজকাল তো মেয়েদের দেখে বোঝাই যায়না কে বিবাহিতা আর কে অবিবাহিতা । প্রশ্নটা করেই আমি লক্ষ্য করি যে আপনার সিন্দুর নেই । আবার হেসে ওঠেন উনি ।

নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে তুঙ্গা তার দিকে । তবে কি এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম সাফল্যের একটি দৃষ্টান্ত ? সম্প্রতি সে একটি সিনেমা দেখেছে- বিউটিফুল মাইন্ড । নোবেল লরিয়েট জন ন্যাশের জীবনী । তিনিও স্কিজোফ্রেনিক ছিলেন কিন্তু এখন সুস্থ । সব থেকে ভালো লেগেছিলো জন ন্যাশের নিজের কথা পড়ে । উনি বলেছিলেন যে *যখন কোন ওষুধেই কাজ হয়নি, কথা শোনার প্রকোপ বেড়েই যাচ্ছে, আমি স্থির করি আর কথায় কান দেবো না ।*

হঠাৎ কি মনে করে জানি না ভদ্রলোক উঠলেন, জানালার দিকে পা বাড়ালেন । নিচু হয়ে বাইরের আকাশটা দেখলেন -- আজ আকাশটা যেন নববধূর সাজে সেজেছে, দেখুন !

প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে ট্রেন । যথাস্থানে বসতে গিয়ে চলমান ট্রেনের গতিতে টাল সামলাতে না পেরে তুঙ্গার গায়ের ওপর পড়ে গেলেন উনি ।

---এ মা! দেখুন তো কি কান্ড ! নাহ্ বড্ড জ্বালাচ্ছি আপনাকে, সরি সরি !

----ও কিছু না । ইটস ওকে । বলে নিজের রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিল তুঙ্গা ।

মনে মনে বলে ওঠে : তুম ছোড় দিয়া দিল  তাই এখন আমি ক্যাচ কিয়া রে ! বার বার এইভাবেই পড়ে যাবার চেষ্টা করে যাও !

----আমি আর আপনি একই ফ্লাইটে নিশ্চয়ই গুয়াহাটি যাব ? আপনি বিমানে যাচ্ছেন তো ?

----না উড়োজাহাজে ।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

একা হয়ে যাবার পর তুঙ্গা চাকরির জন্য চেষ্টা শুরু করে । Interior designer হিসাবে একটা কাজ পেয়েও গেল পুণাতে । মাঝারি মাপের একটি কোম্পানি । ওর বস মি: দেশমুখ খুব স্নেহপ্রবণ মানুষ । তুঙ্গাকে নিজের মেয়ের মতন দেখেন । উনিই প্রায় জোর করে ওকে এই লম্বা ছুটিতে পাঠিয়েছেন । নাহলে তুঙ্গার ইচ্ছা ছিল শুধু পুজোর কটা দিন বাড়ীতে থাকবে ।

অরিত্রকে দেখছিল তুঙ্গা - এইভাবে দেখা না হলে সে জানতেই পারতো না যে তার মনের ভেতর এই মানুষটার জন্য কতটা জায়গা আছে । বিয়ের আগে তো সেরকম যোগাযোগ হয়নি । তবে বিয়ের পরে যে কদিন একসঙ্গে ছিল ভালই লাগতো । সবথেকে ভালো লাগতো ওর কেয়ারিং অ্যাটিটিউড । আর ভীষণ নম্র। এই দুটো গুণ তুঙ্গার মন জয় করেছিল । কখনো ভাবেনি তার জীবনে এরকম একটা অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে । যখন চলে আসতে হয়েছিল তখন অরিত্রর জন্য মনের কোণায় একটু সহমর্মিতাও ছিল । তাই বাবারা যখন লিগাল স্টেপ নেবার কথা বললেন ও রাজি হয়নি । উকিল কাকু বলেছিলেন যে এই বিয়েকে মানসিক ভারসাম্যহীনতার গ্রাউন্ডে Nullify করে দেওয়া যায় ।

দূর কি আবোলতাবোল সব চিন্তা করছে - যার সাথে কোনদিন সংসার করেনি সেরকমভাবে তাকে নিয়ে এতো কথা ভাবা - নাহ ! ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে । শরীরটা খুব খারাপ লাগছে । আগে খেয়াল করেনি তো ! মুম্বাই আর কত দেরী ? হাত ঘড়ি দেখলো সে।

অরিত্র এবার কথা বলল -- আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

--না মানে গা টা খুব গুলাচ্ছে ।

-- আপনি রিলাক্স করুন । আমি আছি চিন্তা করবেন না।

শিহরণ, যেন এক জলতরঙ্গ ছড়িয়ে গেল শিরায় শিরায় ।

ভালোলাগায় মরে যাচ্ছিলা তুঙ্গা । একেই কি বলে সাতপাকের বন্ধন? এ বন্ধন অবিচ্ছেদ্য - যেন কোন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা দুজনে । এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে অরিত্রর দিকে । তাদের ডাইভোর্স হয়নি । কিন্তু অরিত্রর কোন খোঁজও রাখেনি । একটি দু:স্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে চেয়েছিল সবকিছু । নিজের সৃষ্টিশীল কাজের জগতে ডুব দিয়েছিল । কিন্তু আজ দেখলো পুরনো স্মৃতি বুকের পাঁজরে বিদ্ধ হয়ে থাকা তীরের মতন কোন যন্ত্রণা তৈরি করেনি, আছে শুধুই ভালোলাগা । সেই ভাললাগা, যা ছিল প্রথম যখন অরিত্রকে সামনাসামনি দেখেছিল তখনকার মতন। কি দেখা হচ্ছে ? অরিত্রর কৌতুহল ।

---আপনাকে ।

--আমাকে ? আবার সেই ভুবন ভোলানো হাসি । বুকে কাম সেপ্টেম্বর এর বাজনা বাজে।

---না আমার এক খুব কাছের মানুষ ঠিক আপনার মতন দেখতে ।

---তাই বলুন ! আমি ভাবলাম কোন চিত্রতারকার সাথে মিল খুঁজছেন। আবার কাম সেপ্টেম্বর, বুকের রক্ত চলকে ওঠা ।

অদ্ভুত এক আনন্দধারা ওর সারাদেহে ছড়িয়ে পড়লো । ভীষণ ভালোলাগছিল । এতো আলো এতো বাতাস এতো মাধুর্য, কৈ আগে তো চোখে পড়েনি ? তার ধূসর জীবনাকাশে এক রামধনু যেন হঠাৎ দেখা দিয়েছে । হাজার হাজার প্রজাপতির পাখনায় ভুবন রঙীন হয়ে উঠেছে।

ট্রেন ঢুকছে মুম্বাই স্টেশানে । কুলিদের হুড়োহুড়ি আর ভেন্ডারদের আওয়াজে গমগম করছে স্টেশান । নামতে হবে । জিনিসগুলো জড়ো করে তুঙ্গা উঠে দাঁড়ালো ।

----চলুন নামা যাক ।

মুখ ফিরিয়ে দেখলো অরিত্রকে -

অনেক ধন্যবাদ । বেশ ভালো কাটলো সময়টা । হয়ত আবার দেখা হবে । কি বলেন ? ভালো থাকবেন । বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই পা চালালো সে ।

শেষ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল অরিত্র - আপনার স্বামীর নামটা জানা হল না যে?

অরিত্র দাসগুপ্ত, নর্মদা ফার্মাসিউটিক্যালস -

প্রায় এক লাফে দরজার সামনে এসে তুঙ্গার পথ রোধ করে দাড়ালো সে ------

ত্রস্ত তুঙ্গা হরিণশিশুর মতন একজোড়া সজল কালো চোখ মেলে চাইলো, অবরোহী চাঁদের মতন দেখাচ্ছিল তাকে ।

ঠিকই চিনেছিল অরিত্র । নামটা শুনে স্যাঙ্গুইন হল । যদিও চেহারা অনেক বদলে গেছে । মাঙ্গলিক সব কাজ হয়েছিল কিন্তু অরিত্র তখন খুব অসুস্থ ।

স্কিজোফ্রেনিয়া গ্রাস করেছে তাকে । খালি নানান লোকের গলার আওয়াজ ও কথা শুনতে পেত সে ।

সব কেমন গুলিয়ে যেত । মনে হত সকলে তার শত্রু --- কে যেন পেছন পেছন আসছে !

ওকে মেরে ফেলবে - সবাইকে সন্দেহ করতো । নতুন বিয়ে করা বৌকে মনে হত খুনী !

অনেকদিন হাসপাতালে ছিল । মা বহু মন্দিরে ছুটোছুটি করেছেন । অসহায় মানুষের শেষ আশ্রয় । কামাখ্যা, কালীঘাট, তিরুপতি কিছুই বাদ যায়নি । অবশেষে সে সুস্থ হয়েছে । আবার কাজকর্মে ফিরেছে । যদিও সারাজীবন তাকে খুব মাইনর ডোজে একটা ওষুধ খেয়ে যেতে হবে, নিয়মিত । কোন নেশা করা চলবে না । তাতে ওষুধের এফেক্ট কমে যাবে।

ট্রেন থেকে নেমে গেল ওরা । অরিত্র বলল - চলুন কোথাও বসা যাক । প্লেন এর বেশ দেরী আছে । চুপ করে কিছু ভাবলো তুঙ্গা । মনে পড়ে গেল তার ছোটমামার কথা । বিয়ের পরে যখন এই গন্ডগোল হয় তখন উনি বলেছিলেন --- মা একবার থেকে দেখ না ! ওষুধপত্র দিয়ে যদি সারানো যায় ! তার দেওয়া সিঁদুর যখন মাথায় আছে এত সহজে হাল ছেড়ে দিবি ? ভাঙা খুব সোজা মা, গড়াই কঠিন !

আজ যেন সেই কথাগুলোই সারা অন্তরে অনুরণিত হচ্ছে ।

একটু হেসে তুঙ্গা বলল - ঠিক আছে চলুন ।

-- ব্যাগগুলো খুব ভারী তাইনা ? আমাকে দিন । অরিত্র এগিয়ে আসে ।

তার হাতে ব্যাগগুলো সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে তুঙ্গা এগিয়ে চলে কংক্রীটের জঙ্গলে । এক নতুন স্বপ্নের সন্ধানে ।

কৈশোরে পড়া, কোনো এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের গল্প- সিস্টার মালতী সেনের এক উন্মাদের সাথে বিবাহ ও পরে সুস্থ অবস্থায় মিলন ; ইউ-পিতে যাবার পথে ট্রেনে-- এইরকমভাবে যে নিজের জীবনেও অনেকাংশেই মিলে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি তুঙ্গা । স্বপ্ন সত্যিও হয় তাহলে !!

---

## গল্পটি সত্যঘটনা ভিত্তিক ।

## নায়ক এখন সুস্থ । উচ্চপদে কর্মরত ।

# মৃগতৃষা

## ১

খুব সাবধানে প্লাস্টিকের কেস থেকে এক এক করে ডিমগুলো ফ্রিজে তুলে রাখছিল মল্লিকা। ডিম দিয়েই আজকাল তিনবেলা পেট ভরায় ।মাছে গন্ধ লাগে আর মাংস কিনতে এতদূরে যেতে হয় যে পোষায় না । ওর সহকর্মী রূপা বলে ‘এত ডিম খাসনা শেষকালে ডিমের মতন চেহারা হয়ে যাবে !’ মল্লিকা হাসে । হাসলে তাকে খুব সুন্দর দেখায় । ডান গালে একটা টোল পড়ে । শুধু ঐ টোলটা দেখার জন্য বিতান কেবল ওর পেছনে লাগতো ।নানান রসিকতা করতো -‘ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো !’-গুনগুনিয়ে ওঠে মল্লিকা ।

‘এই তুমি বনফুল হবে কেন তুমি আমার বৌ ’-টোলে একটা মৃদু টোকা মেরে বলে বিতান।

মিষ্টি হাসি দিয়ে পাশ কাটিয়ে বাগানে চলে যায় মল্লিকা ।

‘আমার এই দেহখানি তুলে ধর -তোমার ঐ ---’ হঠাৎ একঝটকায় তাকে কোলে তুলে নেয় বিতান -এই কি হচ্ছে কি হচ্ছে ? চোখ পাকায় মল্লিকা ।

তুমিই তো গাইলে -আমার এই দেহখানি তুলে ধর !

আবার হাসি আবার খুনসুঁটি --------আবার ডুব দেওয়া আনন্দ সাগরে ।

কোনদিন কি কেউ ভেবেছিল প্রখ্যাত পার্বত কেমিক্যালস্রে মালিক বিতান সাহার আদরিনী স্ত্রী মল্লিকা জীবনের পথে চলতে চলতে একদিন হোঁচট খেয়ে হঠাৎ পান্ডববর্জিত এই মালবাজারে এসে পড়বে ? এমন এক জায়গায় নিয়তি তাকে এনে ফেলবে যে সামান্য মাংস কিনতে নিজেকে যেতে হবে সুদূর এক বাজারে আর না গেলে মাংসই খাওয়া হবেনা ! এক দমকা হাওয়ায় কেমন সব ওলটপালট হয়ে গেল । যেই আকাশের চাঁদটা মল্লিকা নামিয়ে এনেছিল ওদের আনন্দ নিকেতনে সেই চাঁদটাই যেন ফটাস্ করে ফেটে গেল ।

## ২

বিতান আর ও খুব বেড়াতো।প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেত গঙ্গার হাওয়া খেতে । কতদিন এমন হয়েছে -গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে মল্লিকা জীবনানন্দ পাঠ করেছে । যখন চাঁদ উঠেছে তখন তীরে এসে ভীড়েছে ওদের ছোট্ট তরী ।তারপর বাড়ি ফেরার সময় নিউমার্কেট থেকে বাজার করে আনা-সেও এক দারুণ মজা ! মাঝেমাঝে নিজে হাতে রান্নাও করতো মল্লিকা । একটা কাজ চাই তো ! কাঁহাতক বই পড়ে আর সিনেমা দেখে কাটানো যায় ?

সোসিওলজিতে এম.এ করেছিল । বিয়ের পরে অনেকবার চেষ্টা করেছে তার প্রিয় বিষয় ক্রিমিনোলজি নিয়ে গবেষণা করার । কিন্তু বিতান রাগ করতো ।

-‘আমি তো বেঁচে আছি তবে তোমার রোজগার করার কি দরকার ?’

-‘না ঠিক রোজগারের জন্য নয় একটা কাজ তো চাই, তাছাড়া পড়াশোনা করতে আমার ভালোলাগে !’

- বাড়ি বসে যা পড়ার পড় । গবেষণা না করলে জ্ঞান হবে না বা পন্ডিত হওয়া যাবে না এ কোন ধরণের কথা ?

-‘ বৌদিকে গবেষণার পরে দাউদ ইব্রাহিম বা বীরাপ্পানের খুলি স্টাডি করতে ডাকবে !’- ছোট দেওর টিপ্পনী কাটে ।মল্লিকা চুপ করে থাকে।

মল্লিকার বাবা অধ্যাপনা করতেন । তারও ইচ্ছা ছিল বেশ একটা পি.এইচ.ডি করে অধ্যাপিকা হবে ।ছাত্র গড়বে ।কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বিতানের সঙ্গে আলাপ । বিতান তখন ম্যানেজমেন্ট পাশ করে নিজেদের কোম্পানীতে সবে কাজকর্ম দেখতে শুরু করেছে । তার বাবা চন্ডীমোহন সাহা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন ।

ওনার পর্বতারোহণের নেশা ছিল । তাই কোম্পানীর নাম রেখেছেন ‘পার্বত কেমিক্যালস্ ’-এখনো একটা বিরাট পরিমাণ অর্থ নানান পর্বতারোহী সংস্থার জন্য ব্যয় করে কোম্পানী ।

সেবার ওরা দুজনে গোটা কয়েক বন্ধুর সঙ্গে কানহা্ ফরেস্টে বেড়াতে গিয়েছিল । চাঁদনী রাতে বুনো গন্ধ মেখে মাতাল হয়ে উঠেছিল বিতান । মল্লিকা বনহরিণীর মতন চকিতে সরে যায় গাছের আড়ালে । কিন্তু কতক্ষণ ? এরপরে আর আলাদা থাকার উপায় ছিলনা । বিয়ে করে ফেলতেই হল । বিয়ের পরে শ্বশুরমশাই হঠাৎ মারা গেলেন । বিতানের ওপর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো । দেওর তখনো মেডিক্যাল পড়ছে ।

তার মধ্যেই মাঝেমাঝে ওরা হারিয়ে যেত কোন অজানার উদ্দেশ্যে ।

এমনি এক বসন্তে ওরা ঘাটশিলায় গিয়েছিল । গাছে গাছে ফুল, কুহু কুহু, প্রকৃতিকে অপরূপা লাগছে ।

-‘তোমার নাম মল্লিকা না হয়ে মাধবী হলে বেশ হত !’

-‘কেন ?’

-‘মাধবী বিতানে অলি গন্ধে বিলোল ........দ্বার খোল দ্বার খোল ---

ঠক্ ঠক্ - সত্যি কে যেন কড়া নাড়ছে ।

‘ এই কি হচ্ছে কি ? ছাড়ো ছাড়ো -কেয়ারটেকার দেখলে কি মনে করবে বলতো ?’

‘কি আর মনে করবে ! হিংসায় জ্বলবে । তোমার কেয়ার ---টেকার ’।

‘তুমি ভারি অসভ্য ! যাও ’-

মল্লিকা কপট রাগ দেখায় । কেয়ারটেকার রান্নার খবর নিতে এসেছে ।

গরম গরম ভাত,পাত্লা মসুর ডাল, দেশি মুর্গীর ঝোল,তার সঙ্গে আলু না ফুলকপি ভাজবে তাই জানতে এসেছে । বিতান বললো ‘আলু ভাজো’ ।

মল্লিকা বললো ‘ফুলকপি ভাজো’ ।

কেয়ারটেকার চিঁ চিঁ করে বলে --‘দুটোই ভাজি ?’

দুজনে সম্মতি জানিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে ।বিতান হাত দিয়ে ওর টোলটা স্পর্শ করে । মল্লিকা ওকে আলতো করে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলে---‘তুমি বড্ড ছেলেমানুষী কর বিতান !’

সেদিন সকালে সদ্যস্নাতা মল্লিকাকে দেখে বৃষ্টিভেজা একগুচ্ছ ফুলের মতন লাগছিল।সুন্দর, নির্মল । ভোরের চিকন আলো এসে পড়েছে ওর মুখে । জাম রঙের তাঁতের শাড়িতে অপরূপ লাগছে । মনে হচ্ছে যেন কোন স্বর্গের দেবী মাটিতে নেমে এসেছে ।

গলায় টাই বাঁধতে বাঁধতে বিতান বললো-‘ আজ বোস অ্যান্ড এসোসিয়েটস্ এর পার্টি আছে- আমার ফিরতে রাত হবে ।’

মল্লিকা এইসব পার্টিতে যায়না । এগুলোতে বিজনেস ডিল হয় । কোম্পানীর তাবড় তাবড় শেয়ারহোল্ডারেরা আসেন । অনেক কথা, আলোচনা,সইসাবুদ হয় । তারপরে Liquid asset, cash outflow, convertible debenture একসময় হারিয়ে যায় দামী মদিরায় ।

বিতান সোসাল ড্রিঙ্কিং করে । বিয়ের আগে মল্লিকা এই দুটোর তফাৎ বুঝতো না ।ওদের কাছে ‘মদ খাওয়া ’ মানে ভয়ানক খারাপ অভ্যাস,মানুষ সর্বস্ব খোয়ায় অথবা তারা ভীষণ বাজে লোক । কিন্তু এই বিতানের মতন লোকেরা মদ খেয়ে সম্পদ বাড়ায়। মদের গেলাস হাতে বড় বড় ডিল হয় । কোম্পানীর অ্যাসেট বাড়ে । বিজনেস টাইকুনদের নেকনজরে পড়ে ওদের পার্বত কেমিক্যালস্ । আজকাল অবশ্য মল্লিকাও মাঝেমধ্যে মিসেস পাকড়াশী, মিসেস ডোগরার সঙ্গে বসে রেড ওয়াইনে গোলাপী ঠোঁট ভেজায় । কথায় বলেনা -সঙ্গদোষে শিলা ভাসে !

বিতান বেরিয়ে যাবার পরে মল্লিকা ওর বোন যুথীকে ফোন করে ।

-‘দক্ষিণেশ্বরে যাবি ?’

-‘ কখন ?’

-‘একটু পরেই আমি বেরবো- তুই রেডি হয়ে থাক, আমি তোকে যাবার পথে তুলে নেবো ।’

দুই বোনে মিলে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে খানিকক্ষণ পঞ্চবটির ধারে বসে হাওয়া খায় । দূরে গাঙের বুকে নাও ! তরতর করে ভেসে চলেছে কোন সে অজানায় !

ফেরার পথে ভিখারিনীর দল ঘিরে ধরে ওদের । সবাইকে প্রসাদ ভাগ করে দেয় মল্লিকা । যুথীর দিকে ফিরে বলে ‘ আগে ওর কাছে যাবো। ওর মাথায় প্রসাদী ফুল ছুঁ’ইয়ে বাড়ি যাবো। আজ ওদের পার্টি আছে । ওর এমনিতে ফিরতে রাত হবে ।’

সোজা ওরা চলে যায় পার্বত কেমিক্যালস্রে থিয়েটার রোডের অফিসে। অফিস চত্বরে গাড়ি ঢোকে । মল্লিকাকে দেখে সেলাম ঠোকে গেটে বসা দরোয়ান । ও সোজা ওপরে

উঠে বিতানের ঘরের দিকে চলে যায় । পেছন পেছন যুথী । কেবিনে ঢুকতে গিয়ে দরজার হাতল ঘুরিয়ে মল্লিকা যেন স্থবির হয়ে গেল ! কালনাগিনীর মতন বিতানের বাহুপাশে ফোঁসফোঁস করছে এক রমণী,আলুথালু বেশ, মেহেন্দি করা এলোমেলো লাল চুল চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছে ! মল্লিকা কয়েক সেকেন্ড বোধহয় দাঁড়িয়ে ছিল । অসাড় হয়ে যাওয়া পা দুটোকে টেনে টেনে কোনক্রমে সচল করে। তারপর আর একমুহূর্ত দাঁড়ায়নি। তার পদশব্দ মনে হয় বিতানের কানে গিয়েছিল । নিজের ব্যাভিচারে সেও লজ্জিত, দৌড়ে বেরিয়ে আসে কেবিন থেকে ।

‘ মলি যেওনা, যেওনা .......আর কোনদিন হবেনা মলি, আমার কথা শোনো-- যেওনা !’

যুথীকে নিয়ে মল্লিকা সোজা চলে যায় নাকতলায়, বাপেরবাড়ি । তারপর সমস্ত কিছু হয় আইন মেনে । বিতান দেখা করার জন্য অনেকবার ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করেছে কিন্তু মল্লিকাকে টলানো যায়নি । যা নিজে থেকে চলে যায় তাকে ফিরে পাওয়া যায়না --- মল্লিকা জানে ।

## ৩

সোসিওলজিতে এম.এ এর জোরে চলে এসেছে উত্তরবঙ্গের মালবাজারে ।এখানে একটি এন.জি.ওতে কাউন্সিলারের কাজ নিয়েছে। ওর কাজ অসহায় মেয়েদের কাউন্সেলিং করা । সাহায্য করা । আশেপাশের চা বাগানের কুলি বৌ বা তাদের মেয়েদের নানান ভাবে মোরাল সাপোর্ট দেওয়া, মদপ্য স্বামীকে বাগে আনা এইসব কিছুই ঐ এন জি ও দায়িত্ব নিয়ে করে ।

তাই সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত মহিলাদের আজ বড় ভরসা মিস মল্লিকা মিত্র ।

বিতান নেই কিন্তু মাথার ওপর থেকে চাঁদোয়া সরে যায়নি ।

একদিন সব ঝড়ই থেমে যায়, বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে যায় রং চটা অক্ষরগুলো - সেদিন চারপাশে শুধু নৈ:শব্দ্য -তারই মাঝে দু একটি কোকিল বুঝিবা কুহুকুহু ডেকে ওঠে !

হাজার আলোকবর্ষ পার করে প্রবুদ্ধ ওকে স্বপ্ন দেখায় । ওদের অর্গানাইজেশনের এক তরুণ ডাক্তার,বয়সে মল্লিকার চেয়ে ৪ বছরের ছোট ।ওর বাবা মাও ডাক্তার । তাঁরা শিলিগুড়িবাসী। মল্লিকা তাঁদের স্নেহধন্যা ।

উইক এন্ডে ওরা পাহাড়িয়া পথে ঘুরে বেড়ায়,ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে বসে আকাশে উড়ে যাওয়া হংসবলাকা দেখে । নরম রোদে ঝিকমিক করে চা গাছের সারি,কোন আদিবাসি সুরে মাতাল হয় ভুবন, উদাসী হাওয়া এসে এলোমেলো করে দেয় মল্লিকার আঁচল - সলাজে নিজেকে ঢেকে নেয় সে । প্রবুদ্ধ জীবনের গল্প করে । কোন কোন দিন মল্লিকার কোয়ার্টাস্ এ বসে ওর সেতার বাদন শোনে । মল্লিকা চমৎকার সেতার বাজায় । ভোরাই এর মিহি সুরে ঝঙ্কৃত হয় দুটি হৃদয় ।সুরের মাতন লাগে শরীরেও । সেই শরীরে যা বিতান ছাড়া কেউ কোনদিন স্পর্শ করেনি । সূর্য ডোবার পরে যখন ছায়ারা দীর্ঘ হয় তখন দুটি ছায়াশরীর ভাগ হয়ে যায় ।তারপরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় দূরে !

## ৪

মল্লিকার অফিসে, গেটের পাশে দুটো ফুলগাছ আছে । সেদিন দেখলো গাছ দুটি হাসছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে । একটা ফুল ছিঁড়ে চুলে লাগাতে যাবে এমনসময় পাশের বোর্ডটায় চোখ পড়লো : *এই বাগানে ফুল তোলা মানা* -একটু আনমনা হয়ে যায় ও এমনসময় একটা বিকট হর্নের আওয়াজে পেছন ফিরে তাকায় ! গাড়িটিও দাঁড়িয়ে পড়েছে । একটা ল্যান্ডক্রুজার ।সারথী নেমে ওর দিকেই আসছে । পেস্তা টি-শার্ট, বাদামী লিভাইস পরা ব্যাক্তিটি ওর ভীষণ চেনা । হঠাৎ মল্লিকা উল্টো দিকে মুখ করে ছুটতে শুরু করে । আর বহুদূর থেকে ভেসে আসে ‘মলি দাঁড়াও -যেওনা মলি-আমি কলকাতা থেকে ড্রাইভ করে আসছি !’ মল্লিকা ঝট্ করে সরকারী হাসপাতালে ঢুকে পড়ে । আত্মগোপন করে । জানলা দিয়ে দেখতে পায় সেই ব্যাক্তি ফিরে যাচ্ছে ।

## ৫

কলকাতা ছাড়ার পর বন্ধুবান্ধব মারফৎ নিয়মিত বিতানের খবর ওর কানে আসতো ।যদিও ও বিশেষ আগ্রহ দেখায় না । শুনেছে আজকাল বিতান কেবল সুরায় ডুবে থাকে ।কাজকর্ম দেখেই না । ছোটভাই ডাক্তারি ছেড়ে ব্যবসাপত্র সামলাচ্ছে ।

আজ শনিবার । বিশেষ কাজ থাকেনা এইরকম দিনে । একটা ইংরেজি উপন্যাসের পাতায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল মল্লিকা । হঠাৎ বাইরে একটা কোলাহল শোনা যায় । একটু বিরক্তিতেই উঠে গেল জানলার কাছে ।নিশ্চয়ই ফুৎসা আবার ঝামেলা করেছে । এ হল ওদের নেপালী দরোয়ান । যখন ডিউটি থাকেনা প্রায় মদে চুর হয়ে চলে আসে অফিসের সামনে আর ঝামেলা করে, গালিগালাজ করে । বেশ কয়েকবার মল্লিকা ওকে শাসিয়েছে । ও যখন সুস্থ থাকে তখন মল্লিকার পায়ে ধরে ক্ষমা চায় আবার নেশার ঘোরে চলে গেলেই সব ভুলে যায় । জানলার পর্দা সরাতেই দেখলো হালকা ভীড় । ফুৎসাকে দেখা গেলনা। পায়ে পায়ে নেমে গেল বারান্দা দিয়ে । তারপর একটা অফুরান মুহূর্ত । আজ হালকা গোলাপী শার্ট -ময়ূরকণ্ঠী ট্রাউজার । চোখ দুটি স্বপ্নালু । শিলাখন্ডে হোঁচট খেয়ে, শ্যাওলা মাখা পথ পেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে চাইছে মল্লিকা - দৌড় দৌড় !

তার অসতর্ক পদচারণায় একটা তাজা ফুলে ঢাকা গাছ বুঝি মুড়িয়ে গেল ।

## ৬

রবিবারগুলো সাধারণত প্রবুদ্ধ কাটায় মল্লিকা বনে । গরম গরম লুচি বা কচুরী সঙ্গে ঝাল ঝাল কষা আলুর দম কিংবা ঘুগনি বানায় মল্লিকা ।কখনো কখনো ওরা ব্রেকফাস্ট সেরে চলে যায় ঝালং বা সামসিং । সারাটা দিন কাটায় ওখানে । বড় মধুর সেইসব সময় । কোথা দিয়ে যে গোটা একটা দিন ফুরুৎ করে পালিয়ে যায় বোঝাই যায় না। তবে আজ মনে হয় যাওয়া হবে না । কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে আছে । যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে ।ভীষণ ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। মল্লিকার বাড়ি পৌঁছে দেখে গেট খোলা । একটু অবাক হয় । ছুটির দিনে এত সকালে কোথায় গেল ? ---‘মল্লিকা ! মল্লিকা !’

কোন সাড়া আসেনা । নিজের কথা ফাঁকা ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে ।

বেডরুমের দিকে এগোয়, জানলাগুলো হাট করে খোলা । হাওয়ার দাপটে কোণে স্তূপাকৃতি করে রাখা মিউজিকের নোটস্ গুলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে । বাগান থেকে উড়ে এসেছে অজস্র শুকনো পাতা,প্রবুদ্ধর পায়ের চাপে মচ্মচ্ করছে । হঠাৎ শুরু হয় প্রচন্ড বর্ষণ ।

প্রবুদ্ধ জানলা বন্ধ করতে এগোয় । বৃষ্টির ছাঁট ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতন ওর চোখেমুখে এসে বিঁধতে থাকে । আর ঠিক তখনি ঝড়ের তান্ডবে ঘরের একপাশে রাখা সেতারটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় । প্রবুদ্ধ উবু হয়ে বসে এক এক করে ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লাগাবার বৃথা চেষ্টা করে ।

*প্রতিবারই ঝড় ওঠে যেন সব তচনচ করে দেবার জন্যই । ডুয়ার্সের বনপাহাড় কেঁপে কেঁপে ওঠে বাতাসের তান্ডবে ।*

# এখানে পিঞ্জর

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, আজকের মিটিং এর বিষয় । বাঁশরি ল্যাপটপটা খুলে দেখে নিচ্ছিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা । ওকে প্রেজেন্টেশান দিতে হবে । হৃদয়পুর শহরটা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ধুঁকছে । যত লোক বাড়ছে,বাড়ছে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, হোটেল ইত্যাদি । পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জঞ্জাল । সেই জঞ্জাল যেখান সেখানে ফেলে রাখা হচ্ছে ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে । বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জঞ্জালকে হ্যান্ডেল করাই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য । বাঁশরি আজ কয়েকটা নতুন পদ্ধতির কথা এনভায়ারনমেন্ট কমিটিকে জানাবে । সরকার পক্ষের কিছু লোকজনও থাকবে । ওর বস প্রফেসর সৌন্দর্য্যরাজন খুব আশাবাদী এই প্রজেক্টটা নিয়ে । এর আগে উনি পরিবেশ রক্ষার বেশ কিছু চমকপ্রদ সলিউশান দিয়েছেন । নামডাকও হয়েছে । এখন যেকোন সমস্যার সমাধান করতে ওনারই ডাক পড়ে সবার আগে । বাঁশরির মোবাইলটা বেজে উঠলো ।

-হ্যালো ।

- বাঁশরিদি, আমি সতনু বলছি ।

- আরে সুতনু, তারপর বলো কি খবর, অনেকদিন বাদে ।

- আজ ভোরবেলা আমি হৃদয়পুরে এসেছি । তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই ।

-আজ বিকেলে ডিপার্টমেন্টে চলে এসো - কথা হবে ।

ফোন রেখে বাঁশরি নিজ কাজে মনোনিবেশ করে ।

সুতনু একটি *এন.জি.ওর* প্রজেক্ট অফিসার । ভারি সুন্দর সংস্থাটির নাম -‘বনী ’ । বন সংরক্ষণ ও নানান পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে । সুতনু করিতকর্মা ছেলে, যদিও দেখে বোঝার উপায় নেই কারণ স্বভাবলাজুক । গ্রামেগঞ্জে গিয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা বাড়ায় । কাজের সুত্রেই আদিবাসী মেয়ে টুংলীর সঙ্গে আলাপ ও প্রেম । টুংলী টুডু । মেয়েটি একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নার্স । প্রেম হলেও বিয়ে নিয়ে সতনুর পরিবারে আপত্তি আছে । কারণ- আদি ও অকৃত্রিম জাতপাত প্রথা।

বাঁশরির নিজের কথা মনে পড়ে যায় - তার জীবন তার অমল ।

গ্রামের ছেলে সহজ সরল অমলকে ভালোবাসে বাঁশরি মৈত্র।

অমল পাল, জাতিতে কুম্ভকার ।এম.টেক পড়ার সময় একসঙ্গে ল্যাবে কাজ করতে গিয়ে যেই প্রেমের সুত্রপাত তা বিবাহ অবধি গড়াতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বাঁশরিকে । তার জাঁদরেল ব্যারিস্টার পিতার ঘোরতর আপত্তি ছিল এই বিয়েতে ।

-হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট বাবাই ।

-মে বি মে বি, বাট ইউ কান্ট ডিনাই হিজ ব্যাকগ্রাউন্ড । সোসাইটিতে কি পরিচয় দেবো ? আমার জামাই এক গ্রামের ছেলে - ওহ, নো !আই কুড নট ! লোকে ছি: ছি: করবে

। এখন তোমার মনে হচ্ছে যে ও অনন্য কিন্তু আজ থেকে পাঁচবছর পরে যখন মোহ কেটে যাবে তখন তুমি নিজেই বিরক্ত হবে । কোন ম্যানার্স জানেনা, এলিগেন্স নেই হাওয়াই চটি পরে ফ্যাটফ্যাট করে ঘুরে বেড়ায় এরকম একজনকে আমি আমার একমাত্র জামাই হিসাবে ভাবতেই পারিনা । হি কান্ট ম্যাচ আপ উইথ আস ।

শেষে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যখন রেজিস্ট্রি করলো ওরা তখন লোকলজ্জার ভয়ে বাবা তাদের ডেকে এনে জামাইকে স্বীকৃতি দেন । তবে তার পিতার কথা অনুযায়ী পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হলনা । তার আগেই এক দুর্ঘটনায় অকালে চলে গেল অমল, এক তরুণ বিজ্ঞানী - বেঁচে থাকলে সমাজে যার অবদান লেখা হত স্বর্ণাক্ষরে ।

সে মারা যাবার পর ল্যাবে আসতেই ইচ্ছা করতো না বাঁশরির । তার ছোঁয়া চারিদিকে । কিন্তু কাজ তো করতেই হবে । শেষে একটা চাকরি নিয়ে দূরে চলে গেল । পরিবেশবিদের কাজ । তবে প্রায় দেশ-বিদেশে যেতে হত নানান কনফারেন্সে, সিম্পোজিয়ামে । এরকম এক সিম্পোজিয়ামে আলাপ প্রফেসর সৌন্দর্য্যরাজনের সঙ্গে । উনিই ওকে রিসার্চ এ যোগ দিতে উৎসাহ দেন । বিপত্নীক এই বিজ্ঞানী কাজপাগল, পারফেকশনিস্ট । এছাড়া ওনার সঙ্গীতের দিকেও টান আছে । এম.এস শুভলক্ষ্মী ওনার প্রিয় শিল্পী, অবসরে এম.এস শুনেই উনি আনন্দ খুঁজে নেন । এই একটা জায়গায় বাঁশরির সঙ্গে ওনার খুব মিল। বাঁশরির তো এম.এস - এর সুপ্রভাতম্ শুনেই শুরু হয় প্রতিটি দিন ।

সৌন্দর্য্যরাজন বলেন - পরিবেশ বিজ্ঞানকে কিছু দাও । তোমাদের মতন মেধাবী ছাত্রীরাই তো একে এগিয়ে নিয়ে যাবে । শিশুর মতন টেন্ডার বিজ্ঞানের এই ধারাটি । একে সমৃদ্ধ কর ।

বাঁশরি দেঁতো হাসি দেয় । ও যেন শুধু দিতেই এসেছে, নেবার বেলায় দুহাত শুন্য । এরপরে ওনার প্রেরণাতেই রিসার্চ জয়েন করেছে । একসঙ্গে কাজ করে ওরা ।ভালোলাগে ওনার সাহচর্য। তাঁর সান্নিধ্যে যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে । স্বল্পভাষী, নম্র এই মানুষটি কোন কথা না বলেই যেন অনেক কিছু বলতে পারেন । মাঝেমাঝে ওনার আমন্ত্রণে ওনার বাড়িতে কফিপান করতে যায় বাঁশরি । নিজে হাতে কফি বানান প্রফেসর । অ্যাকাডেমিক, নন অ্যাকাডেমিক নানান ধরণের আলোচনা হয় । সেদিন হাই টেম্পারেচার নিয়ে যখন উনি ডিপার্টমেন্ট থেকে দুপুর বেলায় চলে গেলেন বাঁশরির বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল । আজকাল এরকম হামেশাই হয় । ও বোঝেনা এই অনুভূতির অর্থ । অমল যেদিন চলে গেছে সেদিন সবতো শেষ হয়ে গিয়েছিল । তবে ? মনকে বোঝায় যে দুটি নি:সঙ্গ মানুষ কাছাকাছি থাকলে একটু উষ্ণতার সৃষ্টি হতেই পারে । সারাটা দিন ওনার সান্নিধ্যের পর সন্ধ্যাবেলায় যখন বাড়ি ফেরে তখন অদ্ভূত একটা ভালোলাগায় মনটা ছেয়ে থাকে । মনে হয় কখন আবার দেখা হবে ? কিন্তু এই ভালো লাগালাগির কথা কাউকে বলা যায়না । এমন কি যাঁকে ঘিরে এই ভালোলাগা তাঁকেও কি কোনদিন বলতে পারবে ?

যথাসময়ে প্রেজেন্টেশন হয়ে গেল । সবাই ভালো বলছেন । এখন এই নিয়েই চর্চা চলছে । কম খরচে এরকম অভিনব উপায়ের সন্ধান পেয়ে মন্ত্রীমহল ও খুশী । এদিকে ময়নামতীর জঙ্গলে কড়া সরকারী নিয়ম চালু হয়েছে । কোন বুনোশূয়োর পর্যন্ত মারা যাবে না । *মাইনর* **<u>ফরেস্ট প্রোডিউস্</u>** যেগুলোকে বলা হয় সেই শালপাতা, মহুয়া, কেন্দু কিছুই

কুড়ানো যাবেনা কারণ এর নাম করে ঢুকে লোকেরা পশুপাখি মেরে ফেলে । অথচ বনচরেরা এইগুলোর ওপরেই নির্ভরশীল । ওরা বুনোশূয়োর পুড়িয়ে খায় ।এখন নিয়মের বেড়াজালে বন্দী হয়ে ওদের অবস্থা শোচনীয় । সুতনুরা চায় যে সরকার পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বনবাসীদের দিকেও নজর দিন । এমন কিছু করা হোক যাতে একূল ওকূল দুইকূলই রক্ষা হয় । এদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও একটি ব্যাবসায়িক গোষ্ঠী যারা চোরাচালানকারিদের সঙ্গে জড়িত বলে হাওয়ায় খবর ভাসে তারা এই ইস্যুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের ফায়দা তুলতে চাইছে । মাঝখান থেকে বনচরেরা অত্যাচারিত হচ্ছে ।

এদের দলের এক পান্ডা হরিশ অগ্রবাল, যাকে লোকে আগরওয়াল নামে চেনে একদিন সুতনুকে ডেকে পাঠালো ।

-এ কাম হাপনি ছড়িয়ে দিন সুতনুবাবু । হাপনার ভী ভালো হবে হামরাও ভী খুস্ ।

-মি: আগারওয়াল আমার সামনে একটা লক্ষ্য আছে । ট্রাইবাল কমিউনিটিকে বাঁচিয়ে বনসংরক্ষণ । আপনি বললেই তো আমি কাজ ছাড়তে পারিনা ।

-সে ঠিকি আছে, হাপনি আমার কথায় কান না দিতেই পারেন, সে সবি হাপনার ইচ্ছা কিন্তু অত টাইবাল টাইবাল করলে শেষে যাখন হাপনার existence সাংকাট দেখা দিবে হামি কুছু করতে পারবো না হ্যাঁ ! বলিয়ে দিলাম ।

এর ঠিক একমাস পরে রাত তখন আন্দাজ ৯টা হবে, সুতনু কাজ সেরে রোজকার মতন ঘরে ফিরছিল । আধো আলো আধো ছায়াতে চারটি ছায়ামূর্তি তাকে ঘিরে ধরলো । কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধ, চোখে অন্ধকার । তিনদিন পরে হাসপাতালে সুতনুর মৃত্যু হল । বাঁশরি খবরটা পেয়ে স্থবির হয়ে গেল । সতনুকে সে ছোটভাইয়ের মতন স্নেহ করতো । আরো দু:খ হল টুংলীর কথা ভেবে । *যে ফুল না ফুটিতে ঝরিলো ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা !*

এই দূর্দিনে টুংলীর হাতটা ধরে থাকার সংকল্প নিল সে ।

টুংলী হৃদয়পুরে এসেছে । সুতনুর মৃত্যুর পরে বনচরদের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে । জঙ্গলের কর্মীদের সঙ্গে নানান ঝামেলা লেগেই আছে । এদিকে অগ্রবালের লোকেরাও নানান জোরজুলুম চালিয়ে যাচ্ছে । বনীর প্রজেক্ট অফিসার পদটি খালি পড়ে আছে । বাঁশরি ঠিক করলো সে ঐ পদে যোগ দেবে । প্রফেসরকে মনোবাসনাটা জানাতেই উনি ছুটি দিতে রাজি হয়ে গেলেন । বললেন -সফল হয়ে এসো ।

ময়নামতীর ঘন জঙ্গলে অনেক বনচরের বাস । বেশিরভাগই এত গরীব যে পরণের কাপড়টুকুও ছেঁড়া । বুনো ওল, ঘুঘু, ডাহুক, শূয়োর খেয়ে এরা জীবনযাপন করে । কিছু খ্রীস্টান মিশনারি আছেন তারা বিনামূল্যে এদের ওষুধপত্র দিয়ে থাকে । অশিক্ষা ও নানান কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই উপজাতিগণ নিজেদের ভালোটুকু বোঝারও ক্ষমতা রাখেনা । সহজ সরল এই মানুষগুলোকে ঠকিয়ে নেওয়া তো খুবই সোজা । কিছু লোক উঠে পড়ে এখন সেটাই করছে ।বনীর দায়িত্ব নেবার পরে অগ্রবালের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছে ।

-মিসেস পাল হাপনি কোয়ালিফাইড ভি আছেন, সুন্দরী ভি আছেন, হাপনি এই জাঙ্গালে লাইফ বরবাদ কারতে চাইছেন কেন ?

-সেই কৈফিয়ৎ তো আমি আপনাকে দেবোনা মিস্টার অগ্রবা সরি আগারওয়াল ।

-সে হাপনি নাই দিতে পারেন তবে বলছিলাম কি সোসাইটিতে তো আরো আনেক কাম আছে, হাপনারা সিক্ষিতারাই তো আন্য মেয়েদের সামনে আর্দস্, ইখাণে- এ জাঙ্গালে বসে সমাজের কি উপকার করবেন ? এখানে বেশিদিন থাকলে হামি হাপনার সাথে গন্দী বাত্ শুরু করবো । আনেক এ বি সি ডি পড়েছেন , আচ্ছি বাত্ করেছেন ! হিন্দী মুভি দেখেন ? নাকি হাপনার ব্রেনে পেন হয় !

অগ্রবাল লোকটি শুধু মুখোশধারী শয়তানই নয় লম্পটও বটে ।ওর লোকজন অসহায় ঝিলম, রূপাই, বনমতীদের ধরে নিয়ে যায় । সরকার যদি বনচরদের জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন তাহলে তাদের কেবল বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হবেনা । দুদিকই রক্ষা হবে তাতে । কিন্তু করে কে ? নেতরা নিজেদের ঘর গোছাতেই ব্যস্ত । নিরক্ষর ও সরল বনবাসীদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে যার আখেড় গুছিয়ে নিচ্ছে । নামেই নানান প্রোজেক্ট চালু হয়েছে । তার কটা টাকা বনচরদের কল্যাণে খরচ হয় আর কত টাকা টেকোলোকের টাকে গিয়ে পড়ে তা আল্লাই জানেন । শ্যামরা টুডুর ছেলেটার না খেয়ে খেয়ে পেটে ঘা হয়ে গেছে । ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। বনীর পক্ষ থেকে এক ডাক্তার তাকে দেখেছে, কিন্তু শেষ অবধি বাঁচানো যায়না । একটি হাতের কাজের দোকান খুলেছে বনী । সেখানে আদিবাসী মেয়েদের তৈরী নানান জিনিস কিনতে পাওয়া যায় । এক রাজনৈতিক দালাল এদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে পয়সা আদায় করে । যদি ১০ টাকা রোজগার হয় তাহলে ৫ টাকা দিয়ে দিতে হয় । আর রইলো কি ? এক সন্ধ্যায় টুংলী এসে কান্নাভেজা গলায় নালিশ জানায়-

দিদি, কাল রাতে টুসুর মরদের কাছে টাকা চেয়েছিল ও দেয়নি তাই মেরে ওর হাত ভেঙে দিয়েছে । রাগে বাঁশরির সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে ।

অগ্রবালের ডানহাত, কাত্তিক হাঁসদার নিকানো উঠোনে তখন সদ্য ভোরের আলো এসে খেলাধুলো করছে । মুর্গীর ছানাগুলো মায়ের পেছন পেছন দাবায় ঘোরাফেরা করছে । কাত্তিক নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছে । এরকম অসময়ে বাঁশরিকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

-বলি, এসব কি শুরু করেছেন আপনারা ? জোর করে টাকা আদায় করছেন আবার না দিলে মারধোর করছেন ? কি ভেবেছেন টা কি ? আপনাদের ঐ আগরওয়ালকে বলে দেবেন এরপর কারো গায়ে যদি হাত তুলেছে আমি কাউকেই ছাড়বো না ।

ও-ওয়াক থু - মুখ থেকে দাঁতন ফেলে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের পাটি বার করে বিশ্রীভাবে হাসলো কাত্তিক -হে হে । গা টা ঘিনঘিন করে ওঠে বাঁশরির ।

--আগরওয়াল সাব খুব রেগে যাবেন মেমসাহেব । আপনি ভদ্রঘরের মেয়েছেলে, এইসব নোংরামোতে কেন জড়াচ্ছেন বলুন তো ? বাঙালী ভদ্রজাত, পড়ালিখা করুন, কম্পুটার না কি যেন বলে তাতে বসে খুটখুট করুন, এখানে বনবাদারে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন । আপনি ভালো চাইলেই কি ওদের ভালো করতে পারবেন ? যে টাকাটা আমরা নিই সেটা ওরা এমনিতেই দেশী মদ খেয়ে ওড়াবে । আপনি বেকার আপনার পরিশ্রম দিচ্ছেন । এই ছোটলোকগুলো কে আপনি চেনেন না তাই । আগরওয়াল সাব রেগে গেলে কিন্তু কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না । আপনার ভালোর জন্যেই বলছি ।

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বলে গেল বাঁশরির ।

-দেখুন কাত্তিক ( বাবু বলতে রুচিতে বাধলো ) আমি কি করবো না করবো সেটাকি আপনাদের আগরওয়াল ঠিক করবে না আপনি ? একটা আদিবাসীর গায়ে যদি হাত দিয়েছেন তাহলে এই মেয়েছেলে কিন্তু ব্যাটাছেলে হয়ে যাবে, মনে রাখবেন -- অত্যন্ত কর্কশ গলায় বললো সে । কাত্তিকের অবশ্য তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই । বত্রিশ পাটি বের করে মুখে একটা নোংরা শব্দ করে বললো- যতই গালি দিন মেমসাহেব এটা আপনার কলেজ ক্যাম্পাস না, কলকাতাও না - এটা জাঙ্গল আছে। এখানে আগরওয়াল সাব বাদশা, এখানে যতই লেকাচার দিন, গলা -ফা-টা----

হুস - করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাঁশরির জীপ ।

আজ সকালে প্রফেসরের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে । এদিককার সব ঘটনা খুলে বলেছে ওনাকে । উনি সাহস জুগিয়েছেন, বলেছেন যে প্রফেসর ওয়াঙ্গেরি মাথাই, যিনি প্রথম পরিবেশবিদ হিসাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন তিনিও তো একজন ভদ্রমহিলা । কিনিয়ার এই অসীম সাহসী নারী লড়াই করেছেন অনেক। তাঁর স্বামী তাঁকে বলেন - too educated, too strong, too successful, too stubborn and too hard to control. ওনার সংগ্রাম বনচরদের নিয়েই ।

বাঁশরিকেও চেষ্টা করতে হবে হেরে গেলে চলবে না ।

এই কথা কটাই মাথার ভেতর ঘুরছে সমানে । *হেরে গেলে চলবে না* --

কিন্তু সুতনুর কথা জানে, কি ভয়ানক পরিণতি হয়েছে তার !

আবার ভাবে মরে গেলেই বা কি ? কি বা আছে তার ? না হয় একটা মহৎ কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করলো । হঠাৎ প্রফেসরের কথা মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে । তবে কি ? আর ভাবতে পারেনা সে । মনের নিভৃত কোণে যেন গুচ্ছ গুচ্ছ সূর্যমুখী নতুন আলোর স্পর্শ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে । অথচ রাতটুকু কোনদিনই কাটবে না ।

টুংলীর গলার আওয়াজে চিন্তায় ছেদ পড়ে । কাত্তিক অ্যান্ড কোং গঙ্গাধরের বাপকে ধরে নিয়ে গেছে । টাকা আদায় করতে এসেছিল -ও দেয়নি । বাঁশরি কাত্তিকের ডেরায় পৌঁছতেই একদল অচেনা লোক তাকে ঘিরে ধরলো । চলতে থাকে চূড়ান্ত গালিগালাজ ।

-আগরওয়াল হাভেলী মে এ ছামারিয়া আজ নাচেগী - আরে ও রঙ্গা ইস্কি গোরে গোরে চামড়ে পে হাথ লাগাকে তো দেখ জাড়া - বাঁশরির সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল । গা টা ঘিনঘিন করে উঠলো।

এ হেঃ হেঃ হেঃ - হলুদ ছোপ ধরা দাঁতের পাটি বের করে লোকটা এসে বাঁশরির গায়ে হাত বোলতে উদ্যৎ হল । দিশি মদের গন্ধ এসে নাকে লাগছে । গা গুলিয়ে ওঠে । পাশেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে গঙ্গাধরের বাপ ।

বেগতিক দেখে বাঁশরি গলা নামিয়ে বলে- ওকে আপনারা ছেড়ে দিন ।

- এইতো, পথে এসো সুন্দরী, দোবো দোবো এই কুত্তাকে আটকে রেখে আমরা কি করবো ? কুত্তার মাংস খাবো ? হো হো হো ! আমাদের পাওনাটা চুকিয়ে দিলেই আমরা ওকে ছেড়ে দোবো । আগারওয়াল সাব বেইমানি করেন না ।

- কত টাকা হলে ওকে ছেড়ে দেবেন আপনারা ?

টাকাটা কাত্তিকের মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বাঁশরি ওর সহকর্মীদের ইশারা করে । তারা বৃদ্ধকে তুলে নিয়ে যায় । রীতিমতন রক্ত ঝরছে ।

ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় । ক্লান্ত চরণে খওয়ার টেবিলে বসে । ঘুঘুর মাংস আর ভাত । এবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয় । কাজের মেয়েটিকে বহুবার বলেছে বনের কোন পাখি না মারতে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । এদেরকে বোঝাতে সময় লাগবে । ঘুঘুর মাংস নাকি মূর্গীর চেয়েও সুস্বাদু । মনিবকে না চাখালে শান্তি নেই । খেতে পারেনা - মুখে বিস্বাদ ঠেকে । পাখিটার কান্না যেন স্পষ্ট শুনতে পায় ।

ঘুম ভাঙে একটা গোলমালের আওয়াজে । বুধিয়া, মানে ওর কাজের মেয়েটি এসে দরজা খুলে দেখে একদল আদিবাসী এসেছে । অগ্রবালের লোক গতরাতে ওদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে । সেই জায়গায় অগ্রবাল একটা রিসর্ট বানাবে । একমুহূর্ত দেরি না করে বাঁশরি জিপ বার করতে হুকুম দেয় । সোজা গিয়ে হাজির হয় আগরওয়ালের ডেরায় ।

জঙ্গল পেরিয়ে সুবিশাল এলাকা জুড়ে *আশিয়ানা,* তার বাসভবন ।

কত মানুষের মেহেনতের কামাই, চোখের জল, বুক ফাটা আর্তনাদ এর প্রতিটি পাথরে লেখা আছে তা বলাই বাহুল্য । আগরওয়াল ফুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত । চরিত্রের কি অদ্ভুত বৈপরীত্য!

----আসুন মিসেস পাল আসুন, কি ব্যাপার এত্তো সাকাল সাকাল এই stupid কে মনে পড়লো কেন?

-আমি আপনার এগেনস্টে *এফ আই আর* করবো । একি মগের মুলুক পেয়েছেন নাকি ?

-আহা হা এই সাত সাকালে এতো মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন ? আসুন হামার ঘরে আসুন । চা-কাফি খান, ব্রেকফাস্ট করুন তারপর কথা হবে । হাপনি সবসময় হামার উপরে রেগে থাকেন, হামি তো কুছুই বুঝতে পারছি না হাপনি কি বলছেন !

- চুপ করুন বেয়াদপ কোথাকার, আপনার সব জাড়িজুড়ি আমি আজকেই বন্ধ করে দেবো, জেলের ঘানি টানতে হলে সব ফাজলামো বেরিয়ে যাবে - বাঁশরির সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে ।

-একজন ভদ্দরলোকের বাড়ি ঢুকে এই সাতসাকালে মিথ্যা ইলজাম দিচ্ছেন, চোটপাট করছেন, হামিও তো হাপনাকে পুলিশে দিতে পারি ? মানহানির মামলা করতে পারি সেটা হাপনি জানেন ?

-হোয়াট ? আমাকে পুলিশে দেবেন ? ইউ স্কাউন্ড্রেল, দাঁড়ান কে কাকে পুলিশে দেয় দেখাচ্ছি।

গট্‌গট করে বেরিয়ে যায় । থানার দিকে যাবার জন্য এগোতেই কাত্তিকের দল ঘিরে ধরে । কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে । তাদের চোখে নরখাদকের দৃষ্টি । এক ব্যাক্তি এসে তার শরীরে হাত বোলাতে থাকে --জানেমন এ গুলাবের মতন রং, এত্তো ঝাড়জাল সইবে কি করে? খুশবু ভি আছে নাকি ? সে ঝুঁকে পড়ে শুঁকে দেখতে উদ্যত হয় ।

একজন ব্যাগ ধরে টানাটানি করে--এত্তো ভারী ব্যাগ, হাপনার কষ্ট হচ্ছে, হামি লিয়ে যাচ্ছি !

বাঁশরি পেরে ওঠেনা। সে কি হেরে যাবে ? হারিয়ে যাবে ? কি করবে বুঝে ওঠার আগেই একটা গাড়ির তীব্র হর্ণ যেন চরাচর ভেদ করে ঘন বনে মিলিয়ে যায় ।

পুলিশের জিপ এসে গেছে । এস-আই য়ের সঙ্গে নামলেন প্রফেসর সৌন্দর্যরাজন । আজই এসেছেন এখানে । আগেই ফোনে কথা হয়েছিল । তারপরেই উনি পুলিশে যোগাযোগ করেন । প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সময়ের আগেই চলে এসেছে ।

এদিকে বাঁশরি কেমন যেন জড়ভরতের মতন হয়ে গেছে । এতদিনের এত সাহস এক নিমেষে উবে গেছে। একসাথে এতগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়াতে মাথাটা ঠিক যেন কাজ করেছে না । প্রফেসর এগিয়ে এসে বলেন - আর ইউ ওকে ?

- ইয়েস স্যার ।

- কাম অন লেটস গো ব্যাক টু *হৃদায়পুর,* পোলিস উইল ডু দা রেস্ট ।

- বাট আই কান্ট গো লিভিং দেম অন দেয়ার ওন ।

সৌন্দর্য্যরাজন জানালেন যে একজন এক্স ব্রিগেডিয়ার রিটায়ার করে পরিবেশবিদ হিসাবে কাজ করছেন । তিনিই বনীর নতুন অফিসার হয়ে আসছেন । উনি সব সামলে নেবেন । চিন্তার কিছু নেই। অগ্রবালের বিরুদ্ধে একটা এফ আই আর, লজ করা হয়েছে । ওর পার্টির হাই কমান্ড ওকে সাসপেন্ড করতে পারে । শুন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে বাঁশরি । ও কি হেরে গেল ? হেমন্তের আকাশে এক অদ্ভূত বিষন্নতা । একটা গাছের গুঁড়ির ওপরে ধীরে ধীরে বসে পড়ে । খুব ক্লান্ত লাগছে । প্রফেসর এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখেন । আলতো করে চিবুকটা তুলে ধরেন। ভাললাগায় শিহরিত হয় সে । মোলায়েম পরশে সব জ্বালা - যন্ত্রণা মুহূর্তে উধাও । আবেশে চোখ বুজে ফেলে বাঁশরি । পরাজিতের মুখে বিজয়িনীর হাসি ।

বহুবার পড়া কবির লাইন কটি আপনমনেই আওড়ে যায় -

*বর্ণ -জটিল গহনলোকের মর্মবাণী রং*

*বাঁশী আমার তাঁরই ধ্যানের শুদ্ধসারং ------ ।*

# ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

গতবছর ডিসেম্বর মাসে আমরা পাঁচজন মিলে গোয়া বেড়াতে যাই ।ব্যাঙ্গালোর থেকে নিজেদের গাড়িতে যাচ্ছি । বেরোতে বেরোতে একটু বেলা হয়ে গেল । ছুটিছাটার দিনে যা হয়। অতনু তাড়া দিচ্ছিল, তবুও দেরী হয়ে গেল । শনিবারের বারবেলা । আমাদের ভেতর তনিমা একটু কুসংস্কারাচ্ছন্ন- 'শনিবারের বারবেলায় যাত্রা করছিস ! দেখিস যেন যাত্রা শুভ হয় ।'

- 'তনিমা দেবী, একযাত্রায় তো পৃথক ফল হয়না । তুই যখন যাচ্ছিস গাদাগুচ্ছের মাদুলি পরে, তখন যাত্রা কি করে অশুভ হয় বল ? ''- রজত ফোড়ন কাটলো ।

'আজকের দিনটা তোরা ওকে রেহাই দে ।'- তনিমার সমর্থনে এগিয়ে আসে সরোজ । সরোজ উড়িষ্যার ছেলে কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলে । আজ ও আমাদের ড্রাইভার । ঠিক হয়েছে পালা করে ও আর রজত গাড়ি চালাবে ।

লাঞ্চের জন্যে একটি জায়গায় থামলাম আমরা । আবার খানিক দেরী হয়ে গেল । এবারে অতনু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো-' যেভাবে আমরা চলেছি, তাতে কবে যে গোয়া গিয়ে পৌঁছবো কোনো ঠিক নেই'- আমরা হেসে উঠি। তা মন্দ কি ? বেড়াতেই তো বেরিয়েছি । সেই যদি রোজকার মতন ঘোড়ায় জিন দিয়েই চলতে হবে তাহলে বেড়াতে যাবার মানে কি ? এইসব টালবাহানা করতে করতে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। চলেছি তো চলেছি ! পথ আর ফুরোয় না ।রাত তখন প্রায় নটা বাজে। শীতের রাত। প্রায় জনমানবহীন একটা পথ দিয়ে চলেছি আমরা। ঠিক হয়েছে কোন লোকালয় পেলে ডিনার সেরে নেওয়া হবে। হঠাৎ গাড়িতে যান্ত্রিক গোলোযোগ দেখা দিল। গাড়ি আর এগোয় না। ছেলেরা নেমে অনেকক্ষণ খুটখাট করলো। নাহ ! এক পাও এগোচ্ছে না গাড়ি। অতনু এবার বেশ রেগেই গেল। -----তোরা এত দেরি করে ফেলেছিস এখন কি হবে ? এই জনমানবহীন প্রান্তরে কনকনে শীতের রাতে যদি ডাকাত আসে ! তাছাড়া যা ঠান্ডা, জমে গেলেও আশ্চর্য হব না।

--জয় গুরু, জয় গুরু, তনিমা এক মনে মন্ত্র জপ করে চলে। --"ইস্ খুব ভুল হয়ে গেছে। যদি কোয়ালিসটা আনতাম ! পুরোনো সুমোটা করে আসাই উচিৎ হয়নি।" রজতের স্বগতোক্তি। আমি এতক্ষণ ছিলাম নীরব দর্শক। এবার কথা বললাম-- "হেঁটে গিয়ে দেখবো, আশেপাশে কোন দোকানপাঠ আছে কিনা ?"

"ক্ষেপেছিস !" প্রায় একসাথে বলে উঠলো সরোজ ও তনিমা । অচেনা জায়গায় এই অন্ধকারে কোথায় যাবি ? অগত্যা গাড়ির কাছেই পায়চারি করতে লাগলাম। মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছি আমিও। এদিকে তনিমা তো আমাদের প্রায় এই মারে কি সেই মারে। "তখনি বলেছিলাম শনিবারের বারবেলার যাত্রা কখনো শুভ হয়না। আমার কোন কথা যদি এরা কানে তোলে। আরে ! দূরে ওই আলোটা কিসের !" আমরাও ঘাড় ঘোরালাম। সত্যি, বেশ কিছুটা দূরে একটি আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন বাড়ি বা দোকান-টোকান হবে।

রজত বললো --চলতো গিয়ে দেখি। হয়তো কোন লোকালয় আছে।

সে ও সরোজ চলে গেল । আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো। মুখে হাসি-- হ্যাঁ ওটা একটা বাড়ি। এক ভদ্রমহিলা থাকেন- সাথে একটি বাচ্চা চাকর । আশেপাশে কয়েকটি ছোটছোট দোকান আছে কিন্তু সবই বন্ধ হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলাকে আমরা সব কথা বলেছি। উনি সবাইকে যেতে বললেন। 'জয় গুরু' বলে তনিমা মাথায় হাত ঠেকালো। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পা বাড়ালাম। গাড়ি লক্ করে দেওয়া হলো। মালপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। টাকাপয়সার ব্যাগ সাথে নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বাড়িটি মাঝারি আকারের। নাম *রোজব্যাঙ্ক* । নামটি শুনলেই আগাথা ক্রিস্টির গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। গেটের ভেতর ঢুকতেই গোলাপের মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগে। বাড়িটিতে বিজলি বাতি নেই। নেই বলেই যেন বেশি ভালো লাগে। বড় বড় মোম জ্বলছে। গেটের কাছে একজন বয়স্ক মেমসাহেব। পরণে স্কার্ট ব্লাউজ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। চাপা রং। যেন পিতলের কলসে মেঘের ছায়া পড়েছে। মৃদু হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ঢুকেই একটি বড় হলঘর। একদিকে সোফা পাতা, অন্যদিকে ডাইনিং টেবিল। পরিপাটি করে সাজানো। জানা গেল মহিলার নাম মিসেস ডরোথি ডিমেলো। একটি অনাথ বাচ্চা ছেলে সাথে থাকে। টুকটাক কাজ করে দেয়। --আপনারা চা কফি কিছু খাবেন? মিসেস ডিমেলো শুধান।

সরোজ বলে - না অনেক রাত হয়ে গেছে । বলে আমাদের দিকে ঘুরে বলে - তোরা কেউ চা খাবি নাকি ? আমার ইচ্ছে যে ছিলনা তা নয় কিন্তু কেউ কিছু বলছে না দেখে ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে রইলাম ।

----তাহলে হাত মুখ ধুয়ে নিন আমি ডিনার সাজাতে বলি - বলে মিসেস ডিমেলো বাচ্চা চাকরটিকে ডেকে পাঠালেন । আমরা একটু অবাকই হলাম। এত তাড়াতাড়ি সকলের জন্যে ডিনার বানালো কে ? কৌতুহলি তনিমা প্রশ্নটা করেই বসলো। মিসেস ডিমেলো বললেন --আমি একটু বেশি করেই রান্না করে রাখি। ওটা হাইওয়ে তাই গাড়ি বিগড়ে যাওয়ার ঘটনা আকছারই ঘটে।

বুঝলাম সেইসব হতভাগ্যদের এই রোজব্যাঙ্কেই ঠাঁই মেলে। ডিনারের আয়োজন সম্পূর্ণ। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুরকম খাবারই টেবিলে হাজির। বাচ্চা চাকরটি বেশ তৎপর। ডরোথি ডিমেলোর আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। খেতে খেতে টুকটাক কথা হচ্ছিল। ডিনার শেষে সকলে হলঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। গোয়া বা গোয়াপুরি ছিল হিন্দু পন্ডিত অধ্যুষিত অঞ্চল। পর্তুগিজরা এসে এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। গড়ে ওঠে পর্তুগিজ উপনিবেশ। এখনো বহু প্রাচীন অট্টালিকা আছে যা দেখে পর্তুগিজ জীবনযাত্রার একটি আন্দাজ পাওয়া যায়। মিসেস ডিমেলোর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন সুদূর পর্তুগাল থেকে। পরবর্তীকালে তার এক পিতৃপুরুষ একজন স্থানীয় কঙ্কনী ললনার প্রেমে পড়েন। সেই নিয়ে পরিবারে তুলকালাম। ছেলেটির নাম ছিল রয়। বহুবার নিষেধ করা সত্ত্বেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করলো না রয় ও মাধবী। অতঃপর এক চাঁদনী রাতে একটি পুরোনো গির্জার পেছনে দুটি ছায়ামূর্ত্তি পরস্পরের দিকে এগিয়ে এলো। তারা হাতে হাত রাখলো, শপথ করলো কোনোদিন একে অপরকে ছেড়ে যাবে না। চাঁদের আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল মাধবীকে। এক ঢাল কালো চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমর ছুঁয়েছে। তাতে একটি ফুলমালা জড়ানো। তন্বী, মীনাক্ষী, মাধবী । নিঝুম রাত। রাতজাগা পাখিরা যেন মাঝে মাঝে এই নি:স্তব্ধতাকে বিদ্রুপ করে ডেকে ওঠে। মাধবীর ঠোঁটে একটি চুমু খেল রয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের কানফাটা আওয়াজ অন্ধকারকে বিদীর্ন করে কোথায়

মিলিয়ে গেল। লুটিয়ে পড়লো মাধবীর রক্তাক্ত দেহ। কে এই নিশাচর বন্দুকবাজ ? আজও তা অজানা। এই ঘটনার পর রয়কে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শোনা যায় কোন কোন চাঁদনী রাতে সেই জঙ্গলের কাছে আজ আড়াইশো বছর পরেও রয়কে মাঝে মাঝে দেখা যায়। শোনা যায় তার বুকফাটা কান্না। কোন গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে গেলে এক গোরা চামড়া লিফট্ চান। গাড়িতে উঠে তিনি যাত্রীদের এই প্রেম উপখ্যান শোনান। তারপর জঙ্গলের ভেতর কোন জায়গায় গাড়ি থামাতে বলে অন্ধকারে মিলিয়ে যান। তাই চাঁদভাসি রাতে স্থানীয় মানুষ ওই বনপথে বড় একটা যায় না। গা ছমছমে কাহিনী সন্দেহ নেই। মিসেস ডিমেলোর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। রাত অনেক হয়েছে। এবার শুতে যাওয়ার পালা। দোতালায় দুটি ঘরে শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধবধবে সাদা চাদর, নরম গদি, মোমদানিতে বড় বড় মোম জ্বলছে। হাসনুহানার গন্ধে ঘর মো মো করছে। মায়াবি পরিবেশ। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। বিছানায় শুয়েই ঘুমপরীদের দেশে পাড়ি জমালাম। ঘুম ভাঙলো রজতের দরজা ধাক্কানিতে। এই কাকভোরে আবার কি চাই? এখনো বাইরে ভাল করে আলো ফোটেনি। বাচ্চা চাকরটা কোথা থেকে এক মেকানিক ধরে এনেছে। সে আমাদের গাড়িটি সারিয়ে দিয়েছে। অতএব আমরা এবার গোয়া অভিমুখে যাত্রা করতে পারি।

চোখে মুখে জল দিয়ে নিচে এলাম। মিসেস ডিমেলো ঘুম থেকে উঠে গেছেন। স্মিতহাস্যে সুপ্রভাত জানালেন। আমরা সকলে মিলে বারান্দায় এলাম। ভোর হতে তখনো বাকি। একটা হালকা কুয়াশার চাদর জড়ানো ও আবছা আলো চারিদিকে। শিশিরভেজা গাছপালা। বাগানে অনেক ফুল। গোলাপটাই বেশি। মনে মনে বললাম রোজব্যাঙ্ক - সার্থক নামখানা। কাঁকর বিছানো পথের ঠিক মাঝখানে ঝরাপাতা ও ঝরাফুলের ওপর দাঁড়িয়ে একটি প্রকান্ড দেবদারু গাছ। “কই এটা তো কাল দেখিনি -`` তনিমা বলে ওঠে। আমি বলি-- কাল অন্ধকারে হয়তো খেয়াল করিসনি। সকলে মিলে মিসেস ডিমেলোকে বিদায় জানিয়ে গেট ছাড়িয়ে পিচ রাস্তায় উঠে পড়লাম। ঠান্ডা হাওয়া, ফুলের মিশ্র সুবাস। মুখে চোখে ভোরের হাওয়ার ঝাপটা লাগছে। চারিপাশের প্রকৃতি যেন এক অনাবিল আনন্দের ছোঁয়া এনেছে। মিসেস ডিমেলোর কাছে আমাদের ঋণ কোনদিনও শোধ হবে না। ওনার দেখা না পেলে এই নির্জন হাইওয়েতে আমাদের যে কি দশা হতো, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পূবে সূয্যিমামা হাসছে। চারিদিকে লালরং। কেউ যেন মুঠোমুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে ভোরের আকাশে। পথের দুপাশে রাত পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। পায়ে পায়ে পথচলা। অবশেষে গাড়ির কাছে পৌছনো গেল। শীত ভালোই ছিল। তবু এতদূর হেঁটে আসতে আসতে গা গরম হয়ে গেছে। গাড়িও এখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। যাত্রা শুরুর আগে তনিমাকে একটু খোঁচা দিল অতনু-- ‘তাহলে তনিমা দেবী, শনিবারের বারবেলার যাত্রা তো দিব্যি শুভ হলো রে !‘ তনিমা দন্ত বিকশিত করলো।

---কখনো কখনো তাহলে অন্যরকমও হয়, কি বল ? সরোজ বলে ওঠে। তনিমা লাজুক হেসে বলে ---তা হয় বইকি।

সবথেকে কাছের চায়ের দোকানের ঝাঁপ উঠলো। আমাদের প্রাণটা চা চা করে উঠলো। আমরা গুটি গুটি পায়ে হাজির হলাম। সাত সকালেই দোকানে কিছু স্থানীয় লোক জুটে গেছে। গরম চা ও বিস্কুট খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ করলেন।

---‘আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?‘

---‘গোয়া।‘

---‘কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

---‘বাঙ্গালোর।‘

---‘কবে রওনা হয়েছেন?‘

রজত পুরো ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। ভদ্রলোকের চক্ষু চড়কগাছ। ---‘বলেন কি ? ওই বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন ?‘ রজত বললো- ‘হ্যাঁ, উপায় কি ছিল ? আর তাছাড়া আমরা শহুরে লোক, অত ধর্মটর্ম মানিনা ।‘

বৃদ্ধ-- না আমি ধর্মের কথা বলিনি। মশাই আপনারা ঠিক দেখেছেন তো ? বাড়ির নাম রোজব্যাঙ্কই ছিল?

---হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ।

--- কিন্তু বাবুমশাইরা -

রজত এবার রাগতস্বরে বললো---আপনি এতো কিন্তু কিন্তু করছেন কেন ? আমি কি গালগল্প দিচ্ছি নাকি !

বৃদ্ধ একটু থমকে গিয়েই সামলে নিলেন---আসলে ওই বাড়ির কোন বাসিন্দাই আজ দশবছর হলো জীবিত নেই। এক প্রচন্ড ঝড়ের রাতে বজ্রপাতে ওই মেমসাহেব ও চাকরটি নিহত হয়েছে। তারপর থেকে বাড়িটা অমনিই পড়ে আছে। হাইওয়েতে কোন গাড়ি বিগড়ে গেলে যাত্রীদের জন্য মিসেস ডিমেলো তার সাহায্যের অশরিরি হাত বাড়িয়ে দেন ।

তনিমার মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে । আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো । এক মূহুর্তে নিভে গেল উষাকালে জ্বলে ওঠা সব আনন্দের বাতি । এক এক করে কালরাতের সব ঘটনা মনে পড়ে গেল। এমনকি রয়-মাধবীর প্রেম কাহিনীটি পর্যন্ত। এই ডিসেম্বরের সকালেও আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সরোজ প্রাণপণে নিজের গায়ে নিজেই চিমটি কেটে চলেছে । একি স্বপ্ন না বাস্তব ? এই মাইক্রোপ্রসেসার ও স্যাটেলাইটের যুগে এও কি সম্ভব !

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আবার চলার শুরু। পথেই বাগিচা ঘেরা রোজব্যাঙ্ক। সকলেরই চোখ চলে গেল সেইদিকে। কোথায় সেই ফুলের কেয়ারি ? রাশি রাশি গোলাপ ? শুধু দেবদারু গাছটি উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে আছে । বাগানটি আগাছায় ভর্তি। বাড়িটির অবস্থাও তথৈবচ। জীর্ণ শ্যাওলা ধরা একটা দিক ভেঙ্গে পড়েছে । ছাদের পাঁচিলে একটি বাজপাখি উড়ে এসে বসলো । আর শীতের রোদ্দুরমেখে রহস্যময় রোজব্যাঙ্ক আমাদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে ।

# মোহনার দিকে

## একাকীত্ব

সে অনেকদিন আগের কথা । আমরা সদ্য কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি । আমাদের বিষয় পরিবেশ বিজ্ঞান । চিরকাল কলকাতায় থেকেছি । কাজেই পুণায় পড়তে এসে প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হত । স্বজন পরিজন ছেড়ে একা এতদূরে থাকা ; তার ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতন ক্লাসে মাত্র একজন বাঙালী, তাও সে ছেলে । আমার হল মহামুস্কিল । যাইহোক আস্তে আস্তে সব সয়ে যায় । ক্রমে অনেকের সাথে আলাপ পরিচয় হল ।দেখলাম বেশ কিছু বাঙালী সিনিয়ার আছে ।পরবাসের একাকীত্ব অনকেটাই কাটলো ।

## সুপর্ণ

আমাদের ক্লাসের একমাত্র বাঙালী সুপর্ণ রায় । লাজুক প্রকৃতির ছেলে। একদিন যেচে আলাপ করলাম ।তারপর থেকে প্রায় রোজ কথা হত । বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল । আস্তে আস্তে সে নিজেকে মেলে ধরতে লাগলো ।বাবা - মা নাসিকে থাকেন । মায়ের মাথার ব্যমো আছে । সুপর্ণ তার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ । তাই এই অসুখ তাকে খুব কষ্ট দেয় । এমনিতেই সে খুব কম কথা বলে ।মায়ের অসুখ তাকে আরো অর্ন্তমুখী করে তুলেছে ।এখন মৌনতা তার সঙ্গী ।

একদিন পড়ন্ত বিকেলে, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বসে আমি একটি ইংরেজি নোভেলে চোখ বুলাচ্ছি। পাশেই পুরাতন আমলের একটি বিল্ডিং, যেটি আমাদের লাইব্রেরী । হঠাৎ দেখি মুখচোরা সুপর্ণ খুব হাসি হাসি মুখে লাইব্রেরীর দিকে আসছে ।

-কি রে এতো খুশী খুশী দেখাচ্ছে যে ! ব্যাপার কি ? আমি কৌতুহলী ।

- আ আমি না প্রেমে পড়েছি জানিস ! সরল ছেলের নির্মল উচ্ছ্বাস ।

-বলিস কি ! চোখদুটি কপালে তুলে বললাম । তা কে সেই ভাগ্যবতী ? বল বল -- গুরু ডুবে ডুবে পানি পান ? এ্যাঁ ?

সুপর্ণ চুপ করে আছে, হাসছে, আমিও নাছোড়বান্দা । শেষকালে বলে -

-ঐ যে মোহনা শ্রোত্রি আছে না !

- মোহনা ? মানে আমাদের ব্যাচের মোহনা ?

- ইয়েস ম্যাম ! ঈষৎ লজ্জিত সে ।

সুপর্ণর মেয়ে বন্ধু বলতে আমিই ! তাই আমাকেই বলতে এসেছে সকলের আগে ।

আমি জিগেস করলাম -- মোহনা জানে সে কথা ?

-হ্যাঁ ওকে বলেছি ।

-কি বললো সে ?

-ও বলেছে ভেবে দেখবে ।

-বাহ বাহ ! বেস্ট অফ লাক -সুপর্ণ চলে গেলো ।

## মোহনা

মোহনা শ্রোত্রি মারাঠি মেয়ে ।বয়সে আমাদের থেকে এক বছরের বড়। আমরা তিন বছরের গ্র্যাজুয়েট । ও চার বছরের এনভায়ারনমেন্টাল ইঞ্জিনীয়ারিং করে এসেছে ।মেধাবী ছাত্রী । ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। দেখতেও ভারি সুন্দর । ফর্সা টুকটুকে । কোমড় পর্যন্ত লম্বা এক ঢাল কালো চুল ।চোখমুখ যেন গ্রীক ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তি ।বেশি হাসলে মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে । এহেন মোহনার প্রেমে যে কেউ অনায়াসে পড়তেই পারে। আমার সাথে ওর তেমন দোস্তী নেই ।ঐ হাই হেল্লো পর্যন্তই ! তবে মাঝে মাঝে আমার ঘরে নোট নিতে হানা দিত । - আমি তো নোট লিখিনা মোহনা !

-তাহলে পড় কি করে ?

-কেন জিনিসটা বেশ বুঝলেই তো পারা যায় তাই না ?

-তোমাদের বাঙালীদের খুব বুদ্ধি হয় । সূপর্ণও নোট লেখে না !

-তুমি সূপর্ণকে খুব ভালোবাসো তাই না মোহনা ?

লজ্জায় ওর চোখমুখ লাল - ছুট্টে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে । মনে মনে হাসলাম । তুমি একটি অবলা হরিণীর চেয়েও সহজ বধ্য ।

## মহাবালেশ্বর

আমরা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্ররা এক্সকারশনে গেলাম মহাবালেশ্বর। এটি মহারাষ্ট্রের শৈল শহর। স্ট্রবেরী চাষ হয় ওখানে ।সে এক ভারি সুন্দর লাল পাহাড়ের দেশ । ওখানে খুব সিনেমার শুটিং হয় ।মাধুরী দীক্ষিত তখন উঠতি নায়িকা ।প্রায়ই ওখানে তার শুটিং থাকে । একদিন সামনাসামনি দেখলাম ।বেশ বাজে দেখতে ।গালে ব্রণ ভর্তি, রোগা প্যাটকা ।মনে মনে বললাম ‘ রূপালি পর্দার স্বপ্নসুন্দরীর এই ছিরি ! ধন্য আলোক চিত্র!’

সূপর্ণকে একটু ক্ষ্যাপাতে গেলাম ।

-সুপর্ণ দেখতে পাচ্ছিস ? বলতো কে ?

-হ্যাঁ,ও তো মাধুরী রে,তেজাব সিনেমায় ছিল ।

-তুই চিনিস ওকে ?

-কেন চিনবো না ? আমি তেজাব দেখেছি । মোহনার সাথে ।

-ও ছেলে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে ? তা গুরু ট্রিট ফ্রিট দাও !

লাজুক হেসে বলে ‘ স্কলারশিপের টাকাটা পাই ! ’

সুপর্ণ একটি গবেষণাগারের স্পনসরড ছাত্র ছিল ।

## থিসিস ও তারপর

ফাইনাল ইয়ারের শেষভাগে জোর কদমে থিসিসের কাজ চলছে ।আমার বিষয় ‘ওয়াইল্ড লাইফ ’আমি আপাতত আছি মাইশোরের কাছে একটি অরণ্যে । ওখানেই আমার কাজ কারবার চলছে । সুপর্ণ ও মোহনা আছে পুণাতেই । সে যুগে ইমেলের চল ছিল না। একদিন সুপর্ণর একটি চিঠি পেলাম । পরীক্ষা শেষে সে এবং মোহনা রিসার্চ করতে ঢুকবে । খুব ভালো কথা । যথাসময়ে আমরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হলাম। তারপর যে যার পথে চলে গেল । আমি একটি এন-জি-ও তে যোগ দিলাম। নাম তার ‘সবুজায়ন ’- পরিবেশ বিদ্যার ছাত্রদের এন-জি-ও তে যোগ দেওয়া মানে সমাজসেবা নয়- তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যান -নানান পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করেন । কিছু কিছু কাজ গবেষণাধর্মীও বটে। বিদেশ থেকে ফান্ড আসে । কাজ হয় বড় বড় পরিবেশ বিজ্ঞানীর আন্ডারে । বেশ সুন্দর একটি প্রচেষ্টা মনে করে আমি সবুজায়ন এ যোগ দিলাম।বছর দেড়েক পরে একদিন একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এর কনফারেন্সে হঠাৎ সুপর্ণর সাথে দেখা।মোহনা এবং সে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এ গবেষণারত । খুব শীঘ্রই ওরা বিয়ে করবে । খুব খুশি হলাম শুনে । আগাম নেমতন্নও জুটলো । তবে যাবো কিনা কথা দিতে পারলাম না ।

## সেদিন চৈত্রমাস

বছর চারেক পরে চৈত্রমাসে একটি হিমালয় সংক্রান্ত সেমিনারে গেছি হিমাচল প্রদেশে ।সুপর্ণর সাথে দেখা । খুব আনন্দ হল এতদিন পরে পুরনো বন্ধুকে দেখে ।প্রায় একলাফে ওর সামনে পৌছে গেলাম।

--কি রে কেমন আছিস?

--ভালো- সংক্ষিপ্ত জবাব ।

--মোহনা কেমন আছে ?

--জানিনা ।

--জানিনা মানে ? তোদের বিয়ে তো এতদিনে হয়ে যাবার কথা !

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো:

---আমাদের বিয়ে হয়নি - (খুব হতাশ দেখাচ্ছিল ওকে ) আমি ওর উপযুক্ত পাত্র নই

তাই মোহনার বাবা মা তার অন্যজায়গাতে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন ।

আমি চমকে উঠে বলি - সেকি ! মোহনা রাজি হল কেন ?

--ওরা মোহনাকে জোর করে ওদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়, তারপর স্বজাতের এক তরুণের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন ।

--দিয়ে দেন মানে ? মোহনা একবারো অবজেক্ট করলো না ?

--জানিনা -আমার আর ভালোলাগছে না, অন্য কথা বল । খুব অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে ।

কাজেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হল । কিন্তু ভেতরটা আমার ব্যাথায় মুচড়ে উঠলো ।

## রোগশয্যা

জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে বেশ কিছুকাল ছিলাম । শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে কেবিনের বাইরে যাবার অনুমতি মিললো ।অল্পবিস্তর হাঁটাচলা করি আমি সামনের বারান্দায়। পাশের কেবিনে এক অল্পবয়সী মহিলা গুরুতর অসুস্থ । কিডনির অবস্থা খুব খারাপ । কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট না করলে বাঁচানো যাবে না তাকে । ভদ্রমহিলার মায়ের সাথে একদিন যেচে আলাপ করলাম । জানা গেল রোগিনী বিবাহবিচ্ছিনা । মানসিক অবসাদে ভোগেন মাঝে মাঝে - আর তার ওপর এই কিডনির অসুখে ধরেছে ।একজন ডোনার পেলে তাকে বাঁচানো যেতে পারে কিন্তু এখনো কাউকে পাওয়া যায়নি ।খুব দূর্বল । সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হয় । একদিন দেখতে গেলাম ।

কোথায় সে এক ঢাল কালো চুল ?দুধে আলতা রং? শরীরে কাল শিটে পড়েছে ।চোখগুলো গর্ত্তে ঢোকা ।সিলিঙের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে মোহনা ।

---চিনতে পারছো আমাকে ?আমি শুধাই ।

ক্লান্ত চোখ মেলে আমার দিকে চাইলো সে ।ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো। হাত তুলে ইশারায় আমাকে কাছে বসতে বললো ।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে মোহনা । সুপর্ণ একে বাঙালী তায় ওর মায়ের মাথার ব্যমো ছিল । এছাড়া মোহনা সুপর্ণর চেয়ে এক বছরের বড়ও বটে ।কাজেই তার বাবা এই সম্পর্ক মেনে নিতে অপারগ । মোহনা লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ালেও বাবা মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার মতন তার সাহস ছিল না । এহেন অবস্থায় তার বাবা ও কাকারা তাকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নজরবন্দী করে রাখেন । তারপর প্রাচীন যুগের মতন নিজেদের পছন্দ করা পাত্রের হাতে অর্পণ করেন ।বিয়ের পর তাকে চলে যেতে হয় আমেরিকা । কিন্তু মন পড়ে থাকে এই ভারতে । এখানে সুপর্ণ আছে যে !

মোহনার স্বামী লোকটি পন্ডিত হলেও লম্পট ও খুব ধান্দাবাজ । যথারীতি বিবাহিত জীবনে নেমে আসে অশান্তির ছায়া । একদিন বিবাহবিচ্ছেদও হয়ে যায় । তখন থেকেই এই রোগের সুত্রপাত।

এইসব ঘটনা হিন্দী মশলা সিনেমাতে দেখা ছিল । বাস্তবজীবনেও যে হতে পারে তা আমার ধারণারও বাইরে ।সবকিছু শোনার পরে আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো ।

আমারই বয়সী একটি মেয়ে যে রূপে গুণে একেবারে প্রথমসারির তার দূর্ভাগ্য ও করুণ পরিণতির কথা ভেবে বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠছিল । কিছু মানুষের ভুল বা একপেশে একটি ডিসিশনের জন্য এইভাবে একজনের জীবন নষ্ট হয়ে গেল !

হাসপাতালে এসে আমার শরীর সারলেও মনটা একদম ভেঙে গেল ।

## উৎকণ্ঠা

দিন কেটে যায় আপন ছন্দে । আমার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দিন ঘনিয়ে এলো । ক্রমশ মোহনার অবস্থার অবনতি হচ্ছে। চোখের সামনে এক সহপাঠিনী এইভাবে মৃত্যুর কলে ঢলে পড়ছে আর আমার করনীয় কিছুই নেই-কোনদিন কি ভেবেছিলাম আমাকে এও দেখতে হবে ? মোহনার বাড়ির লোকজন বহু চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে করে কোন ডোনার এর সন্ধান মেলে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । কেউ এগিয়ে আসছেন না।

*মোহনাকে কি বাঁচানো যাবে না ?* কদিন ধরে এই একটা প্রশ্ন আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

## দেবদূত

একদিন সকালে দেখি মোহনার কাকার মুখে চওড়া হাসি । কি ব্যাপার না একজন ডোনার পাওয়া গেছে ।সেও অল্পবয়সী ।ডাক্তার অনেক জটিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই ব্যক্তি কিডনি দিতে সক্ষম । মোহনা এবার নবজীবন লাভ করবে - মনটা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো । ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কেবিনে ফিরলাম । আজ বিকেলে আমার ছুটি । এরকম একটি শুভসংবাদ নিয়ে ফিরতে পারবো আগে ভাবিনি । দেবদূতরা তাহলে এখনো আসেন !

## নবজীবন

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি মুম্বাইতে কিছুদিন ছিলাম । নিয়মিত মোহনার খবর নিতাম ।নির্দিষ্টদিনে ওর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়ে গেল।মোহনা নবজীবন লাভ করলো ।একদিন তাকে দেখতে হাসপাতালে গেলাম ।ইনফেকশনের ভয়ে ডাক্তার ও নার্স ছাড়া কারো কেবিনে প্রবেশাধিকার নেই ।ছোট্ট একটি জানলা মতন সেটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয় রুগীকে । নিষ্পাপ একটি মুখ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে । ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বোধহয়।ঠিক যেন একটি শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে । বাইরে এসে ওর বাবা মায়ের সাথে দেখা করলাম । স্বভাবতই খুব জানতে ইচ্ছা করছিল কে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে !জানা গেল এক বাঙালী যুবক । খুব খুশি হলাম । গর্বে বুক ফুলে উঠলো । মনে মনে বললাম যে লোকে কেবল বাঙালীদের নিন্দাই করে- এদের দেখতে পায়না তারা ?

আন্টিকে জিগেস করলাম - ‘ নাম কি এই ভদ্রলোকের ?

একগাল হেসে উনি বললেন - ড: সুপর্ণ রায় - মোহনার ক্লাসমেট ছিলেন-হি ইস একসেপশনাল !

চকিতে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল - হৃদস্পন্দন একলাফে কয়েকগুন বেড়ে গেল - এরকম মেলোড্রামা তো আশা করিনি ! কোনরকমে শুধু বলতে পারলাম - উনি কোথায়?

উত্তরটা কানে ঢুকলো না । আর দাঁড়াতে পারছি না ।কানের দুপাশে শিরাগুলো উত্তেজনায় দপদপ করছে ! দ্রুত পায়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা খোলা আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম । কাঠফাটা রোদ্দুর যেন আজ সবকিছু ঝলসিয়ে দেবে ! আর কানে শুধু একটি লাইনই ধাক্কা মারছে, বারবার ---*হি ইস একসেপশনাল ! হি ইস একসেপশনাল !*

# লছমী

লছমীর সঙ্গে আলাপ বনজোছনায়, এক সবুজ অন্ধকারে । আমি একটি ন্যাশেনাল পার্কে পরিবেশবিদ হিসাবে কর্মরতা ছিলাম । একদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় । লছমী ওখানে টাইপিস্ট হিসাবে নতুন কাজে যোগ দিয়েছিল । বয়স গোটা ২০-২২, চাঁপাফুলের মতন রং, টিকালো নাক,ভাসা ভাসা দুটি স্বচ্ছ চোখ। আগে ওকে বেশ কয়েকবার দেখেছি, টুকিটাকি কথা হয়েছিল ।

--ম্যাডাম আমাকে একটু কনকপুরা রোডে নামিয়ে দেবেন ? বাস আসতে এখনো অনেক দেরি, আজ আমার একটু তাড়া আছে, আমার মেয়ের খুব জ্বর !

পথে যেতে যেতে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বাকি আলাপন :

--তোমার বাড়ি কোথায় লছমী ?

--রাঁচীতে ম্যাডাম ।

--সে কি !তুমি কান্নাডিগা নও---আমি বিস্মিত ।

--আমার গায়ের রং তো কালো নয়, ওর সহজ উত্তর ।

--তা এই অল্পবয়সে এতদূরে এসেছো,শুধুই কাজের সন্ধানে নাকি কোন বিশেষ কারণে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সে-তারপর বলে,আজ নয় ম্যাডাম পরে একদিন আপনাকে সব বলবো অবশ্যি আপনি যদি শুনতে চান ।

এরপর জঙ্গলমহলে এক বিকেলে আমি আর লছমী -পড়ন্ত বেলায় সুর্যের শেষ আভায় লছমীর মুখে এক লালিমা খেলা করছে । রাঁচী শহরের কাছে একটি গ্রামে লছমীর বাবা কোন এক প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন । লছমী লালা সম্প্রদায়ের মেয়ে । লালারা বিহারের কায়স্থ । ছয় ভাইবোনের মধ্যে লছমী মেজ ।পড়াশোনায় সে বরাবর খুব ভালো ছিল--কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ পরিবারে যা হয়, ছেলেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত । কেবল বাবা তাকে খুব স্নেহ করতেন । একদিন সেই এলাকায় এলেন এক আর্মি জওয়ান । কোন বন্ধুর বাড়ি ছুটি কাটাতে এসেছে,সুন্দরী লছমী সহজেই এই বীরপুঙ্গবের নজরে পড়লো । এর সঙ্গে ভাব জমে উঠলো । ক্রমে ঘনিষ্ঠতা এবং প্রণয় ।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা । অভ্যাসবশত: সেদিনও লছমী গিয়েছিল আর্মিম্যান উমেশের সঙ্গে দেখা করতে । শালবনের ধারে চাঁদনী রাতে মিঠিমিঠি বাত হল । সরল মেয়েটি বোধহয় একটু বেশি আবেগতাড়িত হয়ে গিয়েছিল । হঠাৎ উমেশ খপ্ করে তার হাত চেপে ধরে - কিছু বুঝে ওঠার আগেই টেনে নিয়ে যায় জঙ্গলে । লছমী চিরদিনের মতন কুমারীত্ব হারায় ।

এরপরের ঘটনা আরো জটিল । ও অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ে । এদিকে উমেশ পলাতক । স্বভাবতই পরিবারের অন্য লোকেরা ও গ্রামবাসীগণ তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতে থাকে । বাবা তার পাশে ছিলেন কিন্তু তাঁর একার পক্ষেও এই ভারবহন সম্ভবপর হয়না ।

সইতে না পেরে একদিন লছমী গৃহত্যাগী হয় ও চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিতে যায় ।

তাকে বাঁচান এক চিকিৎসক । মধ্যবয়সী, বিপত্নীক ।

তিনি ওকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান । যথাসময়ে কিশোরী লছমী মাতৃত্বের স্বাদ পায় । এরপরে কাহিনী একেবারে অন্য দিকে মোড় নেয় । ডাক্তারবাবু লছমীকে চাপ দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেন । তার বাচ্চাটিকে অনাথ আশ্রমে দেবার জন্য চাপাচাপি করেন । ঠিক এইসময় লছমী কিছু মানুষের দেখা পায় যারা তিরুপতিতে তীর্থ করতে আসছিল বিহার থেকে । বাচ্চাটিকে নিয়ে এক রাতে পালিয়ে সে তাদের দলে ভিড়ে যায় । অবশেষে তিরুপতিতে আসতে সক্ষম হয় ।

একেই বোধহয় বলে ঈশ্বরের করুণা । তিরুমালা মন্দিরে সে আমাদের ন্যাশেনাল পার্কের ডি-এফ-ওর ( ফরেস্ট অফিসার ) নজরে পড়ে । সেই ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী লছমীকে নিয়ে আসেন এই জঙ্গলমহলে । লেখাপড়ায় সে ভালো ছিল । ডি-এফ-ও ওকে টাইপ শেখার ব্যবস্থা করে দেন ও কিছু দিনের মধ্যেই টাইপিং এ চোস্ত হয়ে ওঠে । একটি থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যায় । শেষে আরো বড় এক কর্তার সুপারিশে একটি চাকরি জোটে এই পার্কে । এরপরে কন্যাসন্তান সহ লছমীর দিনকেটে যায় আপন ছন্দে ------!

গল্প শেষ করে থামলো লছমী । বলি -- তোমার তো খুব সংগ্রামের জীবন !

মৃদু হেসে সে বলে --- জিন্দেগীকে হরকদম পে জঙ্গ হোতা হ্যায় ।

ওর জীবনবোধ আমাকে চমকিত করলো । ইতিমধ্যে গাঢ় সন্ধ্যা নেমেছে । দলে দলে পাখিদের ঘরে ফেরা দেখতে দেখতে আমি অফিসঘর ছেড়ে নিজঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

লছমীর কাজ নিঁখুত । সে টাইপ হোক বা অন্য কাজ । শুধু তাই নয় ওর কাজের প্রতি নিষ্ঠা আমাকে অবাক করতো । বিহার সম্পর্কে নানান কথা শুনতাম কিন্তু সেখানকার একটি গ্রামের মেয়ের মধ্যে যে জ্ঞানের ঝলক ও নিষ্ঠা দেখলাম তা আমাকে সত্যি মুগ্ধ করলো । খুব উপভোগ করতাম ওর সান্নিধ্য । কতদিন এমন হয়েছে আমি ওকে নিয়ে চলে গেছি ডীপ ফরেস্টের ভিতরে । সেখানে গাড়ি থামিয়ে বুনোপথে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটেছি । মহুয়ার গন্ধ মেখে কত গল্প করেছি । তারপর একসময় ফিরে এসেছি সভ্যজগতে ।

একদিন ওর মেয়ের ধুম জ্বর । জঙ্গলের আপিস থেকে ডাক্তারখানা অনেক দূরে । এই পথে গাড়ি চলাচল খুব কম । আমাকে ও অনুরোধ করলো -- ম্যাডাম, আমাকে একটু লিফট্ দেবেন ? ঝারোখার আজ খুব বিমার ।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি ওর মেয়ের গা পুড়ে যাচ্ছে । অসুস্থ বলেই তাকে আজ নিয়ে এসেছিল আপিসে । আমি ততক্ষণাৎ ওদের ডাক্তার খানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি । ডাক্তার দেখানো হয়ে গেলে ও আমার হাত দুটো ধরে কান্নাভেজা গলায় বললো - ম্যাডাম, আপনি আমার মাই-বাপ-আপনার এই দয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না - আমি সবসময় আপনার কথা মনে রাখবো - উপরওয়ালা আপনার ভালো করবেন ।

--উপরওয়ালা আর কোথায় লছমী ? তোমরাই আমার ভগবান।

কয়েক ফোঁটা জল যেন ওর নরম গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকদিন পরে ছাদে উঠলাম । মেঘমুক্ত আকাশ, মৃদুমন্দ সমীরণ বইছে, হালকা একটা সরের মতন অন্ধকার চারিপাশে । চাঁদটা আজ বড্ড ফ্যাকাসে লাগছে ! নাকি কালের পরশে চাঁদটা এরকম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আমিই হয়ত এতদিন খেয়াল করিনি । রাঁচী থেকেও তো এই একি চাঁদ দেখা যায়,তাইনা ? লছমীর বাবার কি একবারো মেয়ের কথা মনে পড়েনা ? আমার আবেগপ্রবণ মন কল্পনার জলরং এ নানান ছবি এঁকে চলে ।

হঠাৎ পিঠে একটা হাতের স্পর্শে মুখ ঘুরিয়ে দেখি আমার স্বামী আমাকে খুঁজতে ছাদে এসে উপস্থিত হয়েছেন ।

--কি ব্যাপার এত রাতে না বলে ছাদে চলে এসেছো যে ?

---এমনি, আজকের চাঁদটা দেখো কি ভীষণ ফ্যাকাসে ।

---সে তো বুঝলাম কিন্তু একবার বলে আসতে হয়, আমি চারিদিকে খুঁজছি যে !

---কেন খুঁজছিলে ?

---এ আবার কি প্রশ্ন ? কেন আবার খুঁজবো ?

---কৈ লছমীকে তো কেউ খোঁজেনা ?

এই অদ্ভুত কথা শুনে আমার স্বামী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন ।

আমি বিড়বিড় করেই চলেছি -- এরকম কত লছমী প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তাদের কথা তো কেউ বলেনা ! আমাকে খুঁজছো কারণ আমি তোমাদের কাছে দামী। কিন্তু মানুষের দাম নির্ধারণ হয় কি করে ? রূপ দিয়ে ? গুণ দিয়ে ? স্বভাব দিয়ে ? কিন্তু লছমীর তো সবই আছে,স্নেহময় পিতা আছেন, পরিবার পরিজন আছেন, কিন্তু কেউ তো ওকে খোঁজেনা !

আমার স্বামী নিরুত্তর থাকেন ---কেবল একটি রাতজাগা পাখি যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি করতে করতে উড়ে যায় ----কেউ খোঁজেনা-কেউ খোঁজেনা-কেউ খোঁজেনা !

পরদিন যখন সবে কচি লেবুপাতার মতন রোদে ভরে উঠেছে সকালটা একমুখ হাসি নিয়ে লছমী হাজির। সঙ্গে একবাক্স ঠেকুয়া । আজ ওর মেয়ের নামে বনশঙ্করীর মন্দিরে পূজো দিয়ে এসেছে । তারই প্রসাদ ও নিজে হাতে বানানো ঠেকুয়া আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছে ।

( ঠেকুয়া বিহারের জনপ্রিয় একধরনের শক্ত,বলের মতন মিষ্টি খাবার )

-ম্যাডাম, সামান্য কিছু এনেছি, যদি গ্রহণ করেন খুব খুশি হব ।

-একি বলছো লছমী ? তুমি নিজে হাতে বানিয়ে এনেছো আমি খুব খুশি হয়েছি গো ! এগুলি বুঝি তোমার দেশের খাবার ?

-হ্যাঁ ম্যাডাম আমি কাল এগুলো বানালাম- ভেঙ্কিকেও দিয়েছি ।

এই ভেঙ্কি বা ভেঙ্কটেশ্বরের সঙ্গে ওর শাদি হবে । ছেলেটি আমাদের আপিসের ক্লার্ক ।

জাতিতে তামিল, উচ্চশ্রেণীর আইয়ার ব্রাহ্মণ । যদিও এই শ্রেণীরা সাধারণত গোড়া বলে আমরা জানি তবুও ওর বাবা-মা এই বিয়ে মেনে নিয়েছেন । একটি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বহু স্বনামধন্য প্রফেসরকে দেখেছি যাঁরা নিজেদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ পর্যন্ত আইয়ার-আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ কূল ছাড়া দিতে রাজি হন না - সেখানে সাধারণ পরিবারের ছেলে ভেঙ্কির বাবা-মা যেন একটি সুন্দর ব্যাতিক্রম । মনে মনে ওনাদের শ্রদ্ধা জানালাম । দক্ষিণীরা খুব অর্থডক্স হন বলে আমরা জানি-কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবসময় তা হয়না - আমরা বোধহয় বেশির ভাগ সময় কম জেনে বেশি বলে ফেলি ।

হাতি আজ লুপ্তপ্রায় প্রজাতি ভুক্ত । সারা দুনিয়াতে অল্পসংখ্যক হাতি জীবিত আছে।তাদের সংখ্যাও ক্রমহ্রস্বমান ।জঙ্গলের চোরাচালানকারী গণ হাতি মেরে তার দাঁত অনেক মূল্যে বিদেশে পাচার করে । বাচচা হাতি ধরে নিয়ে গিয়ে সার্কাসে চালান দেয় । দক্ষিণের অনেক মন্দিরে হাতি পোষার চল আছে । সেখানেও হাতি চালান দেওয়া হয় । প্রচন্ড গরমে পাথরের মেঝেতে এই প্রাণীদের বেঁধে রাখা হয় দিনের পর দিন । ওদের পায়ের তলা খুব নরম তাই প্রখর তাপে ওরা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে । আমার বজ্রকঠিন অন্তরে যেই কোমল অংশটুকু আছে সে আমাকে কাঁদায় । তাই একদা এরকমই একটি হাতি পাচার চক্রকে আমি ও আমার কয়েকজন সহকর্মী হাতে নাতে ধরে ফেলি । বহুদিন ধরেই আমাদের কাছে খবর ছিল কিন্তু কিছু করা যাচ্ছিল না ।মৌচাকে ঢিল দিলে যা হবার তাই হল । লোকগুলি আমাদের পেছনে লেগে গেল । এইসমস্ত দূর্ধষ ক্রিমিন্যালদের দৌরাত্ম্যে এমনিতেই পুলিশমহল বিব্রত ছিল । যদিও মুখে তারা বললো আমাদের এক্সট্রা প্রোটেকশন দেওয়া হবে কিন্তু বাস্তবে কি হবে কেউ হলফ করে বলতে পারলো না । আমার স্বামী ও বন্ধুবান্ধব কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকতে বললো । বলাবাহুল্যই আমি রাজি হইনি । কয়েকটা ক্রিমিন্যালের কাছে শেষে হেরে যাবো ? আমার জেদের কাছে তারা বশ মানলো ।

সেদিন ছিল শুক্রবার । আমি কাজ সেরে বেরুতে যাবো হঠাৎ লছমী ঝড়ের মতন আমার ঘরে এসে ঢুকলো ।

---ম্যাডাম আপনার গাড়িটা একটু দেবেন আমি ইউক্যালিপটাস প্লান্টেশনের ওখানে যাবো আমার ভীষণ দরকার ।

লছমীর সঙ্গে যদিও আমার হৃদ্যতা ছিল কিন্তু এইজাতীয় আবদার ও কোনদিন করেনি । মূল ফরেস্ট আপিস থেকে ৬-৭কিমি দূরে ইউক্যালিপটাস প্লান্টেশনের কাছে আর একটি আপিস আছে । সেখানেই ও যেতে চায় । আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই টেবিল থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে চলে গেল । আমার ড্রাইভার বাসাপ্পাকে নিয়ে হুস করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল আমি দেখতে পেলাম আমার ঘর থেকে । কিছু বুঝতে পারলাম না । কি এমন দরকার হতে পারে যে এইভাবে আমার গাড়ি নিয়ে ও চলে গেল ? এই একটা চিন্তা বারবার ঘুরে ফিরে আসছিল ।

একাকিনী সেই ঘরে বসে আমি,অকস্মাৎ টেলিফোনের ঝন্ঝন্যানি আমার চিন্তায় ছেদ টানলো । টেবিলের ওপর প্রান্তে রাখা ফোন ধরতে উঠলাম, ওদিক থেকে ভেসে এলো এক বনকর্মীর গলা----চোরাচালানকারীর গুলিতে সাংঘাতিক যখম হয়েছে লছমী -ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে-আমি যেন কাল বিলম্ব না করে ইউক্যালিপটাস প্লান্টেশনের আপিসে চলে যাই ।

হাত থেকে রিসিভার পরে গেল । সামনের দেওয়ালে টাঙানো লছমীর আঁকা একটি মধুবনী পেন্টিং, যেটি তার কিছুদিন আগেই আমি বাঁধিয়ে এনেছিলাম । চোখ পড়তেই চীৎকার করে উঠলাম - লছমী রে -এ-এ-এএএএএ ! সেই আওয়াজ সহস্রগুণ হয়ে আমার কানে ফিরে এলো । ফাঁকা ঘরে বড্ড বেশি আওয়াজ হয় ।

চোরাচালানকারীরা বহুদিন ধরেই আমাদের কয়েকজনকে টার্গেট করেছিল । ওদের কাছে খবর ছিল আমি সেদিন ইউক্যালিপটাস প্লান্টেশনের আপিসে সন্ধ্যাবেলা কাজে যাবো- প্ল্যানমাফিক ওরা হাজির হয় সেখানে ।আমাদের জীবন যে পদ্মপত্রের নীর সেটা আমরা ভালো করেই জানতাম । সেই কারণে তো আর বাড়ি বসে থাকা যায়না ! যাইহোক কোনভাবে লছমীর কানে এই খবর পৌঁছায় । কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়, আবেগে সে আমাকে বাঁচাতে চায় । আমাকে ইউক্যালিপটাস প্লান্টেশনের আপিসে যাওয়া থেকে বিরত করার জন্য সে আমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় এবং গুলিবিদ্ধ হয় । সে জানতো আমাকে বারণ করলে আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবো ওর কথা । চোট সাংঘাতিক হলেও ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় সে বেঁচে ওঠে।

আমি যখন হাসপাতালে ওকে দেখতে যাই ও কোমাতে ছিল । পরে জ্ঞান ফিরলে আমাকে কেবল এইটুকুই বলতে পারে---ম্যাডাম আপনার কোন ক্ষতি হয়নি তো ?

আমি কোন জবাব দিয়ে ওকে ছোট করতে চাইনি । জীবনমৃত্যুর সঙ্গে যে পাঞ্জা লড়ছে কতখানি মনের জোর ও ভালোবাসা থাকলে সে এমন একটি প্রশ্ন করতে পারে তা বলাইবাহুল্য । মনুষ্যত্ব নামক শব্দখানা আজও যে কোন কোন মানুষের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় তারই এক সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি সেদিন হাসপাতালের অন্ধকূপে ।

মাসখানেক পরে লছমী সুস্থ হয়ে ওঠে । ভেঙ্কির মা নিজের সন্তানের মতন সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন । আমাদের সবার শুভকামনায় সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে । ভেঙ্কির সঙ্গে ওর বিয়েটিও সময় মতন হয়ে যায় । ঝারোখাকে ভেঙ্কি দত্তক নিয়েছে। ওরা আজ একটি সুখী পরিবার ।

লছমীর বাবাও সেই সুদূর ঝাড়খন্ড থেকে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন এই ব্যাঙ্গালোরে । আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছে এই ঘটনাটাতেই । খবরটা আমিই দিয়েছিলাম কিনা !

# অবগুণ্ঠন

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাস এলো । বৃষ্টিটাও শুরু হয়েছে । গ্রীষ্মের প্রথম কালবৈশাখি শেষে তুমুল বৃষ্টি । গায়ে, মাথায় একটা শীতল আমেজ ছড়িয়ে যাচ্ছে । ঋভুর খুব ভালো লাগছে। চৈতন্য রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে ফেরার পথে প্রায়ই দেখা হয় তার সঙ্গে । কালো বোরখা পরা । কাঁধে একটা চটের ব্যাগ । একটি হেল্‌থ ক্লাবে কাজ করে। বেহালার দিকে বাড়ি। আজও আসছে, ঐ তো দেখা যাচ্ছে ! একটা রঙীন ছাতা মাথায় । অল্পস্বল্প কথা হয় । খুবই নম্র । নাম সায়রা। ওকে ঋভুর ভালোলাগে। তার মৌনতা মুখর হয় ওর সান্নিধ্যে । ঋভু তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পাশ করেছে । এখন গবেষণাধর্মী কাজের জন্যে চৈতন্য রিসার্চ ইন্সটিটিউটে আসতে হয় । বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে । যদি পুরনো পুঁথি ঘেটে নতুন আলোর হদিস মেলে । সাধারণতঃ বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় সে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তেলেভাজা ও চা খেয়ে নেয় । একদিন সেখানেই সায়রার সঙ্গে প্রথমদেখা । তারপর আজ পর্যন্ত অন্ততঃ কুড়িবার দেখা হয়েছে । রোজ হয়না । যেদিন হয় ঋভুর সারাদেহে খুশির জোয়ার আসে। মনটা নেচে ওঠে । অন্তর্মুখী ঋভু হয়ে ওঠে উদ্দাম । দামাল । -- কতক্ষণ ? সায়রার মিঠে সুর বেজে ওঠে ।

--এই তো জাস্ট, বৃষ্টিটা এখনই শুরু হল -ঋভুর বিরক্তি সায়রার নজর এড়ায় না ।

-- ভালই তো আপনি বৃষ্টি ভালবাসেন না ? সায়রা ছাতা বন্ধ করে শেডের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে ।

--- তা ভালই লাগে, তবে কলকাতার বৃষ্টিতে সেরকম মজা নেই । বাঙালীরা বৃষ্টির আসল রূপ দেখেনি ।

--- আপনি বুঝি গুজরাটি ?

-- আরে না না, আসলে একবার রাজস্থানে গিয়েছিলাম । তখন দেখেছিলাম কি সুন্দর বৃষ্টি । শুষ্ক রুক্ষ মরুতে নিয়ে এলো স্নিগ্ধতা, আমি একটা মোটরসাইকেল নিয়ে সেই সিক্ত পথে কতদূরে চলে গেছি । বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে আমার দেহমন, খুব খুব ভালো লেগেছিল । অথচ এই দেখুন না কলকাতায় বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় । কাদা, নোংরা একেবারে যা তা কেস ।

সায়রা শব্দ করে হাসে । আজ এতদিন হল আলাপ হয়েছে, কথা হয়েছে, অথচ ওর মুখটা কখনো দেখেনি । আপাদমস্তক বোরখাবৃত । দেখার লোভ যে হয়নি তা নয় । তবে তা সংবরণ করতে হয়েছে । টুকিটাকি কথার পরে যে যার বাসে উঠে চলে যায় ।

ঋভুর বাড়িতে আছেন ওর বৃদ্ধা মা । তার পথ চেয়ে বসে থাকেন । রোজ সকালে বাজার করার সময় গজগজ করেন -- আর কতদিন হেঁশেল ঠেলতে হবে জানিনা বাপু ! বলি এই গবেষণা টবেষণা কি কোনদিন ফুরাবে ?

হালকা হাসি ছড়িয়ে যায় ঋভুর মুখে । মেয়ে তো দেখে ফেলেছি কনে দেখা আলোয় এখন তোমার গ্রীন সিগন্যাল পেলেই হয় । মুখে নয় মনে মনে বললো । কারণ তার একটু সংশয় আছে । মা কি এই বিধর্মী কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে মেনে নেবেন ? তাই গোপন কথাটি গোপনই রয়েছে ।

-- আপনি সজনে ফুল ভাজা খেয়েছেন ? ঋভুর প্রশ্নে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায় সায়রা ।

পড়ন্তবেলায় দুজনে ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলো । আকাশচুম্বি রাধাচূড়া, জারুল গাছগুলি যেখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে ।

--- হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন ? সায়রা কৌতুহলী ।

--- নাহ্! আজ বাজারে দেখলাম, তবে কিনি নি । মায়ের শরীরটা কদিন খুব খারাপ । কেই বা ভেজে দেবে ?

-- আপনি বুঝি একেবারে রান্না পারেন না ?

---হে হে নাহ্ । ঋভু দন্তবিকশিত করে ।

--- তাহলে বিয়ে করে ফেলছেন না কেন ? টুকটুকে একটা মেয়ে দেখে বিয়েটা সেরে ফেলুন।

---মেয়ে তো দেখেছি ।

-- ওমা তাই নাকি ? কৈ আগে বলেন নি তো !

--- আপনি তাকে চেনেন ।

---আমি চিনি ? সায়রা বিস্মিত ।

---হ্যাঁ চেনেন, উনি আপনার খুবই ঘনিষ্ঠ । সাহস করে বলে ফেলে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঋভু । সায়রা অবাক । কিছুক্ষণ পরে বলে ওঠে --- নাম কি তার ?

-- সায়রা ।

বলেই ঋভু একটা মুচকি হাসি দেয় । সায়রা কেমন হকচকিয়ে যায় ।

-- আমি আজ আসছি কেমন, এই অটো, অটো ! সায়রা একটা চলন্ত অটোতে উঠে পড়েছে । হাত নেড়ে হুস করে চলে গেল ।

ঋভু নির্বাক । বোকার মতন চেয়ে রইলো ওর চলে যাবার পথে । জীবনে এই প্রথম একটি মেয়েকে ভালোবাসা জানিয়েছে । হয়ত ঠিক মতন প্রস্তাব দিতে পারেনি । নাকি সায়রা লজ্জা পেল? তাই হবে । নির্ঘাত সায়রা ভীষণ লজ্জা পেয়েছে । তৃপ্তির হাসি হেসে কাছের দোকান থেকে একটা পানপরাগ খেয়ে নিজের বাসে উঠলো । আজ আকাশে বাতাসে আনন্দ ভেসে বেড়াচ্ছে । মুঠিতে ধরে পকেটে চালান করে দিল ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে । আজকাল সায়রা বাসস্টপেও আসেনা । কি হল ব্যাপারটা ? তার কি একবারো ঋভুর কাছে আসতে ইচ্ছে হলনা এই কদিনে ?

একদিন সায়রার অফিসে সে ফোন করে । কিন্তু তাকে পাওয়া গেলনা । এইভাবে পর পর কদিন চেষ্টা করার পরে একদিন ঋভু ওর হেলথ সেন্টারে হানা দেয় । বড্ড গরম পড়েছে । রোদের তাপে মাথাটা মনে হচ্ছে ফেটে যাবে । কপালটা কেমন দপ্দপ করছে । বডি অ্যান্ড হার্বসের দরজার পেতলের হাতলটা ঘোরাতেই বেড়িয়ে এল এক স্বপ্নসুন্দরী । লালচে রং, বব চুল, পেস্তা ও সাদা ডুরে কাটা নাতিদীর্ঘ পোশাক পরা। রুনুঝুনু করে বেজে উঠলো তার সুরেলা কন্ঠ -- কাকে চাই ?

-- মিস সায়রার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই ।

-- আসুন ভেতরে আসুন ।

কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে ঋভু । মোটা লাল কার্পেটে সারা মেঝে ঢাকা । ঘরের বাতাসে কেমন ধূলোর গন্ধ লেগে আছে । কোণায় রাখা ফেং শুই এর আদি ও অকৃত্রিম বুড়োটা হাত তুলে দাঁত কেলাচ্ছে । ঋভু বসলো । মেয়েটি ভেতর থেকে একগ্লাস লেবুর সরবৎ এনে দিল। এই গরমে অমৃত সমান । সরবৎ খাওয়া হলে গ্লাসটা হাত থেকে নিতে নিতে মেয়েটি বললো-- সায়রাদি আজ একটু কাজে বেরিয়ে গেলেন আপনি অন্য একদিন আসুন, ফোন করে আসবেন । ঋভু কিছু বলার আগেই তীব্র ধাতব বেলের শব্দে মেয়েটি লাফ দিয়ে ভেতরে চলে গেল । এরপরে বসে থাকা মানে সময় নষ্ট । অগত্যা সে বেরিয়ে পড়ে । কাঠ ফাটা রোদে মাথার ভেতরটা জ্বলতে থাকে । একটু বিরক্ত হয় । সায়রা তো একবার দেখা করে যেতে পারতো !

আর সায়রার দেখা পাওয়া যায়না । বোধহয় সে রুট পাল্টে ফেলেছে । তার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে সায়রাকে ফোন করে গেলেও সে দেখা পাবেনা । তবুও ফোন করার পরে সেই একই কথা -- উনি বেরিয়ে গেছেন ।

ঋভু ঠিক করে একদিন সোজাসুজি তাকেই ধরবে । এক নির্জন দুপুরে হেল্‌থ সেন্টারের কাছে আত্মগোপন করে থাকে । বিকেলের দিকে সায়রা বেরিয়ে একটা অটো নেয় । ঋভু অন্য অটো নিয়ে ওকে ফলো করে । একসময় অটো বেহালার অলিগলি ছাড়িয়ে সরু রাস্তায় ঢোকে । একটা পুরনো একতলা বাড়ির সামনে অটো থেকে নামে সায়রা । ভাড়া চুকিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় । গেটের একপাশে একটা আমগাছ । কালবৈশাখীর তোড়ে নিচে গোটা কয়েক আম পড়ে আছে । কোথায় একটা ঘুঘু ডেকে ওঠে । ঋভুও অটোটা ছেড়ে দিয়ে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করে । বাগানে আগাছাই বেশি । দরজার কাছে পৌঁছে ডোরবেল টিপে অপেক্ষা করে । এইভাবে চোরের মতন আসাটা কি ঠিক হল ? তবে গুণীজন বলেই গেছেন, নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড --ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে যায় । একজন বয়স্ক মহিলা দাঁড়িয়ে - কি চাই ?

-- আমি সায়রার বন্ধু, অনেকদূর থেকে এসেছি একটু দেখা করতে চাই।

-- ও, আসুন ।

পুরনো ধাঁচের বাড়ি । দরজা খুলে ভেতরে গেলে সার দেওয়া ঘর । দেওয়ালে প্লাস্টার নেই । ইটগুলো দাঁত বার করে আছে ।

-- বসুন । একটা নড়বড়ে কাঠের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বুড়ি দরজা দিয়ে অন্তর্হিত ।

চেয়ার টেনে বসতে গিয়েই ধপ্, সোজা মাটিতে । কোমড়ে দারুণ লেগেছে। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইতেই একটা কালো কুচকুচে বিল্লী ওর দিকে তাকিয়ে ডেকে ওঠে - ম্যাও! মাথাটা গরম হয়ে যায় -- ম্যাও ! ভেংচে ওঠে ঋভু, শালা বিল্লি আমার বলে লেগেছে আর তুই বেটা -- সায়রা ঘরে এসে ঢুকলো । সেই বোরখা পরা ।

-- আপনি এখানে ? আমার বাড়ি চিনলেন কিভাবে ? ঋভু সব খুলে বলে । কিছুই লুকায় না । লুকাতে পারেনা । সায়রা তার প্রথম প্রেম । তার কাছে কি কিছু লুকানো যায় ?

সব শুনেটুনে সায়রা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে । গ্রীষ্মের শেষ । প্রচন্ড দাবদাহে ধরাতল শুষ্ক । আসছে আষাঢ় মাস মনে তাই আর্দ্রতা । মিঠেল আর্দ্রতা । ঘরের অন্যপাশে একটা ছোট দরজা । সেইদিকে ইশারা করে সায়রা । দুজনে এসে প্রবেশ করে একটি ছোট ঘরে । পাথরের রাধাগোবিন্দ অধিষ্ঠিত । ধূপধুনোর গন্ধে ঘরটা ভরে উঠেছে । হয়ত সন্ধ্যা দেওয়া হয়েছে । ঋভু চমকে যায় । মুসলমানের বাড়িতে পুজোর ঘর ? মনের কথা ছিনিয়ে নিয়ে সায়রা বলে ওঠে -- খুব অবাক লাগছে তাই না? কিন্তু ঋভুর অবাক হবার তখনো বাকি ছিল।

সে চুপ করে আছে দেখে সায়রা হেসে ওঠে । কি অদ্ভূত সেই হাসি । অবগুন্ঠনের আড়ালে এক রহস্যময়ী কি বলতে চাইছেন ?

ঋভু একটু গলা ঝেড়ে বলে উঠলো -- না মানে ইয়ে --।

তার কথা শেষ করার আগেই সায়রা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে -- আপনি আমাকে খুব ভালোবাসেন তাই না?

--- হ্যাঁ তা তো বাসিই নাহলে, ঋভু গদগদ ।

-- কিন্তু আপনি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জানেনা !

-- আমি শুধু জানি আমি তোমাকে চাই, আর কিছু জানার আমার প্রয়োজন নেই ।

-- তাহলে পাঁচ মিনিট পরেও আপনার ভালোবাসা থাকবে তাইনা ? যার জন্যে আপনি আমার পিছু ধাওয়া করে আমার বাড়ি এসে হাজির হয়েছেন!

-- কি যে বলেন, এটা একটা প্রশ্ন হল ? যতদিন বাঁচবো ততদিন তোমায় ভালোবাসবো সায়রা, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি জানো, খুব।

-- তবে এই দেখুন ! একঝটকায় মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলে সে।

কি কুৎসিত ! সারা মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে । নাকের কাছে গর্ত,ওপরের ঠোঁট নেই, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে । নিচের ঠোঁটের কাছে একটা মাংসপিন্ড ঝুলছে । ঋভু হাঁ করে দেখছে সায়রায় কদাকার রূপ । চোখের পলক পড়ছে না ।

-- হা হা হা, হেসে ওঠে সায়রা -- কি ঋভুবাবু ? সব প্রেম উধাও ?

ঋভু যেন বোবা হয়ে গেছে । ঘরের বাতাসে কেমন পোড়া গন্ধ । দম নিতে কষ্ট হচ্ছে । ও কি পালিয়ে যাবে ? পরাজয়ের গ্লানি ওর মনে তীব্র আকার নিচ্ছে ক্রমশ । এই গ্রীষ্মেও মনে বাদল মেঘের আনাগোনা অনুভব করছে । ভালো না লাগার এক বিষন্নতা, সব উল্টেপাল্টে যাচ্ছে । পারবে কি মানিয়ে নিতে ?

প্রায় ১০ বছর আগে কলেজে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল করার সময় সায়রার মুখ ভয়ানকভাবে পুড়ে যায় । সুন্দরী নাহলেও তার মুখশ্রীতে একটা ঢলঢলে ভাব ছিল । সেই মসৃণ মুখ কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে হয়ে যায় বীভৎস । আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই ভয় পেত সে। বহুদিন বাড়ি থেকে বার হয়নি । ক্রমে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল । দিন যায়, মাস কাটে । কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরে কতদিন বসে কাটানো যায় । পেটে টান পড়তে তাকে বহির্জগতের সামনে আসতেই হয় । অঙ্গে তুলে নেয় বোরখা । সুচরিতা হল সায়রা । যদিও পুজোর ঘরে সে আজও সুচরিতাই । ঋভু নির্বাক। এতবড় একটা ঝড়ের পূর্বাভাস সে সকালেও পায়নি ।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম । বুকের গভীর ব্যাথা, ভীষণ ব্যাথা । মন অশান্ত । একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পথে নামে সে । ঝিরিঝিরি বাতাস, হৃদয়ে কোমল পরশ ।

ঋভুর স্কুলের বন্ধু অনিকেত । কলকাতার নাম করা কসমেটিক সার্জেন । চেম্বার পার্কস্ট্রীটে। বাড়ি ফিরে পাতা লাগায় । ফোন করে । কথা হয় । অনিকেত বলে যে রোগিনিকে না দেখলে কিছুই বলা সম্ভব নয় । কত পার্সেন্ট বার্ন আছে না দেখলে বলা যাবে না সার্জারিতে উপকার হবে কিনা । অতএব রোগিনিকে নিয়ে যেতে হবে ।

আরেক বৃষ্টিস্নাত সকালে ঋভু ও সায়রার ট্যাক্সি এসে থামে পার্কস্ট্রীটের এক চেম্বারে । জলন্ত সিগারেটখানা পায়ের তলায় পিষে ফেলে সায়রার হাত ধরে গটগট করে ভেতরে ঢুকে যায় । টেরাকোটার সন্ধানে ।

# অলৌকিক

ঘটনার সুত্রপাত হরিপুরে । সেদিন রাতে নিলু একা শুয়েছিল ওই বড় ঘরটাতে । দিনটা ছিল লক্ষীপুজো । কোজাগরী রাত । কদিন খুব ধকল গেছে ! নীলু চিরকালই খুব ডানপিটে, সাহসী । তাই এই ঘরটি নিয়ে তাদের বাড়িতে নানান গল্পকথা চালু থাকলেও নীলুর কোন তাপ উত্তাপ নেই সেই বিষয়ে - ও পরম আনন্দে ঘুমাবে ।

কথিত আছে যে এই ঘরে কেউ একবার শুলে নূপুরের রিনিঝিনি, কান্নার আওয়াজ অথবা কেবল কথাবার্তার আওয়াজ পায় ও তার প্রাণ সংশয় দেখা দেয় । সোজা কথায় ‘অপমৃত্যু’ হয়ে থাকে । আজ থেকে প্রায় দুশো বছর পূর্বে এই ঘরেই কোজাগরী রাতে অত্যাচারী জমিদার ‘ পরমেশ্বর চৌধুরীর ’ ব্যাভিচারে অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী লীলাবতী আত্মহত্যা করেন। তারপর থেকেই যত বিপত্তি । এই ঘরে রাত কাটানোর পরে বেশ কিছু মানুষের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে । যদিও এর কোন প্রমাণ নেই যে এই ঘরে ছিলেন বলে তাদের মৃত্যু হয়েছে তবুও ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে খানিকটা সেরকমই মনে হয় ।

নীলু কুসংস্কারমুক্ত এক আধুনিক যুবক । তার মনে কোনরকমের অন্ধবিশ্বাস নেই ।

সে থাকে ব্যাঙ্গালোরে - একটি তিনতারা হোটেল এ কর্মরত । হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে ও দক্ষিণ ভারতেই আছে ।

সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহ বিছানায় পড়তেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লো । হঠাৎ মাঝরাতে কার যেন কথার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় । সে মনে করে কোন ব্যাক্তি তার ঘরে ঢুকেছে । বিছানা হাতড়ে টর্চ বার করে জ্বালায় ।

কৈ কেউ তো নেই ! শুয়ে পড়ে সে । আবার খানিকক্ষণ পরে একই ব্যাপার ঘটে । এবারে কথার সাথে যেন নূপুরের মিঠে আওয়াজ আসছে । কি অদ্ভুত কান্ড ! যাইহোক তারপর থেকে রোজ রাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । বাড়িতে এখনো কাউকে কিছু বলেনি সে - বললেই লোকে ঐসব আষাঢ়ে গপ্পো, ভূত-প্রেত এইসব নিয়ে পড়বে ! কাজেই ও চুপি চুপি ব্যাঙ্গালোরে ফিরে এসেছে । এসে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছে । কিন্তু কোন লাভ হয়নি । রাত্রিবেলা শুলেই কানের কাছে হয় বকবক বা নূপুরের রিনিঝিনি শুনবেই । মহা ঝামেলায় পড়া গেছে ।

আজ চন্দ্রমার জন্মদিন । সন্ধ্যায় বন্ধুরা মিলে সেলিব্রেট করতে এসেছে হোটেল ‘বনবিলাস ’ এর রেস্তোরাঁ ‘অরণ্য’তে - ভারি সুন্দর এই রেস্তোরাঁটি । যেন একটি জঙ্গলের কাঠের বাংলো। চারদেয়ালে ব্যাঘ্রচর্ম বা হরিণের মাথা লাগানো । চেয়ার টেবিলগুলি বড় বড় কাঠের গুঁড়ির মতন - টিমটিমে আলো জ্বলছে - ভারতের প্রায় সব জঙ্গলের ‘কুইজিন’ এখানে পাওয়া যায়। সুন্দরবন, পেরিয়ার, দুধওয়া, রণথাম্ভোর, মুদুমালাই, কানহা এমন কি কাজিরাঙ্গা পযর্ন্ত।

সবথেকে মুখরোচক হল ভেটকির রোস্ট ও ভেড়ার মাংসের চপ । সকলে মিলে হৈ হৈ করে জন্মদিন পালন করলো । বিরাট কেক কাটা হল । এতো হৈ-হুল্লোড়ের ভেতরেও ঐ ভদ্রলোকের দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিলো চন্দ্রমার - ৫’১০‘‘ এর

মতন উচ্চতা, শ্যামলাবরণ, পেটানো চেহারা । সবকিছুকে ছাপিয়ে চোখে মুখে আছে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা । ঘাড়ের কাছে ছোট করে চুল ছাঁটা । আজকাল যেমন হয় । আগে এরকম চুলের ছাঁট মিলিটারীদের ভেতর দেখা যেত । কয়েকবার চোখোচোখি হয়েছে । খাবার শেষে একটি ফর্ম ভরতে দিল । আজ চন্দ্রমার জন্মদিন শুনে অরণ্য রেস্তোরাঁর তরফ থেকে ওদের এই ডিনার 'কমপ্লিমেনটারি' করে দিলেন ঐ ভদ্রলোক । খুব ভালোলাগছিল চন্দ্রমার । শেষ অবধি আলাপটা তো হল । নীলেশ চৌধুরী - অরণ্যের ম্যানেজার ।

আজ রাতে আবার বকবকানি ও নূপুরের রিনিঝিনি শুনতে পাচ্ছে নীলু । নাহ ! আর পারা যাচ্ছে নাহ ! এবারে সে ঠিক করলো তার বন্ধু মানসকে সব খুলে বলবে । সব শুনে টুনে মানস বললো 'জয়নগর ৪ নং ব্লকে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট থাকেন ড: শর্বরী গুপ্ত - উনি এইসব নিয়ে ডিল করেন-সোজা কথায় ভূতের ডাক্তার । ওকে একবার তুই দেখিয়ে আয় ।'

নীলু হাসলো । ওর এইসব গাঁজাখুড়িতে একেবারেই বিশ্বাস নেই । ও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানমনস্ক যুবক । ওকে হাসতে দেখে মানস বললো - 'যা না একবার দেখে আয় ! লাভ না হলেও ক্ষতি তো কিছুই নেই তাইনা ?' - অগত্যা নীলু ঠিকানা নিয়ে এক রবিবার হাজির হল ড: শর্বরী গুপ্তের বাড়ি 'প্রাচী' তে ।

কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলো এক দক্ষিণী রমণী - ড্রয়িংরুমটিতে ঢুকে প্রথমে চোখে অন্ধকার লাগে । ধীরে ধীরে চোখ সয়ে যায় । ছোট ছোট পায়াওয়ালা চেয়ার ও মানানসই টেবিল । একপাশে ঝকঝকে পেতলের পাত্রে একটি মানকচু গাছ রয়েছে যাতে কচি কচি পাতা বেরিয়েছে । ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে । মৃদু চন্দনের সুবাস চারিদিকে । দেওয়ালে একটি প্রকান্ড তৈলচিত্র - একটি অর্ধশায়িতা নারীদেহ । চোখ জুড়ানো । আর আছে শোকেস ভর্তি দেশ বিদেশের পুস্তক সম্ভার । 'হিপনোটিজম' ও 'মরনের পরে জীবন' এই বিষয়ের ওপরও কিছু পুস্তক রয়েছে । মিনিট পাঁচেক পরে ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রমহিলা - বয়স আন্দাজ ৫৫-৫৬ হবে - তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, সুগঠনা ও চোখে মুখে এক অদ্ভুত কাঠিন্য । মানসের 'ভূতের ডাক্তারের' সাথে কোন মিল নেই - কথাটা মনে করে প্রায় ফিক করে হেসে দিতে যাচ্ছিল নীলু এমন সময় ভদ্রমহিলা নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করলেন - 'আপনি নীলেশ বাবু ?'- হ্যাঁ -নীলু প্রতিনমস্কার জানালো !

-কি খাবেন চা না কফি ?

-কফি-ব্ল্যাক হলেই ভালো হয় ।

ড: গুপ্ত মৃদু হেসে বললেন - আমার এক ক্লায়েন্ট গতসপ্তাহে 'কুর্গ' থেকে তাদের এস্টেটের কফি নিয়ে এসেছে,খাবেন ?

নীলু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় ।

-'ফুলমোতাম্মা ! দুকাপ এস্টেট থেকে আনা কফি করে আনো ' - কন্নড় ভাষায় আদেশ দিলেন ড: গুপ্ত ।

নীলু কন্নড় ভাষা ভালই বোঝে । হসপিটালিটি ব্যবসায় থাকতে হলে নানান ভাষাভাষির সাথে কাজ করতে হয় । তাই যে যত ভাষা জানবে তার তত সুবিধে ।

--বলুন আপনার কি সমস্যা - প্রশ্ন করেন ড: গুপ্ত ।

নীলু সব খুলে বলে । ড: গুপ্ত কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন - তারপর বললেন -- দেখুন নীলেশবাবু আমি আপনার কেসটা নিতে পারি কিন্তু আমাকে একটি বারের জন্য আপনাদের সেই গ্রামে নিয়ে যেতে হবে ।

নীলু একগাল হেসে বলে - 'এ আর এমন কি কথা ! নিশ্চয় নিয়ে যাবো । কবে যেতে চান বলুন !'

---আমাকে আপনার সেল নাম্বারটি দিয়ে যান আমি পরে জানাবো - ড: গুপ্ত বললেন।

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে নীলু । ড: গুপ্তর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে - 'আমাকে একটা কল দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলবো !'

শুধু কফি নয় খাবার দাবারের ও এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন ড: গুপ্ত । নিলু ফিস চপ আর পনির পাকোড়া খেয়ে ভোজন পর্বের ইতি টানলো । এবার বিদায় নেবার পালা । উঠে দাঁড়িয়ে ড: গুপ্তকে বিদায় জানাতে যাবে হঠাৎ একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বরে পেছন ফিরে তাকালো সে।

চন্দ্রমাও অবাক হয়েছে বই কি ! এ যে মেঘ না চাইতেই জল ! নীলেশ চৌধুরী তাদের বাড়ীতে ?

--মি: চৌধুরী চিনতে পারছেন ?

হেসে ঘাড় নাড়ায় নীলেশ ।

ড: গুপ্ত বলেন 'ওকে তুই চিনিস চাঁদ ? '

--হ্যাঁ, উনি হোটেল বনবিলাসে আছেন, আমার জন্মদিনে ওখানেই আলাপ ।

এবার নীলু কথা বলে - চন্দ্রমা, ড: গুপ্তর সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের গ্রামে যাবার - হরিপুর - আপনিও আসুন না - খুব ভালোলাগবে । ওখান থেকে উত্তরবঙ্গের বেড়ানোর জায়গাগুলিও খুব কাছে। চন্দ্রমা মিষ্টি হেসে বলে - ভেবে দেখি !

চন্দ্রমা,ড: গুপ্তর একমাত্র কন্যা । ধ্রুপদী নৃত্যে পারদর্শিনী ও একজন প্রফেশনাল ডান্সার।

ড: গুপ্তর কাছ থেকে নীলু একটি প্যারাসাইকোলজির বই চেয়ে এনেছে । খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট । জন্মান্তরবাদ,ভূতেধরা,মিরাকেল, ইউএফও,এইসব কিছুই প্যারাসাইকোলজির আওতায় পড়ে। সোজা কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব ঘটনাকে বিচার করাই প্যারাসাইকোলজির উদ্দেশ্য ।

সামনের শনিবার নীলুরা যাবে হরিপুর । প্রথমে কলকাতা যাবে, সেখান থেকে শিলিগুড়ি এবং শেষে যাবে হরিপুর । তারা উত্তরবঙ্গীয় জমিদার । জমিদারীপ্রথা লুপ্ত হলেও চালচলন সব আগের মতনই আছে। শুধু ঝাড়বাতির বদলে এসেছে নিয়ন আলো আর জুড়ি গাড়ীর বদলে বিদেশী চার চাকা।

হরিপুর গ্রামটির এবার একটি ছোট্ট পরিচিতি দেওয়া যাক । উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও

শিলিগুড়ি শহরের মাঝখানে এই গ্রামটি । ছায়া ঢাকা মেঠোপথ, ফলফুলের বাগান, সবুজ ধানক্ষেত, গাছে গাছে টিয়া -তোতা - ময়না - সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর । শহরের ব্যস্তজীবন থেকে বহুদূরে এই শান্ত পরিবেশে নীলু বাঁচার রসদ খুঁজে পায় । পুজোর সময় সব আত্মীয়স্বজন আসেন পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে । সকলে মিলে হৈ হৈ করে কটা দিন বেশ কেটে যায় । বিজয়ার দিন মা দূগ্গাকে গুডবাই জানিয়ে সকলে মিলে বসে পড়ে মুড়ি মুড়কি বা নাড়ু চিবোতে । শুরু হয় কালীপুজোর দিন গোনা ।

সময়মতন নীলুরা তিনজন পৌঁছে গেল হরিপুর । হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল । রাতের দিকে একপ্রস্থ্ চা ও নিমকি সহযোগে আড্ডা হচ্ছিল । এমন সময় নায়েবকাকা এলেন । যথেষ্ট বয়স হয়েছে ওনার । জমিদারীর জমি যা কিছু অবশিষ্ট আছে উনি তার দেখাশোনা করেন । বংশ পরম্পরায় ওনারা নায়েব । ড: গুপ্ত নানা খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিচ্ছিলেন নায়েবকাকার কাছ থেকে ।আলো আঁধারিতে ঘেরা ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালো নীলু । একমনে আকাশের দিকে চেয়ে আছে চন্দ্রমা । আজকের চাঁদটা প্রায় গোল-

‘চন্দ্রমা’ - মৃদুস্বরে ডাকে নীলু ।

নীলুর আবছা শরীরের দিকে চেয়ে চন্দ্রমা বলে - আকাশের দিকে চাইলে মানবজীবন বড় ক্ষুদ্র মনে হয় তাই না নীলেশ ? নীলু হাসে ।

চন্দ্রমা আপন মনে বলে চলে - ছোটবেলায় যখন আকাশে ইন্দ্রধনূ দেখা যেত আমার খুব ইচ্ছা করতো ওর শুরুটা আর শেষটা ছুঁতে । চাঁদের স্নিগ্ধ আলো বড়ই মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে - চূড়ান্ত বাস্তববাদীকেও করে তলে কবি !

*যত বড় হোক ইন্দ্রধনূ সে সুদূর আকাশে আঁকা*

*আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা !* - নীলুর কাব্যিক উত্তর শুনে চন্দ্রমাও হেসে ওঠে ।

আজকাল নীলুর কথা শোনার ব্যাপারটি অনেক বেড়ে গেছে । ড: গুপ্ত ঠিক করেছেন আজ রাতেই হিপনোটিজম এর সাহায্যে নীলুর অবচেতন মনের নানা তথ্য বার করবেন । এ যেন ঠিক সমুদ্রে ডুব দিয়ে কিছু ঝিনুকের ভেতর মুক্তোর সন্ধান ।

শ্রীমদভাগবৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে আত্মা অবিনশ্বর - শুধু একটি খোলস ছেড়ে অন্য একটি খোলস ধারণ করে । বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে যে কোন এনার্জিকে নষ্ট করা যায় না। কাজেই আত্মা যদি এনার্জি হয় তাহলে গীতার কথা অনুযায়ী সে এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যাবার মাঝে ভূত হয়ে ঘুরতেই পারে ! এইসব নানা চিন্তা আজকাল মাথায় ভীড় করে নীলুর। তার যুক্তিবাদী মন নানা তথ্যের সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে যে এই কথা শোনার ঘটনাটা আদৌ কোন অলৌকিক ব্যাপার নাকি নিছক একটি শারীরিক অসুবিধা !

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে হিমেল হাওয়ার দাপট বেড়ে গেছে । আজ পূর্ণিমা । আকাশের চাঁদটা বিরাট অ্যালুমিনিয়ামের থালার মতন দেখাচ্ছে । চাঁদভাসি পথ ধরে নীলু একমনে হেঁটে চলে নাচমহলের দিকে । মনে পড়ে নায়েবকাকার কাছে শোনা কৈশোরের সেই মর্মান্তিক কাহিনী ! জমিদার পরমেশ্বর চৌধুরীর মদ ও মেয়েমানুষের নেশায় অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী লীলাবতী আত্মহত্যা করেছিলেন বহুবছর আগে । যেই

ঘরটায় নীলু শুয়ে ছিল সেখানেই উনি গলায় দড়ি দেন । সেই নিয়ে কত না গল্প চালু আছে । কোনটা সত্য আর কোনটা অসত্য সেই নিয়ে নানা মুনির নানান মত । তবে আজ পর্যন্ত যারাই ওই ঘরে একবার রাত কাটিয়েছে তারা কেউ শেষ অবধি প্রাণে বাঁচেনি ! একমাত্র নীলু এখনো বেঁচে আছে ।

ধীর পায়ে সে পৌঁছে গেল নাচ মহলের কাছে । একটা মিঠে আওয়াজ ভেসে আসছে ! মনে হয় নূপুরের ধ্বনি ! কিন্তু এই দিকে এতো রাতে তো কারো আসার কথা নয়!

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটি হাসির শব্দ কানে এলো - কোন মহিলা খিল খিল করে হাসছে-

পেছন ঘুরে দেখলো নীলু ! কেউ কোথাও নেই ! কে হাসে ? কে কথা কয় ?

হঠাৎ চাঁদের আলোয় যেন একটা আবছা নারী মূর্তি দেখা গেল । একটু দূরে হেঁটে চলেছে ।

লালচে একটি পোশাক পরা, শাড়ি না ঘাঘরা বোঝা গেল না এতো দূর থেকে ! মুখটা ওড়নায় ঢাকা !মহিলাটি হেঁটে যাচ্ছে আর পায়েল এর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে !

ছম ছম -ছম ছম !

হঠাৎ কেন জানিনা নীলুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো !

শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল । তারপরেই একটি বিকট আওয়াজে চমকে উঠলো নীলু ! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় ! হৃদপিন্ড স্তব্ধ করে দেয় সেই ভৌতিক চীৎকার ।

রাত গভীর হয়েছে । ড: গুপ্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন । নীলেশকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা ! আজই তাকে হিপনোটাইজ করার কথা । একেবারে উবে গেল নাকি ছেলেটা ? ডাক্তারের কপালে ভাঁজ দেখা দিল । পরদিন ভোরে মালির মেয়েটা ছুটতে ছুটতে নায়েবমশাইয়ের ঘরের দিকে আসছে, প্রচন্ড হাঁপাচ্ছে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে ।

নায়েব মশাইয়ের পায়ের সামনে এসে ধপ করে বসে পড়লো সে ।

নায়েব মশাই শুধান - 'কি রে এতো হাঁপাচ্ছিস কেন ? '

মেয়েটি যেন বোবা হয়ে গেছে ।

বুড়ো ওর পিঠে আলতো করে একটা হাত রাখলেন ।

--'কি হয়েছে রে তোর ? '

--'হুই হুই হইখানে !'

--কি ওখানে?

রাঙা দাদাবাবু মইরে পইরে আসেন !

শ্বাসরোধ করে খুব নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে নীলুকে । চোখ মুখ ঠেলে বেরিয়ে

এসেছে। ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে ‘ডেথ ডিউ টু স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ।’ সবথেকে অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে গলায় বা দেহের কোনস্থানে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। নেই কোন আঙুলের ছাপ । আর এর আগে যতবার এরকম হত্যা হয়েছে কোনবারই পুলিশ তার কিনারা করতে পারেনি । তাতে করে এই বাড়ীর বাসিন্দাদের পুরনো ধারণাই আরো জবরদস্ত ভাবে মনে গেঁথে গেল । আজ পযর্ন্ত সে কোন পুরুষকে রেহাই দেয়নি । লীলাবতীর অতৃপ্ত আত্মা ।

বছর ঘুরে গেছে, মানুষ আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক হয়েছে কিন্তু লীলাবতীর প্রতিশোধ স্পৃহা একটুও কমেনি - আজ এতবছর পরেও সে মাঝে মাঝে মহলবাসীদের জানান দিয়ে যায় - আমি আছি ভীষণভাবে আছি !

সবে গতকাল পূর্ণিমা গেছে । তবুও আজ রাতটায় যেন কোন চান্দ্রেয় সুধা নেই ! একতলার বারান্দায় একা বসেছিল চন্দ্রমা । নীলেশকে একটু আগেই পুড়িয়ে ফিরেছে । সারাবাড়ীতে একটা অদ্ভুত নি:স্তব্ধতা । একটা আলপিন পড়লেও বুঝি শোনা যাবে ! মাত্র কয়েকসপ্তাহের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বারবার মনে পড়ছিল তার । কত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল সবকিছু । যেন একটি সিনেমা দেখছে - পরপর শটগুলিকে মনের মধ্যে সাজিয়ে নিচ্ছিল সে । জন্মদিন-হোটেল বনবিলাস - তাদের বাড়ীতে নীলেশের আগমন - হরিপুর - পূর্ণিমার চাঁদ --- ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ----- !হঠাৎ একটি নাম না জানা পাখীর বিকট ডাকে চমকে উঠলো চন্দ্রমা ! কয়েক মূহুর্ত । তারপর যেন এক স্বপ্নের ঘোর থেকে ফিরে এলো বাস্তবে ।

-চন্দ্রমা !

নীলেশ দাঁড়িয়ে । নী-----লেশ ! নী----ভূ--উ --ত ! ভূত--------চন্দ্রমা চীৎকার করে পেছন ঘুরে দৌড় দিল। চোখেমুখে আতঙ্ক । কিন্তু নাহ্ ! সে পালাতে পারলো না, বাঁধা পরে গেল নীলেশের বাহুডোরে। ভয়ে চীৎকার করতে যাচ্ছে নীলেশ ঠাস্ করে একটা চড় মারলো ওর গালে।

- আমি ভূত নই আমি জ্যান্ত ।
- জ্যা-জ্যা -জ্যান--- কি বলছো তুমি, আমি তো--- দীর্ঘশ্বাস পড়ছে চন্দ্রমার, হাঁপাচ্ছে সে।
- হ্যাঁ আমি জীবিত এই দেখো, আমাকে ছুঁয়ে দেখো ।

হাত বাড়িয়ে কম্পিত হস্তে ছুঁয়ে দেখে চন্দ্রমা । দিব্যি জ্যান্ত একটি মানুষ, হ্যাঁ নীলেশই তো । সেই নীলেশ । কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? তাকে তো সে নিজে হাতে পুড়িয়ে এসেছে ।

- আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না নীলেশ কি ব্যাপার, যাকে আমরা নীলেশ বলে পুড়িয়ে এলাম সে তাহলে কে ?

- সে কি আমিই জানি ? আমি শুধু জানি আমি নীলেশ ।

চন্দ্রমা ধপ্ করে বসে পড়ে বারান্দার স্ল্যাবের ওপরে ।

সেদিন রাতে নীলেশ একটি নারীর আর্তনাদ শুনে যখন পেছন ঘুরে তাকায় তখন দেখে একটি বীভৎস মুখের ভয়ানক নারী মূর্তি তার দিকে ধাবমান । নীলেশ প্রাণ ভয়ে পালাতে থাকে । একটি পুরনো মন্দির দেখে সেখানে ঢুকে পরে । মন্দিরটি বহু পুরাতন । বিশেষ

তিথিতেই পুজো হয়। অন্য সময় কেউ সেদিকে যায় না । এরকমই স্বপ্নাদেশ আছে । খুবই জাগ্রত বলে কথিত । নীলেশ হাতজোড় করে মিনতি করে- হে ঈশ্বর আমাকে বাঁচাও - বিড়বিড় করে গায়েত্রি জপ করতে থাকে । এমন সময় একটা ভয়ানক চীৎকারে চরাচর বিদীর্ণ হয়ে যায় । সকাল হতে নীলেশ বাড়ির দিকে আসতেই দেখে জঙ্গলে জটলা, সবাই বলছে নীলেশ মারা গেছে এবং একটি লাশ দেখা যাচ্ছে যেটি দেখতে হুবহু তারই মতন । অবাক কান্ড । নীলেশ স্তম্ভিত, বিচলিত । এরপরে লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সে মন্দিরে লুকিয়ে থাকে। কে এই ব্যাক্তি । অশরিরী আত্মা তাকে হত্যা করেছে বটে কিন্তু তাকে দেখতে নীলেশের মতন হয় কি করে ? কে সে ?

ইতিমধ্যে ডঃ গুপ্ত চন্দ্রমাকে খুঁজতে ওখানে এসে হাজির হন এবং নীলেশকে দেখে যারপরনাই চমকিত হন ।

- তু তুমি এখানে ? তুমি কে ?

- মা, ও নীলেশ ।

চন্দ্রমা পুরো ঘটনা খুলে বলে । ডঃ গুপ্ত সব শুনে বলেন -- আমরা বাইরের লোক, এসব কথা আমাদের নায়েবমশাইকে জানানো উচিৎ ।

নায়েবমশাই সব শুনে খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন । তারপরে হরি সিং কে ডেকে পাঠান । হরি সিং এই বাড়ির পুরনো চাকর । খুব বিশ্বস্ত ও করিৎকর্মা । তাকেই সব খোঁজ নেবার ভার দেন । এই কদিন ওদের পুরনো মহলে নীলেশকে লুকিয়ে থাকতে বলেন । ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে চন্দ্রমা ও ডঃ গুপ্তকে অনুরোধ করেন ।

রহস্য উদ্‌ঘাটন হয় কিছুদিন পর । খোঁজ নিয়ে জানা যায় সেই নীলেশের মতন দেখতে লোকটি জমিদার বাড়িরই ছেলে । কোন এক পূর্বপুরুষের ঔরসে এক পতিতার কোলে জন্ম নেয় এই ব্যাক্তি। স্বভাব তারও খারাপ। দুনম্বরী, অপরাধপ্রবণতা ছোটবেলা থেকেই তার সঙ্গী । সে শুনে এসেছে যে তার বাবা একজন ক্ষমতাবান পুরুষ । যার অঢেল ধন দৌলত । সে বারবার চেয়েছে এই মহলে এসে তার পাওনা দাবী করে । কিন্তু বাদ সাধে তার মা । তিনি সমাজের চোখে পতিতা, তার পুত্রকে কখনই স্বীকার করবে না এই বংশ । কাজেই মায়ের মৃত্যুর পরে সে সোজা এসে হাজির হয় এই গ্রামে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে । যদিও তার পিতা আর জীবিত নেই । ছুতো করে চেষ্টা করে জমিদার বাড়িতে প্রবেশের । দিনের বেলা গা ঢাকা দিয়ে থাকে জঙ্গলে । কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভূত খেলায় হুবহু তারই মতন দেখতে আরেক যুবকের জন্ম হয় । সে আমাদের নীলেশ। সেই রাতে যখন ভয়ার্ত নীলেশ পুরনো মন্দিরে ঢুকে যায় তার ঠিক কিছুক্ষণ আগেই এই ছেলেটি মহলের দিকে পা বাড়ায় কোন কুমতলবে । কিন্তু সেই অশরিরী আত্মা লীলাবতীর রোষের স্বীকার হয় । মারা যায় । পরের দিন সকালে ওর লাশ দেখে বাড়ির লোক নীলেশ ভেবে ভুল করে । আরো মজার ব্যাপার হল পুরাতন ভৃত্য রঘুবীর সবই জানতো। সে এক সঙ্গে দুই নীলেশকে দেখেছে । কিন্তু পতিতাপুত্র তাকে প্রাণভয় দেখিয়ে মুখবন্ধ করে দিয়েছে । আজ সব খুলে বলার পরে সে নায়েবমশাইয়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে ।

---যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। উহ্ ! কি কান্ডই না ঘটে গেল কটা দিনে। চন্দ্রমা কপালের ঘাম মোছে ।

ডঃ গুপ্ত হেসে নীলেশের পিঠে হাত বুলান-- অল ইজ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল ।

সবাই মিলে বৈঠকখানার দিকে পা বাড়ায় । গরম গরম চা সহযোগে খাস্তা কচুরির সদ্ব্যবহার করার জন্যে ।

সেই পুরনো মন্দিরে প্রার্থনার জন্যেই কিনা জানা নেই, নীলেশ এরপরে আর কোনদিন কোন কথার আওয়াজ বা ফিসফিস শুনতে পায়নি । সে দিব্যি সুস্থ । হ্যাঁ একদম পারফেক্ট । চন্দ্রমার সঙ্গে বিয়ের দিনটাও পাকা হয়ে গেছে । সবার নিমন্ত্রণ রইলো । আসা চাই চাই ।

# প্রেকচু তীরে

কপালের ওপর থেকে চুল গুলো আলতো করে সরিয়ে নিল অনন্যা । আর তখনি অনুভব করলো যে এক বিন্দু গরম না থাকা সত্ত্বেও তার কপালটা ঘামে ভিজে গেছে ।এতক্ষণ খেয়াল করেনি তো ! কারণ এতক্ষণ তো সে এই ঘরেই ছিল না। যুগযুগান্ত পেরিয়ে চলে গিয়েছিল সেই কলেজের দিনগুলি তে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সে দাঁড়িয়ে আছে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ এর বারান্দায়- বড় বড় থামগুলির আড়ালে।সে তখন ফাইনাল *এমবিবিএস* পড়ে । একটু দূরে দাড়িয়ে আছে খুব লম্বা এক তরুণ -হাতে একটি মোটা বই ।একে আগে কোনদিন দেখেনি অনন্যা । কে হতে পারে ভাবতে ভাবতেই দেখলো ওর সহপাঠী নির্মাল্য আসছে।

---'কি রে এখানে কি করছিস ?' নির্মাল্যর প্রশ্ন ।

---এমনি দাড়িয়ে আছি-ভাবছি ক্যান্টিনে যাবো কিনা !

---এতে ভাবার কি আছে ? চল চল - আমিও সেরকম একটা কিছু ভেবেই এসেছি ।

এরপরে ক্যান্টিনে চায়ের কাপ হাতে অনেকক্ষণ এলোমেলো আড্ডা চলে । উত্তাল আড্ডা। শুরু হয় গান- দিল ইয়ে কেহেতা হ্যায় কানমে তেরে থোড়া করিব আকে বাহোমে -----!

হঠাৎ অনন্যা দেখে সেই অচেনা ছেলেটি ক্যান্টিনে ঢুকছে ।

---হাই নির্মাল্য !

---হাই রোহিত ! মিট মাই ফ্রেন্ড অনন্যা - অনন্যা এ আমার বন্ধু ডা: রোহিত বসু - লন্ডন থেকে এসেছে । অনন্যা স্মিতহাস্যে নমস্কার জানায় ।

সাধারণ বাঙালীর তুলনায় বেশ লম্বা, পুরু চশমা চোখে, রং খুব ফর্সা -হয়ত দীর্ঘকাল বিদেশ বাসের ফল ।

ডা: রোহিত বসু লন্ডন থেকে কলকাতায় এসেছেন একটি রিসার্চের কাজে ।আপাতত: মাসখানেক এইখানেই আছেন । নির্মাল্যর বন্ধু হলেও উনি তার থেকে বেশ কিছুটা বড়। নির্মাল্য খুব খোলামেলা কিন্তু ওর এই বন্ধুটি একটু চাপা স্বভাবের । এরপর থেকে প্রায় রোজ দেখা হত । একসাথে চা খাওয়া, গল্প করা - ধীরে ধীরে জমে উঠলো আলাপন।

এদিকে নির্মাল্যর খুব ইচ্ছা যে অনন্যা তাকে বিয়ে করে । কয়েকবার তাকে প্রস্তাবও দিয়েছে । কিন্তু অনন্যা ভেবে দেখবো বলে কাটিয়ে দিয়েছে । নির্মাল্য তার বন্ধু । তাকে স্বামী হিসাবে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সে কথা নির্মাল্যকে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ শুনলে সে খুব দু:খ পাবে । অনন্যার কাছে স্বামী মানে নির্ভরশীল এক পুরুষ যাকে সবকিছু সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে । নির্মাল্য পুঁচকে ছেলে । তাকে কি বিয়ে করা যায় ? না না একেবারেই যায়না ।

ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে যে তারা ট্রেকিং করতে যাবে সিকিমের ইয়াকসমের থেকে একটু দূরে একটি স্থানে । কষ্টকর রুট ঠিকি কিন্তু ওরা সকলেই কমবয়সী ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী

কাজেই অসুবিধে নেই। তবে অনন্যার সবথেকে ভালোলাগলো যেটা শুনে তা হল রোহিতও ওদের সঙ্গে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে ওরা দলবল মিলে রওনা হল । প্রথমে ট্রেনে করে শিলিগুড়ি গেল । সেখান থেকে জীপে করে ইয়াকসাম । ইয়াকসাম একটি ছোট পাহাড়ি শহর । কিছু দোকানপাট ও জনবসতি আছে। ওদের দলে ওরা পাঁচ বন্ধু । এছাড়া একজন গাইড কাম পোর্টার যাবে সাথে। নাম তার ‘ গোমা ভুটিয়া ’। ইয়াকসাম থেকে প্রেকচুর ( চু শব্দের অর্থ হল নদী ) ধার ঘেঁষে চলার শুরু । যেতে হবে বাকহিম । তা কম করে ১৩ কিমি তো হবেই ।প্রথম রাস্তায় কেবল চড়াই-উৎরাই ।এই পথটুকু খুব কষ্টকর ।একে রাতভর ট্রেন জার্নি করেছে তার ওপর জীপে করে এতদূর আসার ধকল গেছে । পাহাড়ি রাস্তায় কষ্ট একটু বেশি হয় কাজেই শরীরে হয়ত ক্লান্তি ছিল -বাকহিম যাবার পথে প্রেকচুর ধারে অনন্যা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরতে দেখলো সে একটি হোটেল এ শুয়ে আছে-মাথার কাছে রোহিত বসে ।

প্রায় এক লাফে উঠে বসতে যাবে তখনই রোহিত ওকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো ।

--উঠছো কেন ?তুমি অসুস্থ, রিল্যাক্স কর । অনন্যা প্রতিবাদ করতে পারেনি। জীবনে যাকে প্রথম ভালোবেসেছে তার বাহুডোরে বাঁধা পরে আর যাইহোক তর্ক করা চলে না । চুপ করে থেকেছে । ভীরু দুই আঁখি মেলে নীরবে চেয়ে থেকেছে ।

ইতিমধ্যে হৈ হৈ করে অন্যরা চলে এসেছে ।ওরা বাইরে চা খেতে গিয়েছিল । অনন্যাকে উঠতে দেখে সবাই খুশিতে চনমন করে উঠলো।

---যা খেল দেখালি - নির্মাল্য বলে ওঠে ।

অনন্যা মৃদু হাসে । কিছু বলতে যাবে এমন সময় রোহিত বলে ওঠে - ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও তোমরা । পরে কথা বোলো।

কাজেই বন্ধুর দল কেটে পড়ে - চল চল চল, ম্যাডামকে সুস্থ হতে দে!

অনন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় রোহিত । আরামে চোখ বুঝে ফেলে সে।

পরদিন আবার নতুন করে সব প্ল্যান ছকা হল । আরেক শীতল ভোরে ওরা আবার বাকহিমের পথে পা বাড়ালো । ট্রেকিং রুট খুব সুন্দর । যেন কোন শিল্পীর চিত্রপট । সবুজ বন, পাহাড়, রডোডেনড্রন ফুল সব মিলিয়ে সে এক স্বপ্ন রাজ্য । স্বপ্ন সুন্দর হয় প্রিয়জন পাশে থাকলে । রোহিতের সঙ্গে বসে ট্রেকার্স হাটে গল্প, চা পান - প্রতিটি মূহুর্ত যেন এক একটি মধুবর্ষী ক্ষণ । ট্রেকিং অভিজ্ঞতা এক অনন্য সম্পদ, মনের কোণে । নানান জায়গায় নানান দেশের মানুষের সঙ্গে আলাপ হল ওদের । ডাচ, জার্মান, আমেরিকান । কেউ কেউ প্রফেশনাল ট্রেকার । জুটিই বেঁধে এসেছে তারা। এক সঙ্গে গাইছে, নাচছে, হাসছে । অনন্যা প্রচন্ড ঠান্ডায় একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল । এককোণায় বসে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছিল । হঠাৎ কে যেন একটা শাল ওর গায়ে জড়িয়ে দিল । চেয়ে দেখে রোহিত ।

-খুব শীত করছে ? রোহিতের মুখে উদ্বেগ ।

-হ্যাঁ ।

-চল তোমায় গরম করে দিই।

অনন্যা অবাক হয়ে চায় । একটু লজ্জা পায় । রোহিত পকেট থেকে একটা সাদা মতন শেকড় বার করে ওর হাতে দেয় । স্থানীয় এক পাহাড়ি যুবা রোহিতকে দিয়েছে । মুখে রাখলে শরীর গরম থাকে । কি একটা ভজোকটো বৈজ্ঞানিক নাম আছে । এখন আর ডাক্তারি, বিজ্ঞান এসব ভালো লাগছে না । এ শুধু গানের লগন, এই মধুকাল ফাগুন হাওয়ার । তার সারাটা অন্তর রোহিতময় হয়ে উঠেছে । তারই পথপানে চেয়ে কাটে প্রতিটি সেকেন্ড ।

১৫দিন পরে যখন কলকাতায় ফিরলো তখন হিমালয় আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রথম প্রেমের মধুর পরশের অভিজ্ঞতাও অনন্যা স্মৃতির মণিকোঠায় যতনে তুলে রাখলো ।

'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি তাই দিয়ে মনে মনে -রচি মম ফাল্গুনি !'

একটু ছোঁয়াতেই এতো মাধুর্য ? মনে মনে ভাবে অনন্যা ।

শুনতে পায় মনের দরজায় প্রথম প্রেমের কড়া নাড়া - ঠক ঠক ঠক!

' ডক্টর ! পেশেন্টকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে !'

এতো সিস্টার অড্রের গলা---কাম ইন সিস্টার -অতীত থেকে অনন্যা ফিরে এলো বাস্তবের আঙিনায় । সিস্টার অড্রের সাথে কাজের কথা সেরে আবার ডুবে গেল পুরোন সেই দিনে -

রোহিতের চলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে । অনন্যা রোজই ভাবে যে রোহিত যদি তাকে প্রপোজ করে বেশ হয়- কিন্তু কৈ ? কিছুই হচ্ছে না ।নিজে অনন্যা খুব অর্ন্তমুখী । আগ বাড়িয়ে রোহিতকে কিছু বলার সাধ্য নেই তার । কিন্তু মন যে মানে না । অধরা ও অপ্রাপনীয়তার প্রতি মানুষের চিরকাল প্রবল টান । সে তো সবাই জানে। সেদিন ছিল ২২শে শ্রাবণ ।কবিগুরুর মৃত্যু দিবস । সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় ২৫শে বৈশাখ -২২শে শ্রাবণ পালিত হত । তারাও কয়েকজন উৎসাহী মিলে এইসব অনুষ্ঠান পালন করতো- সাদা শাড়ী, সাদাফুল মাথায়,কানে মুক্তোর দুল -অনন্যাকে খুব নির্মল দেখাচ্ছিল । সবেমাত্র ' এ পরবাসে রবে কে ' - গানটি শেষ করেছে, রোহিত এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানালো তাকে।

--খুব সুন্দর গানের গলা তোমার ।

--থ্যাঙ্কস ।

--ও হ্যাঁ তোমার আর একটি অভিনন্দন প্রাপ্য ।

--কিসের ?

--তোমাদের আসন্ন বিবাহের ।

---বিবাহ ? কার ? অনন্যা অবাক ।

---কাম ওন অনন্যা এতো লজ্জা পাবার কি আছে ? নির্মাল্য আমাকে সব বলেছে ।

অনন্যা হতবাক ! বোবা হয়ে গেছে সে- এমনিতেই সে খুব লাজুক প্রকৃতির, কোনদিনই ঝট করে কথা খুঁজে পায়না তার ওপর এরকম একটি ভিত্তিহীন কথার উত্তরে কি বলবে

ভেবে পায়না। রোহিত উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল । আজ রাতে সে ফিরে যাবে বিলেতে,তার কর্মস্থলে ।

সেদিন রাতেই নির্মাল্যর সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করে অনন্যা । নির্মাল্য তার ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চায় । এরপর প্রেকচু দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে ।কেটে গেছে অনেকগুলো বছর ।নির্মাল্য বিয়ে করেছে । এক ছেলের বাপ সে এখন । অনন্যা বিয়ে করেনি । সে ছোট্টবেলা থেকে মাতৃহীনা, বাবা একা হাতে তাকে মানুষ করেছিলেন। সেই বাবা তার ডাক্তারি পাশের কিছুদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন । অনন্যা খুব ভেঙে পড়েছিল । আত্মীয়স্বজন সেরকম কেউ ছিল না। শেষে পারিবারিক বন্ধু রেভারেন্ড যোসেফের পরামর্শে এই সিকিমে এসেছে সেবামুলক কাজ করবার জন্য । একটি মিশনারী হাসপাতালে ডাক্তারি করে অনন্যা। বিয়ে থা করার সময় বা সুযোগ কোনটাই হয়নি । কিন্তু সিকিমের প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে একদিন এইভাবে তার প্রেমাস্পদকে দেখতে পাবে কোনদিন কি ভেবেছিল ?দূর্ঘটনায় জখম, সংজ্ঞাহীন রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারাদেহ ? ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এই সিকিমেই একদিন প্রথম অনুভব করেছিল রোহিতের মধুর স্পর্শ । জেনেছিল কাকে বলে ভালোবাসা। আর আজ?

ব্রেক ফেল করেছিল রোহিতের জীপ । ভাগ্য ভালো যে খাদে না পড়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে জীপটি উল্টে গিয়েছে । ড্রাইভার ও রোহিত দুজনে ভালই জখম হয়েছে । প্রাণসংশয় না থাকলেও আঘাত গুরুতর ।আহত রোহিতকে দেখে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল অনন্যা । আজও যে সে রোহিতকে কতখানি ভালোবাসে সেটাই আবার উপলব্ধি করলো ।রাতের পর রাত জেগে সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুললো । শুধু জানতো না যে তার কাছেই আসছিল সে ।

বহুদিন নির্মাল্যর সাথে রোহিতের কোন যোগাযোগ ছিল না । এটা খানিকটা ইচ্ছাকৃত । অনন্যাকে নির্মাল্যর বধূরূপে দেখাটা রোহিতের পক্ষে একটু কষ্টকর ছিল । তবুও বহুবছর বাদে দেশে ফিরে অনন্যাকে একটিবার দেখার লোভ সামলাতে পারলো না রোহিত।

যোগাযোগ করলো নির্মাল্যর সাথে । জানতে পারলো সে এতগুলো বছর যা জেনে এসেছে তা পুরোপুরি ভুল । অনন্যা প্রথম থেকে তারই ছিল ।জানা মাত্র তার ঠিকানা যোগাড় করে চলে এসেছিল সিকিম। হাসপাতালে আসার পথে এই বিচ্ছিরি দূর্ঘটনাটি ঘটে । যাক, প্রাণে যখন বেঁচে গেছে আর ভয় কি !

জ্ঞান ফেরার পর চোখ মেলে চায় রোহিত । ঝাপসা একটি মুখ দেখতে পায় । তার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে-আস্তে আস্তে ঝাপসা ভাব কেটে গেলে ফুটে উঠলো তার ভীষণ চেনা একটি মুখ । এখনো ঠিক তেমনি আছে । কালের স্পর্শ একটুও ছাপ ফেলতে পারেনি তাতে। সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর থেকে ভেসে এলো একটি মধুর কণ্ঠস্বর --- এখন কেমন বোধ করছেন ?

--ভালো, মৃদুস্বরে জানায় রোহিত । --ডক্টর !

---বলুন ।

---আমার কিছু কথা ছিল আপনার সাথে ।

---আপনি সুস্থ হয়ে যান আপনার সব কথা শুনবো,কেমন । এখন একটু বিশ্রাম নিন ।

---ওকে ডক্টর ।

এরপরে ডাক্তার পরম মমতায় রোহিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় । তার সমস্ত ক্লান্তি, জ্বালা,যন্ত্রণা নিমেষে উধাও হয়ে যায় । পেশাদারিত্বকে ছাপিয়ে কালজয়ী প্রেমের পরশ পায় রোহিত । ডুবে যায় গভীর সুখ নিদ্রায় ।

এখন গ্রীষ্মকাল । পাহাড়ে হিমবাহ গলা জল বয়ে চলেছে ঝর্ণায় ঝর্ণায় । নাম না জানা বনফুলের গন্ধে মাতোয়ারা চারিপাশ । নি:স্তব্ধতাও এতো প্রাঞ্জল হতে পারে জানতো না রোহিত । সে এখন সুস্থ হয়ে গেছে । হাঁটাচলা করছে । হাসপাতালের বাইরেও যায়। পাহাড়ে বেশিদিন থাকলে গায়ে পাহাড়ের গন্ধ হয়ে যায়, শরীরে শেকড় বেরিয়ে যায় ! একদিন সে ডাক্তারকে বললো -'আর তো এই বন্দী জীবন ভালো লাগেনা । চলুন না একদিন প্রেকচুর ধারে বেড়িয়ে আসি ! শুনেছি ভারি সুন্দর জায়গা ।'

প্রথমে আপত্তি করে অনন্যা কিন্তু রোহিত যুক্তি দিয়ে বোঝায় তাকে। সে নিজেও একজন ডাক্তর তাই জানে কতটা কি করা উচিৎ । অনন্যা আর আপত্তি করে না ।

রোহিতের প্ল্যান মাফিক একটি জিপ ভাড়া করে ওরা একদিন সকালে প্রেকচুর তীরে এসে উপস্থিত হয় । বাতাসে পাইনের গন্ধ,পাশেই কলস্বনা প্রেকচু ! বড় মায়াময় পরিবেশ ।দুষ্টু হাওয়ায় ডাক্তারের একঢাল কালো চুল বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে । চুল সামলাতে ব্যস্ত সে -হঠাৎ রোহিত তার একেবারে কাছে এসে গা ঘেঁষে দাড়ায় ।

---অনন্যা !

চোখ তুলে চায় সে রোহিতের দিকে --- বল !

---আমি তোমার কাছেই আসছিলাম । আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি অনন্যা ।

---আমাকে ? তার চোখজোড়া বিস্ময় ।

---হ্যাঁ ।

---কোথায় ?

---আমার ঘরে - আমার কাছে -লন্ডনে ।

জবাব দেয়না অনন্যা । নি:শব্দে চেয়ে থাকে রোহিতের দিকে ।

কতক্ষণ একভাবে চেয়ে ছিল জানে না - হুঁশ ফেরে রোহিতের চুম্বনে । অনন্যার কপালে সে এঁকে দিয়েছে প্রথম চুম্বন ।

---যাবে না অনন্যা ? রোহিত শুধায় ।

অনন্যার কি আর না গিয়ে উপায় আছে ? সে নীরব থাকে কিছুক্ষণ । তারপর বহুবছর আগের সেই বিশেষ দিনটির মতন নিজেকে রোহিতের বাহুডোঁরে সঁপে দিয়ে নিশ্চিতে চোখ বোজে । প্রেকচুকে সাক্ষী রেখে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায় ।

# ছায়া ঘনাইছে

এ হল মকরন্দপুর জঙ্গল, এখানে বাঘের উৎপাত খুব বেশি । প্রতিবছর অন্তত: জনা ৫০ লোক বাঘের পেটে যায় । বাঘ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর লোক আসে । ঘন জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ ধরে বহু সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ট্যুরিস্ট ঘোরাফেরা করেন । ভারতবর্ষে যেই মানুষটির থেকে বাঘ সম্পর্কে কেউ বেশি জানেনা বলে মনে করা হয় সেই টতরলভয ঋবতসতক্ষ পর্যন্ত এখানে প্রায় আসেন । জয়ীরাও এসেছে। জয়ী ও তার স্বামী অমিত । জাস্ট ফর এ চেঞ্জ ।

চারদেওয়াল অসহ্য ঠেকছিল । গত একমাস ধরে দুজনের সহবাস যেন একটা রুটিনে এসে দাঁড়িয়েছিল । দম আটকে আসছিল জয়ীর । এক অনভ্যস্ত গাম্ভীর্যের বেষ্টনী কাটিয়ে কিছুতেই পৌঁছতে পারছিল না অমিতের কাছে । একই ছাদের তলায় বসবাস অথচ যেন দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা দুজনে । শুরুটা কিন্তু করেছিল জয়ী নিজেই । একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে জয়ী তার প্রাক- বৈবাহিক প্রেমের কথা অমিতকে বলে। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল খুব একা । বাবা ব্যস্ত ডাক্তার, মা খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী । দুজনে দুজনের জগৎ নিয়ে সদাব্যস্ত । ছোট্ট মেয়েটিকে সঙ্গ দেবার অবকাশ ছিলনা তাদের । যাবতীয় সুখ যা কড়ি দিয়ে কেনা যায়, সবকিছুই ছিল, ছিলনা শুধু ছোট্ট বুকে এক তিল শান্তি । কৈশোরে কলেজ যাতায়াতের পথে আলাপ সুবাসের সঙ্গে । রিয়েল এস্টেটের দালাল । বয়সে বেশ কিছুটা বড় । সুপুরুষ, সুবক্তা । সবুজ মনে ধীরে ধীরে ছায়া ফেলে, ছড়ায় নির্মল সুগন্ধ । ভিক্টোরিয়া, আউট্রাম ঘাট থেকে সুবাসের শ্যাওলা ধরা মেস । তারপরে জয়ীর বাড়ি যাতায়াত শুরু ।

সেদিন ছিল লোডশেডিং । দুজনে জয়ীর ঘরে বসে গল্পগুজব করছিল। বাবা রাত করে ফেরেন, মা বিদেশে গেছেন ট্যুরে । সুবাস হঠাৎ মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয় । হালকা জ্যোৎস্নার একটা চাদর চারিদিকে । নিকোটিনে হলদে হয়ে যাওয়া পুরু ঠোঁটের ফাঁকে হারিয়ে যায় জয়ীর কমলালেবুর মতন ওষ্ঠযুগল । একবার নয় বহুবার । একদিন নয় বহুদিন । অবশেষে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় জয়ী তাকে বিয়ের কথা বলে। সেই প্রথম সুবাস জানায় এই বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

--তাহলে ? এতদিন যা হল সবই খেলা ? জয়ী আর্তনাদ করে ওঠে।

--আমি তো জোর করে কিছুই করিনি,তোমার সম্মতিতে তোমার বাড়ি ঢুকেছি, তোমার বেডরুমে গেছি ।

জয়ী বোকার মতন চেয়ে থাকে ।

--কিন্তু ?

-- কোন কিন্তু নয়, তুমি এনজয় করতে চাইলে আমি আসবো কিন্তু বিয়ে করা সম্ভব নয় । তাছাড়া আমি কজনকে বিয়ে করবো ? আমার তো অনেক বান্ধবী !

জয়ী বোবা হয়ে গেছে, নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না । সুবাস কি বলছে ? কি বলছে সুবাস ? এরপরে সেই সম্পর্কে চির ধরে। একটা মৃত সম্পর্কের শববহনের কোন মানে হয়না । জয়ী বড় ক্লান্ত । এবার খেলা ভাঙার খেলা ।

দিনে কেটে যায় আপন ছন্দে, আসে শীতঘুম সেরে বসন্ত । গাছে গাছে নতুন কুঁড়ি, নতুন ভোর, নতুন আভা । জয়ীর বিয়ে হয়ে যায় । ওর স্বামী অমিত একটি কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক । পিওরলি একাডেমিক মাইন্ডেড মানুষ । পড়াশোনার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন ।

স্ত্রীকে বড্ড ভালবাসেন । তিনিই অমিতের জীবনে একমাত্র নারী । তাই ভালবাসাও সুগভীর । জয়ীও তার ভালবাসায় ও কর্তব্যে কোন খামতি রাখেনি । আজ ছমাস হল তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু এত সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওদের মধ্যে যে লোকে বলে ওরা মেড ফর ইচ আদার । এখানেই হয়েছে জয়ীর পরাজয় । তাই সব সুখের মধ্যে থেকেও মনে হত সে অমিতকে ঠকাচ্ছে । একটা অপরাধ বোধ ওকে কুরে কুরে খায় । ঋতুকালের অস্তরাগে ওদের প্রথম মিলন হওয়ায় বায়োলজিক্যাল কোন অসুবিধা অমিতের নজরে পড়েনি । জয়ী তার কাছে ফুলের মতন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক । তার সব আবদার সব হুকুম অমিত হাসি মুখে মেনে নেয় । কোন অভিজাত রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে চাইলে সরল হেসে ওর কোমড়টা আলতো করে জড়িয়ে বলে ওঠে - ও তো খুব এক্সপেন্সিভ জায়গা ! আচ্ছা তুমি যখন যেতে চাইছো তখন নাহয় যাবো । কিংবা ডালে নুন বেশি হয়ে গেলে মিষ্টি হেসে বলবে - চিন্তার কি আছে ? আমি লেবু টিপে খেয়ে নেবো খন । জয়ীর বুকে হাহাকার । এত কষ্ট আগে কখনো হয়নি । একটা সময় এলো যখন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষতবিক্ষত জয়ী, বান্ধবী শতভিষাকে সব খুলে বলে ।

--অমিতকে কিছু বলতে যাসনা ।

--কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি ওকে ঠকাচ্ছি ।

--আরে বোকা এগুলো কি কেউ কাউকে বলে নাকি ? চেপে যা । একি সেই সত্য যুগ আছে ? সদা সত্য কথা বলিবো, সত্য পথে চলিবো ? তোর জীবনে যে এরকম কিছু ঘটেছিল সেটাই ভুলে যা । কি হয়েছে সেক্স করেছিস তো ? তোরা আধুনিক যুগের মেয়েরা মিজাইল সায়েন্সই পড় আর রোবটিক্সই পড় তোদের সেকেলে কুসংস্কার গুলো কিছুতেই যায়না ।

তবু সব এলোমেলো লাগে, মনটা খচখচ করে । একসময় ঝড়ে ভাঙা গাছের মতন ভেঙে পড়ে জয়ী । এক বিষাদকন্যার পতনের আওয়াজ শুনে অমিত কিছুক্ষণ নীরব থাকে, তারপরে ভীষণ গম্ভীর হয়ে যায় । সেই থেকে চলেছে এই হিমশীতল সম্পর্ক, যান্ত্রিক জীবন । বেড়াতে এসেছে জঙ্গলে কিন্তু কোথায় সেই উদ্দাম বন্যপ্রেম ? শহর থেকে অনেকদূরে এক বনবাংলোয়, অচেনা অন্ধকারে দুটি প্রাণীর মৌন সহাবস্থান বনের নীরবতাকেও লজ্জা দেয় ।

ডিনার সেরে অমিত শুয়ে পড়ে । জয়ী চাঁদ দেখবে বলে বাংলোর ছাদে ওঠে । পরিষ্কার আকাশ, সার বেঁধে মেঘের দল চাঁদটাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলছে । রাতপোষাকের ফাঁক দিয়ে অনাবৃত মোমের মতন শরীরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ধবল জ্যোৎস্না । জয়ী একা একা এই নীরবতা উপভোগ করে । শুধু মাঝে মাঝে রাতপাখির কর্কশ ডাক সবকিছু ভেঙে খান খান করে দেয় ।

ঘরের ভেতরটা গুমোট লাগায় অমিতের ঘুম ভেঙে যায় । কেমন দমবন্ধ লাগছে । তাকিয়ে দেখে জয়ী পাশে নেই । এত রাতে কোথায় গেল সে ? বাথরুম, মালপত্র রাখার ছোট ঘরটা, প্যাসেজ সর্বত্র খুঁজলো। কোথাও নেই । ছাদে যাবার কথা একবারো মনে হলনা । মেনগেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল অমিত । চারিপাশ নিঝুম । হৃদয়ের একপাশে সব হারানোর বেদনা, অন্যপাশে কেমন ভরে ওঠার জন্যে আকুলতা । এই সম্পর্কের ভাঙন তাকে রুখতেই হবে ।

জীবনে একা হলে সে ফুরিয়ে যাবে । নাহ ! সে এইভাবে ফুরাতে চায়না । গহীন রাতের নীরবতাকে ছাপিয়ে শুকনো পাতার মচমচানি শোনা যায় । প্রিয় মানবীকে খুঁজে ফেরে অমিত।

সারাটা রাত ছাদেই কেটে গেল জয়ীর । সূর্য চোখ মেললে, পাখির ডাকে মুখরিত হয় চারিপাশ। ঠান্ডা সতেজ বাতাসে চোখমুখ জুড়িয়ে যায়। জঙ্গলের রং, রস, রূপ সবটুকু উপভোগ করতেই তো আসা ! নাহ । নিচে গিয়ে অমিতকে ঘুম থেকে তোলা যাক । এই কষ্ট আর সইতে পারছে না সে । চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে বলবে তুমি আমার, আমি তোমার । শুধু তোমার। আমার কৈশোরের অপরাধ আজ আর আমাকে স্পর্শ করতে পারেনা । আমি জানি আমি একান্তই তোমার, তোমায় আমি খুব ভালবেসে ফেলেছি ।

পায়ে পায়ে নিচে নামে জয়ী । অমিত, আজ তুমি আকাশনীল জামাটা পরো কিংবা হলুদ গাঁদা নকশাকরা পাঞ্জাবীটা । আমার শাড়ি হবে আগুন রঙা । আমরা পাশাপাশি হেঁটে যাবো নিবিড় অরণ্যে । আমার মেঘরং চুল দেখে তুমি সাঁঝের ময়ুরকন্ঠী আকাশ ভেবে ভুল করবে,অমিত আমরা আবার আগের মতন হাসবো, গাইবো, বেড়াবো । মনের মাধুরী দিয়ে সব তিক্ততা জয় করবো । আমি জয়ী হতেই চাই । এরকম করে আমাদের এক একটি ভালবাসার দিন কমে যাচ্ছে অমিত, এসো আবার নতুন করে বাঁচি ।

কিন্তু একি ? ঘরের দরজা হাট খোলা । ভোরবেলা অমিত কোথায় গেল ? খোঁজ, খোঁজ !

বনবিভাগের এক কর্মীই প্রথম খবরটা দেয় । খানিকক্ষণ আগে এক কাঠ কুড়ানি ঘন জঙ্গলে অমিতের মৃতদেহটি দেখতে পায় । ম্যান ইটার পিঠের দিকে অনেকটা মাংস খুবলে খেয়েছে । বীভৎস আকার নিয়েছে লাশটি । এত রাত্তিরে এইভাবে একা কোন অস্ত্র ছাড়াই উনি কেন জঙ্গলে গিয়েছিলেন সেটাই রহস্য । স্ত্রী হয়ত গাঢ় ঘুমে ছিলেন তাই টের পাননি।

*এই ঘটনার মাসখানেক পরে শ্রী সদানন্দ গিরি আশ্রম থেকে জয়ীর বাবার কাছে একটি চিঠি যায় ।*

শ্রী চরনেষু বাবা,

আমি ব্যাভিচারিনী । দিনের পর দিন pre-marital sex করেছি । বিয়ের নামে আমার দেবতুল্য স্বামীকে আমি ঠকিয়েছি । জেনে শুনে একজন নিরীহ মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি ....তাই মনে হয় সব পেয়েও আমি সব হারালাম । তোমাদের কাছে এটা হয়ত নিছক একটা দূর্ঘটনা কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমার ব্যাভিচারের শাস্তি । জীবনে বাঁচতে গেলে কিছু স্থায়ী সম্পর্কের প্রয়োজন । কিন্তু যার জীবনে সম্পর্কগুলো দানাই বাঁধেনি তার সামনে সবচেয়ে সুন্দর যেই পথটি খোলা তা হল আর্তের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া । একমাত্র সেই পথে চললেই একদিন জ্যোতির্ময় পরমাআয় বিলীন হতে পারবো । সেই অমৃত পথের যাত্রী আমি । আমাকে তোমরা খুঁজো না ।

ইতি তোমার আদরের--------

# আদিম রিপু

মাধ্যমিক পরিক্ষার্থিনী দিয়া সেন আত্মহত্যা করেছে । মৃতদেহের পাশে যেই সুইসাইড নোটটি পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন ।

পাড়ায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে -কোন প্রেমঘটিত ব্যাপার নিশ্চয় ! এই বয়সে আর কি বা হতে পারে ?

ছোটবেলা থেকেই দিয়া মাতৃহীনা । ঠাকুমার স্নেহযত্নে মানুষ হচ্ছিল । বাবাও খুব ভালোবাসে তা কে । যদিও বাবা বেশীরভাগ সময়টা ট্যুরে কাটান বলে তাঁর সঙ্গ খুব একটা পেতনা দিয়া । তবুও তাঁকেই সবথেকে বেশি ভালোবাসতো ।

ওদের বাড়ির পরিবেশটিও ভারি সুন্দর । বিশাল কম্পাউন্ড, একধারে একটি পুকুর, দিয়া সাঁতার শিখেছে ওখানে -বাবাই শিখিয়েছেন । অন্য পাশে কয়েকটি নারকেল গাছ আর একটি বড় কদমগাছ । সেই কদমগাছে নানান পাখপাখালির ভীড়! তোতা, ময়না, ফিঙে, দোয়েল আরো কত কি! বিকেলে পুকুর পাড়ে বসে দিয়া জলে মাছেদের খেলা দেখে । ছোটছোট মাছ । আর পাশের বাড়ির হারুকাকাদের একটা বড় খেজুড় গাছ পুকুরের ওপরে প্রায় নুয়ে পড়েছে -টুপটুপ করে জলের মধ্যে খেজুড় পড়ে দিয়া বসে বসে গোনে । মাঝেমাঝে পুকুরে মৎস্যশিকারী বকের আবির্ভাব হয় । কখনো কখনো বকগুলো ঠকে যায়, মাছরাঙা মাছ নিয়ে ফুরুৎ করে পালায় । দিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে । এইভাবেই সন্ধ্যে নামে । আকাশে কালপুরুষ দেখা দেয় । দিয়া ঠাকুমার ডাকে ঘরে ফেরে । পড়তে বসে । এইভাবেই দিন কাটে । মাঝেমাঝে মায়ের অভাব খুব বোধ করে। কিন্তু বাবার কথা মনে হলে আবার সব ভুলে যায় । দিয়া যখন খুব ছোট তখন মা আগুনে পুড়ে মারা যান । কানাঘুষোয় সে শুনেছে যে এটা আত্মহত্যা । কিন্তু মা আত্মহত্যা করেছেন এটা দিয়া ভাবতেই পারেনা । তার বাবা এতো ভালোমানুষ, সফট্ স্পোকেন, শান্ত, কেয়ারিং -এহেন বাবাকে ছেড়ে মা হঠাৎ স্বেচ্ছায় চলে যাবেন কেন?

ইস্কুলে যেতে দিয়ার ভারি ভালোলাগে। ক্লাশের সবমেয়ের সঙ্গেই ও মেশে । তবে সবথেকে আপন ‘ নীপা ’ । নীপা একটু লাজুক তবে পড়াশোনায় ভীষণ ভালো । আর দুটিতে মেলেও ভালো।

-আজ কি টিফিন এনেছিস রে? দিয়া আদুরে গলায় প্রশ্ন করে।

-সুজির পোলাও !

-উরিব্বাস ! দে দে ।

-আরে দাঁড়া, দাঁড়া বক্সটা খুলতে দে।

-খুলে কি করবি ? আমাকে দে দেখি ! আমি খুলিতং ।

নীপার টিফিন বক্স থেকে প্রায় সবটুকু খেতে উদ্যত হয় দিয়া -মুখে দুষ্টু হাসি ।

বাবার সঙ্গে একদিন নীপার আলাপ করিয়ে দেবে । নীপাকে অনেক গল্প বলেছে । তার বাবা কত ভালো মানুষ, ট্যুর এ গেলে কত জিনিস আনেন -এইসব । বাবা মাঝে মাঝে বিদেশেও

যান, কাজে । সেইসময় দিয়ার চোখে জল দেখে ঠাকুমা বলেন ‘দিদি তোমার যখন বিয়া হইয়া জাইবো বাবারে কি সঙ্গে লৈয়া জাইবা ?’

দিয়ার আপেলের মতন লাল টুকটুকে গাল লজ্জায় আরো লাল হয়ে যায়।

একদিন দিয়া বাবার সঙ্গে স্বভূমি বেড়াতে গিয়েছিল । কি সুন্দর কমপ্লেক্সটা ! কত দোকান । লোকশিল্প, ভুরিভোজ, সাজগোজ সব রকম দোকান রয়েছে । ওরা ‘চা-ঘরে ’ বসে চা খেল । তারপরে একটা নাটক দেখলো । ওখানে একটা বিরাট মঞ্চ আছে । সেখানে রোজ কিছু না কিছু অনুষ্ঠান থাকে । বাবা একটা মুখোশ কিনলো । পুরুলিয়ার ছৌনাচের মুখোশ । দিয়ার মুখোশ জিনিসটা ভালো লাগেনা । তবে বাবাকে ও কিছু বলেনি । একটা হ্যান্ডলুমের দোকান থেকে ও একটা সুন্দর শ্যাওলা রঙের,সাদা কালো ফুল তোলা চটের ব্যাগ কিনে দিয়েছে বাবাকে । বাবা খুব খুশী । কত শিল্পীরা বসে পোর্ট্রেট এঁকে দিচ্ছেন । দিয়া বাবার সঙ্গে বসে একটা ছবি আঁকালো । এইসব সময় মায়ের কথা খুব মনে হয় । কি মজা হত যদি মাও এইসময় থাকতেন !

ভগবানের ওপর খুব রাগ হয় ওর -কেন মাকে কেড়ে নিলেন ? বাবার কাছে অভিযোগ করে ছোট্ট দিয়া । বাবা চুপ করে থাকেন । আজ পর্যন্ত যতবার মায়ের কথা উঠেছে বাবা কিছু বলেন নি । মনে মনে দিয়া ভাবে যে তার বাবা অসম্ভব দু:খ পেয়ে নীরব হয়ে গেছেন । তাই মায়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান ।

বর্ষা আগত । বৃষ্টির অঝোর ধারায় প্রতিটি সূর্যস্নাত দিন ভিজে যাচ্ছে। কখনো কখনো সূর্যের মুখটাও দেখা যাচ্ছেনা । এরকম দিনে ভুনি খিচুরি আর ইলিশ মাছভাজা দিয়ে ভোজন পর্ব সারা হয়। তাই আকাশের মুখ ভার দেখলেই দিয়ার রামুকাকা ইলিশের খোঁজে বাজারে চলে যান ।

আজও সকাল থেকেই আকাশটা থমথমে । এরকম ওয়েদার দিয়ার খুব একটা ভালো লাগেনা ।

স্কুলে গিয়ে দেখলো ওর প্রিয় বন্ধু নীপা মুখ ভার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কয়েকবার জিগেস করা সত্বেও কোন উত্তর পেলনা । টিফিনের সময় একটু ধমকের সুরেই বললো - ‘আমাকে বলবি না তোর কি হয়েছে ?’

--‘বললাম তো কিছু হয়নি ।’

--‘তাহলে এরকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন ?’

--‘এমনি ’।

কয়েকদিন এরকম কাটলো । প্রিয় বান্ধবীর মুখ ভার । আকাশও কদিন যাবৎ মেঘময় । মহামুস্কিল! আজ দিয়া প্রায় জোর করে নীপার নীরবতা ভাঙালো ।

--‘বাসে একটা লোক রোজ পেছনে দাঁড়িয়ে এতো অসভ্যতা করে যে বলার নয় ।’

--‘ও এই ব্যাপার ? তা বাস পাল্টে ফেল তাহলেই তো হল ! ’

--‘আমি বাস পাল্টে ফেলেছি । এখন মিনিবাসে যাতায়াত করি । কিন্তু লোকটা আমার পিছু নিয়েছে, ও মিনিবাসে ওঠে এখন’ । দিয়া কি বলবে বুঝে পায়না । চুপ করে থাকে । শুধু

আশ্বাসবাণী শুনিয়ে সাহস যোগাবে নাকি কোন ভাবে প্রিয় বান্ধবীকে সাহায্য করবে সেই চিন্তায় দিন কেটে যায়।

দিন কয়েক এরকম কাটার পরে দিয়া ঠিক করে সশরীরে গিয়ে লোকটিকে ধমকাবে । নীপা মুখচোরা লাজুক মেয়ে কিন্তু দিয়া একবারে উল্টো । আর এই সমস্ত অসভ্য লোকেদের শায়েস্তা করা দরকার । এরা ভুলে যায় যে চিত্রাঙ্গদাও নারীর একটি রূপ !

একদিন নীপার সঙ্গে তার বাড়ি বসে প্ল্যান ছকে । ঠিক হয় স্কুলে যাবার পথে রুট পাল্টে নীপার বাসে চড়বে । তারপর দেখা যাবে বদমাইশ লোকটাকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায় । ঠাটিয়ে একটা চড় মারবে গালে । ফজলামো হচ্ছে তাইনা ? এই লোক গুলোই নোংরা সিনেমা, নোংরা ওয়েবসাইট খুলে দেখে আর তার এফেক্ট পড়ে অন্যদের ওপর । স্বভাবলাজুক নীপা প্রথমে একটু ভয় পেলেও পরে সম্মত হয় । দিয়া একটা কাল্পনিক আত্মতৃপ্তির ঢেকুর গিলে নিজ গৃহাভিমুখে পা বাড়ায় ।

তারপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ! পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক দিয়া রুট পাল্টে নীপার বাসে চড়ে । একটু দূরে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বাসে ভীড় বাড়ে । তবে দিয়া যেখানে দন্ডায়মান সেখান থেকে নীপাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । একে একে পেরিয়ে যাচ্ছে স্টপ গুলো, কোথাও বাস দাঁড়াচ্ছে কখনো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে । একসময় দেখা যায় নীপার যন্ত্রণাকাতর রক্তিম মুখ, একটা তাজা গোলাপ কেউ যেন পিষে ফেলছে। বিন্দু বিন্দু ঘামে ওর সরল মুখটা ভরে উঠেছে । ওকে অদ্ভুত লাগছে । দিয়া অবাক হয়ে দেখছে,নিজের বন্ধুর এই অসম্মান । বাসময় যাত্রীদের গায়ের ঘেমো গন্ধে দম আটকে আসছে । কিছুক্ষণ দেখার পরে সে মাঝারি ভীড় ঠেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় । রাগে ওর কপালের দুইপাশে শিরা গুলো দপ্দপ্ করছে । আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে! সবার সামনে লোকটার মুখোশ টেনে খুলে দেবে ! চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, দাঁতে দাঁত ঘষে নেয় । ইতিমধ্যে একটা স্টপেজ এসেছে । কন্ডাটরের চীৎকার শোনা যাচ্ছে -‘ কেওড়াতলা মহাশ্মশান -কে নামবেন এগিয়ে আসুন ’ এগিয়ে আসুন !

আরে লোকটা নেমে যাবে মনে হচ্ছে -ঐ তো এগিয়ে যাচ্ছে -!

দিয়া সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোককে জোরে ঠেলে এগোতে উদ্যত হয় -নাহ্ একে নামতে দেওয়া যাবে না .......! কিছুতেই না ! আর ঠিক তখনি কালপ্রিটটিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় । সিনেমার পর্দায় ভেসে ওঠা ছবির মতন স্পষ্ট । হালকা নীল শার্ট, কালো প্যান্ট, আর কাঁধে শ্যাওলা রঙের সাদা-কালো ফুলতোলা একটা চটের ব্যাগ । থমকে যায় দিয়া, ভারী হয়ে গেছে পা দুটি । গলার কাছে দলা পাকিয়ে ওঠে । বুকের ভেতরে একটা ভারী পাথর যেন ওর হৃদপিন্ডটা চেপে ধরেছে । শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে । মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়বে । আঁ---আঁ---আঁ ! চীৎকার করে কেঁদে ওঠে দিয়া - এক পরিত্রাহি চীৎকার ! সেই কর্কশ আওয়াজে বাসযাত্রীরা চমকে ওঠে। ততক্ষণে কিশোরী দিয়ার পালকের মতন নরম শরীরটা মেঝেতে লুটাচ্ছে। গোলাপের মতন লাল টুকটুকে গাল বেয়ে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে অসংখ্য মুক্ত, বাস ভর্তি মানুষের পদপিষ্ঠ হয়ে যে গুলি দুমড়ে মুচড়ে যা চ্ছে ।

সত্য ঘটনা ভিত্তিক গল্প । লেখিকার বান্ধবীর গল্প ।

# প্লেগ

## ১

গুজরাটের হিন্দু অধ্যুষিত এক অখ্যাত গ্রাম । ১৫০ ঘরের বসবাস । বেশির ভাগই সাধারণ মধ্যবিত্ত, কিছু ধনবানও আছেন । ব্যবসা বাণিজ্যতেই এরা নিযুক্ত । কেউ মালিক কেউ বা শ্রমিক। গ্রামের অনতিদূরে এক মুসলিম ফকির থাকেন । সকলে ওয়াসিম বাবা বলে । একটি পুরনো বটগাছ তলায় উনি আস্তনা গেড়েছেন । গুজরাটে দাঙ্গার সময় উনি গ্রামের বাইরে চলে যান। নাহলে জীবন সংশয় দেখা দিত । হিন্দুত্ববাদী কিছু মানুষ ওনার ওপরে প্রচন্ড খাপ্পা । নানান ছুতোনাতায় ওনাকে অপদস্থ করতে পারলেই যেন তারা খুশি হয় । ফকির বাবা অবশ্যি কোন রকমভাবেই অভিযোগ করেন না । শুধু হাসেন আর বলেন- আল্লাহ্ তুঝে দুয়া করে ।

একমাত্র ব্যাতিক্রম রবি দাভে । এই বাচ্চা ছেলেটি ফকির বাবাকে ছেড়ে সারাদিন নড়ে না। হয় আশেপাশে খেলে বেড়ায় নয়ত দূরে বসে ওনার কার্যকলাপ দেখে । অনেক সময় বাবা বলেন- বেটা বহৎ হুয়া আভি ঘর যা, মা ঢুন্ড রেহি হোগী । তখন সে ধীরপায়ে ফিরে যায় গৃহপানে ।

ফকিরবাবা সারাদিন আল্লার নাম করেন । নিজের সামান্য কিছু খাবার থেকে পাখি, কুকুর, গরুদের খেতে দেন । গ্রামের রাখালেরা যখন গোচারণে আসে ও দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে সেই সময় ফকির বাবার ডেরায় অনেক গরুকে জাবর কাটাতে দেখা যায় । অনেক ছগশিশুকে দেখা যায় বাবার কোলে । জুলজুল করে চাইছে তারা ।

সারা মাসে মাত্র একবার ফকিরবাবা মাধুকরীতে যান । গ্রামে আসেন । একটা দোকান থেকে মোটা চাল, নুন এইসব নিয়ে যান । দোকানি বিরজু পয়সা নেয় না । যদিও বিরজু হিন্দু তবুও সে বাবাকে বিনাপয়সায় দিয়ে দেয় । আসলে গতবছর দাঙ্গার আগে ওর ছোটছেলে ভারি অসুখে পড়েছিল । বাঁচবে নাই ধরে নিয়েছিল সবাই । সেই সময় ফকিরবাবার দেওয়া কিছু ভেষজ ওষুধ খেয়ে ছেলেটি সুস্থ হয়ে যায় । তাই দোকানি ওনাকে শ্রদ্ধা করে । মুখে কিছু না বললেও সে কিন্তু ফকিরবাবার বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের দলে যোগ দেয়না । যখন ওরা বলে উনি মোল্লা, উনি জঙ্গী দলের লোক, পাকিস্তানের চর তখন খারাপ লাগা সত্ত্বেও সে চুপ করে থাকে । মনে মনে ভাবে লোকে কত সহজে মানুষের সম্পর্কে বাজে কথা ছড়াতে পারে, অপবাদ দিতে পারে । কেউ তো ওনাকে চিনলো না জানলো না, সহজ ভাবে মিশলো না । উনি বিধর্মী এটাই ওনার অপরাধ । কটূ ভাষণে ওনাকে সম্বোধন করেই যেন তৃপ্তি । কেউ কেউ বলে --পাকিস্তানে তো হিন্দুদেরও অত্যাচার করে । তা করুক, তাই বলে নিরীহ ফকিরবাবার ওপরে রাগ করলে হবে? দোষীর শাস্তি নির্দোষের ঘাড়ে ? উনি তো কারো উপকার ছাড়া ক্ষতি করেন না ।

কিন্তু এসব কিছুই বিরজু মনে মনে ভাবে । একবারো মনের কথা মুখে আসেনা । ভয়ে, আতঙ্কে। ধর্মের স্বঘোষিত ধ্বজাধারীদের রোষের শিকার হবার ভয়ে । ধর্ম ! হাসি পায় বিরজুর । ছোটবেলায় শুনেছে ভগবানের নাম করলে মঙ্গল হয় । সবার শুভ কামনা করাই

ভালোমানুষের লক্ষণ । কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সব কেমন বদলে যাচ্ছে । ভারি অবাক লাগে কিন্তু ।

একদিন ওয়াসিম বাবাকে বিরজু বললো- এখানে আপনাকে সবাই অপছন্দ করে, আপনি কেন মুসলিম অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে চলে যান না?

ফকির বাবা হাসেন । বলেন আল্লার দুয়ায় আমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। আর হিন্দু মুসলিম সবাই তো এক, সবাই মানুষ । সবাই আল্লার সন্তান । আল্লা সবার ভালো করবেন।

বিরজু চুপ করে শোনে । এক বিরাট মাপের মানুষের সামনে মনে মনে মাথা নত করে । ইচ্ছা করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে কিন্তু গ্রামের কেউ দেখে ফেললেই মুস্কিল। ওকেই গ্রাম ছাড়া করবে । রবি বলে যেই ছেলেটি ফকিরবাবার কাছে যায় ওকে নিয়ে অনেক গোলমাল হয়েছিল । ওর বাবাকে শাসিয়েছে গ্রামের মুখিয়া যে ফকির পাকিস্তানের চর, বেশি মাখামাখি করলে বিপদে পড়বে ওর ছেলে । ছেলেকে মার ধোর করে লাভ হয়নি । ছেলে, খেলার নাম করে কখন কোথায় যাবে তা কি আর বাবা মা দেখার জন্যে কাজকর্ম ফেলে বসে থাকবেন ? তাই রবিকে আটকানো যায়নি । কিন্তু বিরজু ব্যবসা চালায় । তার ওপরে গ্রামের মুখিয়া চটে গেলে তার সমূহ ক্ষতি । ফকিরবাবা একবার গ্রামে আসেন তাতেই ওর ওপরে সকলে খড়্গ হস্ত । ও বলে যে একজন চাল নিতে আসছে সেটা তার খাদ্য, তাকে ও কঠিন কথা বলতে পারবে না । তবে মাখামাখিও করে না ।

## ২

পাশের গ্রামে মরক লেগেছে । মহামারী । বেশ কিছু পরিবার উজাড় হয়ে গেছে । লোকে পালাচ্ছে। এই গ্রামেও খবর পেয়েই ধনবান ব্যাক্তিরা পালিয়েছেন । দরিদ্ররাও পুটলি বেঁধে গৃহত্যাগ করার পরিকল্পনা করছে । ছোট ছোট ছেলেপুলেদের কোলে নিয়ে মায়েরা সার বেঁধে চলেছে কোন সে অজানায় । প্লেগ যে কালব্যাধি ।

খবরের কাগজের শিরোনাম - গুজরাটে মহামারী । দলে দলে লোক পালাচ্ছে । গ্রাম কে গ্রাম খালি হয়ে যাচ্ছে । শয়ে শয়ে লোক মরছে । টিভি চ্যানেল, মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে । অনেকে আগ বাড়িয়ে সরকারের পদত্যাগ ও দাবী করেছেন ।

এহেন পরিস্থিতিতে কিন্তু ফকির বাবার কোন হুঁশ নেই । রবি নামে যেই ছেলেটি ওনার চারপাশে ঘুরঘুর করতো হঠাৎ তার শরীরে এই অসুখের লক্ষণ ফুটে ওঠে । গ্রাম প্রায় খালি । বেশ কিছু মানুষ মৃত । আশ্চর্য হল রবির পরিবার কিন্তু তাকে ফেলে রেখেই পালিয়েছে । ফকিরবাবা সেই থেকে ওর সেবা যত্ন করছেন । বিরজু আজ সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় বাবাকে বলে গেল- পালান, ও তো মরবেই, আপনি নিজের প্রাণ বাঁচান, দেখছেন না আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। আর ওর নিজের বাবা মাই তো ওকে ফেলে গেছে । আপনার কি দায় পড়েছে ?

ফকির বাবা মৃদু হাসেন - বেটা তু যা । ইসকো ইস হালৎ মে ছোড়কে ম্যায় নেহি যা সকতা।

পারওয়ারদিগার ইসকি রকসা করে ।

কি আর করা চাচা আপন প্রাণ বাঁচা । বিরজু চলে গেল। সপরিবারে । যাওয়ার সময় ফকিরবাবা ও রবি দুজনের জন্যেই মন কেমন করে উঠলো।

এরপরে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে । ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন এর সহযোগিতায় প্লেগ পুরোপুরি কন্ট্রোলে । আবার নতুন ভোর, নতুন সূর্য । ঘরে ঘরে হাসি । যে যার ঘরে ফিরেছেন । শ্মশানের মতন শুন্য গ্রামগুলোতে আবার সাঁঝবাতি জ্বলছে । পচা লাশের দূর্গন্ধ আর নেই । নব নব কুঁড়ির সুগন্ধে ভরে গেছে চরাচর ।

ফকির বাবার খোঁজ কেউ করেনি । কেউ কৌতুহলীও নয় । অনেকে খুশি। হয়ত পালিয়েছে কিংবা মরেছে । আপদ গেছে । কোথার থেকে এক মোসলমান কাবাব মে হাড্ডির মতন এসে জুটেছিল এই গ্রামে । অপবিত্র করে দিল সব । জগদম্বে মাইকি মন্দির চত্বরে নিশ্চয়ই বেটা সুযোগ পেয়ে ঢুকেছিল । সেই কারণে বেশ একটা মহাযজ্ঞ করে মন্দির শুদ্ধ করেও নেওয়া হল ।

বলা তো যায়না ভগবতী চটে গেলে আবার কি উৎপাত শুরু হয় । ধর্মকর্মে শুদ্ধতা হল একটা বড় জিনিস । একটা বিধর্মী এসে মাকে কে ছুঁয়ে যাবে, ধর্মে সইবে ?

গ্রামের কিছু পৈতে ও টিকিধারীর এই সুবাদে নানা উপঢৌকন মিললো । দেবীর রোষের ভয়ে সবাই যার যার নিজের ভাঁড়ার উজাড় করে দিয়েছেন ।

## ৩

চমক লাগে প্রথম, নটবরলালের । লোকটি গ্রামের পিয়ন । চিঠিচাপাটি বিলি করে । মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসে বিড়িতে সুখটান দেয় । সেই প্রথম দেখতে পায় ।

একেবারে শেষ বাড়িটির পরে আছে জোড়া পলাশ গাছ । সেই গাছের নিচে রবি খেলা করছে একটি ছাগশিশুর সঙ্গে । আর পাশেই ফকিরবাবা পাখিদের খাবার দিচ্ছেন ।

এরা বেঁচে আছেন ? অবাক কান্ড ।

নটবর দে ছুট ! পড়িমরি করে গ্রামের দিকে ছুটে যায় । কাকে আগে সংবাদটা দেওয়া যায় । মুখিয়া, হ্যাঁ মুখিয়া কেই জানানো যাক ।

মুখিয়াও কম বিস্মিত নন । প্লেগের হাত থেকে কেউ বাঁচেনি । কত মানুষ মারা গেছেন, গ্রাম শুন্য করে ওরা সবাই পালিয়েছেন । আর এরা বেঁচে রইলো কি ভাবে ?

অলৌকিক ব্যাপার । যেই রবিকে ওর বাবা মা ফেলে গিয়েছিল তারা ফকির বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছে । ভেবেছিল তাদের সন্তান চিরতরে হারিয়ে গেছে, পাড়ি জমিয়েছে অচিন দেশে । কিন্তু সে তো দিব্যি বেঁচে ! গ্রামবাসী লজ্জিত । অনুতপ্ত । মুখিয়া নীরব । পৈতে ও টিকিধারীরাও অবাক। হবারই কথা । কিন্তু কি করে হল এই চমৎকার ?

-- আল্লার দুয়ায় । ফকির বাবার সহজ জবাব । মুখে সরল হাসি ।

আর রবি ? সেও মিটি মিটি হাসছে ।

---ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া না দিয়ে পারেন ? হলই বা সে ভক্ত মুসলমান । জাত ধর্ম তো মানুষের সৃষ্টি । জাতের নামে বজ্জাতি করে আমরা তো নিজেদের অহং কে আরো সমৃদ্ধ করি । কোন ধর্মগ্রন্থ শেখায় মানুষে মানুষে বিভেদ ? কেউ না । এসব আমাদেরই তৈরি --

বলে ফকিরবাবা মুখিয়ার দিকে চাইলেন । হালকা একটা হাসি, এক অমল বিভা ছড়িয়ে গেল তাঁর মুখে । মুখিয়া দেখছে, ধীরে ধীরে ফকিরবাবা মিলিয়ে যাচ্ছেন এক কুয়াশায় । সেই কুয়াশা হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে । সেই মিলনস্থল থেকে ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব আলো --- উজ্জ্বল ও আরামদায়ক, শান্ত ও সমাহিত । যেই আলোর কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, গোত্র নেই, অপাপবিদ্ধ সেই আলোর দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে গোটা গ্রামবাসি । সেই মুগ্ধ চাউনি গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দিকচক্রবালে । হারিয়ে যাচ্ছে মেঘেমালার আড়ালে। কোন বিশাখা, স্বাতী অথবা অরুন্ধতী আলয়ে --------- ।

এই ঘটনার পর ওয়াসিম বাবাকে গ্রামের কেউ কোথাও কোনদিন দেখেনি । নাহ্ বিরজু বা আমাদের ছোট্ট রবিও না ।

# আত্মজ

আজ হাটবার, হাটের মানুষ সার বেঁধে চলেছে বেচাকেনা করতে । আদিবাসী মেয়েরা চলেছে হাট অভিমুখে । কৃষ্ণকালো দেহবল্লরী হাঁটার ছন্দে ছন্দে দুলছে, হাঁটু অবধি শাড়ি পরা, খোঁপায় পলাশ গোঁজা। খালি গায়ে হলদে রোদ পড়ে চিকমিক করছে । কারো হাতে বড় মোরগা, কারো হাতে বাঁশি । ব্রত দেখছে, একমনে দেখছে ওদের চলন বলন । আজ কদিন হল সে এখানে এসেছে গবেষণার কাজে । ও নৃতত্ত্ববিদ্যার ছাত্র । আদিম জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গবেষণা করছে । ওর ডানদিকে একটা শাল গাছের ছায়ায় বসে একটি কমবয়সী ছেলে মহুয়া বেচছে । বন্য নেশা, মাতাল করে দেয় । ব্রত এক গ্লাস খেয়েছে । বেশ ফুরফুরে লাগছে ।

ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম মহুয়াডিহি, সেখানে একটা মাটির ঘরে থাকে সে । রাতের বেলা পিদিম জ্বেলে লেখাপড়া করে । দিনের বেলাটা ওদের স্টাডি করে অর্থাৎ ফিল্ড ওয়ার্ক করে । পাশেই এক বুড়ি থাকে । নাম রম্মা । ওর কেউ নেই, একাই থাকে । হাটে জিনিস বেঁচে । কালো কুচকুচে, ভোঁতা নাক আর তাতে একটি সোনার ফুল চকচক করছে । মুখে চোখে বলিরেখা স্পষ্ট । মাথার অর্ধেক চুল সাদা । দূরে একদল তরুণী পরস্পরের কোমড় জড়িয়ে ধরে আদিবাসী গানের তালে তালে নাচানাচি করছে ।

লহ পহিল ধরতি লোসোত গে

থোল থোলে তহেকন ---

আদিবাসী সুরের মূর্চ্ছনা হৃদয়ে মাদল বাজায় । নাচের তালে তালে পা মিলিয়েছে গুপী । গুপী মূর্মূ, সাঁওতাল ছেলে, ব্রতর ফাই ফরমাশ খেটে দেয় । বদলে একটু পড়াশোনা করে । অক্ষর পরিচয় আছে ছেলেটির, অল্প স্বল্প লিখতে পড়তেও পারে । এই গ্রামেই গদাধর বক্সী নামে এক তরুণ একটি *এন জি ও* চালায় । সেই সংস্থার পক্ষ থেকে এই আদিবাসীদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছে । সেখানেই গুপী খানিকটা পড়েছে । গ্রামের অনতিদূরে একটি নদী আছে, ময়ার নদী । সেই নদীর মাছ খেতে হবে, কতদিন যে মাছ খাওয়া হয়নি ! গুপীকে বললেই ধরে এনে দেবে । কিন্তু রান্না করার কুড়েমিতে মাছ খাওয়া হয়না।

একদিন গুপীর সঙ্গে এই নিয়েই কথা হচ্ছিল । রম্মা বোধ হয় শুনেছিল :

- বাবু মুই রেঁনধে দিলে তুই খাবি বটে ?

ব্রত হেসে সম্মতি জানালো ।

খুব কড়া করে রম্মা বুড়ি সেই মাছ রেঁধে ছিল । স্বাদ অপূর্ব । ঝাল ঝাল । মোটা চালের ভাত দিয়ে খাওয়া হল । ব্রত একটা ২০ টাকার নোট দিতে গেলে রম্মা রেগে গিয়ে বলে ---

হুই বাবু, তু আমার ছ্যালের মত আছিস বটে, তুর থেইকে মুই টাকা লিবো লাই । ব্রত জোর করেনি । পকেটে পুরে ফেলেছিল নোটখানা । বরং যখন শহরে এলো কিছু নতুন জামা কাপড় কিনে নিয়ে গেল গুপী ও বুড়ির জন্যে । পেয়ে দুজনেই ভারি খুশি ।

রম্মার কুঁড়ের পাশে কিছুটা জমিতে ব্রত চাষ করেছে । কুমড়ো গাছ লাগিয়েছে । পাশে ধনে পাতা, দেশী টোমটো, বিলাতী বেগুন, কাঁচলঙ্কা এমনকি একটি বাতাবিলেবু গাছও পুঁতেছে ।

হাট থেকে বেসন কিনে এনে পেঁয়াজি ভেজে দিল গুপী । মুড়ি দিয়ে, ঘন মোষের দুধের চায়ের সঙ্গে সেই খুব খাওয়া হল । একদিন রম্মা দাওয়ায় বসে বোতল থেকে একটি পাত্রে মহুয়া ঢালছিল। ব্রত এগিয়ে গিয়ে বললো - আমাকে একটু দে না !

বুড়ি খিঁচিয়ে উঠলো - তুকে দিব লাই, তুরা বাবু লোগ আছিস । এ রসি তুম্‌হার জন্যে লাই । এতে লেশা হবেক ।

– আমি নেশা করবো ।

– তোকে দিব লাই, লেশা হলে মজাক হব্বে লাই । তুরা বাবু লোগ আছিস !

ব্রত আর কথা বাড়ালো না । গদাধর বক্সীর সঙ্গে পরিচয় আছে রম্মার । ওর কাছেই শুনেছে এই মহিলাটি আদিবাসী হলেও অন্যরকম । হাঁড়িয়া খেয়ে নেশায় মাতাল লোকজন ধুলোয় লুটায়, গড়াগড়ি যায় । বুড়ি কিন্তু নিজের দাওয়ায় বসে নেশা করে তারপরে ঘরে ঢুকে পড়ে । নিজের মনেই থাকে সে । একটি ছেলে ছিল, সাপের কামড়ে মারা গেছে । ওর মরদ অনেক আগেই মরে গেছে । এইভাবেই ওর দিন কাটে মারাংবুরুর কৃপায়।

এই ছোট্ট আদিবাসী জনপদে এসে ব্রতর নিজস্ব জীবন যাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন হলেও ওর বেশ লাগছে কিন্তু । মাঝে মাঝে ওদের ভাষায় গান গেয়ে উঠছে, মহুয়া খাচ্ছে । মজায় আছে । ওর বন্ধু তীর্থর বৌ অলিভিয়া সেদিন ঠাট্টার ছলেই বলে - দেখো ব্রতদা বনমাতাল হয়েছো ভালো আবার কোন আদিবাসী সুন্দরীর প্রেমে পড়না যেন । আমরা বাপু মহুয়া, হাঁড়িয়া দিয়ে সেলিব্রেট করতে পারবো না । তীর্থ ফাজলামো করে দু কলি শ্রীকান্ত আচার্য আওড়ে দিল ।

*আমি খোলা জানালা, তুমি ঐ দখিণা বাতাস*

*আমি নিঝুম রাত, তুমি কোজাগরী আকাশ --- !!*

তা প্রেমে পড়ার মতন পরিবেশ বৈকি ! পলাশ, শিমূল মাখামাখি, ধামসা, মাদল এর তালে তালে মহুয়ার মাদকতার সঙ্গে লাল মাটি মেখে উদ্দাম নাচে মেতেছে কৃষ্ণকলি, শাম্বোষ্ঠি, হরিণচোখো মেয়েরা । তবে আপাতত প্রেমে না পড়ে ব্রত পড়লো এক মারাত্মক অসুখে । দিনে দিনে দূর্বল হয়ে যাচ্ছে, মুখে রুচি নেই, মাথা ঝিম ঝিম, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়া । গুপী ডেকে নিয়ে এলো ওদের হেকিম কে । কি সব শেকড় বাকড়, ওষুধপত্র দিল, কদিন গেল কিন্তু কোন উন্নতি হলনা । দিনে দিনে রোগ বাড়তে লাগলো ।

শেষে বিছানা থেকে ওঠাই বন্ধ হয়ে গেল । কিভাবে যে মাসখানেক কেটে গেল ব্রত জানতেই পারলো না । একদিন যখন চোখ মেলে চাইলো বুঝতে পারলো না যে সকাল না বিকেল শুধু এক অপার্থিব আলো যেন ঘরময় ছেয়ে আছে । ঘরের কোণে রাখা মাটির ঘড়া থেকে ঠান্ডা জল নিয়ে এলো রম্মা ---বাবু পিইয়ে লে ।

আলতো করে ব্রতর মাথাটা তুলে ধরলো রম্মা । দূর্বল শরীরে একটু জল চলকে পড়েও গেল খাটে । রম্মা খুব সন্তর্পণে নিজের আঁচলটা দিয়ে মুছে নিল জলটুকু ।

তাকে চোখ মেলতে দেখে কোথা থেকে ছুট্টে এলো গুপী । খুব খুশি হয়েছে চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে । গুপীর কাছেই শুনলো কত যত্ন করে, রাত জেগে নাওয়া খাওয়া ভুলে রম্মা বুড়ি ওর সেবা করেছে তবেই না আজ সে চোখ মেলে চেয়েছে । হেকিম তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল । শহরে নিয়ে যাবার মতন অবস্থা ছিলনা তার শরীরের । গদাধর বক্সী খবর পেয়েই এসেছিলেন কিন্তু ব্রত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল । শহর তো অনেকদূরে, নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে

যেতে হয় । ব্রতকে হয়ত বাঁচানো যেতনা, নিয়ে যাবার পথেই কেলেঙ্কারী হয়ে যেত । শেষকালে রম্মা বুড়ি এক ডাক্তারকে এখানে আনিয়েছিল । তাঁরই ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছে ব্রতবাবু । গুপী, একটি সাঁওতালকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

– বাবু তুই এত্তো কথা বলিস লাই, শুইয়ে থাক এট্টু ।

ব্রত চুপ করে রম্মাকে দেখছে । সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে এই প্রবাসে আদিম জনজাতির এক বৃদ্ধা রমণী যার সঙ্গে সুস্থ থাকাকালীন তার কোন ঘনিষ্ঠতা হয়নি সে এইভাবে রাত জেগে তাকে সুস্থ করে তুলেছে ? একটু দুধ, কিছু ফলমূল, মুসুরডাল সেদ্ধ সব নিজে হাতে সাজিয়ে দিচ্ছে রম্মা, ব্রতর সামনে। কোথায় পাচ্ছে এই দরিদ্র রমণী ব্রত তা জানেনা । জানতে চায়না, অন্ততঃ এই মুহূর্তে । শরীর, মন দুই বড় দূর্বল । ওষুধ, পথ্যি সবই সময় মতন এসে যাচ্ছে । ধীরে ধীরে জোর বাড়ে শরীরে । একদিন ঘর থেকে বাইরে বেরোয় । মাথাটা যেন টলে যায়! সব কেমন ঘুরছে । আস্তে আস্তে দাওয়ার খুঁটিটা আঁকড়ে ধরে বসে পড়ে সে । দুরে রম্মা ছগলটাকে খেতে দিচ্ছিল । দৌড়ে এসে ধরে ফেলে ব্রতকে ।

- বাবু তুই ঘরের থেইকে বেরোস লাই, পইড়ে যাবি বটে ! ব্রতর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যেন প্রচুর পরিশ্রম করে ফেলেছে । রম্মা একটা গামছা নিয়ে এলো । যত্ন করে ব্রতর মুখটা মুছিয়ে দেয় । আরাম লাগে, ভালো লাগে । চকচকে কাঁসার বাটিতে খানিকটা পাকা পেঁপে ছোট করে কেটে এনে ব্রতর সামনে রাখে রম্মা ।

- খেইয়ে লে বাবু, দেহে বল হবে ।

ব্রতর মুখে অরুচি হলেও পেঁপেগুলো অপূর্ব লাগে । নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায়, সেই কোন ছোট্টবেলায় মাকে হারিয়েছিল সে । বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন । বাগানে কুমড়ো গাছটা লকলকিয়ে উঠেছে, কত ফুল ধরেছে, কি সুন্দর ঝুমকো ফুল ! আজ আকাশটায় অঢেল নীল, আলো মেখে ভুবন আজ বড়ই মায়াময় ।

খবর পেয়ে দেখতে এসেছে বক্সী ।

- রম্মা নানী না থাকলে আপনাকে বাঁচানো যেতনা, জানেন তো ?

রম্মা যেন লজ্জা পেয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল ।

– হ্যাঁ, সবই শুনেছি । মনে এক অপরূপ শান্তি বিরাজ করছে ব্রতর। উন্মুক্ত আকাশপানে চেয়ে খুব উদাস লাগছে । একটা মিঠে সুর কানে আসছে, বোধহয় বাঁশি ! কে বাজায় ?

একটু দূরে গুপী অর্জুন গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে । কোন আদিম সুর, খুব চেনা অথচ ভীষণ অচেনা ।

একদিন কাজ ফুড়ালো ব্রতর । ফিরে গেল নির্জনতা ছেড়ে শহুরে কোলাহলে । টুসু, করম পরব, দাঁসাই নাচ থেকে অনেক দূরে ইট, কাঠ, কংক্রীটের জঙ্গলে । ভুলে গেল রম্মাকে । ভুলে গেল গুপীকে । জীবন যুদ্ধের একজন সৈনিকের মন থেকে ঝরে পড়লো একটি শুকনো পাতা ।

বছর সাতেক পরে এক শীতে কলকাতা থেকে একটি কাজে দিল্লী যাচ্ছে ব্রত, ট্রেনে হঠাৎ দেখা বক্সীর সঙ্গে । সেও কি একটা কাজে কলকাতা এসেছিল এখন দিল্লী যাচ্ছে । এতদিন

পরে হলেও দুজন দুজনকে ঠিকই চিনেছে । কুশল বিনিময়ের পরে গুপীর কথা জানতে চাইলো ব্রত ।

– ও তো এখন কাঠ চেরাই এর কাজ করে । রাতে গ্রামের ছোট ছেলেপুলেদের পড়ায় । আমাদের *এন জি ও* সব রকম সাপোর্ট দিচ্ছে ওকে ।

খুব খুশি হল শুনে । কথা দিল সময় পেলেই একদিন যাবে সেই ফেলে আসা লাল মাটির দেশে।

– আর রম্মা ?

– রম্মা নানি আজ তিন বছর হল মারা গেছে । শেষটায় গায়ে জোর ছিলনা তাই খাটতে পারতো না, শেষ সম্বল বলেও কিছু ছিলনা, তাই প্রায় অর্ধভুক্ত অবস্থায় মরেছে । শেষ বেলায় আপনার কথা বলেছিল । আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছিল । গুপীর কাছে খুব বায়না ধরেছিল । বুড়িটা একটু পাগলী ছিল ।

ট্রেন ছুটছে প্রচন্ড গতিতে । বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার যেন ছায়ার মতন ঘিরে ধরেছে ব্রতকে । বুকের ভেতরে কেমন জ্বলছে, কষ্ট হচ্ছে একটা । দম আটকে আসছে । এক মহা শূন্যতা যেন ছেয়ে গেছে সারা দেহে, মনে । মাথাটা টনটন করছে, পা টলছে । অনেক কষ্টে বার্থের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে ব্রত, ঘুমবার চেষ্টা করছে । ঘুম আসছে না । গা গোলাচ্ছে, চোখে ঝাপসা দেখছে । কেমন অবলীলায় বক্সী বলে দিল - বুড়িটা একটু পাগলী ছিল । একটা মুখ কেবল ভেসে উঠছে বারবার । মাথায় কাঁচাপাকা চুল, কপালে বলিরেখা, নাকে একটা সোনার ফুল চকচক করছে ! কি করে সে ভুলে গেল ঐ মুখ ? কি করে ? এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে শুনশান স্টেশান । আজ কি অমাবস্যা ? একটা আলোর ক্ষীণ আভাও দেখা যাচ্ছেনা কোথাও। হঠাৎ ব্রতচ্যুত ব্রত কেঁদে ফেললো । দু চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু । কোন বাঁধন মানছে না । চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে বালিশ । ব্রত কাঁদছে ।

ট্রেন গয়া স্টেশানে এসে থামলো । বক্সী গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন । ব্রত নেমে গেল মালপত্র নিয়ে ।

তারপর এক বিশেষলগ্নে মুন্ডিত মস্তক, মাতৃহীন একজন মানুষ, প্রেতশিলায় পিন্ডদানের কাজে ব্যস্ত । কুয়াশার জাল কেটে ভেসে আসছে অদৃশ্য শ্লোক ---------

*বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহ পরাণি,*

*তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য জ্ঞানী সংযাতি নবানি দেহী ।*

# রাই কমল

রাইকমল, রাই ও ইন্দীবরের গল্প । রাই একজন জকি । ব্যাঙ্গালোর শহরে বসবাস । বিবাহ বিচ্ছিনা এই সুন্দরী অনেক পুরুষের হৃদয়েই ঝড় তুলেছেন তার সৌন্দর্য্য ও অশ্বচালনার দক্ষতা দিয়ে । তার একমাত্র প্যাশন ঘোড়া । কোডাইকানালের মেয়ে রাই ছোটবেলা থেকেই ঘোড়া ভালবাসেন । পাহাড়ী শহরে বেড়ে ওঠার দরুণ চোখের সামনে নানান ঘোড়ার ঘোরাঘুরি দেখেছেন । সাদা ঘোড়া, কালো ঘোড়া, বাদামী ঘোড়া --- ! আস্তে আস্তে ভাললাগা পরিণত *হয় প্যাশনে*।

ইন্দীবর একজন নেভাল আর্কিটেক্ট । সাবমেরিন ডিজাইন করেন । প্রথমে চাকরী করতেন । এখন একজন প্রথম সারির শিল্পপতি । সি গাল কর্পোরেশনের মালিক । ইন্দীবরের প্যাশন ছবি । ছবি আঁকা, ছবি সংগ্রহ, ছবি তোলা ওনার নেশা । এত কাজের ভেতরেও সময় বার করে উনি নিয়মিত ছবি আঁকেন ।

নতুন বছরে রাই এসেছেন কোডাইকানাল শহরে ছুটি কাটাতে । মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোরের একঘেয়েমি কাটাতে নিজের শৈশবের বাড়িতে এসে কিছুদিন, হয়ত বা কয়েক মাস কাটিয়ে যান রাই । পুরোনো বন্ধু মিসেস মার্থার বাড়ি আজ রাতে পার্টি আছে । নিউ ইয়ারর্স পার্টি । সন্ধ্যে হতে না হতেই রাই একটা সুন্দর পোশাক পরে চলে গেলেন পার্টিতে । গৃহকত্রীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর একটা রোজওয়াইন নিয়ে এককোণে বসলেন । সুন্দর মিউজিক বাজছে । সম্ভবতঃ চায়কোভস্কি । একে একে আসছেন অতিথিরা । কয়েকজন চেনা অন্যরা অচেনা । হঠাৎ একজন ভদ্রলোক হলে প্রবেশ করলেন । রাই চমকে গেলেন । ইন্দীবর ? এই পার্টিতে ? এতবছর পরও রাইয়ের সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। বুকের গভীরে একটা শীতলতা ছড়িয়ে যায় ।

ইন্দীবরও রাইকে দেখছেন । অবাক হলেন না, কারণ এটা রাইয়েরই জন্মভূমি । এখানেই প্রথম দেখা হয়েছিল এই তনয়ার সঙ্গে । সে তো কতকাল আগের কথা ! একঢাল কালো চুল, পদ্মের পাঁপড়ির মতন দুইচোখ, কুঁচবরণ । অশ্বচালনায় দক্ষ । ইন্দীবর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন এই হিলস্টেশানে । প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েন এই ডানপিটে সুন্দরীর । অপরপক্ষও কিউপিডের তীরবিদ্ধ হয়েছেন । কাজেই একটি পাহাড়িয়া প্রেম কাহিনির শুভারম্ভ হয় ।

- তুমি কাকে বেশি ভালবাসো ? আমাকে না তোমার ঘোড়া গুলোকে ?
- Skopje কে । রাইয়ের মুখে দুষ্টু হাসি । Skopje রাইয়ের প্রিয় সাদা কেশরওয়ালা ঘোড়া।

ইন্দীবর মৃদু হেসে বলেন - ওহ্ ! তাহলে Skopje কে নিয়েই থাকো ।

- আহা -হা! রাগ কোরো না। দেখ তো কত হ্যান্ডসাম ইয়ংমেন আমার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য পাগল, আর তুমি তো আমার ভালালাগার ছোট্ট লিস্টে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পেরেছো, এই কি কম কথা ?

ইন্দীবর রাইয়ের গালে একটা মৃদু টোকা মেরে বলেন - ইউ আর ভেরি নটি।

সবুজ ভ্যালির পথে দুজনে ঘুরে বেড়ান । নানান বাঁকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায় । প্রাণ ভরে ভ্যালির রূপ দেখেন । ধূলোবালি হীন অমল সৌন্দর্য্য । প্রতিটি অপরূপ সূর্যাস্ত দুজনে একসঙ্গে উপভোগ করেন । রাইকে এক অপ্সরা মনে ইন্দীবরের ।

– আচ্ছা রাই মানে তো রাধা, ইন্দীবর মানে কি ? রাইয়ের মিঠে সুর বেজে ওঠে ।

– জানোনা বুঝি ? ইন্দীবর হল নীলপদ্ম ।

– তোমার নামের মানেটাও তোমার মতনই সুন্দর ।

দুটি নির্মল হৃদয় প্রেমের জোয়ারে ভেসে যায় । ভাসতে ভাসতে একদিন নোঙর ফেলে তীরে । ইন্দীবর মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যান নির্জন সৈকতে । সমুদ্র ওনার বড় প্রিয় । বড় ভালবাসার ।

– তোমার ভালবাসার সঙ্গে তোমার নামটা বড্ড বেমানান ।

– কেন ? ইন্দীবর শুধান ।

– সমুদ্রে কি নীলপদ্ম হয় ?

– হয় হয় দেখার চোখ থাকা চাই ।

– ইউ আর ভেরি ইম্যাজিনেটিভ ডার্লিং ।

ইন্দীবর যখন সাবমেরিন ডিজাইন করেন তখন টেকনোলজির সঙ্গে সঙ্গে এসথেটিক্সকেও উনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । উনি সুন্দরের পুজারী । ক্রমে নাম ছড়িয়ে পড়ে । মেধা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে একজন প্রথম সারির নেভাল আর্কিটেক্ট হয়ে ওঠেন । বাড়ে কাজের চাপ । বাড়ে দায়িত্ব, উচ্চাশা । আর রাই? উনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন ঘোড়া নিয়ে । পুরুষ অধ্যুষিত অশ্বচালনা ক্ষেত্রে তিনি মহিলাদের আধিপত্য বাড়াতে চান । অনেক মহিলা আছেন যারা ঘোড়া ভালবাসেন, ঘোড়া চড়েন । কিন্তু এই ক্ষেত্রটিকে অর্গানাইজড্ করতে হবে । তাছাড়া পুরুষেরা বড্ড বেশী লাভ -ক্ষতির হিসেবে করে । অনেক মানুষই অর্থহীন নির্মল আনন্দ নিতে চান । তারা ভাললাগায় জিন দিয়ে, হারিয়ে যান নীলদিগন্তে । যেখানে মাটি ও মেঘে কথা হয় । তাদের জন্যই একটি মহিলা পরিচালিত টার্ফ ক্লাব something different সৃষ্টি করার কথা ভাবা হচ্ছে । কিন্তু ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সোজা নয় ।

রাইয়ের আস্তাবলে অনেক ঘোড়া । তারা ওনার সন্তানের মতন । নামগুলোও সুন্দর সুন্দর - serendipity, sancho, dance away, bathsheba, galloping joy ইত্যাদি । উনি নিজে হাতে পরিচর্যাও করেন মাঝে মাঝে । এরাই রাইয়ের ভুবন।

ইন্দীবর মুম্বাইয়ের বাসিন্দা । রাই ব্যাঙ্গালোরের । কর্মসূত্রে দুজনে দুই জায়গাতে থাকেন । মাসে একবার দেখা হয় । কখনো তাও হয়না । তবে বছরে একবার সময় বার করে দুজনেই বেরিয়ে পড়েন । একসঙ্গে বেড়াতে যান দেশ বিদেশে । নিরালায় পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করেন ।

এইভাবেই ঘুরে যায় মাস, বছর । কাজের চাপ বাড়ে দুজনেরই । আস্তে আস্তে যোগাযোগটা ক্ষীণ হতে থাকে । অবশেষে কেবল ফোন মারফৎ যোগাযোগ । দুজনে দুজনের কাজ ও প্যাশন নিয়ে সদাব্যস্ত । কিন্তু এইভাবে কি জীবন চলে ? নি:সঙ্গ বেলায় তো মনে হয় নিকটজনের কথা, একটু উষ্ণতার খোঁজ তো করে মানুষ, তা তিনি যতই ব্যস্ত হোন । একদিন রাই আবিষ্কার করেন যে ইন্দীবর ও তার মধ্যে দূরত্বটা বেড়ে অনেক আলোকবর্ষতে পরিণত হয়েছে । মন

বিষণ্ন হয় । এক ব্যাথাতুর অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । তবে কি তাদের ভালবাসা গাঢ় ছিল না ? কিন্তু উনি নিজেই কি যথেষ্ট সময় দিয়েছেন তার স্বামীকে ? serendipity, bathsheba, galloping joy ছাড়াও যে আরো একটি মানুষের অস্তিত্ব আছে তার জীবনে সে কথা এর আগে কখনো তো মনে হয়নি । বিয়ের আগে যাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন বলে রসিকতা করেছিলেন সেটাই নির্মম একটা সত্য হয়ে গেল তার জীবনে ? একটু একটু করে দুজনে দূরে সরে গিয়েছেন, এতটাই যে বিয়ের তারিখটাও আর মনে থাকছে না একজনের, কৈ আগে তো এই দূরত্ব বোঝেননি? রাই ডুবে যান এক গভীর অন্ধকারে ।

সমঝোতা করতে করতে একটা সময় মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়, রাই মুক্তি চান । কিছুদিন ইন্দীবরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, নিরালায় কয়েকটা দিন যাপনও রুখতে পারেনা ডাইভোর্স । সেই চরম পরিণতি রাইকে আরো ঘোড়াপাগল করে দেয় । যদিও তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বহুপুরুষ তার সঙ্গ কামনা করেছেন, একটু ছোঁয়া, একটু হাসির জন্যে নিজেদের সবকিছু তার পায়ে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন তবু রাই কিন্তু আজও একা ।

পার্টি জমে উঠেছে । একে একে অনেক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল রাইয়ের । একসময় যখন হল প্রায় ফাঁকা ইন্দীবর এগিয়ে আসেন ।

– কেমন আছো ? কোন ভুমিকা ছাড়াই সরাসরি প্রশ্ন । আজও ইন্দীবর আগের মতনই স্বচ্ছ, স্পষ্টবক্তা ।

– -ভালো । রাইয়ের সংক্ষিপ্ত জবাব, তুমি কেমন আছো ?

– আমিও ভালই আছি ।

– এখনও ছবি আঁকো ?

– হ্যাঁ, সময় যে খুব পাই তা নয় তবে চেষ্টা করি ।

যেন কিছুটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই দুজনে দুজনের কাজের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যান ।

রাইকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে । গাঢ় নীল পোষাক, কোন অলঙ্কার নেই অথচ তাও কি অপরূপ লাগছে । যদিও সেই একঢাল কালো চুল আর নেই ।

বয়কাট চুল, তাতে হালকা রূপালি তুলিরেখা । হাতে শুধু একটা হীরের আংটি । ইন্দীবর লক্ষ্য করলেন যে এই সেই হীরে যেটা এক বিবাহবার্ষিকীতে উনি নেদারল্যান্ডস্ থেকে এনে দিয়েছিলেন । রাই এখনো এই আংটিটা পরেন ? অদ্ভুত একটা ভালোলাগায় মনটা ছেয়ে গেলো ।

রাই ভাবছেন, ইন্দীবর কি একা না আবার বিয়ে করেছেন ? খবরের কাগজে প্রায়ই ওনার ছবি বেরোয় । কিন্তু সব জায়গাতেই পড়েন যে উনি খুব প্রাইভেট পার্সেন, তাই ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়না । মাঝে যে অনেকগুলো বছর । এতগুলো বছরে অনেক কিছুই তো পাল্টায় ।

– তুমি কোডাইকানালে কাজে এসেছো বুঝি ? রাই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন।

– হ্যাঁ, আমার কোম্পানী এখানে একটা হোটেল লিজ নিচ্ছে। সেই ব্যাপারে এসেছি।

ইন্দীবরের ব্যবসা অনেক বড় হয়েছে। প্রচুর ডাইভার্সিফিকেশন হয়েছে। লেটেস্স্ট সংযোজন - টুরিজম।

রাই তাকে নিমন্ত্রণ করলেন ডিনারে। আজকাল ডাইভোর্সের পরেও অনেক স্বামী - স্ত্রী বন্ধুর মতন মেশেন। কিন্তু এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আসলে সময় না দেওয়া, ব্যবধান বা দূরত্বই তো এদের বিচ্ছেদের কারণ।

ইন্দীবর হলে একটা কোণা খুঁজে নিয়ে নিজের ল্যাপটপটা বার করলেন।

– এসো তোমাকে আমার আঁকা ছবি দেখাই।

অনেক ছবি রয়েছে। একটা ফোল্ডার খুলতেই দেখা গেল ওনার রিসেন্ট পেন্টিংগুলো। তৈলচিত্র। সবই ঘোড়ার ছবি। সাদা ঘোড়া কালো ঘোড়া বাদামী ঘোড়া। রাই অবাক। চিরটাকাল শুনে এসেছেন ঘোড়া আঁকা খুব শক্ত। তাই কোনদিন একটাও ঘোড়ার ছবি আঁকেননি ইন্দীবর। অনুরোধ করলে বলেছেন - আই ওয়ান্ট টু ড্র এ হর্স অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ মেস।

– তুমি কবে থেকে এতো ঘোড়াপ্রেমী হলে ? রাই সহাস্যে শুধান।

ইন্দীবরও মিটিমিটি হাসছেন।

– আগে এই ঘোড়াগুলোর সঙ্গে তাদের মালকিনও আমার সমস্ত মন জুড়ে ছিলেন, এখন তিনি কাছে নেই তাই এরাই আমার সুখদু:খের বন্ধু।

রাই অবাক হয়ে যান। তবে কি উনি এখনো একাই আছেন ? এখনো তাকে এতোটাই ভালবাসেন ? নি:স্তব্ধ রাতে বিষণ্ন রাইয়ের আজ অনেক বছর পরে হঠাৎ মনে হয় বিবাহ ভেঙে দেবার সিদ্ধান্তটা বোধহয় বড্ড তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলেছিলেন উনি। সত্যি তো ! সময় মানুষকে কত শিক্ষাই না দেয়, যদিও প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ সবসময় পাওয়া যায় না। কোডাইকানাল থেকে আজও আকাশ ছোঁয়া যায় কিন্তু মাটির কাছাকাছি ফেরা যায় কি ? আপনমনে সুরকাটা, তালকাটা, ছন্দহীন রাই এক নতুন স্বপ্নের সন্ধান করে চলেন।

রাইয়ের বাড়ি -মেরিলিন। আজ এখানে ডিনারে নিমন্ত্রিত ইন্দীবর। বড় বড় শিল্পপতিরা সচরাচর একা কোথাও যান না। কিন্তু আজ ইন্দীবর একাই এসেছেন। এই সেই বাড়ি যেখানে উনি আগেও বহুবার এসেছেন। যদিও অনেক কিছুই বদলে গেছে। ড্রয়িংরুমে নানান ফুলের মেলা। যেন একটা ছোট্ট বাগান। একটা চাকর কিছু তাজা ফুল এনে ভাসিয়ে দিল ফুলদানিতে। সুন্দর একটা গন্ধে ছেয়ে গেল পুরো ঘরটা। একটু পরে সাদা পোষাকে ঘরে ঢুকলেন রাই। কি অপূর্ব লাগছে তাকে। ঘরটা আলোময় হয়ে উঠেছে। চেহারায় একটা আভিজাত্য চিরকালই আছে। সবসময়ই রাই এলিগ্যান্ট। আজ বয়সের সাথে সাথে যেন অন্য একটা মাত্রা এসেছে তার সৌন্দর্য্যে।

ঘরে ঢুকেই রাই গল্প জুড়ে দিলেন । লক্ষ্য করলেন যে ইন্দীবর তার অনেক খবরই রাখেন । এমনকি টার্ফ ক্লাব something different এর কথাও জানেন উনি । রাই মুগ্ধ । বিস্ময়ে, ভালোলাগায় । সবুজ পাহাড় আর ঝর্ণার মাঝে বসে জীবনের সায়াহ্নে নতুন করে নানান রোমান্টিকতা লালন করে চলেন এককালের ডানপিটে সুন্দরী । রাই গান জানেন না । তবুও আজ তার সমস্ত সত্ত্বা যেন গলা ছেড়ে গাইতে চাইছে । খুব ভালো লাগছে । ভালবাসার প্রতি মানুষের অধিকারবোধ কি চিরটাকালই থেকে যায় ? বড় বিচিত্র এই মন ।  বড় বিচিত্র তার খেলা ।

নিজে হাতে Jamaican Hibiscus Drink তৈরি করেছেন, ইন্দীবর পান করে উচ্ছসিত ।

– এসো তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো ।

ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন রাই । একটা বড় ক্যানভাস গোছের কিছু মসলিন দিয়ে ঢাকা । ঢাকনা তুলে দিতেই বেরিয়ে পড়লো একটি ছবি ।

– বাহ্ ! অপূর্ব । কে এঁকেছেন এই চমৎকার ছবিটি ?

ইন্দীবরের প্রশ্নে দুষ্টু হাসলেন রাই । সেই পুরোনো দিনের মতন ।

– বলতো কে এঁকেছে ?

– কোন ধারণাই নেই ।

– তবুও বল !

– সত্যি, কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না ।

মিটিমিটি হেসে রাই একবার ছবিটার দিকে তাকান । তারপরে বলে ওঠেন:

– এক ঘোড়ার মালকিন ।

– রিয়েলি ? ইন্দীবরের চোখজোড়া বিস্ময় । মৃদুস্বরে বলে ওঠেন - কিন্তু তিনি তো ছবি আঁকতেন না, আমাকে ঠকাচ্ছো না তো !

– নো স্যার । তিনিই এঁকেছেন ।

ছবির পাশে রাখা চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসে পড়েন রাই -- হ্যাঁ, রীতিমতন গুরুর কাছে গিয়ে তালিম নিয়েছি । তোমার মতন আমার অত প্রতিভা নেই, তবুও চেষ্টা করেছি । তোমার ভালোলেগেছে এতেই আমি খুশি ।

রাইয়ের মুখে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে । এক স্বর্গীয় আভা ছড়িয়ে গেছে ইন্দীবর প্রিয়ার মুখখানিতে । চোখ দুখানি বুজে রাই ডুব দেন স্বপ্নে ।

আর ইন্দীবর ? তিনি দেখছেন । দুচোখ ভরে দেখছেন । তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছবিটিকে ভেদ করে চলে গেছে বহুদূরে। সময়কে এফোঁড় ওফোঁড় করা সেই দৃষ্টি পুরোনো দিনগুলোতে চোখ বোলাচ্ছে । রাই ছবি এঁকেছেন ? যে রাই সাদা কাগজে একটা দাগ টানতে চাইতেন না কখনো। সবসময় - আমি পারিনা, বলে এড়িয়ে যেতেন । সেই মানুষ ছবি এঁকেছেন ? তাও রীতিমতন চর্চা করে ? রাই আজো তাকে এতো ভালবাসেন ? অথচ কত অভিমান নিয়ে সরে গেছেন তার জীবন থেকে

! হৃদয়ে কেমন একটা মোচড় দিয়ে ওঠে । চোখদুটো কি ভিজে গেল ? ঝাপসা ঝাপসা দুটো চোখ রাইয়ের অলক্ষ্যে মুছে নিয়ে ইন্দীবর একমনে চেয়ে আছেন ছবিটির দিকে । দেখে দেখেও আঁশ মিটছে না । দেখছেন, শুধু তারই জন্য- প্রিয়তমার আঁকা সমুদ্রে ভাসমান নীলপদ্মটিকে। নীলপদ্ম কথা বলছে ।

# রোজ ইব্রাহিম

শিল্পপতি রোজের সকাল হয় বেলা বারোটায় । যখন ওর হাউজকিপার এসে গরম কফির কাপ হাতে দরজায় নক করে । শ্যাওলা রঙের পর্দা সরাতেই দিনের উজ্জ্বল আলো এসে ঢোকে ওর ২৫ তলার অ্যাপার্টমেন্টে। মুম্বাইয়ের এই বহুতল বাড়িতে রোজের বাস আজ ৬ বছর। শ্যাওলা-শ্যাওলা। এই শ্যাওলা কথাটি রোজের খুব পছন্দ । শব্দটা ভীষণ সতেজ, সবুজ মনে হয় । ভেজা ভেজা ভাব লেগে আছে, *algae* না কি যেন বলে । বায়োলজিতে পড়েছিল । বিজ্ঞানের ছাত্রীই তো ছিল সে ! মনে পড়ে স্কুল ফাইনালে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্টের জন্য তার বাবা তাকে একখানা সুন্দর ড্রেস কিনে দিয়েছিলেন । সেটাও ছিল শ্যাওলা রঙের । শুধু সে তখন রোজ ছিলনা । ছিল মধুজা । বাবাই নামটা দিয়েছিলেন । মধু --জা, মেয়ে হাসলে মধু ঝরে, কথা বললে মুক্তো পড়ে । চলনে বলনে জলতরঙ্গ বাজে । চন্দনপুরের ইস্কুল মাষ্টার সুবিমল সান্যালের আদরিনী কন্যা, মধুজা । মা ছোটবেলায় মারা যান । সৎ মা ছিলেন । তিনি মধুজাকে ভালো না বাসলেও, জ্বালাতেন না । হয়ত বাবাকে ভয় পেতেন, কে জানে ।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার পরে কলেজে ভর্তি হবার জন্যে যেতে হল সোনাপাড়া। ওদের চন্দনপুর থেকে বেশ দূরে । ট্রেনে ১ ঘন্টা লাগে । কলেজ যাতায়াতের পথেই ওকে দেখেন অনেক কয়লাখনির মালিক অজিত বাগচী । বিশাল বড়লোক । মধুজার বাবার প্রায় হাতেপায়ে ধরে তাকে পুত্রবধূ করেন । *বি এস সি* টাও কমপ্লিট করতে দিলেন না । মধুজার বিয়ে হয়ে গেল এক ফাগুনে। ফুলশয্যা রাতেই তার স্বামী সুকেতুর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে । মধুজার রূপ, যৌবন কিছুতেই যেন তার উৎসাহ নেই । ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় যে তার স্বামী সমকামী । মধুজার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে । সে কি নিদারুণ কষ্ট । কাউকে বলাও যায়না । বুকের ব্যাথা মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই । এরকমভাবেই কাটছিল । বাধ সাধালো অনীশ । তার স্বামীর বাল্যবন্ধু । বাগচী ভিলায় অবাধ যাতায়াত । মধুজার অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট সে । পতঙ্গের মতন । তারপর একদিন বহ্নিতে পুড়ে গেল পতঙ্গ।

মধুজাও নষ্ট হল । ভালোবাসা যখন মনের আঙিনা ছাড়িয়ে দেহে নামে তখন বৃষ্টিশেষে ভেজা ঘাসের মতন কিছু জলকণা তো লেগেই থাকে । একদিন আবিষ্কার করলো যে সে অন্তঃসত্ত্বা । অনীশ বললো অ্যাবর্ট করাতে । মধুজা রাজি নয় । নিজের প্রথম সন্তান, বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে তৈরি, তারই দেহের একটি অংশ, এইভাবে সে নষ্ট হতে দেবেনা । আর সে নিজের কৃতকর্মে একটুও লজ্জিত নয় । একজন সমকামীর খেলার পুতুল বৌ হয়ে থাকার চেয়ে মা হয়ে বাঁচা ঢের ভালো । তার স্বামীকে সে মনে মনে ঘেন্না করতো । *ঠগ*, জোচ্চোর কোথাকার !

কাজেই তাকে ঘর ছাড়তে হল । কাছের মানুষেরা দূরে চলে গেলেন । কলকাতায় এসে পেটের দায়ে পথে নামতে হল । রূপেযৌবনের জোরে একটা কাজও পেয়ে গেলে । সেলসের কাজ । বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রোডাক্ট বিক্রী করা । কিন্তু যার জন্যে পথে নামা সেই বাচ্চাটিকে বাঁচাতে পারে না। গর্ভপাত হয়ে যায় ।

যেই লেডিজ হোস্টেলে সে থাকতো সেখানে একজন মহিলা থাকতেন । উনি একটি সিনেমা কোম্পানীতে কেশসজ্জার কাজ করতেন । তারই সুপারিশে মধুজার চাকরি হয় ঐ প্রোডাকশন হাউজে । ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা দিয়ে সে মালিকের নেকনজরে পড়ে ও কোম্পানীর একজন দায়িত্ববান কর্মী হিসাবে উপযুক্ত কাজের ভার পায় । মালিক ঝুনঝুনওয়ালা ছিলেন

নি:সন্তান । মৃত্যুর সময় তার সমস্ত শেয়ার মধুজার নামে লিখে দিয়ে যান । মধুজা হয় রোজ । সিনেমা লাইনের মানুষ ঝুনঝুনওয়ালাকে কিন্তু মধুজাও নিজের পিতার মতনই শ্রদ্ধা করতো । আস্তে আস্তে ম্যানেজার আনিসের সাহায্যে নিপুন হাতে কোম্পানী আরো বড় করে । সফল হয়। নামযশ ছড়িয়ে পড়ে । খ্যাতির শিখরে পা রাখে রোজ । জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল ও সিনেমা করে তাদের প্রোডাকশন হাউজ আজ প্রথম সারিতে এসে গেছে । সঙ্কেত প্রোডাকশনের তৈরি সিনেমা মানেই সুপার ডুপার হিট ।

দিব্যি চলছিল । এরকমভাবে দিন কাটলে মন্দ হতনা । কিন্তু একদিন রোজ পড়লো মহা অসুখে। কত ডাক্তার বদ্যি এলো গেলো । রোগ সারলো না । কালব্যাধিতে শুকিয়ে যেতে লাগলো । শেষে একদিন আনিসের কথামতন এক মুসলিম ফকিরের ওষুধ খেয়ে রোজ পুরোপুরি সেরে গেল । শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ও বিস্ময়ে রোজ ধর্মান্তরিত হল । হল রোজ ফতিমা ইব্রাহিম । কিন্তু ফতেমাটি সে ব্যবহার করেনা ।

কফির কাপ হাতে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায় রোজ । নীচে আরব সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। চমৎকার দেখাচ্ছে । নীল, ফেনিল জলরাশি । আজ সন্ধ্যায় সাগর কিনারে যেতে হবে । একটি এডস্ রুগীদের চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনে । রোজ ইব্রাহিমকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর গ্ল্যামারই আলাদা । এই জনপ্রিয়তা রোজ উপভোগ করে । মনুষ্যজাতির প্রতি করুণা হয় । এরাই একদিন কম পেছনে লেগেছিল ? অথচ তার ন্যায়অন্যায় বিচার করার আগে কেউ একবারো দেখলো না তার স্বামীর অপরাধটা । একটা সমকামি !

নারী শব্দটা সেদিন রোজকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল । রোজের মাথাটা দপদপ করে ওঠে ।

চাঁদনি রাত । এক মাইল পর্যন্ত পরিস্কার দেখা যাচ্ছে । রোজের পরণে সমুদ্রনীল পোশাক । ওড়নার দুই প্রান্ত থেকে নক্ষত্র জোছনা ঝরে ঝরে পড়ছে । দৃঢ় পদক্ষেপে পৌঁছে গেলো ডায়াসে । নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলো। হঠাৎ চোখ চলে গেল বামদিকে । ভীষণ চেনা একটি মুখ । অনেক বছর আগে দেখা হলেও চিন্তে একটুও অসুবিধা হয়না । তার স্বামী সুকেতু । স্বামী তো বটেই ! আইনত: বিচ্ছেদ হয়নি । কিন্তু সুকেতু এখানে কি করছে ?

-- রোজ আসুন, আমাদের এক রোগীর সঙ্গে পরিচিত হোন ।

এই এডস্ ক্লিনিকের প্রধাণ চিকিৎসক ডাঃ যোশির কথায় রোজ উঠে দাঁড়ায় । তাকে সোজা সুকেতুর কাছে নিয়ে যান ডাঃ যোশি ।

-- ইনি মিঃ বাগচী, এর কিছুটা আর্থিক সহযোগিতায় এই ক্লিনিক চালু হয়েছে । দূর্ভাগ্যক্রমে ইনিও এই রোগের শিকার । এদের অনেক কোলমাইনস্ ও আছে ।

--- জানি ।

-- জানেন ? ডাঃ যোশি বিস্মিত । আপনি ওকে আগে থেকে চেনেন ?

-- হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনি । কথাগুলো বেশ কেটে কেটে বলে রোজ ।

সুকেতুর চোখে মিশ্র প্রতিক্রিয়া । রোজ ইব্রাহিম নামটা অনেক শুনেছে । সবাই জানে । রিচ অ্যান্ড ফেমাস । কিন্তু এ যে তারই বিবাহিতা স্ত্রী মধুজা সেটা সুকেতু কেমন করে জানবে ? মধুজা বেঁচে আছে তাহলে ! যেই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে বাগচি ভিলা ছেড়েছিল, শুনেছে পিত্রালয়েও তার স্থান হয়নি । ওরা সকলে ভেবেছিল মধুজা মারা গেছে। কিন্তু সে তো

দিব্যি বেঁচে আছে ! রোজ মধুজা, মধুজা রোজ সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে । আর ওর বাচ্চাটা ? মনের মাঝে নানান প্রশ্ন ভীড় করে সুকেতুর ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রোজ চমৎকার একটি ভাষণ দিল । হাততালি আর থামতেই চায়না । বিশেষভাবে যে লাইনটি সবার মন জয় করেছে তা হল -- *এডস্ রুগীদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক । কারণ তারাও মানুষ। আসুন রক্তরেখা ভুলে আমরা একসঙ্গে বাঁচি ।*

অনুষ্ঠান শেষে রোজ গাড়িতে উঠতে যাবে এমনসময় কে যেন পেছন থেকে ডেকে উঠলো - মধুজা!

- আমি মধুজা নই মিঃ বাগচী আই অ্যাম রোজ ইব্রাহিম, রোজ ফতিমা ইব্রাহিম । আন্ডারস্ট্যান্ড?
- তুমি কি কোন ইব্রাহিমকে আই মিন মুসলিমকে বিয়ে করেছো? রোজকে আবিষ্কার করতে চাইছে সুকেতু ।
- যদি করেই থাকি দেন হোয়াটস্ বাইটিং ইউ ?
- না মানে এমনি কৌতুহল।
- বেশি কৌতুহল ভালো নয়, ওটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুন ।

রোজের দামি প্যাজেরো হুস করে বেরিয়ে গেল । সুকেতু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত।

আমেদাবাদে একটি ব্রাঞ্চ খুলেছে রোজ । সেই ব্যাপারেই তাকে যেতে হবে আমেদাবাদ । ভাড়া করা একটি হেলিকপ্টারে ওরা যাবে । কিন্তু যাবার আগের দিন প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ায় রোজ সফর বাতিল করে । বদলে গেলো এক সিনিয়ার ম্যানেজার । হেলিকপ্টারটি আকাশে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সব যাত্রী মারা যান । রোজ খবরটা পেয়ে স্তম্ভিত । টিভিতে শুনলো যে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হচ্ছে । বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি । কোন উগ্রপন্থীর সংগঠনের হাত আছে কিনা তাই নিয়ে তদন্ত চলছে । সব নিউজ চ্যানেলে এখন একটাই খবর --রোজ ইব্রাহিম মারা গেছেন ।

রোজের স্বামীর খবর পাওয়া গেছে । তিনিও ধনী তবে তাঁর আয়ুস্কাল বেশি নয় । তিনি এডস্ রোগের শিকার । আইন অনুসারে তিনিই হলেন সব প্রপার্টির মালিক । মুম্বাইয়ের সব রোজ নিবাসের মালিক । কিছুদিন শোকগাঁথার পরে সুকেতু বাগচী রোজের জুহুর বাংলো *সাগরিকায়* আস্তানা গাড়েন । একাই থাকেন । যদিও এডস্ রোগী তাও মস্তি করতে ওনার জুড়ি নেই । প্রায় রোজ রাতেই বাংলোয় পার্টি থাকে । মুম্বাইয়ের অনেক বিগশট নিমন্ত্রিত হন । বড়, মেজ, ছোট কর্তা আসেন । খাওয়া দাওয়া হৈ হুল্লোড় হয় । বাংলোর বাইরে একটা পাগল থাকে । রাস্তার কুকুরের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে ঘুমায় । পার্টি হলে ওর ভারি আনন্দ । কারণ এমনিতে সে আস্তাকুড় থেকে খাবার কুড়িয়ে খায় কিন্তু পার্টির দিন উচ্ছিষ্টগুলো পায় । সেদিন তো সুকেতু গাড়ি থেকে নামতেই পাগলটা ছুটে চলে গেল তার কাছে -- দরোয়ন ঘাড় ধরে বার করে না দিলে কি হত কে জানে । আরেক দিন গাছ বেয়ে পেছনের বাগানে ঢুকে পড়ে । শেষে মালির চীৎকারে পালায় ।

এদিকে সঙ্কেত গ্রুপ অফ কোম্পানির একটা বিরাট মুনাফা হওয়ায় আজ রাতে বিশাল পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছে সুকেতু । মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারও আমন্ত্রিত । সন্ধ্যে হতেই সব অতিথিরা এক এক করে আসছেন । বাংলোর লনে বেয়ারাগণ কর্মব্যস্ত । দামী মদিরার ফোয়ারা,

স্বল্প বসনা সুন্দরীরা লাস্যে, ছন্দে আরো মোহময়ী। তাদের সুগভীর বিভাজিকায় কয়েকশো ওয়াটের আলোর ঝর্ণাধারা। এক পরীর দেশ, যেন গোটা আকাশটা তারা ওড়না জড়িয়ে ধরায় নেমে এসেছে। বলিউডের কিছু তারকাও এসেছেন। হাজির পেজ থ্রীর লোলিটারা। সুকেতুর পার্টি জমজমাট। সবাই চেনা অচেনার গন্ডী ছাড়িয়ে আলাপনে ব্যস্ত। তারা কথামালা বুনছেন।

একটু আড়ালে গিয়ে একটা চুরুট ধরায় সুকেতু। তার রাইট হ্যান্ড আসলাম এখনো এলোনা। কপালে ভাঁজ পড়ে। এমন সময় ওর সেক্রেটারি, জন আসে। খুব কাজের মানুষ। পুরনো, বিশস্ত। ওদের কোল মাইনস্ এর ব্যবসাতেও হেল্প করতো।

– স্যার, চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ?
– এখনো আসলাম এলোনা !
– দেখুন রোজ মেমসাহেবের ভুত হয়ত মাঝপথ থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। বলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে দাঁত বার করে হাসতে থাকে। আপনি বোম্বাস্টিক লোক মশাই ! একেবারে হেলিকপ্টার ব্লাস্ট ! তবে যাই বলুন এই ধরণের মৃত্যুতে কিছু বোঝার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ। রোজ মেমসাহেবের এইটুকু হক ছিল, শত হলেও বিয়ে করা বৌ বলে কথা !

বলে আবার বিশ্রীভাবে হাসতে থাকে জন। এতক্ষণে মুখ খোলে সুকেতু।

– হ্যাঁ, বিয়ে করা বৌ বলেই তো স্বর্গারোহণের পথটা পরিষ্কার করে দিলাম। স্বগ্গে গিয়ে সুখে থাকো।

হঠাৎ বিকট হাসির শব্দে দুজনেই চমকে ওঠে। আরে, সেই পাগলটা না! এটা কোথার থেকে এলো ? আপদটার সাহস তো কম নয়।

বেয়ারা ! বেয়ারা -- বিরক্তিসূচক একটা হাঁক পাড়ে সুকেতু।

ততক্ষণে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। সিকিউরিটি গার্ড আসার আগেই পাগলটা পরিষ্কার ইংরেজিতে বলে ওঠে -- ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মিঃ বাগচী ! রোজ ইব্রাহিমকে খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেফতার করলাম। পকেট থেকে সিবিআই অফিসারের কার্ড বার করে দেখালো পাগলরূপী মিঃ অশ্বিন ভরদ্বাজ।

– এসবের মানে কি ? আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে অপমান করার অর্থ কি?
– যা বলার কোর্টে গিয়ে বলবেন। নাউ মুভ, কাম ইউথ মি।

ঠাট্টা তামাশা ছেড়ে অতিথিরা জড়ো হয়েছেন। সবার চোখে বিস্ময়। রোজ ইব্রাহিমের হত্যাকারী তারই স্বামী ? -- নাহ্ ! একা উনি নন, একটা দল সম্ভবতঃ এর পেছনে আছে। সুকেতুবাবুর ডানহাত আসলমকে জেরা করে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু আইন প্রমাণ চায়। আর সুকেতু বাগচী তো নিজের মুখেই একটু আগে স্বীকার করলেন যে উনি এই কীর্তির একজন পার্ট--- এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ ভরদ্বাজ।

সকলে নির্বাক। নিশ্চুপ। একটা পিনের শব্দও বোধকরি শোনা যাবে। পুলিশ সুকেতুকে নিয়ে চলে গেল।

জেল হাজতে এসে শুধু জন দেখা করে গেছে। আর কেউ আসেনি।

কয়েকদিন পরে বৈকালিক নিউজ চ্যানেল খুলে জন জানতে পারে যে সুকেতু এই চক্রান্তের মাস্টার মাইন্ডের নাম আদালতে বলবে বলে পুলিশকে জানিয়েছে। তাই সুকেতুকে আপাততঃ পুলিশ কাস্টডি থেকে ছেড়ে দেওয়া হল কিন্তু বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হবে ।

পরদিন সব নিউজ পেপারের হেডলাইন হিসাবে এই খবর ছাপা হল । তারপর একদিন সুকেতুকে নিতে এলো একটি কালো কাঁচে ঢাকা মার্সিডিজ । সামনে, পেছনে পুলিশের গাড়ি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । আবার বিস্ফোরণ । গাড়িতে টাইম বোমা !

ড্রাইভার সেজে খুনীর লোক এসেছিল । সাক্ষীর মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল ।

আবার কাগজের শিরোনাম --- রোজ ইব্রাহিম হত্যা মামলার সাক্ষী নিহত। রহস্য অনুদ্ঘাটিত ।

আজকাল রোজের সব বাড়ির সামনে থেকে পুলিশ পিকেটিং তুলে নেওয়া হয়েছে ।

একদিন সন্ধ্যায় জুহুর বাংলো সাগরিকায় এক ব্যাক্তি প্রবেশ করে । কালো ওভারকোট, কালো টুপি পরা । সঙ্গে একটি বাচ্চা ছেলে । ভেতরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দেয় ।

বাচ্চাটিকে মারধোর করে । কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । এমন সময় দরজায় কড়াঘাত ।

দরজা খুলতেই দেখে রোজ দাঁড়িয়ে । ভূত দেখার মতন চমকে ওঠে সেই ব্যাক্তি । রোজ বেঁচে আছে? হতবাক হয়ে গেছে কালোকোট পরা ব্যাক্তি।

– খুব অবাক লাগছে তাইনা অনীশ ?

অনীশ সামলে নিয়েছে । পকেটে হাত দিতেই বাইরে পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যায় । এক ঝটকায় রোজকে সরিয়ে অন্ধকারে দ্রুত মিলিয়ে যায় সে। কিন্তু ভরদ্বাজের বাহুপাশে বাঁধা পরে ।

– অ্যান্ড আল্টিমেটলি ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মিঃ অনীশ সাহা ।

ধস্তাধস্তিতে অনীশের টুপি খুলে যায় । এদিকে বাচ্চা ছেলেটি তারস্বরে কাঁদছে । বছর ১৫ বয়স হবে। রোজ ছুট্টে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে । রোজকে দেখে সে মাম্মি বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

আবার জুহুর বাংলো সাগরিকা । আজ রাতে এক মহাপার্টি । হোস্ট রোজ ফতিমা ইব্রাহিম । গেস্ট মুম্বাইয়ের হুস হু রা । রোজ শুরু করেন -------

হেলিকপ্টার ব্লাস্টের পরেই উনি আত্মগোপন করেন জানার জন্যে কে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চায় ? প্রথমেই মনে হয় সম্প্রতি দেখা হওয়া স্বামী সুকেতুর কথা । কিন্তু শুধু সন্দেহের বশে কিছুই করা সম্ভব নয় । প্রমাণ দিতে হবে । উনি সিবিআইয়ের সাহায্য চান ।

সিবিআই অফিসার মিঃ ভরদ্বাজ পাগল সেজে সাগরিকায় অষ্টপ্রহর পাহারা দেন । লক্ষ্য রাখেন সুকেতুর গতিবিধির ওপরে । ওর ডানহাত আসলম ধরা পড়ে । জেরা করে বিশেষ কিছুই জানা যায়না শুধু জানা যায় যে সুকেতু বোম সংগ্রহ করেছিল । কিন্তু কার হুকুমে বা কেন সেই বিষয়ে কোন আলোকপাত হয়না এই জেরায় । সুকেতু যে এই চক্রান্তের মাস্টার মাইন্ড নয় সে কথা রোজই পুলিশকে বলেন । কারণ সেই ডেয়ারিং অ্যাটিটিউড সুকেতুর নেই । সে একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ। তাহলে পর্দার অন্তরালে কে ?

জানার জন্যে সিবিআই থেকেই একটা চাল চালা হয় । সুকেতু আদালতে সব ফাঁস করে দেবে এই মর্মে একটা খবর বাজারে চাউর করা হয় । সেইমতন নিউজ পেপারে, নিউজ চ্যানেলে খবর

বেরোয় । খুনী সাবধান হয়ে যায় । এবং আদালতে পৌঁছানোর আগেই সুকেতুকে হত্যা করার জন্যে গাড়িতে বোমা লাগায় । কিন্তু সুকেতু ও একজন পুলিশ ইনস্পেক্টার বোমা বিস্ফোরণের আগেই গাড়ি থেকে লাফ মারে । ওরা জানতো যে কালো মার্সিডিজ যেটা সুকেতুকে নিতে এসেছে সেটা খুনীর পাঠানো । খুনিকে শনাক্ত করার রাস্তা যাতে খোলা থাকে তাই চড়েছিল ।

এদিকে খুনী যখন কার ব্লাস্ট হবার কথা জানলো, সে আড়ালে হেসেছিল ।

সিবিআইয়ের দ্বিতীয় চাল হল রোজের সব বাড়ির সামনে থেকে পুলিশ পিকেটিং তুলে নেওয়া । খুনী ভাবলো এই সুযোগ । অনাথ আশ্রমে গিয়ে রোজের ও তার একমাত্র ছেলে ব্রাত্যকে নিয়ে আসে । কারণ রোজ ও সুকেতুর অবর্তমানে সেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে । যদি তাকে আগেই কিডন্যাপ করা যায় তাহলে খুনীর রাস্তায় আর কোন কাঁটাই রইলো না । ব্রাত্যকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে একটা দাবার চাল দেবে আর সব সম্পতির মালিক বকলমে সেই হয়ে যাবে।

একটা বিপদ আশঙ্কা করেই রোজ গিয়েছিল অনাথ আশ্রম থেকে তার ছেলে ব্রাত্যকে নিয়ে আসতে। গিয়ে শোনে যে তার বাবা ছেলেকে নিয়ে গেছেন । তখনই রোজ দ্রুত সাগরিকায় এসে উপস্থিত হয়। সপারিষদ । এবং তার সব সন্দেহ সত্যি রূপে দেখা দেয় । ধরা পড়ে অনীশ সাহা । সম্পত্তির লোভে যে পাগল হয়ে গিয়েছিল । সুকেতুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেয়েছিল ও ভেবেছিল যে সে সফল কিন্তু বাধ সাধলো কাগজের হেডলাইন -- সুকেতু আদালতে বয়ান দেবে আসল খুনী কে । কিন্তু অনীশ জানতো না যে রোজ জীবিত আছে । তাই সে ব্রাত্যকে সরাবার মতলব আঁটে ।

কিন্তু রোজের তো গর্ভপাত হয়ে গিয়েছিল তাহলে ব্রাত্য?

নাহ্ ! রোজ সমাজের চোখে ধূলো দেবার জন্যে গর্ভপাতের খবরটা রটায়। আসলে তার সন্তান বেড়ে উঠেছিল এক অনাথ আশ্রমে, ফাদার অ্যালেক্সের কাছে । অনীশ যখন জানতে পারে যে রোজের ছেলে বেঁচে আছে এবং বাবা হিসাবে তার রেকর্ড বুকে নাম আছে তখন সে সম্পত্তি হাতবার প্ল্যান আঁটে । সুকেতুকে দলে টানে । কথা ছিল আধাআধি ভাগ হবে । কিন্তু রোজের মৃত্যুর খবর জানাজানি হবার পরে অনীশ বেঁকে বসে। শেয়ার নিয়ে গোলমাল লাগে । সুকেতুও তার মালিকানা ছাড়তে রাজি হয়না । এই গোলমালের সময় সিবিআই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং বাকি সবারই জানা ।

মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুকেতু । রোজই তাকে পার্টিতে ডেকে নিয়ে এসেছে । চিরটাকালই সে রোজের কাছে ছোট হয়ে গেলো। অথচ জ্ঞানত: কোন ক্ষতি সে করেনি রোজের । অনীশের সঙ্গে হাত মেলাতেও চায়নি । কিন্তু বাজারে বিপুল দেনা তাকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে । নিজের সমকামীতা লুকিয়ে বিয়েও করেনি । বিয়েটা তার বাবাই জোর করে দিয়েছিলেন । ছেলে সমকামী জানা সত্ত্বেও । অনেকবার চেয়েছে রোজকে সব খুলে বলতে কিন্তু পারেনি । কেন পারেনি সেই প্রসঙ্গ আজ অবান্তর ।

আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে সে । রাতজাগা চাঁদ শুধু সাক্ষী হয়ে থাকে এক অলিখিত কাহিনির ।

# ডটকম

নীহারিকা রায় । তন্বী, শ্যামা, শান্তোষ্ঠী । কলকাতার একটি গবেষণাগারে পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন । সবুজে ছাওয়া পলাশপুরের মেয়ে। বাবা ছিলেন শিক্ষক । বাড়িতে বাবা মা ভাই ছাড়াও আছে একজোড়া চুনিয়া মুনিয়া । আগে নীহারিকা ওরফে নীহার পলাশপুর থেকে যাতায়াত করতো । এখন হোস্টেল পেয়ে যাওয়াতে হোস্টেলেই থাকে । অনেকরাত পর্যন্ত ল্যাবে কাটাতে হয় । কাজ করে, ইমেল করে। জিওভান্নিকে । ওর ইলেকট্রনিক বন্ধু । অদেখা কিন্তু ভীষণ কাছের। তার সুখ দু:খের সাথী । তার আত্মার আত্মীয় ।

নীহার প্রকৃতিপ্রেমিক ও রোমান্টিক । একমুঠো শিশিরভেজা বকুলফুলের চেয়ে প্রিয় ওর আর কিছুই নেই । মোমজোছনায় লুটোপুটি খেতে নীহারের যত ভালোলাগে জিওভান্নিকেও ঠিক ততটাই ভালোলাগে ।

কতগুলো বাংলা ওয়েবজিনে নিয়মিত লেখে সে, ঝুমি ছদ্মনামে । লেখার হাতটি বেশ ভালো । গল্পের চেয়ে কবিতায় বেশি দক্ষ । দেশ বিদেশের মননশীল বাঙালী গোষ্ঠি ভূয়সী প্রশংসা করেছে তার । অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছে । ইদানিং সে নিয়মিত ফ্যানমেল পাচ্ছে । তাকে সকলে একটু চোখের দেখা দেখতে চায় -- রূপলাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভর ---।

নীহারের গবেষণা শেষ । একটি পি এইচ ডি ঝুলিতে ভরে ফেলা গেছে । স্বভাবতই বাবা মা ভারি খুশি । তারা চাইছেন মেয়ের জীবনতরী এবার নোঙর ফেলুক । কিন্তু নীহারের চোখে অন্য স্বপ্ন । সে সুদুরের পিয়াসী । তার পোস্টডক করতে বিদেশে যাবার ইচ্ছে । কিছু অফারও হাতে আছে । সবথেকে লোভনীয় অফার মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের । সেটি ইতালিতে । সেখানেই তার নেটবন্ধু জিওভান্নি থাকে । কাজেই নীহার খুব উত্তেজিত । কিন্তু তাদের তিনকূলে কেউ কখনো কালাপানি পার করেনি তাই বাবা মা দ্বিধায় আছেন । না জানি সে দেশ কেমন !

নীহার কিন্তু দমবার পাত্রী নয় । তার মতন মেধাবী ও ক্ষুরধার মেয়ের দমে যাওয়া উচিৎও নয়।

একদিন পরবাসের ডাক এলো । নীহার সস্তার স্যুটকেস গুছিয়ে তৈরি । ওর গাইড প্রফেসর দাসের চিঠি নিয়ে যেতে হবে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে সেই স্বপ্নপুরে ।

এদিকে জিওভান্নির সঙ্গে প্রেমপর্ব বেশ জমে উঠেছে । অশুদ্ধ ইংরেজিতে হৃদয়সুধা মিশিয়ে ভালই চলছে সেই মিঠেল পর্ব । দেখতেও মন্দ নয় তাকে । এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল পেছনে পনিটেল করা । চোখেমুখে স্নিগ্ধতার ছাপ । সেদিন কথা হচ্ছিল ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে । জিওভান্নির সরল প্রশ্ন -- তোমরা ভারতীয়রা একটা ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্যতার অধিকারী । তোমরা পশ্চিমকে অনুকরণ করো কেন ? এর উত্তর নীহারের জানা নেই । তাই বলে--আমার জিওভান্নি শুনলেই কেবল পিৎজার কথা মনে পড়ে ।

– পড়লেও খাওয়া যাবে না, জিওভান্নির সরস জবাব ।

জিওভান্নি একটি মিউজিয়ামের দায়িত্বে আছে । ও প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্র। তার মতে ভারতীয় ও রোমান সভ্যতাই অন্য সভ্যতার চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের ছিল ।

নীহারের প্রথম প্রেম তার এক মাষ্টারমশাই । ওর কাছে সে অঙ্ক পড়তে যেত । জাতিতে সাহা । বেশ কিছু চাল ও তেল কল ছিল । ভদ্রলোক হঠাৎ লেখাপড়া শিখলেন কেন জানা নেই । নিজের ঠাকুর্দার নামে নামকরণ করে একটি স্কুল স্থাপন করেছেন । সেখানেই উনি অঙ্ক পড়ান । এটা ওনার নেশা । পেশা পৈত্রিক ব্যবসা । বিবাহিত । একটু মেয়ে চাটা । ছাত্রীরা বেশি নম্বর পায় বলে ওনার বদনাম আছে । সেই রতন সাহার প্রেমে পড়লো নীহার । বিরাট গাড়ি হাঁকিয়ে ইস্কুলে আসেন। এক মুগ্ধতা ছড়িয়ে ফিরে যান । নীহার তার বাড়ি সাহাকুঞ্জে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করে । তারপরে এক বর্ষণমন্দ্রিত সন্ধ্যায় রতনের শরীরে শরীর মিশিয়ে আদর করার সময় ধরা পড়ে যায় তার স্ত্রীর কাছে। ব্যাস ! গৃহশিক্ষা দান বন্ধ । এরপরে আর প্রেমের তরী বেয়ে উদ্দাম জলস্রোতে ভাসা হয়নি । সেই প্রেম আবার ডানা মেলেছে জিওভান্নির কল্যাণে । সবথেকে ভালো লাগে ওর পাঠানো ই-কার্ড গুলো । লাল-নীল- হলদে রং বেরঙের কার্ড যখন কম্পিউটারের স্ক্রীন জুড়ে থাকে মনটা উদাস হয়ে যায় । একমূহুর্তও আর তাকে ছেড়ে থাকতে মন চায় না । কিন্তু হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান, কাছে যাবে কিভাবে ?

কিন্তু সুযোগ এসে গেছে, এখন আর বিলম্ব নয় । মাতৃভূমিকে বিদায় জানিয়ে এক সুন্দর দিনে নীহার চলে গেল প্রিয় মানবের দেশ ইতালি । জিওভান্নি থাকে ফ্লোরেন্সে । নীহার পৌঁছেই ফোন করলো । কথা হল । রোমাঞ্চ, ভালোলাগা ছড়িয়ে গেল শিরায় শিরায় । এবার দেখা করার পালা । আবার দেশ থেকে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হলে মনে হয় বাড়ি ফিরে যাই । যদিও মা তাঁর স্নেহের আঁচল বিছিয়ে রেখেছেন এই দূরদেশেও । নানান উপদেশ, খোঁজখবর নেওয়া কোথাও কমতি নেই । এমনকি ভাইকে ধরে ইমেল করাও শিখে নিয়েছেন । প্রথম প্রথম খুব অসুবিধে হত । বিফ, পোর্ক খেতে সে অভ্যস্থ নয় । খাওয়ার বেলায় সে একশো ভাগ বাঙালী । লাউঘন্ট, মোচা, এঁচোড় এই হল তার প্রিয় খাদ্য । তাই সসেজ ও হ্যামে স্বচ্ছন্দ হতে সময় লাগলো । ডিপার্টমেন্টে এক বাঙালী সিনিয়র আছেন । তার স্ত্রী আপাতত নীহারকে সব চিনিয়ে দিচ্ছেন । বাজার হাট, ইন্ডিয়ান স্টোর ইত্যাদি । মাঝে মাঝে লাউচিংড়ি রেঁধেও খাওয়াচ্ছেন । কিন্তু যার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর তার দেখা মিলছে না । সে খুবই ব্যস্ত । যবে থেকে নীহার এই দেশের মাটিতে পা দিয়েছে তবে থেকেই ।

ওর ক্যাম্পাসের বাইরে যে ছায়াঢাকা পথটি আছে সেই পথে সে হেঁটে যায় তার সহকর্মী পাবলোর সঙ্গে । পাবলো নিজের কথা বলে, নীহার নীরবে শোনে । মনে মনে সে জিওভান্নির উপস্থিতি অনুভব করে । সেদিন ডিনারে একজনের সঙ্গে আলাপ হল । সোফিয়া । বায়ো ফিজিক্সের মেয়ে । ভারি ভালো মেয়ে । তার বাড়িও ফ্লোরেন্সে । জানা গেল কিছুদিন পরেই সে ফ্লোরেন্স যাবে বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে । নীহার স্থির করলো সেও ফ্লোরেন্স যাবে । সোফিয়ার সাথে ভাব জমালো । তাকে নিজের মনবাসনা জানালো । জিওভান্নির কথাও বললো । মুচকি হেসে সোফিয়া বলে- সো ইটস্ আ ডটকম লাভ ? ফ্লোরেন্স যাবার একজন সঙ্গী পেয়ে সোফিয়াও খুশি । সেদিন বিকেলে কাফেটেরিয়ার পাশে রোজমেরী গাছের নিচে বসে নীহার । কল্পনার সেই নায়কের হাজারো ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায় । আগের দিন রাতে ওর ফোন এসেছে। কথা হয়েছে । সে জানিয়েছে যে সে ভারি ব্যস্ত । কিছুদিন পরেই সময় করে দেখা করবে । নীহার তাকে ফ্লোরেন্স যাবার প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই বলেনি । ম্যাপেল গাছের পাতাঝরা পথ ধরে ওম্ ওম্ রোদে, হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় এক একটি ক্ষণ যেন এক একটি যুগ । সেই সোনাঝরা সন্ধ্যা কবে আসবে ? কবে সে আসবে ? যেখানেই হাত দেবে ফুটে উঠবে বসন্ত? জিওভান্নি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো ?

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে ---------গুনগুনিয়ে ওঠে নীহার ।

নিজের অজান্তেই কখন জিওভান্নি তার এত অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে কৈ টের পায়নি তো !

আজ ওকে একটা আন্না আখমাতোয়ার কবিতা ই-কার্ড পাঠিয়েছে । অনেকে বলেন রুশ সাহিত্য ব্লান্ট হয় । নীহারের বেশ লাগে । চায়কোভস্কি তার প্রিয় কম্পোজার । সোয়ান লেক যে কতবার শুনেছে, আচ্ছা জিওভান্নির সঙ্গেও নিশ্চয়ই একদিন শুনবে । হাঁসের পাখায় জলের তান ।

এসে গেল সেই কাঙ্খিত উইকএন্ড । সোফিয়ার সঙ্গে পৌঁছে গেল ফ্লোরেন্স । এতদূর তো চলে এসেছে কিন্তু এখন খুব লজ্জা করছে । একটু কুন্ঠাও বোধ করছিল । সবকিছুকে ছাপিয়ে এক অদ্ভূত ভালোলাগায় মন ছেয়ে ছিল এই অচেনা আপনজনের জন্য ।

সোফিয়ার বাবা স্যান্টিনো । পেশায় শল্যচিকিৎসক । মা রুখামা একজন ভাস্কর । ভদ্রমহিলার মিউজিয়ামে যাতায়াত আছে । কথায় কথায় জিওভান্নির কথা উঠলো । রুখামা বললেন যে ওকে ভালো করেই চেনেন। জিওভান্নির দ্বিতীয় স্ত্রী রুখামার একজন ক্লায়েন্টের মেয়ে ।

- দ্বিতীয় স্ত্রী ? চমকে ওঠে নীহার ।
- হ্যাঁ, জিওভান্নি খুব অ্যালকোহলিক হয়ে পড়ায় বৌকে বেদম পেদাতো। তাই দ্বিতীয়বারও ওর ডাইভোর্স হয়ে যায় ।

নীহারের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম । চোখে ঝাপ্‌সা দেখছে । মাথাটা কেমন ঘুরছে । কি বলছেন রুখামা ? ওর অবস্থা দেখে সোফিয়া ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলে- রিল্যাক্স ।

নীহারের আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই । মনে হচ্ছে পড়ে যাবে । আস্তে আস্তে সে সোফার ওপরে এলিয়ে পড়ে । ডুবে যায় চিন্তায়, গভীর চিন্তায় । সোফিয়ার গলার স্বরে চিন্তায় ছেদ পড়ে ।

-- সো ইউ ওয়ান্ট টু মিট হিম ওর নট ?

কয়েকমূহুর্ত কিছু ভাবলো নীহার । তারপরে হিমশীতল কন্ঠে বলে উঠলো -- ইয়েস ।

শেষ অঙ্ক এই রকম :

নীহার ও সোফিয়া একটি ছোট বসার ঘরে অপেক্ষারত । জিওভান্নিকে খবর দেওয়া হয়েছে । এখন গোধূলি । মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে । কয়েকজন চিনা বা জাপানি পর্যটক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছে । এমন সময় জিওভান্নির মঞ্চে অবতরণ । ঠিক সেইরকমই চেহারা । অপরাহ্নের আলোয় বড় মায়াময় লাগছে তাকে । বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল । কুশল বিনিময়ের পর সোফিয়া বেরিয়ে গেল ।

জিওভান্নি নীহারের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে -- হঠাৎ এইভাবে চলে এলে যে ?

- তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে ।
- চলো কোথাও বসা যাক ।
- --কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে । জরুরী কথা ।
- এসেই তো গেছো । এত তাড়ার কি আছে ? পরে কথা হবে ।

– হ্যাঁ, এসে গেছি কিন্তু আগে তো জানতাম না যে তুমি দু দুবার বিয়ে করেছো ! তাহলে হয়ত দেশ থেকেই আসতাম না । স্বজন পরিজন ছেড়ে কেন এখানে এসেছি, তুমি বোঝো না ? আ-- আমাকে তো একবারো বলোনি যে তুমি বিবাহিত ।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে জিওভান্নি । তারপর বহুযুগের ওপার হতে বলে ওঠে -- কিন্তু আমি তো এটাও বলিনি যে আমি অবিবাহিত, তুমি এতসব জানলে কি করে ?

নীহার, রুখামার কথাগুলো তাকে জানায় ।

সব শুনে মৃদু হেসে জিওভান্নি বলে -- এই তিরিশ বছর বয়সে তুমি একজন ভার্জিন এটা আমাকেও সমান অবাক করেছে নীহারিকা । প্রোব্যাবলি ইট্ হ্যাপেনস্ অনলি ইন ইন্ডিয়া ।

চল কোথাও বসা যাক, অন্ধকার হয়ে আসছে । তুমি চাইলে আমি আর কোনদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো না । এ্যাম সরি -- লজ্জিত জিওভান্নি শান্তভাবে কথাগুলো বলে ।

আন্তর্জালের মাধ্যমে যেমন অনেক অচলায়তন ভেঙে যায় সেরকম কখনো কখনো চলে আসে অবিশ্বাসী ঝড় ।

– কি হল যাবে না ? জিওভান্নির কোমল আহবান ।

সেই আহবানকে অবহেলা করা যায়না, নীহারও পারে না।

– চলো কোথায় নিয়ে যাবে, আমি তো কিছুই চিনিনা ।

জিওভান্নির কাছে কিছুদিন কাটিয়ে নীহার ফিরে আসে মিলানে । একসঙ্গে খাওয়া, বেড়ানো, গল্পগুজব করা ভালই কাটলো দিনগুলি । ফেরার সময় খুব মন খারাপ লাগছিল ।

তবু তো আসতেই হবে । ফিরে এসে একাকিত্ব কাটাতে ডুবে গেলো বইয়ে । লাইব্রেরীতে ।

একদিন হঠাৎ একটি মিউজিয়ামের ওপরে বই পড়তে গিয়ে নীহার বাকশুন্য হয়ে গেল । চোখের পাতা পড়ছে না । বার বার লেখাটি পড়ছে, ঠিক দেখছে তো !

*প্রায় ২০ বছর আগে ফ্লোরেন্সে একটি মিউজিয়ামে কাজ করতো জিওভান্নি নামে এক যুবক । তার একমাত্র শখ ছিল দেশ বিদেশের বন্ধু পাতানো, বিশেষ করে ভারতবাসীদের খুবই পছন্দ করতো সে। অনেক পত্রবন্ধু ছিল তার । একদিন অ্যালকোহলের নেশায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা যায় ।*

হতভম্ব নীহারিকা ছুটে যায় বায়োফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে । সোফিয়াকে খবরটি দিতে । কিন্তু কোথায় সোফিয়া ? খোঁজ নিয়ে জানা যায় সোফিয়া নামে একটি ছাত্রী ছিল বটে কিন্তু সে বহুদিন আগে পড়তো । বর্তমানে কোন সোফিয়া ঐ ডিপার্টমেন্টে পড়ে না ।

এক অচেনা অন্ধকারে নীহার হারায়, নীহার হারিয়ে যায় ।

# প্রিয়দর্শিনি

প্রযত একজন স্রষ্টা । জলরং তেলরং এর রূপকার । রং তুলি তার নিত্য সঙ্গী । বোহেমিয়ান প্রযতের ঠিকানা আজ এখানে কাল ওখানে । বর্তমান যুগে মানুষ যেখানে অহর্নিশি ছুটছে ও সেখানে এক ব্যাতিক্রম। নিজেকে সে ভবঘুরে বলতেই বেশি ভালবাসে।

আজকাল সে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকে । বিভিন্ন জায়গায় তাঁবু ফেলে । মনের মতন ছবি আঁকা হলে শহরে ফিরে প্রদর্শনী করে । কিছু বেশ চড়া দামে বিক্রী হয় । তারপরে আবার বেরিয়ে পড়ে, নিরুদ্দেশে । ইদানিং দেশের প্রথম সারির শিল্পীদের সঙ্গে প্রযতের নাম উচ্চারিত হচ্ছে । সতীশ গুজরাল, অর্পনা কাউর, অঞ্জলি এলা মেনন, অতুল ডোডিয়া, মনজিৎ বাওয়া, প্রযত মুখার্জী - ! ভালোলাগে, খুব ভালোলাগে । নিজের সৃষ্টি সমাদৃত হলে কার না ভালোলাগে ?

আপাততঃ প্রযত চিত্রকলার মৌতাতে মেতে রামগড়ে আস্তানা গেড়েছে। পাহাড় ঘেরা এই অঞ্চলে আছে ছোট ছোট কিছু গ্রাম ও ভিমাকালীর বহু পুরাতন মন্দির । ভারি সুন্দর মন্দির । প্রযত প্রকৃতির পূজারী । চিরাচরিত পুজো অর্চনা সে মানেনা । মন্দিরটির গঠনশৈলী তাকে আকৃষ্ট করেছে । ইতিমধ্যেই সে বেশ কিছু ছবি এঁকে ফেলেছে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে । এছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তো আছেই । গ্রামের বেশ কিছুটা দূরে সে তাঁবু গেড়েছে । এদিকে লোকজন বড় একটা আসে না । দিনের বেলা গ্রামে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে আনে । একটি খাবারের ছোট দোকান আছে সেখানে কথা বলে এই ব্যবস্থা করেছে । একজন মানুষের কিইবা খাবার লাগে আর প্রযত অত ভোজনরসিকও নয় । সে শিল্পরসিক । দুচোখে শুধু ছবির নেশা । সূর্য ডোবার পরে নেমে আসে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, তারপর রাত । দূরের গ্রামের কুটিরে আলো জ্বলে ওঠে । পূর্নিমা হলে তো কথাই নেই । মায়াময় হয়ে ওঠে চরাচর । তখন শুধু ছায়া সংলাপ শোনা যায় । শোনা যায় তারা কেমন আলোর বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে । মেঘের আড়ালে মুচকি হাসে চাঁদ । ধবল জোৎস্নায় প্রযত একা হেঁটে বেড়ায় বাগমতী নদীর ধারে । ছোট ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তীরে । মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের রুপালী আলো তরঙ্গমালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় । প্রযত মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। গোটা কয়েক নৌকো নোঙর ফেলেছে । মাঝিমাল্লা চড়ায় কাঠকুটো জোগাড় করে রান্না করতে ব্যস্ত । গরম ভাতের গন্ধ ভেসে আসছে । ভেসে আসে খয়েরি ডিঙার পাল তোলা গান-- ওরে মাঝিরে মাঝিরে কোথাও ভাসি-----! মনে ঝিলমিল লাগে । চাঁদভাসি রাত মুগ্ধপ্রাণ স্রষ্টার বক্ষলগ্ন হয়ে কেটে যায় বাগমতী কূলে । আসমানের রং ফিরে আসার পর প্রযত ফেরে নিজের তাঁবুতে ।

প্রযতের তাঁবুর কাছে অন্য তাঁবু পড়েছে । ওরা পথভোলা যাযাবরের দল । । নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায় । যেখানে মন লাগে ছাউনি ফেলে বসে পড়ে । কিছুদিন থাকে আবার নিরুদ্দেশে যাত্রা করে। সেদিন প্রযত তাঁবুর পেছনে বসে সিগারেট খাচ্ছিল । হঠাৎ একটা মধুর শব্দে চেয়ে দেখে রং চং এ পোশাক পরা একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ওর তাঁবুর ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ।

– কি চাই ? প্রযতের গম্ভীর গলা শুনে মেয়েটি এক লাফে পালিয়ে গেলো । নিঃশব্দে, ঠিক যেমনভাবে এসেছিল।

এরপরে বেশ কয়েকবার দেখেছে । গোধুমবর্ণা, কোমড় ছাপানো ঘন কালো চুল, ঢলঢলে মুখ । চলনে বলনে মধুক্ষরিত হয় । একদিন ডেকে নাম জিগেস করলো - কি নাম তোর ?

- সাঁঝ ।
- বাহ্ ! চমৎকার নাম তো । কোথায় থাকিস?
- আমি বানজারাদের মেয়ে গো !

ঠিকই আন্দাজ করেছিলো প্রযত । এরপরে ঘন ঘন আসা যাওয়া । প্রযতের নাম হল ছবিবাবু । ও যখন ছবি আঁকে মেয়েটি একমনে বসে দেখে । আলাপচারিতা গাঢ় হয় । কোন কোন রাতে মহুয়ার মৌতাতে প্রযত রং তুলি নিয়ে আঁকতে বসে । সাঁঝের ছবি আঁকে । শুধু চোখ বা এলোকেশ কিংবা শুধুই খাড়ু পরা পদযুগল । সাঁঝ চুপটি করে বসে থাকে । অন্যসময়ও । অন্য সময়ও যখন প্রযত অন্যান্য ছবিতে টাচ দেয় সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে । ভারি উৎসাহ তার ছবির ব্যাপারে । ইতিমধ্যে প্রযত কয়েকবার ঘুরে এসেছে বানজারাদের ডেরা থেকে । ছবিবাবুকে সবাই খাতির করে । বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে ওদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে ওরা নানান ছবি উপহার হিসাবে পায় বিশেষ করে বাচ্চারা ।

প্রযতের খুব ইচ্ছা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসার মতন অমর সৃষ্টি করে । কিন্তু তার মোনালিসা হবে নগ্নিকা । প্রযত এর আগে কোনদিন নগ্ন নারী আঁকেনি । আর্ট কলেজে যদিও nude স্টাডি করেছিল কিন্তু পূর্ণ চিত্র হিসেবে কোনদিন আঁকেনি।

এক অপরাহ্নের আলোতে যেন মনে হল সাঁঝ তার মোনালিসা । সাঁঝের মুখে একই সঙ্গে আছে আনন্দ, অভিমান, লজ্জা ও অনুরাগের শেড । একটি পূর্ণ প্রতিমূর্তি । সূর্যের লালিমা সাঁঝের মুখে এসে পড়েছে । অপরূপ এক স্বর্গীয় প্রতিমা মনে হচ্ছে তাকে । প্রযত তার মোনালিসা পেয়ে গেছে । লোভ হয়, এক্ষুনি ক্যানভাসে একটি তুলির টান দেয় । তাকে চিত্রিত করে । কিন্তু নিজের সঙ্গে একটা যুদ্ধ করতে হচ্ছে । আগে কোনদিন নগ্ন নারী আঁকেনি । পারবে কি সে ? স্থূলতা, অশ্লীলতাকে ছাপিয়ে একটি নিষ্পাপ, সুন্দর নারীর প্রতিমূর্তি আঁকতে ? পারবে কি তার সমালোচকদের চমকে দিতে ? এই নিয়ে একটা দ্বন্দ চলছে অন্তরে । অনেক ভেবে তবেই কাজ শুরু করবে। এ তার স্বপ্নের ছবি। সে চায়না কোন আঁচড় লাগুক তার সৃষ্টিতে, কোন কালিমা । নির্মল এক চিত্র তৈরি করতে চায় সে ।

- ছবিবাবু তুই আমার ছবি আঁকবি ?
- হ্যাঁ আঁকবো, কদিন সময় দে।
- কেন ? এখন আঁক ।
- আঁকবো রে, আঁকবো আমাকে কটা দিন ভাবতে দে।
- তোরা খালি ভাবিস । তুই ভাবিস, আমার বাপু ভাবে -- সবাই ভাবে ---আর আমি গান গাই ! বলে সাঁঝ গান ধরে---ওদের ভাষায় । --এ গানের মানে কি? প্রযত শুধায় ।
- এ পিরিতের গান, বলে সাঁঝ হেসে মাটিতে ঢলে পড়ে ।
- জানিস ছবিবাবু তুই আমাকে যেই ছবিগুলো দিস সেগুলো আমি বাপুকে দেখিয়েছিলাম । বাপু খুব খুশি হয়েছে ।

একজন খুব নামি আর্ট ডিলারের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রযতের পুরনো বন্ধু এরা। একটি বিশেষ ছবি চেয়েছে। বিদেশে কোন এক মালদার ক্লায়েন্ট একটি ইউনিক ছবির জন্যে ফরমাইশ করেছেন।

প্রযত তার মোনালিসা আঁকার পরিকল্পনা করে।

পরদিন সাঁঝ আসতেই সে ছবি আঁকার বাসনা জানায়। সাঁঝ খুব লজ্জা পায়। পাবেই। কোন পুরুষের সামনে এই প্রথম সে বস্ত্রহীন হবে। কিন্তু ছবিবাবুর কথা সে ফেলতেও অক্ষম। প্রথমে নানান টালবাহান করে অবশেষে রাজি হয়। কিন্তু শরীরের শেষ কাপড়খানি খুলে ফেলার সময় লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে। বাইরে অঝোরে ধারায় বৃষ্টি। বাতাসে হিমগন্ধ। সাঁঝ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে। এই মেঘকালো দিনেও তার চিবুক থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত এক হালকা গোলাপী আভা খেলা করছে। সাঁঝ তো নগ্ন নয়! এক স্বর্গীয় আলোর আবরণে সে ঢাকা পড়ে গেছে। অনাবিল সেই রূপ।

প্রযতের ক্যানভাস মুখরিত তুলিরেখায়। পরম মমতায়, নিপুন দক্ষতায়, এক একটি তুলির টানে বেশ কয়েকটি সিটিং এ সৃষ্টি হয় এক অনন্য নারীর অবয়ব। স্রষ্টার জাদুকাঠির ছোঁয়ায় এক অপূর্ব চিত্রকলার জন্ম হয়েছে। কি নির্মল মুখখানি! এই নারী অনিন্দিতা, শুচিস্মিতা। কিন্তু একি! শিল্পী তার অকৃপণ হাতে, সবটুকু সুধা দিয়ে যেই ছবিখানি এঁকেছেন তার সঙ্গে তো বানজারা তনয়া সাঁঝের কোন মিল নেই। কে এই রূপসী? কে? তার অমল রূপের বিভা, মাধুর্য চারপাশ আলোকিত করে তুলেছে। ভুবন নতুন রসে ভরে উঠেছে। আর্ট ডিলার মিঃ নাগপাল খুব খুশী ছবিটি দেখে ---কি এঁকেছেন প্রযত বাবু! আপনার স্বপ্নের মোনালিসা তো কালজয়ী চিত্রে পরিণত হবে। এ আপনার প্রিয়দর্শিনি।

- বাহ্! প্রিয়দর্শিনি! ভারি সুন্দর নাম তো। আপন মনেই বলে ওঠে প্রযত। খুব খুশি হয়। তবুও নিজের মনের ভাব গোপন করে বলে ওঠে --- কি যে বলেন আপনি। আগে ক্লায়েন্ট পছন্দ করুন তারপর তো। আমাদের মতন সৃষ্টিশীল মানুষদের সৃষ্টি করেই আনন্দ। জীবন চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয় ঠিকই তবে স্রষ্টা সবার আগে তার গুণের কদর চান।
- সে আপনি বিলকুল সাচ বলিয়েছেন। মিঃ নাগপাল হেসে ওঠেন।

প্রযতের স্বপ্নের চিত্রায়ন প্রশংসিত হবেই। সাঁঝ জানে। ছবিবাবু কত শখ করে এটা এঁকেছেন। পরম মমতায় সে ছবিটিতে হাত বুলায়।

প্রযত একমনে দেখছে, এ তো কোন নারীর অবয়ব নয়, এ এক নির্মল চেতনা, নিষ্পাপ সত্ত্বা। শ্বেতপদ্মের মতন স্তনযুগল, নাভিমূলে সমুদ্রের গভীরতা, জঙ্ঘায় উত্তরফাল্গুনীর মায়াবী আবেশ। এ এক নীলাম্বরীহীনা মনস্বিতা, এক পারিজাত পুষ্প। এ কামাগ্নির উৎস নয়, যেন এক উজ্জ্বল আলোর পাখি, যে উথালপাথাল ঢেউয়ে শান্তির বার্তা আনে, তারপরে চেতনাকে চিত্ররেখা ডোরে বেঁধে হারিয়ে যায় দিকচক্রবালে। প্রযত দেখছে। দেখছে নগ্নতার আড়ালে এক অবিস্মরনীয় সৃষ্টিকে। সাঁঝও দুচোখ ভরে দেখছে। দেখে দেখেও চোখ সরাতে পারছে না।

এ যে স্বপ্ন অনাবিল।

অনেকদিন পরে প্রযত শহরে কিছু রং তুলির সন্ধানে গেছিলো। ফিরতে কিছুদিন দেরী হয়। রামগড়ে পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গেল। শ্রান্ত শরীরে তাঁবুতে ফিরে এসে দেখে-একি! তার

তাঁবু তচনচ করা, সব লন্ডভন্ড । ছবিগুলো জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে কেউ । ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে এখানে সেখানে । সারা তাঁবুতে এক অদ্ভূত নিঃস্তব্ধতা । কারা করলো ? কেন?

আঁতকে ওঠে এক বেদনা বিদুর শিল্পী । কারা করলো এমন কাজ ? কাগজ ও ক্যানভাসের দগ্ধাবশেষ চারিদিকে ছাড়ানো । বুকভাঙা আর্তনাদ করে ওঠে প্রযত ।

- ওরা সব জ্বালিয়ে দিয়েছে গো ছবিবাবু ।
- চমকে ফিরে তাকায় প্রযত । পেছনে কালো চাদর গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যাযাবর তনয় মংলু ।
- ওরা কারা ? প্রযত কঁকিয়ে ওঠে ।
- সর্দার ও তার লোকেরা ।
- কিন্তু কেন ?

সর্দার বলছিলো যে ছবিবাবু মন্দ লোক । ছবিবাবু কি সব নোংরা ছবি আঁকে। জিসমের ছবি, নাঙ্গা অউরতের ছবি এঁকে বাজারে বিকাতে চায়, নষ্টামী করে । ছবিবাবুকে আমরা সাজা দেবো। আমাদের মেয়েদের নিয়ে খেলা করতে চায় । খেলা করা বার করবো।

প্রযত ধপ করে বসে পড়ে । মাথায় হাত বুলাতে থাকে । নোংরামো, নষ্টামী, খেলা --- শব্দগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে । সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন আঁছড়ে পড়ছে তার ওপর। সেই ভার সইতে পারছে না --- হায় হায় ! সব গেলো, তার স্বপ্ন, মিঃ নাগপালের ফরমাইশ । কালই তো এটি নিতে আসার কথা তাঁর । প্রযত বিভ্রান্ত, এলোমেলো । স্তূপাকৃতি করে রাখা ছবির দগ্ধাবশেষের পাশে বসে একমনে সে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। হা! ঈশ্বর । এইপ্রথম ঈশ্বরের নাম নেয় । কিন্তু কি লাভ যা গেছে তা কি ফিরে পাবে ? পাওয়া যায় ?

যাযাবরের দল এসে প্রযতের অবর্তমানে ওর তাঁবুতে তাদেরই দলের এক নারীর নগ্ন মূর্তির স্কেচ দেখে প্রচন্ড রাগে ও বিরক্তিতে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে । এই তাহলে ছবিবাবুর আসল রূপ । আর বাইরের জগৎকে দেখায় যেন সে এক মহামানব ।

প্রযত মাথা নীচু করে বসে থাকে । সব হারানোর বেদনা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । প্রযত হারিয়ে যাচ্ছে এক মহাশূন্যতায় । বিষন্নতায় । ডুবে যাচ্ছে হতাশায় । বানজারারা শুধু নগ্নতাটাই দেখেছে ! কি স্বর্গীয় আভা নির্গত হচ্ছে সেই নারীর মুখ থেকে । কুশ্রীতা থেকে কি করে জন্ম নেবে এই অপার্থিব সৌন্দর্য ? যে নিজে প্রযত সে কি করে আঁকবে পাপচিত্র ? এই নগ্নতা অশ্লীল নয়, এ নারীকে প্রকৃতি রূপে আবাহন । তার সুনির্মল সুষমায় অবগাহন । দেহের গন্ডী ছেড়ে এই নারী মিশে গেছে অনন্তে । বিশ্বচেতনার সঙ্গে । এই ছবির কোন লিঙ্গ হয়না । এ একান্তই প্রকৃতির অর্চনা। কিন্তু কেউ বুঝলো না, সবাই স্থুল ভাবেই বিচার করলো। বিমর্ষ প্রযতের দু চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে । ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে দরদী শিল্পীর মরমী মন । প্রযত কেঁদেই চলেছে, গুলমোহর গাছটার নীচে বসে সে কাঁদছে । হঠাৎ পিঠে একটা আলতো ছোঁয়ায় অশ্রু সজল চোখে ফিরে তাকায় । লিটন, বানজারাদের ছেলে । হাতে ধরা একটা ছবি ।

- কি ব্যাপার লিটন ?
- ছবিবাবু, সাঁঝ এই ছবিটা আগেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গোলমালের আশঙ্কা করে। কারণ আপনাকে আর সাঁঝকে নিয়ে গোলমাল বহুত দিন ধরেই । ও আপনাকে এটা ফেরৎ দিতে বলেছে । আমাদের দলের ওরা সব জ্বালিয়ে দিয়েছে । রং করা ছবিতো পায়নি, পেন্সিল

দিয়ে আঁকাটা দেখেই চটেছে । ওরা সদলবলে এসেছিল । কুৎসিত গালিগালাজ করেছে । তাদের চোখে আগুন জ্বলছে, - ছবিবাবু মেয়েছেলে নিয়ে লেংটা ছবি বানাচ্ছে, শালা হারামী । নোংরামো হচ্ছে, এ্যাঁ ? বানচোতের টুঁটি টিপে দেবো । সেজে থাকে যেন বিল্লী, শালা মানুষখেকো বাঘ ।

– সাঁঝ কোথায় ? প্রযতের স্বরে উৎকন্ঠা ।

– সাঁঝকে ওর বাপু বেদম পিটিয়েছে কাল রাতে । সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । তবে একজন ওকে বাগমতীর তীরে যেতে দেখেছিল ।

– বাগমতীর তীরে ? মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রযত উত্তরের অপেক্ষা না করেই হনহনিয়ে রওনা দিল নদী কিনারে ।

– সাঁঝ, তুই কোথায় সাঁঝ ? ফিরে আয়, দেখে যা আমার প্রিয়দর্শিনিকে আমি ফিরে পেয়েছি । সাঁঝ রে এ এ এ !

নাহ্ ! কোন সাড়া আসেনা । নদীর জলে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ডুবে যায় প্রযতের হাহাকার । সূর্যের শেষ রক্তিমায় লিটনের ছবিটি নিয়ে অপার্থিব আলোয় মেলে ধরে সে । মায়াবী আলোয় নগ্নিকা হয়ে ওঠে অমৃতা । অনন্যসুন্দর । তার প্রিয়দর্শিনি ক্যানভাসের সীমা ছাড়িয়ে অসীমে বিলীন হয়ে যায় । একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ছবিটির মধ্যে খুঁজে পেতে চায় সাঁঝকে । যাকে ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, পাওয়া যায় না । সে থাকে শুধু অনুভবে, চেতনা জুড়ে। মহাবিশ্ব নামক আলো আঁধারির খেলায়, অসূর্যম্পশ্যা প্রথম আলো হয়ে ।

আজ কদিন যাবৎ প্রযত বাগমতীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছে এক অজানা গ্রামে। খিদে, তৃষ্ণা এইকদিন যেন একবারো টের পায়নি । মনে দু:খ, বেদনা, রাগ জমা হলে খিদে, তৃষ্ণা হারিয়ে যায় । শুধু সে হেঁটেছে । গভীর চিন্তায় মগ্ন । এক হাতে ধরা ক্যানভাসটি। উসকো, খুসকো চুল । এক বিষন্নতার প্রতিমূর্তি ।

ঘাটে পা ডুবিয়ে বসেছিল । একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল । বড় ক্লান্ত সে। কে যেন হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল- বাবু কিসু খাবেন ? ঘুরে দেখে একটি শীর্ণকায় লোক মিটিমিটি হাসছে ।

– তুমি কে ? প্রযত কৌতুহলী ।

– আমি আপনারে দেকসি রামগড়ের ওদিক পানে । আপনি ছবিবাবু তাই না?

– হ্যাঁ, কিন্তু ---

– আপনি আসেন আমার সঙ্গে ।

পা চালিয়ে লোকটির সঙ্গে প্রযত চলেছে । কোথায় জানেনা । দূরে দেখা যায় একটি ছোট্ট তালপাতার ছাউনি । লোকটি হাতের ইশারায় ডাকে, ভেতরে ঢুকে যায় প্রযত । একটি মেয়ে শুয়ে আছে । একটু লজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে । তখন লোকটি বলে ওঠে--ও সাঁঝ, কাসে গিয়া দেখেন।

সত্যি তো, সেই মেয়েই তো ! প্রযত চমকিত, খুশীতে বিহ্বল - ও, এখানে এলো কি করে ?

– নদীতে ডুব দিসিলো, এক সন্ন্যাসী বাঁচাইসেন । উনি এখানে রেখে গেসেন ।

এ কি স্বপ্ন না বাস্তব ? প্রযত কথা হারিয়ে ফেলেছে । ও জানে না কি বলবে, কি বলা যায়, শুধু এক অপার্থিব আনন্দে তার হৃদয় আপ্লুত ।

ইতিমধ্যে মাঝি কিছু খাবার এনে হাজির করেছে । সামান্য কিছু জল দেওয়া ভাত ও আলু সেদ্ধ ।

– বাবু খেয়ে নিন, আপনারে খুব ক্লান্ত দেখাইসে।

প্রযত খেয়ে নেয়, খিদে পেটে এই ভাতই অমৃত মনে হয় । খাবার পরে ক্লান্তিও নিমেষে উধাও।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই সাঁঝ উঠে বাইরে আসে। প্রযতকে দেখা মাত্রই ভীষণ চমকে যায়,

– ছবিবাবু তুই এখানে ?

প্রযত হাসে, হ্যাঁ ।

– তোর ছবি কৈ রে ?

দূরে যেখানে হাঁস মুর্গি খেলা করছে সেখানে দরমার গায়ে হেলান দেওয়া ক্যানভাসটার দিকে আঙুল তুলে দেখায় ।

– সাঁঝ ছুট্টে যায়, সে এক অদ্ভূত পদচারনা, কতকটা চঞ্চল, কিছুটা ক্লান্ত, অবিনস্ত্য । ছবিটিকে ছুঁয়ে দেখে, একবার নয় বারবার । হাতে, মুখে, মাথায় ছবিটি ঠেকাচ্ছে সে।

প্রযত মুগ্ধ চোখে দেখছে । এমনসময় এক বৌদ্ধভীক্ষু এসে প্রবেশ করলেন সেই পর্ণকুটিরে ।

এক পথহারা পথিককে দেখে একটু আশ্চর্য হলেন । প্রযত এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল।

শ্রমণ হাসলেন । ওদের কথোপকথনে সাঁঝ ঘুরে দাঁড়িয়েছে । ধীর পায়ে এগিয়ে আসে সে। দূর থেকে ভেসে আসে স্তোত্র : *বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সজ্ঘম শরণং গচ্ছামি* ---

আরো বড়, দশ বারোজনের একটি দল এসে প্রবেশ করে চত্বরে । মহাভীক্ষু সেই দলের সঙ্গে কিছু কথা বলার পরে দলটি আবার পথে নামে । বৃদ্ধ শ্রমণও যোগ দেন । আবার শুরু হয় অন্তহীন পথচলা --- *ধর্মং শরণং গচ্ছামি* --- সাঁঝ চোখ মুছে দলে যোগ দেয়, অস্ফুটে কিছু বা বলতে চায় কিন্তু প্রযত নীরব থাকে । সে জানে প্রিয়দর্শিনি ক্যানভাসের সীমা অতিক্রম করে অসীমের মাঝে মিলিয়ে গেছে । এই অস্মিতা মহাকালের গহ্বরে অন্তর্লীনা । তাই একদৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকে কালোত্তীর্ণ সেই পথপানে ।

# প্রত্ন

আয়ুষী একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার। মাত্র দুটি ছবি তৈরি করেছে সে তার মধ্যে একটি লোকচিত্র নিয়ে, অন্যটি পুরনো মন্দির নিয়ে।

দ্বিতীয় ছবিটি সাড়া ফেলায় ও পুরনো মন্দিরের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে ছবি করতে এসেছে মন্দির শহর মাদুরাইতে।

মীনাক্ষী মন্দিরে কিছুটা সময় কাটিয়ে চলে এলো অন্য এক গ্রামে। দক্ষিণে তো মন্দিরের ছড়াছড়ি।

প্রতিটি পথের বাঁকে একটা করে মন্দির রয়েছে।

ও এলো উদানগড়াই, আধাশহর আধা গ্রাম পেরিয়ে প্রশস্ত মাঠের পাশে পাথরের মন্দির খানি।

কালচে রং, পুরনো ধাঁচের গড়ন। অপূর্ব স্থাপত্য। শুধু শিল্প রসেই মন ভরে ওঠে।

এটি কৃষ্ণ মন্দির, ওরা বলে গোপালন এর মন্দির। পেছনে লাল রঙের ধূসর পাহাড়। মন্দিরটি বাহুল্য বর্জিত। মেঝেতে দই আর চন্দনের ছড়াছড়ি। গেটের পাশে কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ার মিলন ঘটেছে। ফুলে ঢাকা মন্দিরের পথ।

একজন পুরোহিত সপরিবারে থাকেন। পূজা তিনিই করেন। দক্ষিণীরা খুব ধর্ম প্রাণ, ধর্মীয় নিয়ম কানুন খুব কঠোরভাবে মেনে চলে। নিষ্ঠা সহকারে পূজো হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার বিশেষ পূজো হয়। গোপালকে চান করানো হয়। তারপর খাওয়ানো হয়। তবে এইসবই হয় গর্ভগৃহে।

লোকচক্ষুর আড়ালে। তারপর গোপালকে আবার সস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়।

গোপালের মস্তকে একটি চুনী আছে। হংস ডিম্বের মতন তার সাইজ। এটা নাকি চোল বংশের কোন রাজা এই বিগ্রহকে দান করেছিলেন। এছাড়াও আরো গহনা রয়েছে।

বাঁশিটি সোনায় মোড়া। সেই স্বর্ণও দান করেছেন এক রাজা। ইনি পল্লব বংশের।

পল্লব বংশের এক রাণী এই মন্দিরে মানত করে সন্তানবতী হন বলে রাজা সোনায় মুড়ে দেন কৃষ্ণকানহাইয়ার বাঁশরিটি।

এইসব ঘটনা শুনে বেশ উত্তেজিত বোধ করে আয়ুসী। সব কিছুই লেন্সে ধরতে হবে। লোকে জানবে এই অপরূপ মন্দিরের কাহিনী।

দুমাস বয়সের পুত্র আমনকে নিয়ে এসেছে সে শুটিং করতে। আমনের পিতা মেনস্ট্রিম সিনেমার নামী পরিচালক আবদুল্লাহ গেছেন মরিশাসে, যশ চোপড়ার একটি ছবি করতে।

স্বামীর সঙ্গে তার দেখা প্রায় হয়না। দুজন দুজনের কাজে ব্যস্ত। সব সময়ই যেন ওরা ছুটছেন। মাসের মধ্যে কদিন দেখা হয় আর বাড়ি থাকলেও সারাদিনে কটা কথা হয় সেটা ভাববার বিষয়।

আচ্ছা এই গতির কি কোন শেষ নেই? সীমারেখাটা কোথায়? লাস্ট মাইল স্টোন?

আয়ুষীর ইচ্ছে করে এই গতি থামিয়ে দিতে । সারাটা দুনিয়া যদি স্তব্ধ হয়ে যায় কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেশ হবে ।

নিজেকে খুঁজে ফেরে আয়ুষী, বর্ণময় যৌবন শিখরে বসে ।

ভাবতে ভাবতে সে এসে পড়ে মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে । একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, পিচ্ছিল তবে সুড়ঙ্গ মতন । পাথরের দেওয়াল, শ্যাওলা ধরা । আয়ুষী কৌতুহলে এগিয়ে যায় । তারপর শুধুই পথ চলা । চলা আর চলা । শেষে পৌঁছালো এক স্বপ্ন রাজ্যে । অসম্ভব শীতল আবহাওয়া সেখান কার । আর সুন্দর একটা গন্ধে চারিপাশ মো মো করছে । কিসের গন্ধ সে জানেনা । ভারি ভালোলাগছিল যদিও।

ধীরে ধীরে চলতে চলতে এসে পৌঁছালো এক প্রশস্ত প্রান্তরে । থরে থরে পুরনো ভাঙা মূর্তি সাজানো । সবই মেটে রং এর । অন্যপাশে এক বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ । পাতাগুলো কচি কচি । এই আলোহীন জায়গায় এমন কচি পাতা দেখে অবাক লাগে ।

কুলকুল শব্দে একটা সরু নদী বয়ে চলেছে নুড়ি বিছানো নদীর বক্ষটিতে হরেক রঙের নুড়ি ।

আনমনা ভাবেই নদী পেরিয়ে সে চলে গেল ওই পাড়ে । ওদিকটায় আলো আঁধারির খেলা চলেছে । দেখা গেল অদ্ভুত পাথরের কারুকার্য । প্রাকৃতিক উপায়েই সৃষ্ট মনে হল । কোনটা শিব লিঙ্গ, কোনটা হংসপাখা আবার কোনটা সাপের ফনার মতন । মাটিটা একটু ভেজা ভেজা । কত শত সহস্র বছর ধরে এই সব আকৃতি এখানে রয়েছে কে জানে । আয়ুষী মনে করার চেষ্টা করে ইতিহাসে এমন কোন স্থানের কথা পড়েছিল কিনা।

নাহ্ মনে করতে পারেনা । হঠাৎ একটা পাথরের হাতলে হাত পড়তেই মাথাটা কেমন ঘুরে যায় । মনে হয় পড়ে যাবে,আর পড়েও তো যায় । চোখদুটো আবছা হয়ে আসে, নেতিয়ে পড়ে আয়ুষী ।

ঘুম ভাঙলো এক সুন্দর সকালে । চারিদিকে ধানক্ষেত । সবুজ ধান সারি । পাখির কলকাকলি, মিষ্টি ফুলের গন্ধ আর অসম্ভব নিরিবিলি । এ কোথায় এলো সে ? কখনই বা এলো ?

কোন মানুষ দেখা যাচ্ছেনা কোথাও তবে একটা গরুর মতন জন্তু দেখা গেলো । কেমন আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে । চোখদুটো কি করুণ অথচ শান্ত ।

আর পাখিগুলো তো খুব অদ্ভুত ! কি সুন্দর ময়ূরের মতন রঙ, রামধনুর মতন ডোরা কাটা গা গুলো । এ কোন দেশ ? আয়ুষী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে !

চারিদিক কি শান্ত ! স্নিগ্ধ । অপার শান্তি বিরাজমান । এ কোন দেশ গো !

কিছু দুর হাঁটার পরে এলো এক গ্রাম, গ্রাম নয় মানুষের আবাসস্থল । লোকগুলো অনেক খাটো আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে আর দেখতেও খুব সুন্দর । উজ্জ্বল গায়ের রং, তীক্ষ্ম নাসিকা, পেটানো চেহারা । অনেকগুলো মানুষ কাজ করছে একটি ক্ষেতে । ধান ক্ষেত মনে হচ্ছে না, অন্য কোন শস্যর ফলন হয়েছে ।

সাতরঙা প্রজাপতি উড়ছে, ফুলে ফুলে ঢলে পড়ছে তারা ।

আর কি বিচিত্র বর্ণ তাদের । দেখলেই ভালো লাগে ।

সারাটা এলাকা মাধুর্যময় । ভুবন জোড়া আলোর খেলা সেখানে, চন্দনের সুবাস ।

ভারি অবাক লাগছে আয়ুষীর। কেমন করে সে এলো এই অপূর্ব স্থানে ?

একটা পাথরের ফলক চোখে পড়লো। স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা। নীচে দূর্বোধ্য ভাষায় কি যেন লেখা। মনে হয় পালি জাতীয় কোন ভাষা। ঠিক জানা নেই। এই শিলালিপি তার অচেনা।

নীচে কতগুলো লাল লাল আকারের বিবিধ চিহ্ন আঁকা।

এগুলো কি বোঝা যাচ্ছে না, আরে এতক্ষণ তো খেয়াল করেই নি যে তার হাতগুলো এত লালাভ হয়ে গেলো কি করে ? অনেকটা আপেলের মতন লাল। আর এত তুলতুলে হাত ! যেন নরম কোন মাখনের চাকতি। আজব ব্যাপার। কিছুই বুঝতে পারছে না সে !

ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়ায় বড় আরাম হচ্ছে। চোখে মুখে এসে লাগছে সেই বাতাস। শান্ত এই জনপদে এক ঝাঁক মানুষ নিজের মনে কাজ করছে। কারো কোন তাড়া নেই।

গাছে গাছে ফল, ফুল, পাখি। পরিষ্কার নীল আকাশ, তাজা বাতাস, ধূলো নেই ধোঁয়া নেই।

ঐ তো একজন আসছে এইদিকেই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখ দুখানি জাদুময়।

- বাংলাতেই তো বললো- কিছু খাবেন ? ক্ষিধে পেয়েছে না ?

সত্যি তো ক্ষিধে পেয়েছে আয়ুষীর। এতক্ষণ তো খেয়াল হয়নি।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। সেই মহিলাটি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসে একটি মহলে। পাথরের মনে হচ্ছে, পোড়ামাটিও হতে পারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মহলখানি ভারি সুন্দর। রং টা খয়েরি ধরণের। ভেতরে তুলতুলে ফরাস পাতা।

তবে তুলোর নয়, ঘাসের। নরম ঘাসের। শীতল বাতাবরণে একটা বেশ ওম ওম ভাব।

আয়ুষীকে বসতে বললো। মাটির পাত্রে জল দিল। কি শীতল জল। প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। তারপর একটা পাত্র ও পাতায় করে এনে দিল কিছু খাবার।

বেশির ভাগই ফলমূল তবে কিছু সুরুয়া ধরণের বস্তুও আছে। আর আছে টাটকা মোটা রুটির মতন খাদ্য দ্রব্য।

পেট ভরে খেল আয়ুষী। তৃপ্তি করে খেল। বেলা পড়ে আসছে অথচ কারো কোন তাড়া নেই। যে যার মতন কাজ করছে, কেউ বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউবা সরবৎ পান করছে।

আর চারিদিকে এক অপার্থিব আলো ছেয়ে আছে। খুব স্নিগ্ধ।

গোলাপি বিভা।

অপূর্ব মানবটি এগিয়ে এলো, ধীর পায়ে। কিছু কথা হল। মননশীল কথা।

- আপনার ছেলেমেয়ে কটি ?
- পাঁচটি।
- কি করে?
- কেউ পড়ে কেউ কাজ করে।
- কোথায় পড়ে ?

- পাঠশালায়।

পাঠশালা কিছুটা দূরে। সবুজ প্রাঙ্গনে বসে ছেলেপুলেরা পড়ছে। পাখি গাইছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে, ফুলের মধু খাচ্ছে, ঝরা ফুলে ঢাকা পথে শিশুরা লুটোপুটি খাচ্ছে।

সবাই শান্ত, স্নিগ্ধ।

অথচ কি ভীষণ আধুনিকতা চারিদিকে। একটা গাড়ি ধরণের কি এলো অদ্ভূত দেখতে। জানা গেলো এতে করে চাঁদের আলো ফেরি হয়। মানে ? আয়ুষী অবাক। - মানে খুব সোজা, চাঁদের আলো আমরা ধরে রাখি একটি যন্ত্রে। অমাবস্যার রাতে সেই আলো বিচ্ছুরিত হয়ে যায় তাতে করে আর অন্ধকার লাগেনা।

খুব অবাক লাগছে আয়ুষীর। এ কোন দেশে এলো ? কোন জাদুমন্ত্রে ?

তারপরে ওর শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছিল বলে একজন এসে একটি পুরিয়া খেতে দিল, এতে সাত দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না অথচ দেহ সবল থাকবে। বলে গেল সেই মেয়ে।

- এটা কি ওষুধ ? জানতে চাইছে আয়ুষী।

- ওষুধ নয় গো এটা তো একটি খাদ্য, কৃত্রিম ভাবে তৈরি কিন্তু দেহের জন্য ভালো।

মধুমেহ, স্থুলত্ব এইসব রোগে খুব কাজ দেয়।

আয়ুষী বোবা। আয়ুষী হারিয়ে যায় বিস্ময়ের গহ্বরে।

আরো আছে। তিনপেয়ে পাখি। ভারি সুন্দর দেখতে। সামনেটা লম্বা মতন। সিংহের কেশরের মতন পালক মাথার কাছে খুবই মনোরম চেহারা। জানা গেলো এটাও কারিগরি উপায়ে সৃষ্ট। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং। কোন দেশটা গো এটা ?

বিস্ময়ের কি শেষ আছে ? ইচ্ছে মতন ঘুমিয়ে পড়া যায় মাসের পর মাস নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেওয়া চলে একটু না জেগে অনেকটাই কুম্ভকর্ণের মতন। তারপর উঠে ইচ্ছে মতন কাজ করো। কোন অসুবিধে নেই শুধু শোবার পুর্বে একটা ছোট্ট বড়ি খেতে হবে।

বৃষ্টি হলে ভারি মজা। জল ধরে রাখো। তারপর সেই জল আকাশে উঠিয়ে দাও। প্রযুক্তিগত কৌশলে। সেই বৃষ্টি আকাশের গায়ে লিখবে সুখ দু:খের কথা, গল্প। তারপর তোমার ডাকে একদিন নেমে আসবে রঙীন বৃষ্টি হয়ে সঙ্গে সুন্দর সুবাস।

মাসে একবার একটি আকাশ যানে চড়ে মানবেরা যান পিতৃপুরুষদের সাথে দেখা করতে। সে এক অন্য লোক। তবে কাউকে এখানে আনা যায় না, এলেও ওনারা বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

শিক্ষার কনসেপ্ট এখানে আলাদা, পুঁথি মুখস্ত নয়, মন্ত্র জপ করে মনকে শান্ত করে পাঠ নিতে হয়। মনেও থাকে বেশি। আর অদ্ভূত কি জানো কেউ কারো নিন্দে করছে না, কারো বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র নেই কেউ খারাপ ভাষা ব্যবহার করছে না। সবাই মধুর স্বরে বাক্য বিনিময় করে চলেছে। অবিরাম।

এখানে সবার ইচ্ছে মৃত্যু হয়। এখানে কৃত্রিম ভাবে দিনকে রাত করা যায় রাত কে দিন, ঋতু পরিবর্তন হয় নিজের ইচ্ছেই। আর আগুনে কেউ পোড়েনা এমনই এদের দৈহিক গঠন, এমনই বস্তু দিয়ে এরা সৃষ্ট। আজব দেশ সন্দেহ নেই।

আয়ুষী জেগে আছে তো ?

হ্যাঁ জেগেই তো আছে, এই তো দিব্যি জেগে আছে সে । তাহলে ?

আসলে ও এক অন্য কোন যুগে পৌঁছে গেছে । অন্য এক সভ্যতায় । যেখানে মানুষেরা অন্যরকম, অনেক উন্নত কিন্তু শান্তিময় জীবন যাপন করেন ।

এখানে যে কেউ যা ইচ্ছে করতে পারেন । ইচ্ছে হলে গাইছেন, নাম করছেন, অন্য একজন হয়ত গাইতে পারেন না তিনি কিন্তু তাতে ঈর্ষাকাতর হচ্ছেন না । দিনের মধ্যে কিছুটা সময় ধ্যান করে নিয়ে ধীরে ধীরে এক অদ্ভুত ক্ষমতা বলে উনিও গাইতে পারছেন ।

এরা বলেন সহজ সমাধি । আসলে এরা কেউ তো তাদের দেহের ওপর নির্ভরশীল নন ।

এরা যখন তখন দেহ ত্যাগ করেও বেঁচে থাকতে পারেন । ইচ্ছে হলে হয়ে যেতে পারেন পাখি, মৌমাছি কিংবা হরিণ । অবশ্য এই সব জীব জন্তু পোকামাকড় সবই অন্যরকম দেখতে আমাদের চেনা জীবেদের চেয়ে । আরো উজ্জ্বল আরো প্রাণবন্ত । অথচ কি ভীষণ সমাহিত।

এই জগতে খেয়োখেয়ি নেই, হানাহানি নেই, উগ্রপন্থা নেই । কারণ অহং সর্বস্ব দুনিয়া নয় তো । সবাই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, সবার জন্য সব কিছু রয়েছে ছড়ানো । অনেকটা নাটকের রঙ্গমঞ্চের মতন । যার যখন খুশি যে কোন ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে । নাটক ক্রমাগত অভিনীত হচ্ছে আর হচ্ছে । শুধু পুতুলেরা বদলাচ্ছে ।

এখানে জলহাওয়া বিষাক্ত নয়, মাটি উর্বর, শস্যশ্যামলা, আকাশ নীল, মেঘস্তম্ভ গভীর, পাহাড় ঘাস সবই উদার, নেই কোন দৌড়ঝাঁপ, ব্যস্ততা, কোন্দল । ঘাসপোকারা বুদ্ধিমান, মানবেরা সীমায় বাঁধা প্রকৃতি ।

ইচ্ছে হলে মানবী হয়ে উঠছে বৃষ্টি, মেঘলা আকাশে দুরদেশে দয়িতের অঙ্গে ঝরে ঝরে পড়ছে।

ইচ্ছে করলে সকলে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে কিন্তু প্রয়োজন হয়না কারণ দু:খ বলে কোন কনসেপ্ট নেই, জ্বালা নেই,রোগ ভোগ নেই, অনাহার নেই, হিংসা দ্বেষ নেই । আছে শুধু আনন্দ, সুখ, পরম শান্তি। চিরদিনের জন্য ।

আকাশ থেকে উড়ে আসছে নক্ষত্র কুচি, ভীষণ শীতল, তাই থেকে তৈরি হচ্ছে অন্যভুবন । সেই ভুবনের বাসিন্দারা এখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে আবার ফিরে যাচ্ছে নিজ ভূমে । এরাও তাদের সঙ্গে হাসিকান্নায় কাটাচ্ছেন সময় । অবশ্য এখানে কান্না মানে আনন্দাশ্রু । আবেগের প্রতিফলন, দু:খ নয় ।

আসলে এখানে মানুষের সংজ্ঞাটাই ভিন্ন । মানুষ এখানে মান আর হুঁশ নিয়েই সৃষ্ট । জান্তব অস্তিত্ব নয় ।

চলতে চলতে পথ পাশে দেখা গেল বইতে পড়া কিছু প্রাচীন শিলালিপির অংশ । সাজানো রয়েছে । অনেকটা বৌদ্ধ যুগের মতন অথবা আরো কোন পুরাতন যুগ ।

এ কি সত্যি প্রত্ন ? নাকি অত্যাধুনিক ? স্বপ্ন না বাস্তব ?

ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা আঘাত লাগে, কেমন লুটিয়ে পড়ে আয়ুষী, হঠাৎ । কোমল ঘাসের কোলে । ডুবে যায় ডুবে যেতে থাকে । ডানা মেলে উড়ে যেতে থাকে অচেনা সপ্তর্ষির কোলে, আর ওর দগ্ধ নশ্বর দেহ ধীরে ধীরে আলো হয়ে যাচ্ছে ।

আলোক রশ্মি জমাট বেঁধে চলেছে সার দিয়ে, তারপর একটা ঝটকা লাগে, খুব জোরে, আয়ুষী চমকে ওঠে । গায়ে হাত পায়ে অসম্ভব ব্যাথা অনুভব করে । কেমন ফ্যাকাসে এক বিশ্বে আবার এসেছে পড়েছে সে, খুব গরম, উত্তাপ, হৈ চৈ চারিদিকে, মুখোশের মিছিল ।

মন খারাপের দিন শুরু হয়ে যায়, কষ্ট জমে ওঠে বুকে, গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে যায় ।

দক্ষিণ ভারতের সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে সময় এখন সন্ধ্যে সাতটা বেজে দশ মিনিট ।

পুরোহিত এসে এক রুদ্রমূর্তির সম্মুখে দীপশিখাটা জ্বালিয়ে দিয়ে যান, প্রদীপের ফিকে আলোয় ঘরটা বড় অন্ধকার লাগে ।

পায়ে পায়ে আয়ুষী এগিয়ে চলে কঠিন, রুক্ষ, অশান্তিতে ভরা তিন ভুবনের পাড়ে ।

# মৃগাক্ষী

দেখা হয়েছিল রাসের মেলায় যাবার সময় । জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহারের পথে, লং ডিস্টেন্স বাসের মধ্যে । পাশাপাশি বসেছিল ওরা । প্রায় গা ঘেঁষা ঘেঁষি করেই । মেয়েটি কালো কিন্তু অপরূপা । কোলে একটি বাচ্চা, বাচ্চাটি বমি করে সব ভাসাচ্ছিল ।

সাংবাদিক শ্রীয়া দত্ত জলপাইগুড়ি থেকে রাসের মেলার ওপরে একটি আর্টিকেল লেখার জন্য কোচবিহার যাচ্ছিল। কথায় কথায় জানা গেলো এই মেয়েটি তাদের মিডিয়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ খবর ঠিক খবর নয় তবে যেই খবরটি পেলে ওরা দারুণ উপকৃত হবে সেই সাবজেক্টের সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরতা ছিল । শ্রীয়া নড়চড়ে বসলো ।

লেখিকা মনস্বিতা চট্টরাজ বাংলা সাহিত্য জগতের এক বিস্ময় । অসাধারণ জীবনবোধ ও কল্পনা শক্তি ওনার । বহু পুরস্কারে সম্মানিতা অথচ কোনদিন কোনো পুরস্কার নিতে আসেন নি । ওনাকে কেউ দেখেনি । শুধু ছবি দেখেছে । পদ্মপলাশের মতন আঁখিজোড়া । অপরূপ মুখখানি ।

কেউ ওনার কাছে পৌঁছাতে পারেনা । কারণ কেউ জানেই না উনি কোথায় থাকেন । নিজের সৃষ্ট জগতে ওনার বিচরণ । নিজেকে মিডিয়ার থেকে আড়াল করে রেখেছেন হয়ত স্বভাব লাজুক বলেই ।

আজ এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়ে জানা গেল উনি থাকেন উত্তরবঙ্গেই এক জঙ্গলে । নামটি মুচকুন্দপুর ।

মেয়েটি সাড়ে সাত মাস ওনার কাছে কাজ করেছিল তারপর ছেড়ে দিল কেন ?

মানুষ হিসেবে লেখিকা কেমন, প্রশ্ন জাগে শ্রীয়ার মনে ।

- মানুষ উনি খুবই ভালো, আসলে আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ি তাই চড়াই উৎরাই ভেঙে অত দূরে যাওয়া বন্ধ করতে হল ।

তা দুর তো বটেই । পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে একটা নদী । সেই নদীর ধারে কাঠের বাড়ি । কিছুটা নদী যেন ইচ্ছে করেই কেটে আনা হয়েছে ড্রয়িং রুমের ভেতরে । সেখানে লিলি ফুলের ঝাড় ।

কুলকুল শব্দে লেখিকার মনের আয়নায় সৃষ্টির চিত্র দেখা দেয় ।

পয়সার তো অভাব নেই । শুধু লেখা নয় পৈত্রিক সম্পত্তির বিশাল অংশ পেয়েছিলেন উনি । বিয়ে করেন নি । যদিও রূপের ছটায় যেকোন পুরুষ কুপোকাৎ হতে বাধ্য । বিশেষ করে ওনার চোখ দুটো অসাধারণ । মৃগাক্ষী শব্দটার অর্থ যেন ওনার চোখকে সামনে রেখেই করা হয়েছিল । চেহারায় একটা লাবণ্য আছে । রূপসী, হ্যাঁ রূপসী শব্দটারই পার্সোনিফিকেশান হলেন মনস্বিতা ।

উনি ঔপন্যাসিক । কবিতাও কিছু লিখেছেন । ছোটগল্প একেবারেই লেখেন না কারণ অত স্বল্প পরিসরে নাকি কোন কথাই বলা হয়না ।

ওনার উপন্যাস ত্রিনয়নী খুব সাড়া জাগিয়েছিল । আজও সেটি বেস্ট সেলার । ১৫ বছর আগে লেখা বই । সেটা নিয়ে সিনেমাও হয়েছে । এক বিদেশী কোম্পানি সেই গল্প কিনেছে । ওরাও ছবি তৈরি করবেন । সবই হচ্ছে কিন্তু লেখিকাকে কেউ কোনদিন দেখেন নি সামনাসামনি । এটা খুবই অদ্ভুত ঘটনা । বিশেষকরে আজকালকার জমানায় । এটা তো পাবলিসিটির যুগ । এক বিন্দু করেই লোকে ফুলিয়ে প্রচার করে সেখানে এত অ্যাচিভমেন্টস্ যাঁর তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন এটা বিস্ময়কর তো বটেই ।

শ্রীয়া ঠিক করলো একদিন একাই যাবে । এখন কাউকে কিছু বলবে না । আগে নিজে গিয়ে সব দেখবে । তারপর প্রয়োজন হলে টিম নিয়ে আসবে । এরকম চমকপ্রদ স্টোরি করতে পারলে ওর বস খুশি হবে, প্রমোশন তাড়াতাড়ি হবে আর দুনিয়াও জানবে একজন এত বড় লেখিকার পর্দার অন্তরালের ইতিহাস । ওদের পত্রিকারও নাম হবে ।

মেয়েটির বাচ্চাটাকে জামা কেনার জন্যে একটা মোটা অঙ্কের টাকা হাতে দিয়ে শ্রীয়া পা বাড়ালো রাসের মেলা প্রাঙ্গনে । খুবই সিস্টেমেটিক মেলা । বিদেশীরা দেখে যেতে পারেন । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সব । আর মদনমোহনের মুখখানি তো জাদু মাখা । ঐ মুখপানে একবার চাইলে জগৎ সংসার ভুলে যাওয়া যায় । বেশ ভালো স্টোরি হবে । তারপর মনস্বিতা দর্শন । উহ্ ! যাকে বলে একাদশে বৃহস্পতি । অসম্ভব ভালো সময় যাচ্ছে তার এখন ।

কলকাতা ফিরে কদিনের ছুটি নিল । রাস পর্ব ভালই হয়েছে দেখে বস আর ধানাই পানাই করলো না । ছুটি নিয়ে সোজা চলে এলো মুচকুন্দপুর ।

ঘন গভীর জঙ্গল । আকাশ দেখা যায়না । হরিণ আর বুনোমোষের দেখা পেলো । কিছু নাম না জানা পাখির ডাক শোনা গেলো । জঙ্গলটা ঘন হলেও গা ছমছমে নয় একেবারেই । বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হল । লেখিকার নাম এখানে কেউ জানেনা । ওরা তাঁর বাড়িকে বলে দিলদার প্যালেস । অদ্ভুত নাম কিন্তু ।

চেনে সকলেই । বিরাট প্রসাদের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হয় যে বলার নয় । এটাই সেই মহিয়সীর বাড়ি ? এখানে বসেই উনি সৃষ্টি করেছেন -- নীল দিগন্তে, খাজুরাহোর দিনগুলি, পৃথিবী দুলছের মতন অমর সৃষ্টি ?

গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে শ্রীয়ার ।

গেট পেরিয়ে ঢুকে যায় ভেতরে । সদ্য এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে । রাস্তা কাদামাখা । সোঁদা মাটির গন্ধে চারিদিক ছেয়ে গেছে । শ্রীয়া ধীর পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকে যায় । বাধা দেবার তো কেউ নেই । কাউকেই দেখা যাচ্ছে না ।

আর আশ্চর্য যার চারিদিকে এত আড়াল তার বাড়িতে কিন্তু কোন আড়াল নেই ।

সব খোলা । হাট খোলা । ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কোথার থেকে একটা বিশাল আকৃতির কুকুর প্রায় ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো । টাল সামলাতে না পেরে ও পড়ে গেল মাটিতে । কি ভয়ানক চেহারা ওটার । তেমনই বাঁজখাই গলার আওয়াজ ।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ, যেন ছিঁড়ে খাবে । শ্রীয়া প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, এবার বুঝেছে কেন সব হাট খোলা । আসলে এই জীবটি তো একাই একশো !

- রোহন, রোহন এদিকে চলে এসো ।

কুকুরটি লেজ গুটিয়ে শ্রীয়াকে ছেড়ে মালিকের দিকে ধেয়ে গেল ।

মালিকই বটে । একজন অতিকায়া । কালো বরণ । মুখটা অনেকটাই প্রেতিনীর মতন ।

ঝট করে দেখলে ভয় লাগে ।

কদাকার ভাবে হেসে বলে উঠলো - কি চান ? কোথা থেকে আসছেন ?

- শ্রীয়া চোরের মতন এসেছে বলে যারপরনাই লজ্জিত হবার ভান করে বললো- আমি একটু লেখিকা --

অপর পক্ষ পরিস্কার গলায় বলে উঠলো- উনি তো কারো সঙ্গে দেখা করেন না ।

বোঝাই গেল এরা এই ধরণের আবদারে অভ্যস্থ । অর্থাৎ আগেও কেউ কেউ এসেছিল । শ্রীয়াই প্রথম লোক নয় ।

- -কুকুরের নাম রোহন, খুব অদ্ভুত তো ! শ্রীয়া হেসে ওঠে ।

- অদ্ভুতের কিছু নেই ম্যাডাম, ও আপনার কাছে কুকুর হলেও আমাদের কাছে মানুষ, আমাদের ছেলের মতন তাই মানুষের নামই রাখা হয়েছে ।

প্রেতিনী ভয়ানকভাবে হেসে ওঠে । শ্রীয়াকে নিয়ে সে এসেছে ড্রয়িং রুমে । হয়ত দয়া হয়েছে এই বৃষ্টিভেজা দিনে ওকে দেখে । তাই প্রবেশাধিকার মিলেছে ।

ভদ্রমহিলা মাঝ বয়সী । চেহারায় কোন লালিত্য নেই । বড্ড কাঠ কাঠ ।

টি পট থেকে ধূমায়িত চা ঢেলে পরিবেশন করেন প্রেতিনী । নামটা এখনো জানা হলনা ।

শ্রীয়া অত্যন্ত কোমলভাবে জিজ্ঞেস করে - আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কিন্তু নামটা জানা হলনা যে ।

- -আমি মিস জোসেফ । ম্যাডামের সাথী ।

- কবে থেকে আছেন ?

- তা মেরে কেটে বছর ২৫ তো হবেই ।

- ২৫ বছর ! শ্রীয়া নিজের কন্ঠস্বরে নিজেই চমকে যায় ।

- আর কি, কুশ্রী চেহারা বলে বিয়ে হল না তো । এখানেই ম্যাডামের দয়ায় কাটিয়ে দিলাম অর্ধেক জীবন ।

শ্রীয়ার অনুসন্ধানী চোখ ও সাংবাদিকের তুখোড় মন দিয়ে সহজেই বুঝে নিল যে ভদ্রমহিলার দূর্বলতা তার অসুন্দর চেহারা । কাজেই সে সুযোগ বুঝে টুকটাক ব্লাশ করতে লাগলো । এবং কাজ হল ।

মহিলা নিজেকে মেলে ধরতে লাগলেন ।

এদিকে বেলা গড়িয়ে আকাশে একফালি চাঁদ মুচকি হাসছে । বুনো একটা গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে । শোকেস ভর্তি বই । মিস যোসেফ আবার চা আনালেন । একজন চাকর চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেলো ।

যোসেফ চা ঢালতে ঢালতে একটু গলা ঝেড়ে নিলেন । বাইরের হিমেল বাতাস ঘরে প্রবেশ করেছে। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব চারিপাশে ।

- লেখিকার সঙ্গে দেখা করতে অনেকেই আসেন নিশ্চয় ? শ্রীয়া আলতো করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় ।

লুফে নেন মিস যোসেফ - হ্যাঁ, প্রাচীর ভেদ করে কেউ কেউ ঢুকে পড়ে বৈকি ! কিন্তু আজ অবধি ম্যাডম কারো সঙ্গেই দেখা করেন নি ।

- কিন্তু কেন ? উনি বুঝি খুব মুডি ? শাই ?

- ঠিক শাই নয়, তবে ওনার মুডের ব্যাপার তো থাকেই ।

শ্রীয়া চুপ করে থাকে । ভাবে কি করে অ্যাপ্রোচ করবে । শেষে সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করেই ফেলে- আমি কি দেখা করতে পারি ?

ইতিমধ্যে মিস যোসেফকে - আপনি কালো নন তো, চাঁপার কলির মতন গায়ের রং আপনার, একটু শরীরটা ভার হয়ে গেছে, জিম করুন স্লিম হয়ে যাবেন ইত্যাদি মশলা দিয়ে অনেকটাই সহমর্মিতা আদায় করেছে সে কাজেই হয়ত কিছু সুবিধে পেলেও পাওয়া যেতে পারে ভেবেই প্রশ্নটা করে ।

- আজ হবেনা । আপনি কাল সকালে আসুন আমি দেখি কি করা যায় !

- কিন্তু আজ তো রাত্রি হয়ে গেছে, এই জঙ্গলে আমি কোথায় যাবো?

শ্রীয়া ভাবে, রাতটুকু এখানে কাটাতে পারলে যদি একটা বিশেষ ঘটনা চোখে পড়ে ! অবশ্য সত্যি ও কোথায়ই বা যাবে । নিঝুম পুরিতে অমানিশায় ও একাকিনী কোথায় যাবে । যোসেফ বার করে দিলে বাঘের পেটে গেলেও আশ্চর্য হবে না । তবে ওদের সাংবাদিকদের জীবন তো এরকমই । ভয়, সুখ সমস্ত কিছুকে ছেঁটে না ফেললে ভালো স্টোরি করবে কি করে ?

এই পেশায় রিস্ক তো আছেই । বিশেষ করে শ্রীয়া রিয়েল লাইফ স্টোরি বেশি কভার করে ।

এই আর কি ।

যোসেফ ওকে একটা ঘর দিল । বললো রাতটা এখানেই কাটাও । তার আগে অবশ্য ডিনারও জুটলো । এলাহি হয়ত নয় কিন্তু ছিমছাম ব্যবস্থা ।

মাটন স্টিউ, ব্রেড, ওমলেট, জুস, পোট্যাটো ম্যাশড্ বেশ ভালই লাগলো । ভদ্রমহিলা রূপের প্রশংসায় খুশি হয়েছেন বোঝাই গেল । স্বয়ং রামকৃষ্ণ ঠাকুরই তো বলেছেন- যে যেমন তাকে সেরকম, যেখানে যেরকম সেখানে সেরকম, যাকে যেরকম তাকে সেরকম ---

নিজের মনেই হেসে ওঠে অধার্মিক, যুক্তিবাদী শ্রীয়া ।

সে বর্তমান যুগের আলোকপ্রাপ্তা নারী । সে কোন কুসংস্কারেই বিশ্বাসী নয় । তবে রামকৃষ্ণের কথামৃতর কথাগুলো বেশ লাগে তাই পড়েছে ।

যেই ঘরটায় থাকতে দিয়েছে সেখানে পরিপাটি করে বিছানা পাতা । দুধ সাদা বিছানা । হালকা গোলাপি পিলো কভার । বেশ আইসক্রিমের মতন দেখাচ্ছে । তুলতুলে নরম ভাব ।

পাশে টেবিল ল্যাম্প আর মোমদানি, বোঝা গেলো পাওয়ার কাট হয় । পাথরের বাটিতে ভাসমান পদ্ম ফুল । বেশ লাগছে, অল্প আঁধার ঘরখানি পুষ্পিত কমলের রূপছটায় আলোময় মনে হচ্ছে । ঘরটা দৈর্ঘে প্রস্থে বেশ কম । একদিকে জানলা । সেখান দিয়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে । একটু ভয় ভয় করছিল শ্রীয়ার, আলো নিভিয়ে অবশেষে শুয়েই পড়লো । কোন চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো না যা নিয়ে গল্প লেখা চলে । লেখিকাকে তো দেখলই না এখনো ।

কাল হলেও হতে পারে । দেখা যাক ।

ভোর হতে তখনো কিছু বাকি । হালকা কুয়াশা দেখা যায়, অল্প আলোয় বাইরেটা ফ্যাকাসে লাগে । শ্রীয়ার ঘুম ভেঙে গেছে । অচেনা জায়গায় তাও গা ছমছমে অনুভূতি থাকায় ঘুম ভালো হলনা । শ্রীয়া জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় । একটা পেঁচা যেন উড়ে এসে বসে কার্নিশে ।

কোন রাতজাগা পাখি ডেকে ওঠে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জানেনা ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হয় । লাল টুকটুকে সূর্যকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায় শ্রীয়া । পাখিরা একে একে ঘুম থেকে উঠে পড়ে । দরজায় টোকা ।

খুলতেই যোসেফ এসে চায়ের কথা বলেন । শ্রীয়া হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নেয় ।

ড্রয়িং রুমে পা দিতেই চোখ পড়ে কোণায় । পিয়ানো সাজানো । চমৎকার ভোরাইয়ের সুরে মেতে উঠেছে ভুবন । একজন ভদ্রমহিলা । পোশাক আশাক কেতাদস্তুর । সাদা গাউন পরা । মুখখানি দেখা যাচ্ছে এতদুর থেকেও পরিষ্কার । অসাধারণ রূপবতী বললেও খুব কম বলা হয় ।

আর চোখ দুটি যেন দুখানি পদ্মের পাপড়ি, ঠিক যেমনটা কাল রাতে দেখেছিল, জলে ভাসমান । বয়স যেন বাড়েনি । ২৫ বছর ধরে লিখছেন । কিন্তু আজও যুবতী ।

মিসেস যোসেফ হাতের ইশারায় বসতে বললেন শ্রীয়াকে, দূরের সোফায় ।

কালকের সেই কুকুরটি একপাশে বাঁধা রয়েছে । অবশ্য কুকুর বলা যাবে না ও তো এই বাড়ির ছেলে । শ্রীয়া ভাবতেই পারছে না যে সত্যি সে লেখিকা মনস্বিতা চট্টরাজের সামনে রয়েছে । নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে করছে । স্বপ্নও সত্যি হয় তাহলে ।

এমনই সময় উনি প্রথম কথা বললেন - রেবা, আজকের কাগজটা পড়ে শোনাও তো !

রেবা অর্থাৎ মিস যোসেফ এগিয়ে গিয়ে কাগজ খানা মেলে ধরে পড়তে লাগলেন । এই প্রথম শ্রীয়া লক্ষ্য করলো যে মৃগাক্ষী মনস্বিতার চোখ দুটো পাথরের মতন স্তব্ধ ।

ভাষাময় নয় ভাষার জাদুগরের অপরূপ আঁখিযুগল ।

লেখিকা অন্ধ ? উনি দেখতে পান না ? তাই এই পর্দা ? তাই এই নৈ:শব্দ্য ? এই দ্বীপান্তর ?

এক অদ্ভূত অনুভূতি ছেয়ে যায় শ্রীয়ার মনে । কেমন খারাপ লাগায় হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে ।

অরণ্যের দিনরাত্রি বড় নি:স্তব্ধ লাগে । তার ও সবার মনের হাজার হাজার কৌতুহল ও প্রশ্নের উত্তর আজ এক লহমায় পেয়ে যায় । কেমন বিষন্নতায় ছেয়ে আছে সমস্ত সত্ত্বা ।

মনস্বিতা জন্মান্ধ । ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন তিনি । বাবা বহু চেষ্টা করেও চোখে জ্যোতি আনতে পারেন নি । অনেক ডাক্তার বদ্যি হেকিম দেখিয়েও উনি বিফল হয়েছেন । সবার শেষে কুলগুরু দেবেশ্বরজির কৃপায় কন্যা একটি গুরুমন্ত্র পান । নিয়মিত ধ্যান করেন । এবং তৃতীয় নয়নে দেখতে পান বিশ্ব জগতকে । সেই দেখা থেকেই, জানা থেকেই লিখে যান এক একটি কাব্য । সৃষ্টি হয় অমর কথা । সব ঘটনাগুলো বলা ভালো গল্পগুলো উনি কপালের মধ্যে তৃতীয় নয়নে চলমান দৃশ্যের মতন দেখতে পান । সেগুলোই লিপি বদ্ধ করা হয় । নাহলে যিনি জন্মান্ধ তিনি কি করে প্রতিটা জিনিসের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করবেন ? সেটা তো অসম্ভব ।

থার্ড আই যার বৈজ্ঞানিক নাম পিনিয়াল গ্ল্যান্ড সেখানে মুণি ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখে থাকেন এটা সে শুনেছিল কিন্তু বিশ্বাস করতো না । আজ বিশ্বাস অবিশ্বাসের গন্ডী ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, মনস্বিতাকে দেখে ।

উনি তো নিজে লেখেন না শুধু মুখে বলে যান, লেখেন মিস যোসেফ । তারপরে সেটা পাঠিয়ে দেন পত্রিকা দপ্তরে । বাছা হলে প্রকাশিত হয় এবং এইভাবেই তো আজ উনি প্রখ্যাত হয়েছেন।

অন্ধকার জগতের বাসিন্দা আজ লক্ষ লক্ষ পাঠককে দেন আলোর হদিস । তোমরা আলোয় থেকো । এই বাণীই যেন প্রচারিত হয় প্রতি কাব্যে । পাঠক পড়ে মুগ্ধ হন । আসে স্বীকৃতি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা, জনপ্রিয়তা ।

জন্মাবধি আঁধারের বাসিন্দা মনস্বিতা চট্টরাজ চিরটাকাল রয়েছেন চোখের আড়ালে । কোন অহং বা লাজে নয় নিজের অক্ষমতায় । বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে শ্রীয়ার । বোবা কান্নায় ।

যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত শ্রীয়া অবাক হয়ে চেয়ে আছে যোসেফের দিকে ।

সত্যি এখনো কত কিছু তার জানার বাকি । নিজেকে সুশিক্ষিতা বলতে লজ্জা পাবে এবার থেকে । এবার থেকে নিজেকে অর্ধ শিক্ষিতই বলবে ।

শিক্ষানবীশ শব্দটা অবশ্য চলতে পারে ।

# সামুদ্র

রণ যখন মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেল বাড়িতে প্রচন্ড আপত্তি উঠেছিল তার প্রধান কারণ অবশ্যই লাইফ রিস্ক ।

কিন্তু রণ বড় ডানপিটে ছেলে । কারো কথা শোনার বান্দা নয় ।

যখন রসায়ন নিয়ে কলেজে অনার্স পড়তো তখন একবার দল বেঁধে পিকনিক করতে যাবার সময় ট্রেনে হুটোপুটি করতে করতে এক বন্ধু ঠেলে ফেলে দিয়েছিল দরজা দিয়ে । তালগোল পাকিয়ে পড়েছিল শরীরটা ছুটন্ত ট্রেনের লাইনের পাশে । লোকজন ভেবেছিল সে মৃত । কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তারপর পাক্কা একমাস যমে মানুষে টানাটানি । অবশেষে সে সুস্থ হয় । পরে জানা যায় যে নকশাল ভার্সেস কংগ্রেসের লড়াইতে ও ভিড়ে যায় তাতেই কলেজের অনেক ছেলে ওর অ্যান্টি ছিল । খেলাধুলায়, পড়াশোনায় সে ছিল তুখোড় । তেমনি স্মার্ট । তাই নারী মহলেও ছিল জনপ্রিয় । ঈর্ষা চাগাড় দেয় অনেকের মনে।

ফলত বচসা বাধে অন্য যুবকদলের সাথে এবং তারপর ওকে ওরা দরজার বাইরে ঠেলে দেয় । খুন করার মতলব ছিল না অবশ্যই । ইট ওয়াজ জাস্ট এন অ্যাক্সিডেন্ট ।

তার পরে আবার এই মেরিনের মতন রিস্কি প্রফেশনে যেতে চাইলে বাড়ির লোক বেঁকে বসেন। তবুও ওকে রোখা গেলনা । একদিন ও বিদেশে পাড়ি দিল মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে।

পড়ার খরচ খুব বেশি ছিল । বাড়ির অমতে গিয়েছিল তাই দেশ থেকে কেউ টাকা পাঠাবে না । সেজন্য রণ এক ভারতীয় ডাইভোর্সি মহিলাকে যার দুই মেয়ে ছিল তার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ধীরে ধীরে লিভ ইন রিলেশনে চলে গেল । মহিলা মধ্যবয়স্ক, পেশায় নার্স। তরুণ, হ্যান্ডসাম রণকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে ভারি খুশি । মেয়ে দুটিও একজন আঙ্কেল পেয়ে খুশি । রণর এক অবাঙালি বন্ধু মিলিন্দ আহুজা একবার ঠাট্টার ছলে বললো- বাই ওয়ান অ্যান্ড গেট টু ফ্রী । মা আরো বুড়ো হলে কিক হার আউট অ্যান্ড স্টে উইথ হার ডটার্স ।

মিলিন্দ ভারি দুষ্টু । রণর মনে হয় । মিলিন্দ কিন্তু স্পষ্ট বক্তা ।

- লুক রণ ইউ আর জাস্ট ২৩ অ্যান্ড দা লেডি ইজ ৪৫ সো সি উইল ডেফিনেটলি ফিল বেটার । এজ ডেজ প্রোগ্রেস সি উইল গ্রো ওলড, কিক হার অন দা ব্যাক অ্যান্ড টেক হার ডটার্স টু বেড ।

ভদ্রমহিলাকে শেষ অবধি সরে যেতে হল রণর জীবন থেকে । তবে রণ নিজেই ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিল পড়া শেষ হবার পর । যখন বিদেশ ছাড়লো খুব ভালো স্কোর নিয়ে এবং মেরিন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে শপথ নিয়ে তখন ওনাকে বলে এলো যে দেশে এসেই বাড়ির সাথে কথা বলে বিয়ের ডেট জানাবে ওকে । কিন্তু শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে যা হয় তাই হল । রণ ভারতের মাটিতে পা দিয়েই ওনাকে মুছে ফেললো মন থেকে । ভদ্রমহিলাকে ফোন নম্বর দিয়েছিল কিন্তু সেটি ফেক । ফলে উনিও বহু চেষ্টা করেও রণকে ট্রেস করতে পারলেন না ।

রণ বাড়ি পৌঁছতেই চারিদিকে খুশির জোয়ার বয়ে গেল । এতদিন বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে স্বভাবতই সকলে খুব খুশি । কি করে যে পড়ার খরচ জোগাড় হল কেউ জানতে চাইলো না, মাথাও ঘামালো না । ভাবলো ছেলে বিরাট পাশ দিয়ে ফিরেছে এইতো কত ভালো খবর আবার

ওসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে কিহবে !আসলে ওরা যে টাকা দেন নি বা দিতে পারেন নি সেটাই হয়ত অবচেতনে ছিল তাই সেই সব কথা আর উঠলো না ।

কিছুদিন বাড়িতে কাটিয়ে রণ চলে গেলো জাহাজে । সিঙ্গাপুর থেকে চড়লো ।

বছরে নয় মাস জাহাজে থাকতে হত বাকি তিন মাস ছুটি । তখন কলকাতায় এসে ঘুরে যেত । অনেক সময় অনেক দেশে ঘুরে বেড়াতো । যেমন তৎকালীন কমিউনিস্ট পোল্যান্ডে দেখে এসেছিল কি ভীষণ কষ্টে মানুষজন রয়েছেন । কত ক্ষোভ তাদের সরকারের প্রতি । খেতে পরতে পায় না । যেন এক একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি । লাভা গলে পড়লো বলে ।

আবার তখন দক্ষিণ অ্যাফ্রিকায় কেউ যেতো না । কর্মসুত্রে রণ গিয়েছিল সেই জাহাজে করে । দেখে এসেছিল এই অচ্ছ্যুত দেশের নাড়ি নক্ষত্র ।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন শুরু হল তার ।

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর সে দেশে ফিরে বিয়ের তোড়জোড় আরম্ভ করে । সম্বন্ধ করেই বিয়ে হবে । অনেক পাত্রী এলো । বেশির ভাগই সাধারণ । একটি মেয়েকে তার খুব মনে ধরেছিল । মেয়েটি খুব সুন্দরী । চেহারায় জেল্লা আছে তবে পরিবারটা একটু ব্যাকওয়ার্ড । বেশির ভাগই কেরানি কূল, দু একটি ভালো চাকুরে আছে । চিন্তাধারা, কথাবার্তাও খুবই পেটি ।

যেমন রণ বিদেশে যায় শুনে বললো- আমাদেরও অনেক আত্মীয় বিদেশে আছেন ।

- তাই নাকি ? কোথায় ? রণ উৎসাহী ।
- কেন, ওয়াল্টেয়ারে আছে, দন্ডকারণ্যে আছে ।

রণ কথা বাড়ায় না । পালাতে পারলে বাঁচে । কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে ।

শেযে সম্বন্ধ হল এক মেট্রো রেলের কর্মীর কন্যার সাথে । ছাপোষা হলেও মেয়েটি যাদবপুরের ছাত্রী ছিল, হলই বা এম এ, আর্টস তবুও একটা এক্সপোজার ছিল ।

প্রচুর বই পড়তো সে । অনেক জ্ঞান ছিল ।

পরিবারটা একটু সেকেলে । পশ্চিমবঙ্গীয় তাই একটু কনসার্ভেটিভ । আর মায়ের শাড়ি মেয়ে ধরবে না, বসুধৈব কুটুমবকম চলবে না । যার যার ঘরের সীমানা তার তার এক্তিয়ারে থাকবে কেবল এইসব নিয়ম মেনে চলতো, বিকেল হলেই গা ধুয়ে চুল বেঁধে অফিস থেকে বাড়ির বাবুদের আসার অপেক্ষা ইত্যাদি । মেরিন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না । তবুও বিয়ে হল । কারণ এন আর আই জাতীয় পাত্রদের সময় কম থাকে । মাসের পর মাস ঘরে বসে মেয়ে দেখার বিলাসিতা করা চলেনা ।

মেয়েটি একটু মক্ষী চুষ ও ছিল । সেটা বিয়ের পরে প্রকট হল ।

মোটা মাইনে পাওয়া খরুচে বর যদি গাড়ি কিনতে চায় তাতে ব্যাগড়া দেয় বৌ । সে কেবল টাকা জমায় । জমিয়ে যায় ।

বড় হোটেলে পার্টি দেওয়া যাবেনা । পরিচিত জাহাজের কাপ্তানদের নিয়ে যেতে হবে পাতি কোন রেস্তোরাঁয় । রণ প্রথমদিকে কিছু না বললেও বিরক্ত হত ।

আড়ালে বন্ধুরা বলতো- তোর বৌ তো পাতি মিডিল ক্লাস থেকে এসেছে, ওকে অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করতে বল ।

কাঁচের প্লেট গ্লাস ব্যবহার করতো না ডিনার সেট হিসেবে । পাছে ভেঙে যায় । রণ যতই বলে- ভেঙে গেলে আমি আবার কিনে দেবো কে শোনে কার কথা ।

বিদেশী জাহাজে কাজ করতো রণ, টাকার কুমিরই বলা চলে । কোন দায়বদ্ধতা ছিলনা কারো প্রতি । কারণ আশেপাশের সবাই প্রতিষ্ঠিত । তাই ইচ্ছে মতন সে খরচ করতে সক্ষম । তবুও স্ত্রীর যাতনায় অবস্থা শোচনীয় । বুঝে গেলো এর স্বভাব না বদলালে সোসাইটিতে মান থাকবে না ।

ইতিমধ্যে একদিন ওরা ঠিক করলো যে নতুন চাকরিতে রণ বৌকে জাহাজে নিয়ে যাবে । যদি অনেকের সঙ্গে মিশে কিছু পরিবর্তন আসে ।

বৌ খুশি । যথাসময় ওরা চলে গেল জাহাজে ।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ খুব আনন্দে কাটলো । প্রায় রোজ রাতেই পার্টি হত । রণর স্ত্রীই ছিল একমাত্র মহিলা । কারণ ভেসেল ( জাহাজ ) খানি মালবাহী । মোট ১৫ জন মানুষ আছেন তাতে । একমাত্র মহিলা রণর স্ত্রী ।

সেই কারণেই হয়ত সব পার্টিতেই ওকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত । বেসুরো, হেড়ে গলায় -- *আজি এই আন-ও - নন্দ সন্ধ্যা* -- গান শুনে সবাই ক্ল্যাপ দিতেন ।

ভালই কাটছিল দিন । বিশেষ করে বয়স্ক কাপ্তান সাহেব ওকে বড়ই স্নেহ করতেন ।

তবে ওর বোধহয় সব থেকে ভালো লাগতো বিনাখরচে পেট পুরে খাবার ব্যবস্থা । বাড়িতে একটার বেশি দুটো ডিম খেতো না খরচের ভয়ে যদিও ডিম ওর দারুণ প্রিয় কিন্তু এখানে বড় বড় ডিম যত খুশি খাও । খুবই লোভনীয় ব্যাপার মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা মেয়ের কাছে ।

যখন তীরে এসে তরী ভিড়তো অনেকেই নেমে ছুটতো মনোলোভার সন্ধানে । এতদিন জলের একঘেয়েমি কাটাতে । বৌ সঙ্গে থাকায় রণ সেইসব দোষমুক্ত ।

ওরা শপিং এ যেতো । এস এইচ ও পি পি আই এন জি ----

সেখানেও বৌয়ের সাধারণ মানসিকতা রণর বিরক্তির কারণ হত । শেষে মোটামুটি কিছু কিনে ওরা জাহাজে ফিরতো ।

বাঁশি, অপূর্ব বাঁশি বাজাতো রণ । একটা সঙ্গেই থাকতো সবসময় । সেটাই এনে ডেকে বসে সূর্যাস্তের লালিমা মেখে সুর তুলতো । সেই সপ্তসুরের দোলা লাগতো সমুদ্রের ফেনিল জলকণায় ।

একদিন ট্রিপ শেষে ওরা পাড়ে এলো । সেখান থেকে চলে এলো কলকাতা । রণর স্ত্রী, মৌলি খুব খুশি । খুব আনন্দে কেটেছে এই কটা মাস । নয়মাস ।

ফিরে এসে ওরা কিছু দিন মালেশিয়ায় কাটালো, বেড়িয়ে ।

তারপর কলকাতায় এলো । এসেই শুনলো মৌলির বাবার ক্যান্সার ডিটেকটেড হয়েছে । বেশ অ্যাডভান্স স্টেজ । মনটা খারাপ হয়ে গেলো ওদের ।

রণ নিজের খরচে শ্বশুরকে নিয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়া । সেখানে যদি কিছু ভালো চিকিৎসা হয় । কিন্তু কপাল মন্দ তাই ক্যান্সারের ওষুধ ট্রায়াল দেওয়া হল ভদ্রলোকের ওপর এবং উনি শুকিয়ে কাঠি হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেলেন ।

শুন্য হাতে ফিরে এলো রণ ও মৌলির পরিবার ।

এবার আরেক সম্ভবনা । মৌলি অন্ত:সত্ত্বা হল । রণর অর্থে কিছুটা টান ধরে কারণ বেড়িয়ে ও অস্ট্রলিয়ায় চিকিৎসার জন্য যাওয়াতে বেশ মোটা খরচ হয়ে গিয়েছিল ।

সেই কারণে মৌলি ওকে জাহাজে যেতে বলে । যদিও এখন অফ সিজন তবুও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ক্রমহ্রস্বমান অবস্থা দেখে রণ চলে গেল ।

সিঙ্গাপুরে পাক্‌কা দু মাস বসে রইলো । জাহাজ আসেনা । আসার চান্স খুবই কম কারণ এই সময় সব ভেসেল জলে থাকে । শোরে পৌঁছায় না । দিনের পর দিন হোটেলে অপেক্ষা করতে করতে আরো অর্থব্যয় হতে লাগলো ।

শেষে কোন কুল কিনারা না পেয়ে ও একটা পুরনো ভাঙা জাহাজে চড়ে বসলো । একজন অফিসার ওটা ভ্যাকেট করলেন তাই ওঠা গেলো তাতে ।

এটাই ঐ জাহাজের শেষ ট্রিপ তারপর ওটাকে অ্যাঙ্কার করা হবে, তুলে নেওয়া হবে জল থেকে এতই ভগ্ন অবস্থা ওটার ।

রণ সেই ভগ্ন জাহাজেই চড়লো অগত্যা। বেশ ভালই চলছিল । কয়েক মাস কেটেও গেলো । শেষে প্রায় ল্যান্ডের কাছে পৌঁছে হঠাৎ প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে পড়লো জাহাজটি । ভেসেলটি প্রচুর বড় সাইজের হওয়ায় মাঝখান থেকে চিড়ে গেল । হু হু করে জল ঢুকতে লাগলো । এস ও এস ( সেভ আওয়ার সোল ) পাঠানো গেলোনা খারাপ আবহাওয়ার জন্য । এবং জাহাজটি ডুবে গেলো । সমস্ত অফিসার, কাপ্তান, ক্রু এবং জাহাজটির কোন খোঁজ আজ অবধি পাওয়া যায়নি । হারিয়ে গেলো তারুণ্যে ভরপুর একটি দু:সাহসী বাঙালি প্রাণ । ওদের জাহাজে রণই ছিল একমাত্র বাঙালী ।

খবর যখন এসে কলকাতায় পৌঁছালো ততদিনে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে ।

কান্নার রোল উঠলো । নিঁখোজ বলছে ওরা আসলে তো মৃতই । সবাই সেরকমই ভেবে নিল । শ্বশুরবাড়ি দোষারোপ করলো মৌলিকে ।

- লোভ, মধ্যবিত্ত মেয়ের লোভ । নিজের বাপকে খেয়েছে, বরকে খেলো ।

তোর বাপের চিকিৎসা করতেই তো আমার ছেলে সর্বসান্ত হল ।

নাহলে আজ এই অসময়ে ওকে যেতে হত কাজে ? টাকার প্রয়োজনে ?

তোর কি ? এখন তো আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসবি । আমার ছেলে ? আমার ছেলে কে এনে দিতে পারবি ? ইত্যাদি কটুক্তি শুনে মৌলি বোবা হয়ে গেলো । কেউ যে জেনে বুঝে নিজের স্বামীকে এতবড় বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেনা সেটা কিন্তু কেউ বুঝলো না । এটা যে দূর্ঘটনা, দূর্ভাগ্য সেটা কেউ মানলো না ।

একরাশ কান্না এসে ঢেকে দিল ওর দুই চোখ ।

সময় নিজ গতিতে ধাবমান । মৌলি নিজের পিত্রালয়েই থাকে । শ্বশুরকূলের সঙ্গে বড় একটা যোগাযোগ হয়না । জাহাজের থেকে পাওয়া কমপান্সেশনের টাকা ও একটা স্কুলের চাকরিতেই চলে ওর দিন ।

মৌলিদের বাড়িতে একটা পারিবারিক সমাবেশ হত বছরে একবার । রথের সময় । ওদের একটি পারিবারিক জগন্নাথদেবের মন্দির ছিল । সেখানে ওরা একত্রিত হয়ে পুজো, হোম করতো । ছোট্ট একটা রথ বার করতো ছোটরা ।

সেইবারও সমাবেশ ঘটেছে, রণ মৌলির কন্যার বয়স পাঁচ । রণর মতনই চেহারা হয়েছে তার, সুন্দর, সুগঠিত ।

জগন্নাথদেবের পুজো হবার পরে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল আন্দামান বেড়াতে যাবে । অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয়না পরিবারের সকলে মিলে এবার একটু দূরেই যাওয়া যাক ।

মৌলি রণর কন্যার নাম নৈঋতা । বেড়াতে যাবে বলে ছোট্ট নৈঋতাও খুব খুশি ।

মৌলি ঐ দূর্ঘটনার পর সমুদ্র বা সামুদ্র কোন বিষয়কে এড়িয়ে চলতো । কিন্তু তার কন্যা সমুদ্র প্রেমে পাগল ছিল । কাজেই বুকে পাথর চাপা দিয়ে সে রাজি হল মেয়ের মুখ চেয়ে ।

রণর কোন ধর্মীয় অন্ত্যেষ্টি ওরা করেনি । কারণ ১২ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বলে পুরোহিত জানিয়েছিলেন । আর যেহেতু পুত্র নেই তাই ক্রিয়াকলাপ কিভাবে হবে কেউ জানেনা । মেয়ে তা সে যতই বাপের আপন হোক, পুত্র যতই বাপকে গালি দিক, দাঁতে কাটুক প্রধান প্রধান শেষ কর্ম করা থেকে মেয়েরা বঞ্চিতই ।

শ্রদ্ধা ভরে শেষ কাজ করার থেকে ধর্মের টিকিট ধারীরা মেয়েদের ব্যান করেছেন তার চেয়ে অশ্রদ্ধা নিয়েও পুত্র করবে সমস্ত কাজ । কোনো ধর্মগ্রন্থে এই ব্যাবস্থা লেখা থাকতে পারে কি ? মৌলির অবাক লাগে, ঠিক বিশ্বাস হয়না ।

ধর্ম তো আত্মার কথা বলে, আত্মার কি লিঙ্গ হয় ?

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে চলে সে ।

আন্দামানে গেলো প্লেনে করে । গোটা ১৫ জন মিলে । হাসি তামাশায় কেটে গেল সময়টা । সেলুলার জেল দেখলো । দেখলো কত কষ্ট দেওয়া হত ওখানে রাজনৈতিক বন্দীদের । তারা যাতে আকাশ দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা ছিল জেলে । ভাবা যায় ?

দিনের পর দিন নীল পরিস্কার আকাশ না দেখে কাটানো ? মৌলি ভাবতে পারেনা ।

তাদের রক্ত দিয়ে লেখা সব কথা দেওয়ালে দেখা গেলো । এইভাবে পাওয়া স্বাধীনতা আমরা কিভাবে নষ্ট করছি ।

সাথপাছ ভাবতে ভাবতে মৌলি এসে দাঁড়ায় হোটেলের বাইরে । সমুদ্রকে তার শত্রু মনে হত এতদিন কিন্তু এখন এই বিশালত্বের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো তার কোন অভিযোগ নেই । ঢেউগুলো যেন একে একে এসে তার পায়ে আছড়ে পড়ছে, ক্ষমাভিক্ষা করছে, বলছে- আমাদের দোষ দিও না কন্যে, যদি বাতাসের বেগ না থাকতো আমরা সামলে নিতাম, সামলে নিতাম ।

নৈঋতা হুটোপাটি করছে ঢেউয়ের সঙ্গে, ঢেউয়ের তালে তালে । দূর থেকে ভেসে আসছে একটি মিষ্টি সুর, বাঁশি বোধহয় !

হ্যাঁ বাঁশিই তো ! বড় মিঠে তান ।

পায়ে পায়ে হেঁটে চলে একটা বালিয়াড়ির দিকে । এক ভদ্রলোক বসে একটি বাঁশি বাজাচ্ছেন, বাঁশিটি ভারি অদ্ভুত । কোন ফুটো নেই । আর সুরটা অনেকটা পালাগান শুরু হবার আগের সঙ্গীতের মূর্ছনার মতন ।

- খুব সুন্দর বাঁশি বাজান তো ! মৌলি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় ।

ভদ্রলোক ঘুরে তাকান । বাঁশিওয়ালার চোখে, তনুছায়ায় অতিতের সঙ্কেত । কিন্তু উনি আশ্চর্যভাবে নীরব । কোন উত্তেজনা নেই তো মৌলিকে দেখে, সাড়ে ৫ বছর কি খুব দীর্ঘ সময় ?

===

জাহাজ ডোবার অনেক আগেই লাইফবোট নিয়ে ঝাঁপ দেয় রণ । কারো তোয়াক্কা না করেই কারণ তাকে বাঁচতে হবে । তার স্ত্রীর গর্ভ বেড়ে উঠছে যে নতুন কোরক তার জন্য রণকে বাঁচতে হবে । ভেসে ভেসে সে এসে পৌঁছায় কোন তীরে । দীর্ঘদিন না খেয়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে । চরায় কোন মৎস্য শিকারী তাকে খুঁজে পায় । এই দ্বীপে মানুষ থাকেনা । এটা মরা দ্বীপ । তাই জেলেরা ওকে সঙ্গে নিয়ে আসে অন্য এক সমুদ্রঘেরা গ্রামে । মানুষটি তো স্মৃতি হারিয়েছেন । পোশাক আশাক দেখে বোঝা যায় জাহাজের লোক । ওরা এইসব লোক দেখতে অভ্যস্থ ।

কিছুদিন ওদের কাছেই থাকেন । তারপর চলে যায় এক জাহাজে চেপে অন্যত্র । উনি বলায় যে এটাই ওনার দেশ, সেই জাহজই ওনাকে নামিয়ে দেয় আন্দামানে ।

সেই থেকে উনি সামুদ্র জীবন যাপন করছেন । জাহাজের যাওয়া আসা দেখেন সমুদ্রের ধারে বসে, বাঁশি বাজান । বাঁশি শুনে লোকে পয়সা দেয়, খাবার কিনে খান । কিছু অনুরাগী একটা ছাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেখানেই রাত কাটান ।

দিন দিনমানে হেঁটে বেড়ান সমুদ্র কিনারে ।

মৌলি আর শুনতে পারছে না, এত আনন্দ আর কষ্ট হচ্ছে একই সঙ্গে যে ভাবের প্রকাশ হচ্ছে না শুধু দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা । অবিশ্রান্ত জলের ধারা । নৈঋতাকে নিয়ে কাছে গিয়ে ওনার হাতটা ধরলো । ভদ্রলোক হাসলেন ।

তারপর বললেন - আপনার মেয়ে বুঝি ? ভারি মিষ্টি তো !

বাঁশির সুরের সঙ্গে ভেসে আসে প্রতিটি শব্দের অমোঘ উচ্চারণ যা শোনার জন্য এতদিন ব্যস্ত ছিল মৌলি ।

নৈঋতা হাসছে, মৌলি কাঁদছে, ভীষণ কাঁদছে ।

বাঁশি আবার বাজলো তাহলে ? কখনো চড়া সুর কখনো সুক্ষতায় আচ্ছন্ন সুর এই পাতাঝরা দিনেও এনে দিল পুর্ণিমার জোয়ার । ব্রহ্মচারিনীর সারা দেহ জুড়ে তুষার গলছে, সামুদ্রিক নোনা বাতাস আজ তার কানে পৌঁছে দিচ্ছে সঠিক বার্তা । অবিরাম । ক্লান্তিহীন ভাবে ।।

# ব্ল্যাক মেলার

রূপক ডাটা (আসলে দত্ত) নামী মাল্টিন্যাশনল কোম্পানীর একজন জাঁদরেল সি ই ও । বসবাস ব্যাঙ্গালোরে । প্রচন্ড ব্যস্ত । আজ মালয় কাল বিলেত পরশু সব পেয়েছির দেশ অ্যামেরিকা । সংসার একটা আছে তবে নামেই সংসার । ছেলেপুলে নেই । অত সময় কোথায় ? স্ত্রী মান্ডবী একাকিনি কিটি পার্টি আর বড় বড় শপিং মল ঘুরে সময় কাটান । পয়সার অভাব নেই । খ্যাতিও আছে । রূপক হাঁচলে কাশলেও ব্যাঙ্গালোরের মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সেটা খবর হয়ে যায় ।

মান্ডবীর একটি ভালো নেশা অবশ্যি আছে । ছবির নেশা । স্কুলে পড়াকালীন রং তুলি নিয়ে কিঞ্চিত নাড়াচড়া করতো । এখন সেসব অভ্যাস আর নেই । তবে মাঝে মধ্যে সেই ভালোবাসার টানে এক্সিবিশন দেখতে যায় ।

এরকমই একটি এক্সিবিশনে প্রথম দেখা ঋষির সঙ্গে । স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, সাবলীল । সহজেই মন কেড়ে নেয় ।

আলাপ হল । যদিও সে ছবি দেখতে আসেনি । পাশের কফিশপে বসে কফি খাচ্ছিল । ছেলেটি একটি কোম্পানীতে শেয়ার ব্রোকার । বেশ চালাক চতুর হাবভাব । কিছু কথা বার্তা হল ।

যত দিন যেতে লাগলো তত বন্ধুত্ব গাঢ় হতে লাগলো । একটা সময় এলো যখন একসঙ্গে বেড়ানো এমন কি আউটিং এ যাওয়াও শুরু হল । রূপক ব্যস্ত মানুষ । স্ত্রীর এই গোপন অভিসার তার অগোচরেই রয়ে গেল ।

আজকাল মান্ডবীর বেশ সময় কেটে যায় । ঋষিকে কল করলেই ও এসে হাজির হয় একটি বিশেষ জায়গায় । তারপর ? তারপর কাল্পনিক ডানা লাগিয়ে ভেসে যাও সুনীল আকাশে ।

দুজনে লং ড্রাইভে বেরিয়ে চলে গেল বন্দীপুর ফরেস্টে । স্বামী বিদেশে । একসপ্তাহ থাকবে না । রূপক ব্যস্ত তাই এরা দুটিতে ত্রস্ত নয় । বন্দীপুরে মাইশোরের রাজকন্যার যেই বন বাংলো খানা আছে সেটায় ওরা একটি ঘর ভাড়া করে দু তিন দিন কাটালো । সাঁঝবেলায় হুইস্কির নেশা যখন জাঁকিয়ে বসলো তখন ঋষির আচরণে ক্ষুব্ধ ম্যানেজার বলে গেল - বেশি সাহসী হবার প্রয়োজন নেই । এটা জঙ্গল । এই বাংলোর বাগানে জংলী জানোয়ার এসে উৎপাত করে । বুনো শুয়োর, জংলী কুকুর। কিছুদিন আগেই এক টুরিস্টকে ধরেছিল । ভালো জখম করেছে । তাই আপনারা সাবধানে থাকার চেষ্টা করুন ।

আচ্ছা এই জঙ্গলে এসে সভ্যমানুষ কি করে- মান্ডবী ঈষৎ হেসে শুধায় ।

কেন অসভ্যতা করে, বলে মান্ডবীকে হেঁচকা টানে বুকের ওপর ফেলে জাপটে ধরে ঋষি । মান্ডবী ছাড়াবার চেষ্টা করে না । ঋষির তাপসত্ব ঘুচে যায় । মান্ডবী নষ্ট হয় ।

শহরের অভিজাত পাবে ওদের একসঙ্গে দেখা যায় । আজ মিসেস শর্মা কাল মিস্টার দুবের পার্টিতে দুজনে বন্ধু সেজে যায় । হৈ হল্লা করে । মান্ডবী উদ্দাম, উন্মুক্ত পিঠে মোহময়ী । ঋষি লোভী । ঋষি তলিয়ে যায় ।

ব্যাঙ্গালোরে ফিরে একটি অদ্ভূত ব্যাপার দিন কতক হল শুরু হয়েছে । একটি টেলিফোন আসে । ল্যান্ড লাইনে। একটি পুরুষকন্ঠ । মান্ডবীকে কদিন ধরেই বিরক্ত করছে । হুমকি দিচ্ছে ।

টাকা চাইছে। ঋষি ও তার কিছু ঘনিষ্ঠ মূহুর্তের ছবি লোকটির কাছে আছে। এছাড়াও ওরা কখন কোথায় দেখা করছে সেসবও লোকটির নখদর্পণে। টাকা না পেলে রূপক কে সব জানিয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। মান্ডবী চিন্তিত।

সেদিন বিকেলেই দেখা করলো ঋষির সঙ্গে। একটি রেস্তোরাঁয়। এই রেস্তোরাঁটি একেবারে শহরের কেন্দ্রস্থলে। নাম কোশিস। কেরালাইট মালিক। খাবারদাবার বেশ ভালো। সবচেয়ে নাম কফির আর সসেজেস অ্যান্ড এগটাও মন ভরায়। ব্যাঙ্গালোরের হুস হুরা এখানে আসেন। বেশি আসেন ইন্টালেকচুয়াল ক্লাস। রামচন্দ্র গুহর মতন লেখক নিত্য যাওয়া আসা করে। আর আসেন নাটকের লোকেরা। বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়া। যাইহোক দুজনের জন্য ওমলেট ও চিকেন স্যুপ অর্ডার করে মান্ডবী গুছিয়ে বসলো। ঋষিকে সব খুলে বললো। ঋষি প্রথমে খুব হাসলো।

- হাসছো যে ?

- হাসবো না ? তোমার চোখ মুখের যা অবস্থা হয়েছে !

- কি বলছো ? যদি রূপকের কানে যায় ?

- গেলে যাবে। কি হবে ডাইভোর্স হয়ে যাবে। ভালই তো আমাদের সম্পর্ক একটা পরিণতি পাবে।

মান্ডবী নীরব। তাকে চুপ থাকতে দেখে গলাটা ঝেড়ে ঋষি বলে ওঠে - ওকে বাবা হার মানলাম। এবার খুশি তো। লোকটাকে একদম পাত্তা দিওনা। দেখো ও কি করে।

- সেটা তো সম্ভব নয়। কি করবে তা তো জানি। আমি তো রিস্ক নিতে পারিনা।

ঋষি চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে- কত টাকা চেয়েছে ?

-দশ হাজার।

- মাত্র ?

- কি বলছো? ১০০০০ টাকা মাত্র হল ?

- তোমার পতিদেবের যা স্ট্যাটাস তাতে ১০০০০ কেন ১০ লাখও সামান্য।

মান্ডবী কথা বাড়ায় না। শুধু বলে- এখন কি হবে তাই বল।

- কি আর হবে হয় টাকা দাও নয়তো নিজেই গিয়ে রূপকবাবুকে সবকিছু খুলে বল। বাইরের লোকের কাছে শোনার চেয়ে তুমি বললে হয়ত শাস্তি অনেক কম পাবে। ঋষি হেসে ওঠে।

- তুমি কি একটু সিরিয়াস হবে না ? মান্ডবী রেগে যায়।

লোকটি সব জানে। অদ্ভুত ব্যাপার। ওর কি কোন কাজ নেই ? মান্ডবীর বন্ধু প্রীতি। প্রীতি চাউড্রি। পোড় খাওয়া মহিলা। দুটো ব্যবসা চালায় তার ভেতরে একটি হেল্‌থ সেন্টার কাম জিম। সব শুনেটুনে সে বলে - এই ধরণের লোকেদের এটাই পেশা। দেখ হয়ত ২৪ ঘন্টাই তোকে ফলো করে।

মান্ডবীর গা গুলিয়ে ওঠে । একটা অপরিচিত পুরুষ ওকে সব সময় চোখে চোখে রেখেছে, দেখছে । সেই কাল্পনিক দৃষ্টির সামনে নিজেকে ওর বিবস্ত্র মনে হচ্ছে ।

মনে পড়ে যায় হারানো দিনের কথা । সেই কলেজের দিনগুলো । সেই সান্ধ্য আড্ডা, আন্তাকসরি, তেলে ভাজা নিয়ে কাড়াকাড়ি ---- সেই সময়ের রূপক আর আজকের রুপকের মধ্যে কত অমিল । তখন এক দিন না দেখা হলে থাকতে পারতো না আর আজ মাসের পর মাস বিদেশে কাজে ব্যস্ত থাকে একবারো খোঁজ নেবার প্রয়োজন মনে করেনা যে একা বৌটি কেমন আছে । একটি ট্যুর থেকেই অন্য একটি ট্যুরে চলে যায় । আনসারিং মেশিনে শোনা যায় যে মেসেজ দিন । মেসেজ দিলে উত্তর আসেনা । কখনো হয়ত ফোন এলো । কিন্তু সেই সময় মান্ডবীর কথা বলার মতন অভিরুচি থাকেনা । সে বড় ক্লান্ত । কয়েকবার ভেবেছে ডাইভোর্সের কথা । কিন্তু রূপকের সঙ্গে বিচ্ছেদকেও মনে মনে সমর্থন করতে পারেনি । এক অদ্ভুত নৌকোর দোলচালে সে ছিন্নভিন্ন । তাই জড়িয়ে পড়েছে এই বিপজ্জনক খেলায় ।

অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার ইতি ঘটিয়ে এক শনিবার ব্ল্যাকমেলার লোকটির কথামতন মান্ডবী দশ হাজার টাকার একটি চক্‌চকে নোটের বান্ডিল তার হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা করলো । একটি পুরনো গ্যারেজের পাশে দেখা করার কথা । দুপুর বেলা নিজের পুরনো মার্সিডিজ খানা নিয়ে মান্ডবী একাই চলে গেল সেখানে । দূর থেকে একটা গরু চোখে পড়লো । মান্ডবীর আবার গরুতে ভারি ভয় । যাইহোক এখন বিপদ মুক্ত হতে হবে সবার আগে । আলতো করে গরুকে পাশ কাটিয়ে মান্ডবী পৌঁছলো নির্দিষ্ট জায়গায় । একটি কালো পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়ে । মুখে দাঁড়ি ভর্তি । খোঁচা খোঁচা । কেমন বিশ্রী চেহারা । মান্ডবীকে দেখে নোংরাভাবে হাসলো । তারপর থুক করে থুতু ফেলে এগিয়ে এলো ।

- এই যে মিসেস দত্ত সময় মতন এসে গেছেন । পরিস্কার বাংলায় বললো লোকটি ।

মান্ডবীর হাত থেকে টাকার বান্ডিলটি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে একটা ভাঙা পাঁচিলের ওপরে রেখে একটু আড়াল করে গুনে নিল । ২০টা পাঁচশো টাকার নোট ।

তারপরে একটু হেসে বললো- থ্যাঙ্কস।

মান্ডবি এই অহেতুক সৌজন্যতায় বিরক্ত বোধ করলো ।

- তাহলে আসি, বাই ।

লোকটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

কিছু দিন কেটে গেছে । আজকাল মান্ডবী একটু যেন থিতিয়ে গেছে । ব্ল্যাকমেলারটি এরপরেও একবার টাকা নিয়েছে । ওর কাছে কিসব ছবি আছে যা ও রূপকের হাতে দিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয় তাই মান্ডবী স্থির করেছে কোনভাবে হোক বুদ্ধি করে ওর কাছ থেকে নেগেটিভটি হাতাবে । কিন্তু কি ভাবে ?

এইসব সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতেই ফোন এলো । ওর হাতের সামনেই একটি নোটের বান্ডিল রাখা ছিল । সদ্য ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছে চাকর বাকরদের মাইনে দেবার জন্যে । খেলার ছলেই একটি নোটের ওপরে পাশের ফুলদানির নক্সা দেখে আঁকিবুকি কাটছিল আর ভাবছিল কি করা যায় । পুলিশকে জানাবে? নাকি ঋষির সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দেবে । বেগুনী কালিতে আঁকা নক্সা দেখে নিজেই চমকে গেল । এখনো তো দিব্যি আঁকে সে। কতদিন রং তুলিতে হাত পড়েনি ! এমনসময় ফোনটা বেজে উঠলো । সেই লোকটি আবার টাকা চাইছে । তবে এবার

একেবারে ১৫০০০ এ পৌঁছে গেছে । মান্ডবী রাগতস্বরে বলে উঠলো- একটি টাকাও আমি দেবোনা । আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন ।

ওপর প্রান্তে লোকটি জোরে হেসে উঠলো । হো হো হো ।

গা জ্বলে গেল মান্ডবীর ।

- তাহলে আমি সোজা রূপক দত্তর কাছেই যাবো । কালই তো উনি ফিরছেন জার্মানি থেকে তাইনা মিসেস দত্ত?
- এবার কোথায় নেবেন টাকাটা ? ভয়ার্ত মান্ডবী নীচুস্বরে বলে ।
- এয়ার ফোর্স স্টেশানের দিকে চলে আসুন ।

জায়গাটা বলে দিল লোকটি । মান্ডবী জেনে নিল । সময় মতন হাজির হয়ে টাকাটি দিয়ে দিল । কিন্তু মনে মনে ঠিক করলো হয় সে সব খুলে বলবে রূপককে নয়ত পুলিশকে জানাবে । আর ঋষির সঙ্গেও আর দেখা করবে না । যা হয় হবে এই মানসিক চাপ নেওয়া সম্ভব নয় । রূপককে বলবে সেও তো ওকে অবহেলা করছে । তাই আজ ঋষি ওদের মাঝে আসতে পেরেছে নাহলে ও তো রূপককেই অন্তর দিয়ে ভালবাসতো । শুধু তার হয়েই থাকতে চেয়েছিল ।

আজই শেষ দেখা ঋষির সঙ্গে । ওকে জানিয়ে দেবে যে সে আর এই সম্পর্কের বোঝা বইতে পারবে না । অন্ততঃ নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবে মান্ডবী । বিবাহ বহির্ভূত এই প্রেম কি মান্ডবীকে পীড়া দিচ্ছে ? রূপককে পেয়েও না পাওয়ার কষ্ট ওর মনে এক অদ্ভূত জেদ তৈরি করেছিল । নিজেকে অবহেলিত ভেবে ও এই ড্র্যাস্টিক স্টেপ নিয়েছিল । কিন্তু আজ সে বড় লজ্জিত । কুন্ঠিত ।

কোশিসে গিয়ে চিকেন কাটলেট ও কফি খেয়েই মান্ডবী কথা শুরু করতে চায় । ঋষি ইশারায় বলে --আর কিছু খাবে ?

আজ মান্ডবী উদাস, এলোমেলো । মাথা নেড়ে জানায় তার অসম্মতির কথা । ওয়েটার বিল নিয়ে হাজির হয় । খালি প্লেটে কাটা চামচ দিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে ঋষি বলে ওঠে - কি ব্যাপার আজ তোমাকে খুব শ্যাবি লাগছে ! কি হয়েছে ? তুমি কিছু বলবে বলছিলে কি বল--------। মান্ডবী কথা বলেনা ।

ক্লান্ত চরণে উঠে দরজার দিকে যায় । মান্ডবী দেখতে পায় ঋষি নিজের মানিব্যাগ থেকে একটি নোটের বান্ডিল বার করে ওর থেকে দুটি খুলে ওয়েটারের হাতে দিচ্ছে ।

হঠাৎ উড়ে এসে পড়ে ৫০০ টাকার নতুন নোট । মান্ডবীর পায়ের কাছে । ও নীচু হয়ে তুলতে যায়, চমকে ওঠে । নতুন টাকার গায়ে বেগুনি কালি দিয়ে একটি ফুলদানির নক্সা করা । সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভূত যন্ত্রণা । বিষ সঞ্চারের মতন ।

*এক অদৃশ্য জালে তার সমস্ত সত্তা জড়িয়ে যায় । স্খলিত মান্ডবী বাঁচতে চায় কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যেতে থাকে । ডুবতে ডুবতে শেষ অস্তিত্ব টুকুও হারিয়ে যায় ।*

# রায়কুঠি

কলেজের বন্ধুদের সাথে মেহের বেড়াতে যাবে, প্রায় ১০০ কিমি দূরে, বাবা রাজি নন - আদরিনী কন্যাকে তিনি ছাড়তে নারাজ। মা অবশ্য মত দিয়েছেন। আর মাত্র ২০ ঘন্টা বাকি অথচ এই যাত্রা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। বন্ধুরা বারবার ফোন করে জানতে চাইছে স্টেটাস। মেহেরও ওদের আপডেট করছে। তবে কোন আশার আলো এখনো দেখা যায়নি।

শক্তিগড়। মেহেরের শহর থেকে ৯৮ কিমি দূরে। বেশির ভাগটাই বন তবে পাহাড়ও আছে। তিরতির করে বয়ে চলেছে রমনা নদী। ভারী সুন্দর জায়গা। বিক্রম নামে ওদের এক ক্লাসমেট এই জায়গাটির নাম প্রপোজ করে। বিক্রমের মামা খুব বড় শিল্পপতি। ছুটি কাটানোর জন্য একটি ফার্মহাউস কিনে রেখেছেন ওখানে। সেই সুবাদে বিক্রম আগে ঐ এলাকায় গেছে।

রাতে ডিনার টেবিলে বাবার গলা জড়িয়ে মেহের কেঁদেই ফেললো। শেষ অস্ত্র, বা ব্রহ্মাস্ত্র। আর কোন আপত্তি এলো না। মেয়ের চোখে জল দেখলে বাবা মুষড়ে পড়েন। অতএব সেল ফোনে *এস এম এস* চলে গেল যে মেহের শক্তিগড় যাচ্ছে। বন্ধুরাও খুশি। প্রাণোচ্ছল, সদা হাসিখুশি মেহের ওদের দলের মুকুটে একটি হিরে। সে না থাকলে আড্ডা জমেনা।

পরদিন ভোরবেলা একটি বিরাট হন্ডা সি আর ভি চেপে ওরা একদল ছেলেপুলে চললো শক্তিগড় পানে। পথে একজায়গায় দাঁড়িয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিল। গরমাগরম কচুরি, ফুলকপির তরকারি ও গোলাবজামুন। খাসা ভোজ।

আবার চলার শুরু। রাস্তা বড়ই সুন্দর। কেউ কেউ গেয়ে উঠছে গান, কেউ কবিতা পড়ছে।

ধীরে ওরা এসে নামলো একটি বনের ধারে। গাড়ি থেকে নেমে সরঞ্জাম নিয়ে হাঁটা লাগালো নদীপাড়ে। মেহের কফির ফ্লাক্স বের করে কফি ঢালছে এমন সময় ওদের এক বন্ধু তীর্থ বল্লো- ঐ দেখ দূরে টিলার ওপরে সুন্দর একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সবাই ফিরে তাকালো। সত্যি একটি পুরনো দিনের অট্টালিকা, গঠনশৈলি বিলিতি ধাঁচের। কফি শেষ করে ওরা সবাই সেদিকে পা বাড়ালো। মালপত্রর কাছে রইলো হেমা ও জিৎ।

মেহেররা যখন টানা ২০ মিনিট চড়াই বেয়ে বাড়িটির কাছে পৌঁছলো তখন বেশ হাঁপিয়ে গেছে।

দেখা গেল কাঠের ফলকে লেখা রায়কুঠি। বড় লোহার গেট। তালা নেই। দরোয়ানও নেই।

ভেতরে একটি সুন্দর বাগান। বড় বড় গাছ রয়েছে। রং বেরংয়ের ফুল, প্রজাপতি। শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে পথ। ওরা গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো। মিষ্টি একটি সুর ভেসে এলো। পিয়ানো। ওরা পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একটি বিরাট হল। সেখানে একজন বৃদ্ধ বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। চশমা পরা। মুখে সাদা বড় দাঁড়ি। ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন যেন কতদিন ধরে চেনেন। দূরে সোফা পাতা। ওরা সোফায় বসলো। ভদ্রলোক বাজাচ্ছেন - হান্ড্রেড মাইলসের সুর। *ইফ ইউ মিস দিস ট্রেন আই এম অন* ------

*ইউ ক্যান হিয়ার দা উইসেল ব্লো ---- আ হান্ড্রেড মাইলস।*

সবাই উপভোগ করছে একমাত্র মেহের কেমন ঝিম মেরে গেছে । উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে বাইরে ।

- মেহের তোর কি হয়েছে ? শিরিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় ।
- কিছু না তো !
- এরকম চুপ করে আছিস কেন ?
- জানিস আমি না এই বাড়িটায় আগে এসেছি ।
- তাই নাকি ? কবে ?
- আমি এখানে থাকতাম, ঐ বুড়ো ভদ্রলোক আমার বাবা হন ।
- কি যা তা বলছিস মেহের, স্বপ্ন দেখছিস না তো ?
- আরে না রে, আমার সব মনে আছে, এই বাগানে আমি খেলা করতাম বাবা আমাকে রবিবার করে পিয়ানো শেখাতেন । একটি কুকুর ছিল পেগি, ও আমার সাথে ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওখানে খেলতে যেত । ওখানে ইউক্যালিপ্টাস বন আছে । এই বাড়ির পেছনে একটা কবর আছে । সাইমন রয় এর, আমার দাদু হন ।
- চল তো দেখি, শিরিন কৌতুহলী । মেহেরকে আবিস্কার করতে চাইছে ।

বাড়ির পেছন দিকটা আগাছায় ভর্তি । তারই মধ্যে একটি আকাশচুম্বি ওকগাছের নিচে সত্যি একটি কবর রয়েছে । পাথরের ফলকে খোদাই করা *সাইমন রয়, নেভার বর্ন নেভার ডাইড অনলি ভিসিটেড দিস প্লেস ফ্রম ১৯০১ টু ১৯৬০।*

শিরিন হতবাক । মেহের ঝুঁকে পড়ে দেখছে কবরটা ।

অন্যবন্ধুরা হলঘরে বৃদ্ধকে ঘিরে বসে আছে । বৃদ্ধ একমনে বাজিয়ে চলেছেন পিয়ানো ।

ঘরের আসবাবপত্রে ধুলোর গন্ধ । এককোণায় একটি স্ট্যান্ডে বুনোফুল সাজানো । কিছু শুকিয়ে গেছে । ঝরে গেছে পাপড়ি । মেহের মন্ত্রমুগ্ধের মতন ঘরে ঢোকে । মেহেরকে দেখে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন- তুমি কেমন আছো ডোরা ?

-ভালো, মেহেরের সংক্ষিপ্ত জবাব ।

ঘরের বাকি লোকেরা হাঁ করে চেয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে।

মেহের কে ভদ্রলোক ডোরা বলে ডাকলেন না ? মেহের তো উত্তরও দিল । করো মুখে কথা নেই ।

তারপর ওরা চলে এলো । নিচে । যেখানে ওদের অন্য দুজন বন্ধু অপেক্ষা করছে । মেহের এলো না। ও আসতে চাইলো না । কিছুতেই ।

-আমার বাড়ি ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে আমি যাবো না ।

বৃদ্ধ মিটিমিটি হাসছেন ।

হতভম্ব বন্ধুরা কি করবে ভেবে পায়না । মেহের তো ফিরবেই না বলছে । ওকে ছাড়া ওরাই বা ফিরে যায় কি ভাবে ? একেই এইজন্মের বাবা ওকে আসতেই দিচ্ছিলেন না । তার ওপরে ওকে না নিয়েই যদি ওরা ফিরে যায় তাহলে আর রক্ষে থাকবে না । আর এইসব উদ্ভট কথা মেহেরের বাড়ির লোকেরা বিশ্বাস করবে না । ভাববেন যে ওকে কোথাও একা ফেলে এরা পালিয়ে এসেছে । মহাসংকটে পড়া গেছে । কোন আলোর হদিস মিলছে না ।

মেহের ঘুরে বেরাচ্ছে । সারা বাড়ি । পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে ডোরাকে । ওর পূর্বজন্মের সব স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে । ওর বেডরুমটা সেই ভাবেই সাজানো । ডাইনিং হল । সেই কাপবোর্ডটা রয়েছে । প্রার্থনা ঘর । দন্ডায়মান যীশু । মোমদানি । মা মেরীর কোমল মুখখানি যেই মুখপানে চেয়ে মেহের নিজের মায়ের অভাব ভুলে যেত । ঠাকুর্দা সাইমন, বাবা ও আয়া লুওর্ডেসকে নিয়েই তো ছিল তাদের সংসার । সবাই তাকে কত ভালোবাসতো । তারপর একদিন ঠাকুর্দা মারা গেলেন । কবরে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে ।

এরপরে প্রতিদিন সকালে ডোরা লিলি ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিত তাঁর কবরখানি । পাতাঝরার মরশুমে যখন পাতায় পাতায় ঢেকে যেত কবরটি,ছোট্ট ডোরা তার কোমল হাতে সব ঝরাপাতা সরিয়ে সাফ করে দিত । মনে হত সাইমন কথা বলছেন । ঠাকুর্দার অভাব কোনদিন বোধ করেনি । মনে হত তিনি ওর সাথেই আছেন, সদা হাস্যময় । তারপর এলো সেই রাত । সেই ভয়ানক রাত । কুয়াশায় মোড়া, এক হাত দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না । পাহাড়ি পথ এক সাদা সরের আস্তরণে ঢাকা । সেই অভিশপ্ত রাতে এক মারাত্মক গাড়ি দূর্ঘটনায় ডোরা মারা গেল । মারা গেলো লুওর্ডেস ও গাড়ির ড্রাইভার । তারপর আর ডোরার কিছুই মনে নেই । আজ এতবছর পরে এই বাড়িতে এসে বাবাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে । কিন্তু বাবা কি করে জানলেন যে সে আসবে? উনি তো অবাক হননি । শুধু শুধালেন ও কেমন আছে ।

দলবল মিলে ফিরে এল শহরে । সবার আগে যাওয়া হল মেহেরের বাড়ি । যেতেই হবে । ওর বাবা সব শুনে টুনে রাগ করলেন না কিন্তু । খুব অবাক হলেন । তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বলে উঠলেন -আমাকে নিয়ে যাবে সেই বাড়িতে ?

কিন্তু রাত গাঢ় হয়েছে । তাই ঠিক হল পরদিন যাবে । ওদের মধ্যে দুজন মেহেরের বাবা ও মা কে নিয়ে পুনরায় রওনা দিল । পরের দিন প্রত্যুষে । শক্তিগড় হয়ে দুর পাহাড়ে, রায়কুঠি ।পায়ে পায়ে গেটের কাছে পৌঁছে সবাই বোবা হয়ে গেল । গেটে একটা ভাঙা তালা ঝুলছে । বাড়িটি জনমানবহীন ।

দরজা জানালা ভেঙে পড়েছে । কোথায় সেই পিয়ানোর মিঠে সুর ? কোথায় সেই বৃদ্ধ যাঁকে মেহের বাবা বলে সম্বোধন করছিল ? মেহেরেই বা কোথায় ? অথচ গতকাল তো বাড়িটা ঝকঝকে ছিল । আশ্চর্য ।গেটে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটি ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল । ওরাও সদলবলে ঢুকে গেল ভেতরে ।

পোড়োবাড়িই বলা চলে । শিরিন ওদের বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেল । ঐ তো সাইমনের কবর টি। তার পাশে আরো দুটো কবর । কিন্তু এই দুটো তো কাল দেখেনি । ঝুঁকে পড়তেই দেখা গেল একটি ডোরা ও অন্যটি পিটারের কবর । মনে হল তিনখানা কবর কেউ যেন ঝরাপাতার আড়াল থেকে বার করে রেখেছে । ওদের দেখার জন্যে । কিন্তু কাউকেই তো চোখে পড়ছে না ! এবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল ওরা । ধুলোয় ভরা ঘরদোর । সোফা আছে বটে কিন্তু শতছিন্ন । মাকড়সার জাল হয়ে আছে । আর ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে মেহের ।

ওরা এগিয়ে গিয়ে মেহেরকে দেখছে। ওর মা তার গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। মেহের চোখ খুলছে না। ঘরে যেন বাতাস নেই। দমবন্ধ হয়ে আসছে। ধুলোর গন্ধটা বুকে চেপে বসছে। মেহেরের মায়ের চোখে জল। বাবা নির্বাক। বন্ধুরা নিশ্চুপ। এক অদ্ভুত ছন্দে ধীরে ধীরে মেহের হয়ে গেছে ডোরা। প্রাচীন মিশরের মমিদের মতন। এক অচল সত্ত্বা যাকে কাল বাহুডোঁরে বাঁধতে পারেনা। কখনো কখনো সেই চেতনা ধরা দেয়, ডোরা হয়ে কিংবা মেহের। আবার হারিয়ে যায়, ক্ষণিকের তরে কিংবা চিরকালের জন্যে।

আর তালকাটা, সুরকাটা একদল মানব ছিন্নপত্রের মতন ঝরে পড়ে রায়কুঠির অচেনা বাগানে। যেখানে গতকাল ফুটে উঠেছিল বসন্ত। অমল সবুজ মূহুর্ত। আজ সেখানে শীতের রুক্ষতা। নি:স্তব্ধতা। সব হারানোর বেদনা, হাহাকার।তবু তো যেতে হবে!

শিরিন অস্ফুটে শুধায় -- লাস্ট রাইট কি হিন্দু মতে হবে?

মেহেরবিহীন বিবর্ণ পথে একবুক হতাশা নিয়ে দলটি পুনরায় রওনা দেয় শহরের পানে, ক্লান্ত চরণে।

# মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা

মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা থাকেন ব্যাঙ্গালোরে ৮০০ স্কোয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাটে । মোদিকেয়ারের ব্যবসা করেন । স্বামী একটি প্রাইভেট কলেজে ল্যাবে কাজ করেন । একটি ছোট মেয়ে আছে মধুমন্তী নাম তার, মধুমাখা সরল একটি অস্তিত্ব । ব্রাগাঞ্জা বিয়ের আগে ছিলেন কমলা ঘোষ । এখন মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা বলেই সবাই চেনেন । লক্ষ্মী মন্ত মেয়ে, সুন্দরী সুশীলা তাই দিদিমা নাম রেখেছিলেন কমলা । সেকেলে নাম যদিও কিন্তু দিদিমা যখন রেখেছেন সেই নামই শিরোধার্য ।

কমলা এই মহল্লায় একমাত্র বাঙালী বধূ । পাড়ার অন্য মহিলারা ওর সঙ্গে মেলামেশা করেনা । কেবল মোদিকেয়ারের প্রয়োজন হলে আসে । মোদিকেয়ারের প্রোডাক্ট গুলো বেশ ভালো । তাই মাঝে মাঝে কমলা ওরফে মিসেস ব্র্যাগাঞ্জার কাছে ওরা আসে ।

ফ্ল্যাটের মহিলারা অবশ্য মধুমন্তীর সাথে বাচ্চাদের মিশতে দেয়না যার মূল কারণ কমলার মনে হয় ওরা মাছ খায় বলে । ননভেজ খাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকবার খোটা দিয়েছে ওকে । ছোট্ট মধুকে স্কুলে ভর্তি করতেও ভারি বিপদে পড়তে হয়েছিল ওদের । বাঙালী বলে কোন কেজি স্কুলের কেউ ইন্টারভিউতে ডাকলো না। পাশের বাড়ির বাচ্চারা গটগট করে গিয়ে ভর্তি হয়ে এলো । অথচ মধুর বেলায় সব ফাঁকি । খুব দু:খ হয় কমলার, মিসেস ব্র্যাগাঞ্জার, চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ।

এই পরবাসে একাকীত্ব বড় বেদনাদায়ক । স্বামীর স্বল্প আয় । বাঁধাধরা খরচ । মোদিকেয়ার করে কিছুটা সাহায্য করা । মেয়ে বড় নাহলে কাজ করা মুস্কিল । বিশ্বস্ত লোক পাওয়া সহজ নয় আর বেশি ভালো লোক আনতে গেলে অনেক টাকার দরকার । তাই কমলা বাড়িতেই আছে । নাহলে ব্যাঙ্গালোরের মতন জায়গায় কেই বা ঘরে বসে থাকে । মোদিকেয়ার করে যা আয় হয় সংসারের প্রয়োজনে লাগায় । সস্তার বাজার থেকে সবজি কেনে । হোলসেলের দোকান থেকে পোশাক কেনে । বছরে একবার বেড়াতে যায় কাছাকাছি কোথাও ।

বেড়ানোর ব্যাপারে তার স্বামীর কোন আপত্তি নেই । কবি মানুষ তাই হয়ত এই সমস্ত সুক্ষ্ম ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দেন । যতই পয়সার অভাব হোক কিছুটা জমিয়ে নিয়ে বছরে এই বেড়ানোর প্রোগ্রামটা কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন রেমো ব্র্যাগাঞ্জা । কমলার স্বামী । পদবীটি ছাড়া যার পর্তুগিজত্ব কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই ।

ভালো বাংলা পারেন অবশ্য তারা এখন বাঙালীই । কোন এক পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বাংলায় তারপর থেকে বাঙালি সংস্কৃতি মজ্জাগত হয়ে গেছে । চমৎকার কবিতা লেখেন ।

কথা ভেঙে যায়, কথারা কাঁদায়

*শব্দঝরা পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে*

*আমি কথা সাজাই ।*

*চাওয়া পাওয়ার সাজে*

*একের পর এক এসে ওরা দাঁড়ায়,*

খোলা জানালায়

*সেই জানালা আকাশ হয়ে ধরা দেয়*

*রামধনু সন্ধ্যায়*

*আমি আকাশে কথা কবিতা লিখি* ---

বেঙ্গলি এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রূপকথা নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা চালান । নিজেরাই লেখেন । কমলা রেসিপি কন্ট্রিবিউট করে পত্রিকায় । অসম্ভব ভালো রাঁধে কমলা । ওর মাটন বিরিয়ানি খাওয়ার জন্যে বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের অনেকেই পাগল । কাঁঠালের সন্দেশটাও দারুণ বানায় । দুর্গা পুজোয় এসোসিয়েশনের মেনু সিলেক্শন ওকে ছাড়া হয়না । বেগুনের চপ ওর হাতেই প্রথম খেয়েছিলেন মোদিকেয়ারের ওদের জোনাল ম্যানেজার । অসাধারণ । বেগুনের মতন এত জোলো জিনিস যে এরকম সুস্বাদু হতে পারে তা ছিল ম্যানেজার মিস্টার বাত্রার চিন্তার বাইরে ।

ইউ আর আ ডিলিজেন্ট ওয়াকার অ্যান্ড অ্যা ন ওসাম কুক । মিস্টার বাত্রা খুশি । খুশি কমলা, মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা ।

অতি অল্পেই খুশি হতে পারে কমলা । কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও সে খুঁজে নিতে পারে আনন্দ । ওর মতে সবার নিজের নিজের প্রায়োরিটিস থাকে । পেলে ভালো না পেলে অন্য কিছুতে আনন্দ খুঁজে নাও ।

সাধারণ বধূর অসাধারণ জীবনদর্শন মুগ্ধ করে কবি রেমো ব্র্যাগাঞ্জাকে । তাকে নিয়ে আজকাল কবিতা লেখে রেমো রূপদর্শী ছদ্মনামে । বেঙ্গলী এসোসিয়েশন থেকে একটি বইও বেরিয়েছে । কবিতার বই -- জীবনের নানা ছন্দে ।

জীবনের নানা ছন্দে হারিয়ে যায় সোনার সম্ভবনা । লেখার হাত ভালই ছিল রেমোর । সংসারের টানাপোড়েনে সব চৌপাট হয়ে গেল । মধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন কমিটমেন্টে ফেঁসে গিয়ে তার আর কবিতা করা হলনা । হলনা বোধ সাগরের শঙ্খ, নুড়িগুলো কুড়িয়ে যতনে সাজানো ।এখন শুধুই শখের কবি । যখন দেখে কানাকড়ি যোগ্যতা হীনেরা পয়সার অথবা টেকনোলজির জোরে কবি হয়ে বসেছে খুব বিরক্ত লাগে । ভাগ্যকে দোষ দেয়না । কিন্তু দুঃখ তো হয়ই । কাঁদে রেমো ব্র্যাগাঞ্জা । যন্ত্রণা ভোলে জয় গোস্বামী পড়ে । এমন করে মনের কথা উনি লেখেন বড্ড ভালো লাগে ।

===

ফ্ল্যাটের মহিলারা কমলাকে এড়িয়ে চলে । বেশির ভাগই সফটওয়ারের লোক । কেউ ইনফোসিসে কেউ মাইন্ডট্রি আবার কেউ উইপ্রোতে কাজ করে । যত না ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি মাইনে পাওয়া এইসব কর্মী ধরাকে সরা জ্ঞান করে । নিজেদের সৃষ্ট জগতে এরা বাদশা । মেকি আচার ব্যবহার, অপরকে হেয় করা এদের কাছে জলভাত ।

যারা কম মাইনে পান তাদের এরা বিদ্রুপ করে - আরে ও তো মাসে ১৫০০০ পায় ওর নুন আনতে পান্তা ফুড়ায় ও আবার এটা করবে কি করে ? বা ও আবার বড় শপিং মলে ঢুকেছে দেখো ।

আবার আজকাল সফটওয়ারের লোক নাহলে ব্যাঙ্গালোরের নামজাদা স্কুলগুলো ছানাপোনাদের নিতে চায়না ।

এরা মোটা ডোনেশন দিতে সক্ষম এছাড়া এরা বেশিদিন একজায়গায় থাকে না । আজ এখানে কাল ইউ এস ফলে আবার নতুন বাচ্চা নেবার ছলে আরো টাকা হাতানো যাবে । ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে এরা কি শিক্ষা দেবে ছাত্রদের ? তাইতো অনেক অনেক কাপেল আজ স্বেচ্ছায় নি:সন্তান । টাকা কামানোর যন্ত্র তৈরি করে কি লাভ আছে কিছু ? মানুষের পেট থেকে মেশিন প্যায়দা করার চেয়ে থাক কোল শুন্য আমার !

ওরা কমলাকে এড়িয়ে চলে, সংবেদনশীল মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা কষ্ট পায় কিন্তু মুখে প্রকাশ করেনা । অবহেলা সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে । নরম সরম মেয়েটি ওদের সব বিপদে পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করে । এই যে ওর স্বভাব । আর স্বভাব বদলানো সবচেয়ে শক্ত । তবুও আঘাত আসে । বিপদ কেটে গেলেই স্বরূপ ধারণ করে তারা ।

ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্যাম মিডিওকার বেঙ্গলী ওয়াইফ কথাগুলো ভেসে আসে মাঝে মাঝে ।

ভেসে আসে বিদ্রুপের তিক্ততা মাখা হাসির আওয়াজ ।

বাঙালিদের ওপর ওরা যেন হাড়ে চটা । সুযোগ পেলেই চিমটি কাটে । এত পিছিয়ে থেকেও যেই জাতের কবলে অস্কার আর নোবেলগুলো চলে যায় তাদের ভার্বালি ছোট করা ছাড়া আর কিইবা করনীয় আছে ?

অবাক লাগে মিসেস ব্র্যাগাঞ্জার এরা কবিতা পড়েনা, চটুল হিন্দী গান ব্যাতীত অন্য গান শোনে না । বাঙালী কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, নাচে, জীবনের সুক্ষ্ম জিনিসকে গুরুত্ব দেয় । তারা বেনিয়া শ্রেনী নয় এটাই ওদের দোষ । সবকিছু থেকে কি করে পয়সা এক্সট্র্যাক্ট করতে হয় তা এদের থেকে শিখতে হয় । শেয়ার বাজারের ডেটা যেন জানা খুব জরুরি, বদলে কাহলিল জিব্রান জানলে সেটা অযোগ্যতা, কুঁড়েমি, আঁতলামো ।

শিল্প নিশ্চয়ই প্রয়োজন, শিল্পই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে কিন্তু ফাইনার থিংস অফ লাইফকে তো অবজ্ঞা করা যায়না, মানুষের বাঁচার রসদ তো সেটাই ! নাহলে কিসের জন্য শিল্প ? শুধু কাজ আর কাম ? মদ মেয়েমানুষ আর মোচ্ছব ? ৩৪ ২৬ ৩৪ মাপের সুন্দরী বৌকে গলায় লটকে পার্টিতে ঘুরে বেড়ানো, স্ট্যাটাস বাড়ানো। মোটা হয়ে গেলে বা ব্রেস্ট ক্যান্সারে একটা ব্রেস্ট বাদ চলে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দাও ।

ডাক্তারকে বলা হবে - একে নিয়ে আমি কি করবো ? সোসাইটিতে মুখ দেখাবো কি করে ?

এসব দেখে কমলা নিরাশায় ভোগে । মনে মনে ভাবে এই যদি কর্মঠ, মর্ডান মানুষ হয় তাহলে তারজন্য

দোপেয়ে হবার কি খুব প্রয়োজন আছে ?

প্রতিটি জিনিসকে তার নিজের স্পেস টুকু ছাড়তে হয়না কি ।জীবনের অপর নামই তো গোষ্ঠি বদ্ধতা ।

শুধুমাত্র একটি ধারা বা স্রোত অবলম্বন করে বাঁচা যায় ? জীবন কি করে সেই পথে চলতে পারে ?

===

কমলা বাড়ির কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি করে মাঝেমাঝে । ইমেল করে, চ্যাট করে, পেন্টব্রাশ খুলে ছবি আঁকে ।

মধুমন্তীও আজকাল পেন্ট ব্রাশে ছবি আঁকে মানে আঁকার চেষ্টা করে । এলোমেলো হয়ে যায় তুলির টান, কমলা দেখে, একমনে দেখে । নিজের শৈশবের কথা মনে হয় । বাবা কত যত্ন করে তাকে মানুষ করেছিলেন । বড় আদরিনী ছিল সে বাবার । মায়ের ততটা নয় । মা সুন্দরের ভক্ত । দাদা সুন্দর তাই দাদা প্রিয় । কমলা কুৎসিত নয়

তবে চেহারায় কোন স্ট্রাইকিং ফিচার নেই । ভোঁতা নাক, গোলগোল দুটি চোখ, আলুর মতন গাল আর মোটা ধ্যাপসা দেহ । ফিগারের কোন মা বাপ নেই । ফিমেল কার্ভস হারিয়ে গেছে মেদের আস্তরণে । ভেরি ডিপ্রেসিং ।

তবুও ও উঠে আসে রূপদর্শীর ছন্দোবন্ধনে । সৌন্দর্য্যের বসবাস তো কবির আঁখিপল্লবে । মনের আর্দ্রতায় ।

অনুভবের সুক্ষ্মতায় ।

সেদিন সকাল থেকেই ব্যাজার মুখ ব্র্যাগাঞ্জার । যদিও সুগৃহিনী, রন্ধনে পটিয়সী বৌয়ের বানানো গরমাগরম আলু পরাঠা খাওয়া হল, ফুলকপির সবজি দিয়ে, শেষ পাতে রাবরি -কে সি দাশ থেকে অনেক দাম দিয়ে কিনেছে, মাঝে মাঝে খায় । কে সি দাশের জিনিসের বড় দাম তবুও বাঙালীরা খায় । বি পি ও আর সফটোয়ারের জন্য লোকে ভাবে ব্যাঙ্গালোরের বাঙালীরা সবাই বড়লোক । আদতে সাধারণ লোকও যে প্রচুর সে খবর আর কেই বা রাখে ?

আই আই এস সি, রমন রিসার্চ ইন্সটিটিউট এসবে তো বেশির ভাগই বাঙালী ! তাদের যেন বাঙালী মিষ্টি খাবার কোন হক নেই।এ শুধু বড়লোকের জায়গা । যত পারো দাঁও মারো !

যাইহোক রেমোর আজ মুড বড্ড খারাপ কারণ তার কম্পিউটার খারাপ । ভাইরাসের উপদ্রব নাকি হার্ডডিস্ক গেছে বোঝা যাচ্ছেনা । লোক ডাকা হয়েছে কিন্তু তাদের মর্জি হবে তবে তেনারা আসবেন । বিকেল গড়িয়ে পরের দিন দুপুর । লোকের দেখা নেই । রেমো ব্র্যাগাঞ্জা টুকটাক কাজ জানে কিন্তু মেশিন খুলতে ভরসা পায়না । তাই অধীর অপেক্ষা লিখে চলে তার নিজের ডাইরি ধূসর কলমে ।

পাক্কা চারদিন পরে এসে হাজির হল হামির । কম্পিউটার এক্সপার্ট । কোন ওয়েবসাইট হ্যাকিং করেছিল তাই চাকরি থেকে বিতাড়িত । কোন ভদ্র নামী কোম্পানী ওকে আর কাজে নেবে না কোনদিন । কিন্তু ছেলেটি কম্পিউটার জিনিয়াস । তাই সুদূর গুরগাঁও থেকে সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্গালোরে এসেছে যদি কোন সুবিধে হয় এবং এসেই একটি ছোট হার্ডওয়্যার কম্পানিতে কাজ পেয়েছে । রাঘবেন্দ্র ধনসুইয়া মালিকের নাম । হামিরকে পেয়ে ওনার ব্যবসা দৌড়াচ্ছে । হ্যাকিং সংক্রান্ত বদনামের জন্য টাকাও বেশি নিচ্ছেনা কারণ জানে তাহলে চাকরি পাবেনা । বাজার দরের থেকে অনেক কমে হয়ে যাচ্ছে । ঝানু ব্যবসায়ী ধনসুইয়া আরো ধনবান হচ্ছেন । অঢেল ধন -- সুই করে তার সিন্দুকে প্রবেশ করে ব্যালেন্স শীট সমৃদ্ধ করছে ।

কমলা একা বাড়িতে । পড়ন্ত দুপুর । নীরব পাড়া । হামির এসেই একগাদা ফিরিস্তি দিল । এই করুন সেই করুন । রেমো ব্র্যাগাঞ্জা বাড়ি ছিলনা । থাকার কথাও নয় ।

এই সময়ে বাড়ি থাকবে কি করে ? অফিসে গেছে । তাই কিছুটা সমস্যা বুঝে নেওয়া যাক ভেবে

কৌতুহল বশতঃ মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা জিজ্ঞেস করলেন - হার্ড ডিস্কের সমস্যা কি ?

-নাহ্ ।

-তাহলে?

আপনি বুঝবেন না ।

তবুও শুনিনা পরের বার সতর্ক থাকবো ।

মুখে একরাশ বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে হামিরের । মহিলা নাছোড় বান্দা । এমনটি তো দেখা যায়না । ঘরোয়া মহিলারা তো তাদের দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায় ! এ মাল কোন ঘাটের জল খেয়েছে? আর এক সাধারণ মহিলা তার মতন তুখোড় টেকির এত পরীক্ষা নিচ্ছে কেন ? বরকে বল্লেই হয় হামিরকে কল করতে তাহলে ওকেই বরং কিছুটা বলবে । খুলে বলবে না । বুঝবে তো না কিছুই শুধু একগাদা কথা খরচ হবে । হামির আবার খুব গম্ভীর প্রকৃতির । তবুও মহিলা ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে । শেষে সে বলে উঠলো - আপনার **ও এসটা** রিলোড করুন তাহলেই হবে, হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ করেনি ।

কমলার মুখে মৃদু হাসি---ওপারেটিং সিস্টেম রিলোড না করে যদি রেস্কিউ ডিস্ক দিয়ে রিকভার করা যায় ভালো হবে । ও এস রিলোড করলে অনেক ফাইল নষ্ট হয়ে যাবে, অনেক সফটওয়ার ডিলিট হয়ে যাবে । তাইনা ?

হামির অসম্ভব রেগে গেছে - আমি প্রফেসর মুলচন্দানির প্রতিবেশী ছিলাম অ্যান্ড হি ইজ আ কম্পিউটার জিনিয়াস !

- নট অনলি জিনিয়াস, হি ওয়াজ ইন দা ইনটেল ব্রেক থ্রু চিপ ডিজাইন টিম ! অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ আই আই টি কানপুর আই মেট হিম ইন আর্লি নাইন্টিস । কমলা শান্তভাবে বলে ওঠে । হামির হতবাক ।

মহিলা বলেন কি ? কমলা বলেই চলে --

- প্রফেসর মুলচন্দানি ইজ আ গুড ফ্রেন্ড অফ স্ত্রুসস্ত্রুপ -Stroustrup দা সি প্লাস প্লাস ক্রিয়েটার । আই ডোন্ট থিংক সি প্লাস প্লাস ইজ আ নাইস ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট র‍্যাদার ডার্টি ল্যাঙ্গুয়েজ । এটা তো ওদের ডিনোটেশনাল সিমেন্টিক্স দেখলেই বোঝা যায় ।

হামির এবার পড়ে যাবে । কি বলছেন এই সাধারণ গৃহবধূ ? এতো কম্পিউটার বিজ্ঞানের গোঁড়ার কথা ! ইনি জানলেন কি করে ?

উত্তেজনায় জিগেস করেই ফেলে - আপনি এতকিছু জানলেন কিভাবে ?

মিসেস কমলা ব্র্যাগাঞ্জা হারিয়ে যান অতীতে । বিবর্ণ দিনগুলো উজ্জ্বল ছবির মত উঠে আসে স্মৃতির পাতা থেকে ।

কানপুর আই আই টির কম্পিউটার সায়েন্সের প্রথম হওয়া ছাত্রী ছিলেন কমলা ঘোষ । ধীর স্থির কমলা সেইসব দিনে শুধুই পড়তেই ভালোবাসতেন । বই বই আর বই ছিল তার সাথী । লাইব্রেরীতে বেশি সময় কাটাতো।

শুধু ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট রেমো ব্র্যাগাঞ্জার সাহচর্যে ভিন্ন স্বাদ আসতো জীবনে । রেমো কবিতা লিখতো, পাঠ করতো কমলা শুনতো। ভালো লাগতো, মনকে ছুঁয়ে যেতো সেইসব লেখা । নিজে কবিতা লিখতে পারতো না । মাঝে মাঝে বলতো- কিভাবে এই সুন্দর কবিতাগুলো লেখো বল দেখি ?

কেন তুমি প্রবন্ধ লেখো তো, তার ফর্মটা পাল্টে দাও কবিতা হয়ে যাবে ।

ধ্যাৎ: ! কি যে বল ! ওরকম আবার হয় নাকি ?

ঐভাবেই হয় কমলা দেবী, দ্যাট্স ক্রিয়েটিভিটি ।

কমলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো সাধারণ ল্যাব অ্যাসিস্টেন্টের দিকে, চোখের পলক পড়তো না।

রেমোর কবিমন এড়াতে পারেনি সেই মুগ্ধতা। স্বপ্নের জাল বুনে চলে ভাবুক হৃদয় । বাস্তবে যে অসম্ভব । ফার্স্ট গার্লের সঙ্গে বিয়ে ? তাও আবার বিরাট নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীর মেয়ে কমলা যাঁর অপর সন্তান নাসায় একজন প্রথম সারির অস্ট্রো ফিজিসিস্ট তার পতিত্ব তো কল্পনারও অতীত ! রেমো শুধু সাধারণ চাকুরেই নয় অত্যন্ত সাধারণ পরিবার তার । বাবা ছাপোষা তবলা বাদক, মা টেলারিঙ শপ চালান । রেমো শুধু কবিতা লেখে, ওর দুচোখে মননশীলতার ছবি । সেই ছবিতে আটকে গেছে সরল, বিদূষী কমলা যে কবিতা লিখতে পারেনা বলে বড়ই ব্যাথিত ।

তবুও ভালোবাসা সত্যি হলে অনেক বড় চাপকেও নতিস্বীকার করতে হয় সত্যের কাছে । জয় হয় প্রেমের ।

ওদের বিবাহ হয় । কমলাকে বাড়ি ছাড়তে হয় । চিরতরে । ওর একমাত্র দাদাভাই, যে ওকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতো সে আজকাল নিজেকে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান বলে পরিচয় দেয় ওরা শুনেছে ।

কমলা অনেক তর্ক করেছে । বলেছিল - আমার টেকনিক্যাল ব্রেন হতে পারে দ্যাট ডাজেন মিন রেমো ইস মিডিওকার । হি ইস আ পোয়েট । আই কান্ট রাইট সাচ নাইস পোয়েমস্ ।

আগাগোড়া বিজ্ঞানীর পরিবারে সাহিত্যের কোন জায়গা নেই । নেই কবির কদর । তাদের কাছে সাহিত্য মানে আর্টস । আর আর্টস তো বোকারা পড়ে ! বিজ্ঞান না পড়লে সে আবার মানুষের বাচ্চা নাকি ?

সাহিত্য যে আর্টস নয় সাহিত্যই জীবন, ১ আর ২ য়ের মাঝে যে আরো অনেক কিছু আছে মাথার ওপর আছে হৃদয়, অনুভূতি সে বাড়ির লোককে বোঝায় কে ?

গুচ্ছের অঙ্ক না করার অর্থ হল লাইফ টোটাল ফেলিওর । মননশীলতার কোন স্থান নেই কমলার পরিবারে । অথচ তারা রেমব্রান্ট দেখে মুগ্ধ, বিঠোফেনের সুরের জাদুতে মোহিত ।

তাহলে ? কাউকে না কাউকে তো ঐ চরিত্রগুলোতে অভিনয় করতে হবে জীবনের রঙ্গমঞ্চে । তাইনা ?

তবে তারা সম্ভবতঃ কমলার বাড়ির লোক হবেনা । আবার সত্যি সত্যি হয়ে গেলে হয়ত মত পাল্টেও যেতে পারে । কে জানে ? মানুষের মন তো ! অনেক রথী মহারথীও ঘায়েল হন স্বীকৃতির কাছে ।

কমলা বেজায় লড়াই করেছিল । কিন্তু সেগুড়ে বালি । শেষ সম্পর্কের সুতো টুকুও ছিঁড়ে গেল।

বাবা ! বাবাকে ওরা কমলার কাছে আসতে দিল না ।

-এন্ট্রি টু আই আই টি ডাজেন্ট মিন আদার্স আর হোপলেস । ব্রেনের গঠণ এক একজনের এক এক রকম হয় । কেউ জন্মান আইনস্তু হবার জন্য, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ দার্শনিক আবার কেউ কবি । কোন অবস্থাতেই এই সীমারেখাগুলো ওভার্ল্যাপ করেনা । ডোন্ট ট্রাই টু ক্ল্যাসিফাই পিউপেল ইন সাচ আনফেয়ার অ্যান্ড ফুলিশ ম্যানার ।

কিন্তু কে শোনে কার কথা ? যে যত জানে সে তত অহংয়ের শিকার । জানা যে অত সহজ নয়, সারাটা জীবনেও যে কিছুই জানা যায়না সেই বোধ পন্ডিতদের মধ্যে বিরল ।সিংহভাগ ক্ষেত্রেই তাদের জীবনের ষোলাআনাই ফাঁকি হয়ে যায় । বিনম্রতার অভাব তাদের বোধকে সমৃদ্ধ হতে দেয়না । একটা জায়গায় তারা আটকে যান, চক্রবুহ্যের বেরোনোর পথ যে তাদের অজানা । কোনদিন সেখান থেকে বেরোতে পারেন না ।

সেই ক্লোজড চক্রবুহ্য অনেকসময় মুক্ত বাতাসের অভাবে আরো অনেক অভিমন্যুর বধের কারণ হয় ।

আপনার জীবন নিয়ে গল্প লেখা যায় মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা । হামিরের কন্ঠস্বর ভেসে আসে ।

-আমাদের প্রত্যেকের জীবনই তো এক একটা গল্প মিস্টার হামির ! আপনার জীবনে গল্প নেই ? গল্পগুলোই তো লেখকেরা দক্ষ হাতে, নির্মল সুষমায় লিপিবদ্ধ করেন । জীবনকে বাদ দিয়ে কি উপন্যাস হয় ? শুধু কল্পনা শক্তির ওপর ভরসা করে কোন কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভব নয় । মানুষই জীবন, জীবনই গল্পের অনুপ্রেরণা, তাইনা ?

সন্ধ্যা লগ্নে ধূমায়িত কফির কাপ হাতে হামির বারান্দায়, সদ্য তারা ওড়না জড়ানো আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে, সদ্যপ্রয়াত সিডনি সেল্ডনের বইতে পড়া সেই লাইন কটি -

দা স্টারস শাইন ডাউন অ্যান্ড ওয়াচ আস লিভ

আওয়ার লিটিল লাইভস্, অ্যান্ড দে উইপ ফর আস ।।

হামিরের জীবনও তো একটা গল্পই । বলবে কি সেই গল্প মিসেস ব্র্যাগাঞ্জাকে ? উনি জানতে চাইছেন !

# জীবন যেরকম

ওরা চারজন । সবাই কলেজের দিদিমণি । ঋতা, সুব্রতা, কেয়া আর বাসন্তী । সবাই অবিবাহিতা, মধ্যবয়স্ক । প্রায় চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ । পড়ন্ত বেলায় চলেছে ঘাটশিলা বেড়াতে । ভোর বেলা হাওড়া স্টেশানে এসে বড় ঘড়ির নিচে জমায়েৎ হল সকলে । তারপর টাটানগর গামী ট্রেনে চড়ে রওনা । পথে চিড়ের পোলাও খাওয়া হল, সংস্কৃতের দিদিমণি সুব্রতা বাড়ি থেকে তৈরি করে এনেছিল । একসঙ্গে চারজন মহিলা । গালগল্পই বেশি হচ্ছিল । কাঞ্জিভরমের কথা, ইমামির নতুন রেঞ্জের কসমেটিক্সের কথা, ফেয়ারনেস ক্রীমের কথা বড়জোর নতুন কোন বাচ্চা দিদিমণির বাচ্চা হবার গল্প নিয়েই ট্রেন উত্তাল । মাঝে মাঝে দু এক লাইন কবিতা ভাসছিল তবে সে সবই একে অন্যকে খোঁচা দেওয়া কবিতা ।

বিয়ের ফুল এদের কারোর জীবনেই ফোটেনি । কেউ দাগা পেয়েছেন কেউ বিয়ের মাপকাঠিতে অযোগ্য হিসেবে পরিগণিত কেউ বা ফেমিনিস্ট মনোভাবাপন্ন । পুরুষ শব্দটা এদের কাছে কিছুটা ধোঁয়াশা, কিছুটা আলেয়া । যেমন ফেমিনিস্ট কেয়া । একবার কলেজের অ্যাকাউন্টস্ এর লেকচারার প্রমোদ ঠাট্টার ছলে বলেছিল- কেয়া, লোভী পুরুষকে কখনো একা ঘরে দেখেছো ?

তখন সব ফেমিনিজম বাতাসে মিলে যাবে । তুমিও দূর্বল হবে । যতই লেখাপড়া করো তোমরা তো মেয়েই ! আমাদের বেপরোয়া হতে, লোভী হতে, নষ্ট করতে তোমরাই তো সিংহভাগ দোষে দুষ্ট ।

কেয়া তো খচে বোম । লাল টুকটুকে গাল আরো লাল হয় । রাগে না লজ্জায় প্রমোদ বোঝেনি।

সুব্রতার এখন মেনোপজ হব হব । তবুও মাঝে মাঝে দু:খ করে ফেলে - টাকা, পয়সা থাকলেই তো জীবনে সব হয়না । দেহের চাহিদা মিটলো কৈ ।

বয়সে অনেক ছোট ঋতা আদিরসের আধিক্যে লজ্জায় মুখ লুকায় । ঋতার বিয়ে হয়নি । বিয়ের বাজারে সে কুশ্রী, কালো, বোঁচা নাক, খুদে চোখ । বাবার টাকার খনিও নেই, অঢেল ক্ষমতাও নেই । নিতান্তই ছাপোষা । বরং দায়িত্ব আছে অনেক । ছোট ভাই, খিটখিটে সুগার রুগি মা, ততোধিক কুশ্রী একটি বোন । কাজেই ঋতার মনের দু:খ মনেই চাপা আছে । তবে সে কোন হ্যাংলামো করেনা । আড়চোখে পুরুষের দিকে চায় । মেল আন্ডার গারমেন্টস এর বিজ্ঞাপন লুকিয়ে দেখে ।

বাকি রইলো বাসন্তী । ভালোবাসতো সরিৎ কে । ব্যাটা আমেরিকায় পোস্ট ডক করতে গিয়ে মেম বধূর গলায় মালা দিল । বাসন্তী আর তার মনোমোহিনী নয় । আজকাল তাই সে পুরুষ জাত টাকেই ঘৃণা করে ।

===

যথাসময় ট্রেন এসে থামলো ঘাটশিলা স্টেশানে । যে যার মালপত্র নিয়ে নেমে গেল । বাংলো কলকাতা থেকেই বুক করে আসা হয়েছে । আসলে বাগানে ঘেরা একটি সুন্দর বাড়ি । বড় বড় গাছ । ঠাণ্ডা জলের কুঁয়ো, বাঁধানো কুঁয়োতলা । অনেক নারকেল গাছ, ফুলের সারি । খুবই মনোরম । দোতলায় ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে । নীচে কেয়ার টেকার সপরিবারে

থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজনে কষা বনমুর্গীর ঝোল খাওয়া হল। তারপর ছোট্ট করে নিদ্রা দিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হল সুবর্ণরেখার ধারে। সুবর্ণরেখা। ভারি সুন্দর নাম। কোন এক সময় নাকি এখানে নদীর জলে সোনার কুচি মিলতো। এখন মরা চর, হাঁটু সমান জল। গ্রীষ্মে প্রায় শুকনো। মানুষজন ঘাড়ে সাইকেল নিয়ে পার হচ্ছেন। মজা লাগে, শহর কলকাতার ভীড়ে ক্লান্ত মানুষের এসবে ভারি মজা লাগে।

- ইস্ যদি এখানে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে পারতাম। বাসন্তী আক্ষেপ করে।

- বোর হয়ে যেতিস। দুদিন ভালো লাগবে, তারপরেই বিরক্তি আসবে, ঋতা সাবধানী।

বাসন্তী নিশ্চুপ। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি বাসায় আর ফিরতে ইচ্ছে করেনা তার। পায়রাদের বকম বকম। স্যাঁত স্যাঁতে শ্যাওলা ধরা দেওয়াল আর টানা রিক্সার টুং টাং শব্দ আজকাল অস্বস্তিতে ফেলে।

পরদিন সকাল বেলা সবাই মিলে যাওয়া হল যাদুঘোড়া দেখতে। ওখানে আগে ইউরেনিয়াম মাইনস্ ছিল। তারপর একটা ড্যাম দেখতে যাবার সময় ওরা একটি অটো ভাড়া করলো। একজন তো সামনে, অটোওয়ালার পাশে বসে যাবার সময় অন্য দিদিমণিদের রগরগে রসিকতায় রীতিমতন লজ্জিত। রাস্তাও হয়েছে সেরকম। বড্ড উঁচু নিচু। খালি জার্কিং হচ্ছে। অটো ওয়ালাও হ্যান্ডেলে হাত রেখে বাঁচতে চাইছে কিন্তু প্রতিবার ক্যাঁচ করে ব্রেক কষেই হেলে যাচ্ছে পাশের ললনার ঘাড়ে। পেছন থেকে উচ্চস্বরে হাসির আওয়াজ। র‍্যাগিং এ মেয়েরাও কম যায়না।

===

মুস্কিল হল ড্যাম দেখে ফেরার পথে। হঠাৎ অটো বিগ্রে গেল। মেয়েরা সব এদিক ওদিক ঘুরে সময় কাটালো। অটো সারানো গেলনা। রাস্তা বড়ই খারাপ ও নির্জন। এটা টুরিস্টদের আসার সময়ও নয় কাজেই অন্য যানবাহন নেই একটাও। অগত্যা ওরা ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ দেবদূতের মতন আবির্ভূত হলেন এক ফরেস্টের রেঞ্জার। জলপাই পোষাকে রমণী মহলে নিমেষেই রবিনহুড। কথাবার্তায় বোঝা গেল উনি নিজের বাংলোয় যাচ্ছেন। মেয়েরা লিফ্‌ট চাইলো। অটো কে একপাশে রেখে সবাই মিলে জীপে চড়ে বসলো। লাল লাল মেঠো পথে ওরা চললো শহর অভিমুখে।

ঋতা আড়চোখে দেখছিল রেঞ্জার সাহেবকে। সুপুরুষই বটে তবে বিবাহিত কিনা বোঝা যায়না। কারণ বয়স বেশ কম। নারীর কৌতুহল, একবার যখন জানতে চান জেনেই ছাড়বেন। তবে ভাগ্য সহায় হল। রেঞ্জার নিজেই বলে উঠলেন- আমার বাংলোয় চা খেয়ে নিন, তারপর আপনাদের পৌঁছে দেবো খন।

সুব্রতা হা হা করে উঠলো। বাসন্তী ওকে আলতো খোঁচা দিল। আসলে তার চায়ের তৃষ্ণাটা ভালই চাগাড় দিয়েছিল। অবশেষে ওরা রেঞ্জারের বাড়ি এসে উপস্থিত হল। উনি বাঘা শিকারী। দেখা গেল অনেক শিকারের ছবি টাঙানো।

- আজকাল বন্যপ্রাণী মারা তো আইনত বারণ, সুব্রতা কৌতুহলী।

- হ্যাঁ, তবে এগুলো সবই অন্য এক জঙ্গলে শিকার করা। এসব এখানে পাবেন না। বলে মৃদু হাসলেন রেঞ্জার বিরূপাক্ষ বোস। উত্তর শুনে সুব্রতার সত্যি ধপ্ করে বসে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

নিটোল ভাবে সাজানো ওনার বাংলো খানি । চৌকিদার টি পটে করে সুবাসিত চা এনে হাজির করলো । সঙ্গে মুচমুচে বিস্কুট ।

এটা সেটা কথার পরে হঠাৎ উনি বলে উঠলেন -- আপনারা যাবার আগে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন । উনি ভেতরে আছেন ।

মেয়েরা খুশি হল । একটু হাসিও পেল । এমন রোমান্টিক পরিবেশে মা কে এনে রেখেছেন । তার মানে বৌ নেই অথবা পালিয়েছে ।

- কিন্তু এরকম হ্যান্ডসাম, বীরপুরুষের বৌ পালাবে কেন ? ঋতা চাপা স্বরে বলে ওঠে ।
- আমাদের মতন সহচরী উদ্ধারে আজন্ম ব্রতী হলে পালাতে পারে বৈকি ? বাসন্তী রসে গদগদ ।

অন্যরা খুব জোরে হাসলো । তাদের হাসির রোলে নীরব বনভূমি কেঁপে ওঠে ।

===

খাওয়া শেষ করে ওরা ভেতরে গেল বনপালকের মাতাজি দর্শনে । বেশ শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো । দূরে খাটের ওপরে গেরুয়া শাড়ি পরা, এক ভদ্রমহিলা চোখ বন্ধ করে ধ্যানে নিমগ্ন । ওরা একটু অবাক হয় । ভদ্রমহিলা কি সন্ন্যাসিনী ? তাহলে মা মানে কি গুরু মা ?

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় । কাছে যেতেই চমকে ওঠে ! নাহ্! একটুও ভুল নেই । সেই মুখ সেই চোখ সেই কপাল । শুধু পরণে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষ ।

ভদ্রমহিলাও চোখ খুলে কম অবাক হননি । এক ঝাঁক পরী তার সামনে ? তাও আবার পূর্বপরিচিত পরী ? থতমত খেয়ে গেলেন নাকি ?

সুব্রতা মনে মনে ততক্ষণে কথা সাজিয়ে নিয়েছে । কি বলবে কেমন করে বলবে -

এ যে তাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর বিমল রায়ের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী নিবেদিতা বৌদি।

কতবার ওনার বাড়ি গিয়ে বৌদির রান্না খেয়ে এসেছে ওরা । তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং কলেজে গিয়ে শোনে বৌদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা । প্রিন্সিপাল সাহেব উন্মাদ প্রায়। রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে এই বয়সে বৌ পালালো ? লোকেই বা কি বলবে ?

ছি ছি ! এ যে কি লজ্জা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । মুমূর্ষ প্রিন্সিপাল সাহেব তাড়াতাড়িই অবসর নিলেন । কত খোঁজা খুঁজি হয়েছে, পুলিশ, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম কিছুই বাদ যায়নি ।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । শেষকালে স্যার ওনার মেয়ের কাছে বিদেশে চলে গেলেন । মেয়ে তো বাবার খুবই কাছের মানুষ । মায়ের ওপরেই খড়্গহস্ত - মা একবারো ভাবলো না বাবার কি হবে ?

যেন মায়ের অনুপস্থিতিটা কিছুই নয়, কোন বেদনা নেই তার জন্য, বাবার কি হবে সেটাই বড় কথা । এই তো সেই মা তাইনা ? কত ঝড় ঝাপটা সামলে যিনি মেয়েকে বড় করেছেন । আত্মভোলা, জ্ঞানপিপাসু স্বামীর সমস্ত অবহেলা মেনে নিয়েও সংসার করেছেন । বিদেশ

থেকে যখন তার স্বামী কিছুই আনেন নি, পরিবারের সবার জন্য এনেছেন, স্ত্রী কোন অভিযোগ করেন নি। কারণ তিনি তো শুধু স্ত্রী। গৃহপালিকা। স্বামীর জীবন সঙ্গিনী নন। শয্যাসঙ্গিনী। দায়িত্ব নেবার মানুষ। কিছু পাবার আশা করাও অনুচিত।

এক মহাশূন্যতা ঘিরে ধরেছিল তাকে। সংসার যে অসার সেই উপলব্ধি ক্রমশই তাকে টেনে নিয়ে যায় বৈরাগ্যের পথে। গঙ্গার ঘাটে এক মৌনী বাবা আসতেন। সাধু সন্ন্যাসীদের চিরটাকাল তার স্বামী হেয় করেছেন। সেই সাধুসঙ্গ করতেই উনি আজকাল সব চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

===

একটা সময় বন্ধন কেটে যায়, চুর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় সমস্ত সংস্কার। দুর হয়ে যায় সব বাধা। তখন অন্তরে থাকে এক প্রবল আকুতি। সেই আকুতি টেনে নিয়ে এসেছে তাকে সাজানো সংসার ছেড়ে পথে। বৈষ্ণব মতে দীক্ষিতা বনপালকের মা আজ দিনের বেশির ভাগটা কাটান পথে পথে মাধুকরী করে। নিশ্চিন্তের জীবন ছেড়ে আজ তিনি আনন্দধামের যাত্রী। এই অনিশ্চয়তা উনি উপভোগ করেন। সামান্য চাল কলাই ওনার কাছে অমৃতসমান। দিনান্তে উনি বনজ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন মানব প্রেমের বাণী।

সর্বত্র ঘুরে ঘুরে - *মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান,* এই গানের অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

কে শ্যাম, কেইবা রাই, কেন শ্যাম মরণ তুল্য ? সেই মরণ কোন মরণ ? এইসব সহজ ভাষায় বলেন। কপালে রসকলি কাটা ঘিঞ্জি কলকাতার ততোধিক ঘিঞ্জি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপালের ঘরোয়া স্ত্রী যিনি কোনদিন চৌকাঠের বাইরে পা রাখেন নি। সব যন্ত্রণা চিরকাল মুখ বুজে সয়ে এসেছেন। সংসারের কল্যাণে।

===

কেয়ার মনে পড়ে কতদিন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বৌদি রাতের খাবার জোর করে খাইয়ে দিয়েছেন। কতবার মনের দু:খ হালকা করার জন্য হাজির হয়েছে বৌদির কাছে। কত মিষ্টি ভাষায় বৌদি সান্ত্বনা দিয়েছেন, নিমেষে মনের মেঘ কেটে গেছে। স্যারের স্ত্রীই কেবল নন, সম্পর্কে বৌদি হলেও মাতৃসমা ছিলেন। কোন নি:স্ব, রিক্ত মানুষ তার দুয়ার থেকে ফিরে যেত না। স্যার অভিযোগ করতেন- কোনদিন বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যাবে ! যাকে তাকে ঢোকানোর কি দরকার কে জানে। ভারতে কি অভাবীর অভাব আছে। শেষকালে না আমিই ফতুর হয়ে যাই।

ওদের কলেজের দারোয়ান বীর সিংএর ছেলের ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার ভার বৌদিই তো জোর করে স্যারকে দেন। ছেলেটি এখন মুম্বাইতে কাজ করে। আর চা সার্ভ করে যেই রত্নামাসি, তার ছোট ছেলে যখন হায়দ্রাবাদে কাজ করতে গিয়ে পায়ে কুষ্ঠ নিয়ে ফিরে এলো তখন বৌদিই তো প্রথম ওকে দেখতে যায়। স্যার বারণ করেছিলেন- কুষ্ঠরোগী বলে কথা। কেয়ার মনে পড়ে বৌদি মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করেছিলেন- সব কুষ্ঠ কিন্তু ছোঁয়াচে নয়।

ওরা চারজন, সংসার করেনি, সংসার পায়নি। বৌদি পেয়েছিলেন। তবুও নিজেকে শৃঙ্খলিত মনে করে সব ছেড়ে চলে আসতে হল বিশ্বসংসারের মাঝে। চাওয়া পাওয়ার হিসেবটা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে ইচ্ছে করে সুব্রতার।

আজ তার ভুবন ময় সন্তান। বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছেন, ভালোবাসার, স্নেহের, মমত্বের।

অদ্ভুত পরিবর্তন - একযোগে মেয়েরা তাকিয়ে থাকে তাদের বৌদির দিকে । স্যারের কষ্ট দেখে যাদের ভেতরে কেউ কেউ কালিঘাটে মানত করে এসেছিল যেন বৌদি শীঘ্রই সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসেন । তারাই আজ ভাবছে - স্যারকে কি বৌদির নবজীবনের কথা জানাবে?

থাক না বিশ্ব মাঝে একটি নিষ্পাপ ফুল ফুটে ! স্যারই তো বলেন বৃহত্তর স্বার্থে ছোট খাটো মিথ্যা বললে কোন দোষ হয়না । সুব্রতার আবার ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির শখ আছে । বিভিন্ন ওয়েবজিনের হয়ে সে লেখে । স্যার পরবাসে বসেই পড়েন ।

এইবারের ভ্রমণ আলেখ্যে নাহয় বৌদি পর্ব অনুল্লিখিতই থাকবে ।

পড়ন্ত বেলায় আবীর রোদে নিজেদের বাংলোর পথ ধরে হেঁটে যায় ওরা । কুঁয়ো পাড়ে একটা কাক বিকট চীৎকার করে ওঠে । কেন জানিনা সুব্রতার আজ সেই চীৎকার কে কোকিলের ডাক বলেই মনে হয় ।

# কুয়াশা

- দার্জিলিং কি কোন বেড়ানোর জায়গা হল ? ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে পিয়া ।

আবীর কাচুমাচু স্বরে বলে- দার্জিলিং দেখিনি যে ।

- বেটা বাঙালি আর ২৫ বছরেও দার্জিলিং দেখিস নি ?

আবীর চুপ । কি করবে কৃপণ পিতা কোনদিন কলকাতার বাইরে নিয়ে যাননি । একবার মাসির মেয়ের বিয়েতে মেদিনীপুরের কাঁথিতে গিয়েছিল । তখন টুক করে দীঘা ঘুরে আসে ভাইবোনেরা মিলে । ব্যাস । তার বাবার মতে বেড়ানো মানে পয়সা নষ্ট । কাজেই ভাবলো এই মওকায় দার্জিলিং যাবে । মওকাটা হল অফিসের পিকনিক । অফিস মানে মফস্ব:লের স্টেট ব্যাঙ্ক । চুঁচুড়ার এই ব্যাঙ্কে সদ্য কাজে যোগদান করেছে আবীর । পিয়া ওর সহকর্মী ।

যথাসময়ে রওনা দিল । ট্রেনে সবাই মিলে খুব হৈ হুল্লোড় হল। সারাটা রাত্রি জেগেই কেটে গেল । পিয়ার নাকি ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম হয়না । আবীর কি ছাই এর আগে কোনদিন লং ডিস্টেন্স ট্র্যাভেল করেছে নাকি ? ও আর কি করে জানবে ওর ঘুম হবে কিনা !

যখন শিলিগুড়ি থেকে ট্রেকারে উঠলো সে কি উত্তেজনা ওদের ।

দার্জিলিং এ পৌঁছে আবীর মুগ্ধ । হিমালয় । উঁচু নিচু রাস্তা । পাইন দেবদারুর সারি । তিরতিরে ঝর্ণা, ছোট চোখ চাপা নাক মানুষজন । খুব মজা লাগছে ।

একটা মোটামুটি রেটের হোটেলে এসে পৌঁছলো । মালপত্র গুছিয়ে ম্যালে ঘুরে এলো । তারপরে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব সেরে একটু ভাতঘুম দিয়ে উঠলো । বিকেলে বেড়াতে গেল পাহাড়িয়া পথে । সন্ধ্যা ঝুপ করে নামে পাহাড়ে । ঘরে ফেরে ক্লান্ত পথিক ।

পরদিন সকালে আবার ওরা দল বেঁধে রওনা দেবে পাহাড়ি পথে । সব টুকু আনন্দ লুটে পুটে নেবার জন্য । কুয়াশার জাল ছিঁড়ে হুল্লোড়ে মাতবে নীলচে পাহাড়, চঞ্চল ঝোরা ।

অরূপ ঘোষাল খুব নাম করা চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্ট । বেশ কিছু বছর হল লন্ডন থেকে পাশ করে এসেছেন । পৈত্রিক ফার্ম আছে । সোসাইটিতে ওনার বেশ কদর। কলকাতার একজন এলিজিবেল ব্যাচেলর । কিন্তু উনি বিয়ে করবেন কিনা সেখানেই একটা প্রশ্ন চিহ্ন । ওনার এক ভগিনী আছেন । পঙ্গু । হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন । বাবা মায়ের মৃত্যুর সময় অরূপ কথা দিয়েছিলেন যে বোনকে সারা জীবন দেখাশোনা করবেন । তাই বিয়ের কথা উঠলে দুবার ভাবেন।

পাশের বাড়ির অবন্তী । পেশায় স্থপতি । ছোটবেলা থেকেই অবন্তী অরূপ কে ভালোবাসে ।

অবশ্যি অরূপকে কোনদিন বলতে পারেনি । অরূপ জানেনেই না । পরে যখন দেশে ফিরে এলেন তখন একদিন অবন্তী জানতে পারলো যে অরূপ তার প্রতি সমানভাবে দূর্বল । কিন্তু তাঁর বোন উলু ওর বন্ধু হলেও যবে থেকে জেনেছে যে ও তার দাদাকে ভালোবাসে তবে থেকে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর মধ্যে । অবন্তীকে সে সহ্য করতে পারেনা । ওপরে ওপরে একটি পালিশ থাকলেও সেটা হাবেভাবে বেরিয়ে পড়ে । অরূপ বিব্রত বোধ করেন কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন না । অবন্তী কিন্তু খুবই ভালোবাসে তার এই অসহায় বান্ধবীটিকে । পরম মমতায় তার কাজে সাহায্য করে ।

আপাততঃ ওরাও কলকাতার একঘেয়েমি কাটাতে দার্জিলিং বেড়াতে এসেছে। অরূপের একটি পৈত্রিক বাড়ি আছে দার্জিলিং এ। সেখানেই ওরা উঠেছে।

নামেই দার্জিলিং কিন্তু বাড়িটি আসলে একটু নির্জন এলাকায়। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পথঘাট। বেলা বাড়লে রোদ ওঠে। বড় বড় গাছে ঢাকা বাগান। নাম না জানা ফুল, প্রজাপতি। কলকাতার কল্লোল থেকে বহুদূরে ভারী মনোরম পরিবেশ। মন প্রাণ চাঙ্গা হয়ে যায়।

অবন্তীও এসেছে সঙ্গে। ও অরূপের বাড়িতেই উঠেছে। সকাল সন্ধ্যা অরূপের বোন উলুকে নিয়ে হাঁটাতে যায় পাহাড়িয়া পথে। টুকরো টুকরো কথা হয়। তবে একটা দূরত্ব যেন থেকেই যায়। উলু স্বাভাবিক ব্যবহার করলেও কোথায় যেন একটা ছন্দপতন লক্ষ্য করে অবন্তী। মন ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু মুখে হাসিটি মাখানো থাকে।

সেদিন ছিল ঘন কুয়াশা। সকাল ১০টা বেজে গেলেও কুয়াশা কাটলো না দেখে ঠান্ডায় জমাট বাধা উলু অবন্তীকে অনুরোধ করে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য। দুজনে মিলে ভারী গরম জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অবন্তী পরেছে ওর প্রিয় লাল শালখানা। মাথায় লাল গোলাপ। আস্তে আস্তে হেঁটে যায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। একটা পাখি ডেকে ওঠে দূরে। মাথায় কাঠ কুটো নিয়ে হাসিহাসি মুখে চলেছে একদল আদিবাসী। ওদের সঙ্গে যেন পাহাড় গান গাইছে। একটি লাল লাল গালের কিশোর ওদের দিকে এগিয়ে এলো। একটি সুন্দর গোলাপ তুলে দিল উলুর হাতে। উলু ওর গাল টিপে আদর করলো। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললো ওদের হুইলচেয়ার খাদের ধারের রেলিং বরাবর।

মাথার ওপর দিয়ে শীতলভাবে ছুঁয়ে চলে গেল এক রাশ মেঘ। উলু কোমড় দুলিয়ে ওদের ছুঁতে যায়, বাধ সাধে অবন্তী - উঁহু পড়ে যাবি যে !

নিমেষে উলুর মুখ মেঘময়। অন্ধকার। - পোড়াকপাল আমার, কি পাপ করেছি যে জীবনে কিছুই পেলাম না ! একটু আনন্দ করবো তার উপায় নেই ! চোখ বেয়ে দু এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে। পরম মমতায় মুছিয়ে দেয় অবন্তী। তারপর বান্ধবীকে টেনে নিয়ে যায় কুয়াশা ঘেরা পথে।

তারপর ? তারপর মুখের মিছিল, হতাশা ও হাহাকার। সমস্ত অনুভুতি একটা বিবর্ণ রঙে ছেয়ে গেছে। হঠাৎ। অসাবধানতায় উলু পিছলে গিয়ে খাদে পড়ে মারা গেছে। খাদের পুরো ধারটায় রেলিং ছিলনা।

অরূপ তন্ন তন্ন করে খুঁজিয়েছে। পুলিশ, নিজের লোক, বাঘা বাঘা কুকুর কিছুই বাদ যায়নি। মিলেছে গাছে আটকে যাওয়া হুইলচেয়ার ও দলা পাকানো শরীরের কিছু অংশ। কুয়াশায় দিক বুঝতে না পারায় এই দূর্ঘটনা ঘটে। খাদটার শুরু কোথায় অবন্তী বোঝেনি। সবাই সমবেদনা জানাচ্ছে। আহা উহু করছে। শুধু অরূপ ছাড়া। অরূপের চোখে ঘৃণা, চাপা ক্রোধ। দূর্ঘটনা বলে মন মানতে চায়না। অরূপ জানে এটা পথ পরিষ্কার করার এক চাল। এটা ছলনা। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নেওয়া, অন্যকে শেষ করে নিজের জীবন শুরু করার ঘৃণ্য প্রয়াস। চক্রান্ত। কিন্তু অরূপ ওকে বিয়ে করবে না। কক্ষণো না। ও খুনী। হ্যাঁ ঠান্ডায় মাথায় খুন করেছে অবন্তী। প্ল্যান করেই এসেছিল দার্জিলিং। নাহলে এইসময় অমন জোর করে ছুটি নিয়ে, কাজ অর্দ্ধেক পথে ফেলে ও আসতে গেলো কেন ? মানুষ এত নীচে নামতে পারে ? উলুতো তার বাল্যকালের বান্ধবীও ছিল ! ইদানিং সে অবন্তীকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের দিকে তাকাতে ঘৃণা হচ্ছে।

কলকাতায় একসঙ্গে ফিরেছে যদিও । কিন্তু সবসময় মনে হয়েছে ও একটা খুনী । এক অনতিক্রমনীয় বাধা ওদের মাঝে । যেন কয়েক আলোকবর্ষের ব্যবধান ।

আইন তো প্রমাণ চায় । নয়ত সে অবন্তীকে কাঠ গোড়ায় দাঁড় করাতোই ।

কলকাতায় ফিরে অবন্তীর মন ভেঙ্গে গেছে । যাকে ছোটবেলা থেকে আপন বলে জেনে এসেছে, চিনে এসেছে, যে তার স্বপ্নের নায়ক সে আজ তাকে ঘৃণা করে । তার চোখের দৃষ্টিতে অবজ্ঞা, ক্রোধ অবন্তী স্পষ্ট দেখতে পায় । চুরমার হয়ে যায় ভেতরটা । চাপা কান্নায় হৃদয়ের প্রতিটি খোপ কেঁপে ওঠে । ভেঙে যায় বহু আশায় গড়ে তোলা ভালোবাসার মহল । তাসের ঘরের মতন । অথচ কোন পাপ সে করেনি । জানেন বিধাতা । তার বিবেকের কাছে সে সারাটা জীবন কি জবাবদিহি করবে ? সেটা একবারো মনে হলনা অরূপের ? কি করে এত ছোট ভাবলো সে অবন্তীকে ? একদিন তো সে নিজেই বলেছিলো - তোমাকে আমি কত ভালোবাসি তুমি সেটা কোনদিন আন্দাজ করতে পারবে না ।

অবন্তী অস্ফুটে কিছু বলতে চেয়েছিল । পারেনি । শুধু চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল । কতকাল সে জানেনা । মনে হয়েছিল যেন একের পর এক যুগের অবসান হয়ে গেল বিমূর্ত ভালোবাসাকে বুঝতে । অরূপ জোর করেনি । শুধু নিজের কথা বলেছিল । স্পষ্ট কথা । ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা অবন্তী পছন্দ করেনা । সে নিজেও যখন অকপটে হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিল অরূপ বিস্মিত, মুগ্ধ।

অবন্তীর চেহারায় একটা মাধুর্য চিরকালই আছে । আঁখিপল্লবে হরিণের আহ্বান । ঢল্‌ঢলে মুখখানিতে যেন শ্রীরাধিকার রূপলাবণ্য । যৌবন বাঁধনহারা নদীর মতন । নাহ ! অরূপ আর ও কখনো ফিজিক্যাল হয়নি । সীমানায় বেঁধে রেখেছে ওরা প্রেম কে । প্রেম তাহলে নিস্কামও হয়!

জুনের এক বর্ষণ মন্দ্রিত দিন । অঝোর ধারায় ঝরছে জল । আকাশ থমথমে ।

পাড়ায় জাস্টিস দত্তর বাড়িতে ঘরোয়া আড্ডা । অবন্তী আজ তাড়াতাড়ি চলে যাবে । হাজিরা দিতে আসা । না এলে সন্দেহ দানা পাকাবে । রাত বাড়তে বাড়ির পথ ধরলো । কিছুটা যাবার পর দেখলো উল্টো দিক থেকে অরূপ আসছে । অবন্তীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো । অবন্তী পা চালিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল ।

- তুমি কি কিছু তেই আমাকে ক্ষমা করতে পারোনা ?

অরূপ নির্বাক । আজ অবন্তী একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে । দৃঢ় পায়ে কাছে গিয়ে ওর হাতটা ধরলো । অরূপ জোরে হাত ছাড়িয়ে নিল । তারপর ধমকের সুরে বললো- ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমার পিছুধাওয়া করার চেষ্টা করোনা । তোমার মতন নীচ মহিলার ছায়া মাড়াতেও আমি চাইনা ।

অবন্তীর বোবা কান্নায় রাতের আঁধার শব্দহীন লাগে । অবন্তী নিরুদ্দেশে হারিয়ে যায় । গভীর বেদনা বুকে নিয়ে । এক সন্দেহের চোরাবালিতে ক্রমশ নিমজ্জিত হচ্ছে যেন । প্রতিরোধ করার ক্ষমতা টুকুও নেই তার । উথাল পাতাল ঢেউ অবন্তীর সমস্ত সত্তাকে আছাড় মারছে ।

আজ অরূপ এসেছে একটি থ্যালাসেমিয়া রুগীদের জন্য পরিচালিত অনুষ্ঠানে । পরিচালক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চিনসুরা ব্রাঞ্চ । অরূপ কিছু ডোনেশন দিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে বসলো । ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নাচ গানে মুখরিত হল । কেউ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছে । কে

বলবে এই ছেলে মেয়েগুলো এক মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত । এই তো জীবন । মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনের সংজ্ঞা কি ?

পাঁচতারার নিরাপদ ঘেরাটোপে, কফিহাউসের চায়ের কাপে নাকি এই সব মানুষের মাঝে ? জীবন ঠিক কোথায় ? কে বলে দেবে ?

বিষন্ন অরূপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে আসে ।

ঘন অন্ধকার নেমেছে । দু হাত দূরের জিনিষ ও দেখা যাচ্ছে না । একটি গুলমোহর গাছের নীচে এসে দাঁড়ায় অরূপ । কারা যেন ওপাশটায় দাঁড়িয়ে কথা কইছে ।

ভেসে আসে সংলাপ । হঠাৎ অরূপ স্পষ্ট শুনতে পায় কে যেন দার্জিলিং নিয়ে কথা বলছে, হ্যাঁ - ঐ তো ! পরিস্কার শোনা যাচ্ছে । কারা যেন দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল তারই স্মৃতিচারণ করছে ।

নিঝুম রাতকে খান খান করে অরূপের কানে এসে প্রতিধন্বিত হচ্ছে কয়েকটি লাইন-

*ভদ্রমহিলা কত চেষ্টা করলেন কিছুতেই হুইলচেয়ারটাকে আটকাতে পারলেন না - বেচারি ! পঙ্গু মানুষটা গড়িয়ে গেল খাদের দিকে । লোকে এখন হয়ত লাল শাল গায়ে দেওয়া ঐ ভদ্রমহিলাকেই সন্দেহ করবে ।*

লাল শাল ? পঙ্গু মহিলা ? আর দার্জিলিং ?

ওরা কারা ? ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে, তিন চার জন কম বয়সী ছেলেপুলে । এগিয়ে যায় অরূপ । গটগট করে । ওদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে । জানতে পারে ওরা অবন্তী আর উলুর কথাই বলছে । ওরাও সেদিন প্রাতভ্রমণে গিয়েছিল কুয়াশার চাদরে ঢাকা পাহাড়ি রাস্তায় ।ওদের মধ্যে পিয়া আর আবির দেখেছিল কি প্রাণপণ চেষ্টা করেছে অবন্তী হুইলচেয়ারটাকে আটকানোর জন্যে । পরিত্রাহি চীৎকারে আবীর ছুটেও যায় কিন্তু ততক্ষণে দূর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে । খাদের ধার গড়িয়ে নীচে পড়ে গেছে উলু । ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বাঁচার জন্য শেষ আকুতি ।

কলকাতা থেকে রাত দশটায় ছাড়ে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল হুতুমগড়ের ট্রেন । অরূপ একটা হালকা সুটকেস নিয়ে ট্রেনে চেপে বসে । হুতুমগড়ে অবন্তীর মামাবাড়ি । এর আগেও বহুবার অবন্তী মনখারাপ হলে হুতুমগড়ে চলে গেছে । সবাই জানে ওখানে ও মন সারাতে যায় । তাই একটা সময় মজা করে অরূপ বলতো - ওটা হুতুমগড় নয় তোমার গুম ঘর ।

অরূপ আজ স্বেচ্ছায় চলেছে সেই গুমঘরের দিকে । নাহ ! অভিমানে নয়, অভিমান ভাঙাতে । এক মিথ্যের বোঝা নামিয়ে সত্যকে স্বীকৃতি দিতে । উলুকে হারিয়েছে সে, অবন্তীকে হারাতে চায়না । তাই ভুলের মাশুল দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে চায় নিজ নিকেতনে । সসম্মানে ।

পুব আকাশে সোনা রোদ । পৌষের শেষবেলায় ঘন কুয়াশা দিব্যি কেটে গেছে ।

# বনলক্ষ্মী

পিপলাঝাড় ন্যাশেনাল পার্ক বা সোজা কথায় অরণ্যের পথটা ভারী ভয়ানক । গাঢ় জঙ্গল তো আছেই, বুনো হাতির উৎপাত, মাঝে মাঝে চিতার আগমন সমস্ত মিলিয়ে মাঝ পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে বেশ ভয়ের ব্যাপার। আরো একটি ভয়ের ব্যাপার ঘটে তবে সেটা অত ভয়ানক নয় । গাড়ি খুলে রেখে গেলে অথবা কেউ কোন দামী জিনিস নিয়ে চলাফেরা করলে একটি বুনো মেয়ে এসে হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয় । ফরেস্ট গার্ডরা বলে ও পাগল । মলিন পোশাক আশাক, ময়লা জটাধরা চুল হাতে একটা মোটা তামার বালা।

ভ্রমণার্থীরা অনেকেই তাকে দেখেছে । হঠাৎ ছুট্টে আসে কোথা থেকে তারপর হাত থেকে জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে পালায় ।

একবার এক টুরিস্ট মজা করে বলেছিল যে শহরের ছোঁয়া জঙ্গলেও লেগেছে দেখছি । এতো জংলী পকেটমার !

কয়েকবার ফরেস্ট গার্ডেরা ওকে ধরার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে বলে জানা যায় । ওকে অনুসরণ করলে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় ঘন বনের মধ্যে যে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল ।

বনের ফলমূল, কন্দ এইসব খায় হয়ত । তবে একবার এক রেঞ্জার ওকে আগুন জ্বালিয়ে মাংস জাতীয় কিছু পোড়াতে দেখেছিল । তবুও ওকে ধরা হলনা কেন ?

কারণ রেঞ্জারের পায়ের শব্দ পেয়ে ও নাকি ঘন বনে অদৃশ্য হয়ে যায় । কাজেই ধরা যায়নি ।

মাঝখানে বাজারে খবর রটেছিল যে পিপলাঝাড়ের বনে বামন হাতি আছে । অবশ্য এই এলাকায় বামন হাতি আছে এমন কথা বহুবছর ধরেই শোনা যাচ্ছে । আদিবাসীরা এই নিয়ে অনেক গল্পগাঁথা করে তবে সভ্য মানুষ সেসব বিশ্বাস করেনা, তারা প্রমাণ চায় । আদিবাসীদের অবশ্যই তাতে কিছু যায় আসেনা । আমরা যেমন ওদের অসভ্য বলি ওরাও আমাদের কোন নামে ডাকে । সভ্য বলে ব্যঙ্গও করে । ওদের নিজেদের আইন আছে, ওঝা আছে, ঝাড়ফুঁক আছে দেবদেবী আছেন । নিজেদের সৃষ্ট দুনিয়াই ওরা সুখেই আছে। কারো অহেতুক নাক গলানো ওদের পছন্দ নাও হতে পারে । ওরা বামন হাতির কথা জানলেও এই মেয়েটির কথা কিছু বলেনা । কেউ কেউ অবশ্য ওকে বনদেবী বা বনলক্ষ্মী বলে অভিহিত করে । যদিও শহুরে মানুষের কাছে সে দেবী নয়, ঠগিনী, মেয়ে পকেটমার ।

এই মেয়েটি কোথা থেকে এলো, কেনই বা এলো কেউ জানেনা । গায়ের চামড়া ফর্সা যদিও বহুবছর স্নান না করার দরুণ ময়লা পড়ে সঠিক রং নির্ণয় করা মুস্কিল হয়ে যায় । তবুও কিছুটা তো বোঝাই যায় ।

গার্গী ভট্টাচার্য নাম এক পরিবেশবিদ মাঝে এই জঙ্গলে কাজ করতে এসেছিলেন । তিনি ঐ মেয়েটিকে দেখার জন্যে একটা গোটা রাত মাচায় কাটান কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । মেয়েটি আসেনি । হতাশ হয়ে ভদ্রমহিলা ফিরে যান ।

===

বামন হাতি ধরার জন্যে বা দেখার জন্য মাঝে একদল বিজ্ঞানী এই জঙ্গলে এসেছিলেন । তারাও কিন্তু মেয়েটির দর্শন পাননি । হয়ত লুকিয়ে ছিল । আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস যে এই মেয়েটিকে দেখা গেলে সেদিন তাদের অনেক লাভ হয় । মঙ্গল হয় । শুভ হয় । তাই সে ওদের বনলক্ষ্মী ।

সংবাদপত্রে ওকে নিয়ে হৈ চৈ হওয়াতে একবার এক তরুণ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার একে সাবজেক্ট করবে বলে জঙ্গলের কাছে তাঁবু গেড়েছিল ।

কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও মেয়েটির দেখা না মেলায় হতাশ হয়ে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ একদিন ওর পদচারনার আভাস পায় ।

টুক করে লুকিয়ে পড়ে ছেলেটি একটি গাছের আড়ালে । দেখা যায় লালচে ঘাগরা পরা একটি ছিপছিপে মেয়ে অদ্ভুত ভাবে লাফিয়ে আর হেঁটে এগোচ্ছে । কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল মোটা একটা তামার বালা পরা, সরু হাতে খুব বেমানান ।

একটি আদিবাসী শিশুর সাথে লোকাল ভাষায় বোধ হয় কিছু কথা হল । তারপর আবার জঙ্গলে মিলিয়ে গেল । ব্যস্ ! সিনেমা শেষ ।

ক্যামেরা বার করার সুযোগই দিলনা ।

আলোকচিত্রী অপেক্ষায় রইলেন । একবার যখন দেখা গেছে নিশ্চয় অন্য সময়ও দেখা মিলবে।

বেশ কিছুদিন ওখানে বসে রইলেন এবং দেখা গেল । একদিন দিনান্তে সূর্য ডোবার পালা এলো । পাখিরা শেষ গান গাইতে গাইতে ঘর অভিমুখে চললো । আলোকচিত্রী কাছের ফরেস্ট গার্ডদের ছোট ঝুপড়িতে থেকে চা ও গরম সিঙাড়া এনে খাচ্ছিলেন এমন সময় একটা খসখস আওয়াজে পেছন ঘুরে দেখা গেল সেই রমণীকে । একটা হরিণ শিশুকে কোলে নিয়ে বুনো ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে । ঝট করে আলোকচিত্রী সরে গেলেন গাছের আবডালে ।

মেয়েটি দূর্বোধ্য ভাষায় হরিণছানাকে কিছু বললো । মৃগশিশুটি সরল আঁখি মেলে চেয়ে ছিল । বেশ লোভনীয় সাবজেক্ট দেখে যখন ক্যামেরা বার করেছেন অমনি হরিণটিকে ফেলে মেয়েটি দৌড়ে এসে ক্যামেরাটি কেড়ে নিয়ে দৌড় লাগালো ।

- আরে আরে একি ! করে আলোকচিত্রী পেছন পেছন ছুট্টে গেলেও সেটা উদ্ধার করা গেলনা কারণ ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বড় বড় গাছ আর ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে ওকে অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব ।

ছবিও হলনা, ক্যামেরাও গেল নিরাশ ফটোগ্রাফার শুন্য হাতে ফিরে চললো শহরের কোলে।

বন তাকে হতাশ করেছে । ফিরে গিয়ে এই খবর ফলাও করে কাগজে ছাপা হল । নিজের অনলাইন জার্নালে ও ব্লগে মেলে ধরলেন এই ঘটনা, সারা দুনিয়া থেকে নানান ধরণের চিঠি এলো । অনেক অতি উৎসাহী ঐ জঙ্গলে যাবার জন্য খোঁজ খবর করলেন । রাতারাতি জঙ্গলটি বিখ্যাত হয়ে গেল ।

===

গার্গীর কৌতুহলটা চিরকালই বেশি আর মেয়েটিকে না দেখতে পাওয়ার ক্ষোভ ছিলই । একবার সে ঐ বনপ্রান্তরে বেড়াতে গেল । রিসর্টে উঠে কিছুটা সময় অতিবাহিত করে চলে গেল সেই স্থানে যেখানে মেয়েটির দেখা মেলে । গিয়ে শুনলো মুল রাস্তা বন্ধ । কোন কারণে একটা গাছ ভেঙে পড়েছে । ফরেস্ট গার্ড পোনাপ্পার সঙ্গে খেজুড়ে আলাপ করে জানা গেল যে মেয়েটি সম্প্রতি আসা অনেক কমিয়ে দিয়েছে । বড় একটা দেখা যায়না তাকে ।

গার্গী বুঝেই গেল যে এবারেও খালি হাতে ফিরতে হবে । কি আর করা কপালে না থাকলে কিছুই হবেনা । ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলো জঙ্গলে । দেখা যাক যদি আসে ।

জঙ্গল তার বড় আপনার । ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বুনো ফুলের অদ্ভুত সুন্দর গন্ধের মাদকাতায় ভুবন পাগলপারা ।

- মেম সাব আপ কেয়া ইধারই রহোগি ?

ভাঙা হিন্দীতে পোনাপ্পার গলার স্বর ভেসে আসে ।

- হ্যাঁ । গার্গীর সংক্ষিপ্ত জবাব ।

- ও নেহি আয়া তো ?

- ও আয়েগী, জরুর আয়েগী ।

- এক হিন্দী মুবি হ্যায়, ও কৌন থি, আপনে দেখা হ্যায় ?

- এ লেড়কি ভূত থোড়ি হ্যায় ?

- ও ভি তো ভূত নেহী থি, জেনানা থী । পোনাপ্পা নিজের জ্ঞানভান্ডার উগড়ে দিচ্ছে ।

গার্গী নীরবে শুনে চলে । কেন যেন তার মনে হচ্ছে আজ সে আসবেই ।

আজকাল অনেকেই ওকে বলে- আমরাও ভেবেছিলাম পরিবেশ বিজ্ঞানটা পড়বো । কিন্তু হলনা । ভাবখানা হল -পরিবেশ বিজ্ঞান পড়লেই মাধব গ্যাডগিল হওয়া যায় ।

কিন্তু এই প্রফেশনে কত খাটনি ও রিস্ক রয়েছে সেটা কিন্তু তারা ওভারলুক করে যায় ।

দশটা পাঁচটা অফিসের মতন এই কাজ নয় । পরিবেশ নিয়ে পড়ে মাস্টারি করা আর ফিল্ড ওয়ার্ক এক নয় । যাইহোক দোষে গুণেই তো মানুষ । বিরক্ত লাগে যখন খুব কনফিডেন্সের সঙ্গে কেউ বলেন যে এই কাজটি তিনি সহজেই পারতেন । আসলে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য একই ইমেল একশোজন অচেনা লোককে ফরোয়ার্ড করা কিংবা মেধা পাটকরের মতন ধর্ণা দেওয়া যে পরিবেশ বিজ্ঞানী বা ইকোলজিস্টের কাজ নয় সেটা অনেকের অজানা ...অনেকে তো এমনও বলেন যে ইকোলজিস্টরা জঙ্গলে পশু গণনা করেন ।

অথচ তারাই পয়সা জমিয়ে সেই পশুদের দেখতে পরিবারবর্গকে নিয়ে মহাআনন্দে যান ।

- ঐ দেখ হাতি হাসছে, আর জিরাফটা ! ওটা দুলছে ।

এই দুলুনি মেনটেন করার জন্যই ইকোলজিস্টদের প্রয়োজন । নাহলে পরের খ্রীষ্ট মাসে কে দুলবে ?

আসলে দোষ হল পশুদের নিয়ে পড়াশোনা করলেই । এই সো কলড বাবুরা কর্পোরেট ল্যাডারেও বেশি দুর উঠতে পারেন না । খুব জোর অতলান্ত পার হন এবং সেখানেও মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করেন । অথচ এক্সপার্টস ওপিনিয়ন দেবার বেলায় খেয়াল থাকে না *আমি এক ক্ষুদ্র জীব* ।

পশু নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাদের মগজে নিশ্চয়ই ঘিলু আছে তা নাহলে যুগযুগান্ত ধরে এই সমস্ত বিষয় গুলো জগতে চলতো না । এবং মানুষের সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্যে আরো কত প্রাণীর অবদান আছে তা অনেকেই জানেন না । তাদের মতে দুনিয়া চলে ইঞ্জিনীয়ার অথবা ডাক্তারদের নিয়ে । অর্থনীতিবিদ, সি এ, জিওলজিস্ট, আবহবিদ ইত্যাদির কোনই ভুমিকা নেই । তারা সকলে অপদার্থ এবং যারপরনাই বোকা । এই ধারণাকে অর্ধশিক্ষার চূড়ান্ত নমুনা ছাড়া কিই বা বলা যায় ?

Man is by nature a political animal. Aristotle বলেছিলেন সম্ভবতঃ। জন্তুরা অন্ততঃ পলিটিক্স করেনা ।এই যা রক্ষে ।

শহরে যেমন অনেক মানুষের ভীড়ে কিছু জানোয়ার চোখে পড়ে সেরকম বনেও অনেক জানোয়ারের ভিড়ে এই একটি মেয়ে রয়েছে । বনলক্ষ্মী কিংবা বন ভয় । একবার দেখা হলে বেশ হয় !

না না রে না না রে না না রে নমগে ---

পরিচিত কন্নড় গানের কলি ভেসে আসে । ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে একদল জলপাই পোশাক পরা জঙ্গল রক্ষীর দল । কাছে আসতেই হাতে ধরা খরগোশ চোখে পড়ে । গার্গী জিজ্ঞেস করেই বসে- একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?

-পুড়বো ম্যাডাম । অসাধারণ খেতে । খরগোশটা জুলজুল চোখে চাইছে, যেন বলছে - বাঁচাও আমাকে বাঁচাও ।

গার্গী নিজের পরিবেশ প্রফেশন্যালের আই ডি কার্ড বার করে । ওদের দেখিয়ে বলে -ওকে ছেড়ে দাও নাহলে আমি লোক জানাবো । ভয়ে ওরা ছেড়ে দেয় এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় যে আর কোনদিন এরকম ভুল হবেনা কাজেই লোক জানাজানি যেন না হয় ।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক হলে বনের কান্না কে শুনবে ?

মুক্ত খরগোশটি মুচকি হেসে এক লাফে হারিয়ে যায় সবুজ সতেজ বৃক্ষের আড়ালে ।

বেলা পড়ে এলো, কাঁহাতক আর অপেক্ষা করা যায় ! গার্গী ফিরে চলে রিসর্ট পানে এমন সময় শ হ্হ্হ্হ্হ্হ্হ্হ্হ ! --শব্দ । ঝট করে সরে যায় সার দিয়ে রাখা কাঠের স্তুপের আড়ালে ।

সেই মেয়েটি । বড় সরল চোখের চাউনি । আধ ফোটা ফুল যেন, এক বন্য কুঁড়ি ।

একই পোষাক । চুল জটা ধরা । হাতে বেমানান তামার চুড়ি ।

গার্গী ইচ্ছে করেই বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে । হাতে ঝোলানো দামি ব্যাগ, ইচ্ছে করেই খোলা । মেয়েটি দৌড়ে এসে এক ঝটকায় ব্যাগটি টেনে নিয়ে উধাও বনের মধ্যে । গার্গীও দে ছুট ।

দৌড় দৌড় দৌড় । অবশেষে টালমাটাল অবস্থায় সরু পাথুরে নদী পেরিয়ে ওপারে । গহন বনে ।

পথে পড়লো বুনো বেড়াল, খ্যাঁক শেয়াল, বাইসনের দল । সবাইকে টপকে মেয়েটিকে অনুসরন করে এলো এক পরিস্কার জায়গা । বোঝা গেল ইচ্ছে করেই সাফ করা হয়েছে যাতে মানুষ বাস করতে পারে । এক পাশে একটি চালা ঘর ।

মোটামুটি বাসযোগ্য স্থান । মেয়েটি বুঝতে পারেনি যে গার্গী ঐ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে । সে বহাল তবিয়তে বসলো গিয়ে নিকানো জায়গায় । তারপর পাশের ঝুড়ি গোছের কিছু থেকে সবুজ পেয়ারা বার করে খেতে লাগলো ।

-থু !

প্রায় গার্গীর কোলের কাছে এসে পড়লো । কিন্তু ওর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই । এই রহস্যময়ীর সন্ধান বার করতেই হচ্ছে ।

বৃংহন ! অকস্মাৎ যেন খুব কাছ থেকে ভেসে এলো । বুনো হাতির ডাক গার্গীর অচেনা নয় । মেয়েটির কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই । সে ধীর পায়ে চালা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ।

গার্গীও পেছন পেছন । তারপর এক অফুরান মূহুর্ত ।

পৃথিবী থেকে প্রায় বিলুপ্ত শ্বেত হস্তী শাবক যাদের ক্রমহ্রসমান সংখ্যার জন্য তাদের বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখা কনসার্ভেশন সায়েন্টিস্টদের প্রধান লক্ষ্য, বাচ্চাটা মনে হচ্ছে জখমি -আর সঙ্গে ও কে ? দেখতে হাতির মতন কিন্তু এত বেঁটে ? হাতির বাচ্চা না না, বাচ্চা হাতির মতন তো নয় বেশ পরিপক্ক, গাঁটে গাঁটে পরিপূর্ণতার ছাপ ।

এ যে বামন হাতি ! তাহলে বামন হাতি হয় সত্যি সত্যি ? তাজ্জব ব্যাপার !

গার্গী হতবাক । ছোটবেলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাহাড়ের চুড়ায় আতঙ্ক পড়ে খুব বিরক্ত হয়েছিল । প্রতিবারই ভাবতো ইয়েতি দেখা যাবে কিন্তু কোনবারই সুনীল বাবু ইয়েতির ইয়ে সম্পর্কে কিছু লিখতেন না । ভারি নিরাশ করেছিলেন গার্গীকে । তুলনায় হার্জের টিনটিন ইন টিবেট বেশ লোমহর্ষক । ইয়েতি চ্যাং কে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলেছে উহ ! অসাধারণ !

কিন্তু নিজের জীবনে যে পৃথিবীর রহস্যময় এক প্রাণীর দেখা এইভাবে পাবে ভাবেনি । বাঙালি মেয়ে জঙ্গলের দিকে বড় একটা আসেনা । ও এসেছে সব বাধা ঠেলে, প্রকৃতির কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে । তাই সে বহু আলোচিত বামন হাতির দেখা পেয়েছে । কিন্তু চ্যাংয়ের মতন ভাগ্য কি হবে ? বামন হাতি তো ওকে কোলে থুরি পিঠে নেবে মনে হচ্ছে না কারণ সে মনের আনন্দে কি খাচ্ছে । বরং শ্বেত হাতিটা জুল্‌জুল করে তাকাচ্ছে ।

মেয়েটি দুটোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে । দুটো আদরের আতিশয্যে অভিভুত ।

জখম শ্বেত হাতিটি মাটিতে মিশে যাচ্ছে আহলাদে । অন্যটি চেয়ে আছে । অদ্ভুত অপত্য স্নেহ দৃষ্ট হচ্ছে সভ্য জগতের থেকে কয়েক যোজন দুরে এক অসভ্য নারীর অন্তরে । হাতিরা অনেক সময় সেপটিসিমিয়াতে মারা যায়, জখম থেকে সারা দেহের রক্ত দূষিত হয়ে যায় ।

দুরে একটা শিসের আওয়াজ হল । একটি পুরুষ পরণে বাদামী পোষাক আর গায়ে একটা আধ ময়লা সাদা চাদর দ্রুত পায়ে এদিকেই আসছে ।

কাছে আসতেই মেয়েটিকে দূর্বোধ্য ভাষায় কি বললো । মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে চালার পেছন থেকে একগাদা দামী আধুনিক জিনিস নিয়ে এলো । লোকটি সেগুলো নিয়ে চলে যাবার আগে একটি ঝোলা দিয়ে গেল । মেয়েটি ঝোলা থেকে ভাত আর লাল রং্য়ের তরল কি বার করে গোগ্রাসে খেতে লাগলো । হস্তীশাবক দুটো নিজেদের মধ্যে খেলছে । বামন হাতিটিকে জোকার মনে হচ্ছে ।

শ্বেত হস্তীটি খিলখিল করে হাসছে, বনকন্যা একমনে খেয়ে চলেছে ।

গার্গী ভেবেই পেলনা লুপ্তপ্রায় শ্বেত হস্তীকে শুশ্রুষা করা, আজব জীব বামন হাতি যার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে তাকে পালন করা ও একই সঙ্গে কোন দূষিত মানব সন্তানের দু নম্বরী কারবারের জন্য শহুরে মানুষের হাত থেকে বহুমূল্য বস্তু ছিনিয়ে আনা, এক ধরণের পকেটমারী করা এই জঙ্গল কন্যাকে সে বনলক্ষ্মী বলবে নাকি বনের ত্রাস !

এই রে, মেয়েটি গার্গীকে দেখে ফেলেছে, সর্বনাশ দে ছুট ! পিছু ধাওয়া করছে ।

এবার গার্গীর পালানোর পালা ।

# বাতাস বাড়ি

- লেখকদের জীবনবোধ থাকে আর বিজ্ঞানীদের থাকে না ? ব্যবসায়ীদের থাকেনা ?

চম্পির কথায় মুখ ফেরালো আইনজ্ঞ বাদল বসু । চম্পির মামা ।

- থাকে না কে বললো ? ওদের এক্সপ্রেস করার টুল থাকে না অথবা ওরা লোক চরিত্র বিশ্লেষণ কে বিরাট অ্যাচিভমেন্ট বলে মনে করেন না ।
- এই তো একদম ঠিক বলেছো, আমি কিছুতেই লোককে বোঝাতে পারিনা ।

কথা হচ্ছিলো চম্পির ১২০০ স্কোয়ার ফিট বাড়িতে বসে । বাতাস বাড়ি । ছাদও নিজের নয়, মেঝেও নিজের নয় । যেকোন একটা ভেঙে পড়লেই অস্তিত্ব বিপন্ন । বাতাসে দিন গুজরান । তাই বাতাস বাড়ি । চম্পিই নাম রেখেছে ।

সে অত বাংলাসাহিত্য পড়েনা । তার মতে বাংলা সাহিত্যে প্যানপ্যানানি বেশি, বক্তব্য কম । সে একটু ঝরঝরে লেখা পছন্দ করে । একমাত্র বুদ্ধদেব গুহর লেখা তাকে টানে । বেশ পাশ্চাত্যের গন্ধ আছে, জীবনকে উপভোগ করার কথা আছে । ট্রেনে, বাসে ঠেলাঠেলি কখনো আন্তর্জাতিক মানের হতে পারেনা । মধ্যবিত্তের সমস্যা কখনো সব শ্রেণির পাঠকের কাছে অ্যাপিলিং হতে পারেনা । তবে জয় গোস্বামীর লেখাও খুব প্রিয় । সত্যি কথা লেখেন । সাদাকে সাদা বলতে জানেন । বেশ আয়নার মতন লাগে, প্রতিফলন দেখা যায় ।

চম্পি জানে ওর নেট বন্ধু রোহিতাশ্ব কিভাবে আমেরিকার ক্যানসাসে অবসর যাপন করে কিংবা প্রতিভা কি করে জার্মানিতে নিঃসঙ্গ দুপুর কাটায়, কজন আছেন ওর পরিবারে । কিন্তু বাতাসবাড়ির পাশের ঘরে কে থাকেন সেটা জানেনা । শুধু পুজো বা খ্রীষ্টমাসে যখন একটা সম্মিলনী হয় তখন কারো কারো সঙ্গে মুখ চেনা হয় । চম্পি যে আনসোসাল তা নয় । তবে এই সমস্ত মানুষগুলোকে তার মুখোশধারী বলে মনে হয় । কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরলেই পাজি ।

ব্যালকনি বেয়ে জামা কাপড় পড়েছিল সেটা কুড়াতে ৫তলার মিসেস সিং এসেছিলেন । ভর দুপুরে এসে হাজির । কত ব্লাস করলেন । দু দিন পর রাস্তায় দেখা । মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন।

চম্পি আর ওনার পানে চায় না । বেল বাজালে আজকাল ঘাপটি মেরে বসে থাকে ।

চম্পি এরকমই ।

===

মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প লেখালেখি করে । বেশি লেখে বিভিন্ন ওয়েবজিনে । যখন ওর অবিনশ্বর গল্পটা পরবাসে বেরলো একজন বিখ্যাত লেখকের চামচা ও আনকোরা গল্পকার এসে বললো - আপনার গল্পটা পড়লাম । ভালো লাগেনি ।

- লাগলেই আমি নিজেকে ডিগ্রেডেড মনে করতাম । ও গল্প বোঝার যোগ্যতা আপনার নেই ।

চম্পির সাফ জবাব। চমচা সুবোধ বিরক্ত। হতচকিত। কিছুটা আহত। কারণ চম্পি তার প্রিয় লেখিকা। চম্পাকলি সেন। যেহেতু প্রিয় লেখিকা সেহেতু সে ভেবেছিল সেই ঠিক করবে কি চম্পির লেখা উচিৎ, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। বিনা অনুমতিতেই সব দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন, টিপিক্যাল ক্যালকাটানের মতন।

– উনি বড্ড কাঠ কাঠ কথা বলেন, সুবোধ অনুযোগ করে সহলেখিকা মেধার কাছে।

– হয়ত বলে কিন্তু ওর মনটা খুব বড়। ও অনেক বড় আধার। সবাই ওকে বুঝতে পারেনা। মেধা স্নেহসিক্ত।

চম্পিকে মেধা বেশ পছন্দ করে। ওর কথায় একটা ধার আছে। যা বলে ঠিকই বলে। চিন্তাভাবনায় যুক্তি আছে। এবং ওর লেখাগুলোও ছুরির মতন তীক্ষ্ণ।

মাল বোঝাই গরুর গাড়ির মতন নয়। সাধারণ মানুষ অনেক সময় রিলেট করতে পারেনা। তাই অনেকেই ওর লেখার ভক্ত নয়। তবে বিষয়বস্তু যাই হোক লেখার বাঁধুনি ও সাবলীলতা সবাই এক বাক্যে মেনে নেন।

চম্পি যখন তখন গল্প লিখতে পারেনা। যেই গল্প লিডস্ টু নো হোয়ার তা ওকে টানে না।

লেখার জন্য লেখা ওর একেবারেই না পসন্দ। বাড়ির বৌ বাড়ি নেই, বাবু ঝিয়ের সঙ্গে ফিজিক্যাল হচ্ছে : এই বিষয় নিয়ে ও একলাইনও লিখবে না। তাই চিন্তা করতেই বেশি ভালোবাসে। যেই চিন্তা ওকে নাড়ায়, মনের খোরাক যোগায় তাই নিয়ে দু কলম লিখে ফেলে।

অনেকে ওর লেখায় বিদেশী সাহিত্যের ছোঁয়া দেখতে পান। মোপাসাঁ ও মার্ক টোয়েন ওর প্রিয় লেখক। ভারতীয় লেখকদের ইংরেজিতে লেখা গল্প উপন্যাস ও পড়েনা। কারণ ওর মনে হয় যে তারা বড্ড বেশী অলঙ্করণ এর দিকে যান। হয়ত মাতৃভাষা নয় বলেই। লেখার সাথে সাথে কতটা ইংরেজি ভাষা জানেন সেটাও প্রদর্শন করেন। চম্পির মোটেই ভালো লাগেনা। তবে ঝুম্পা লাহিড়ি বা অরুন্ধতী রায়ের বই ওর ভাললেগেছে। বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে সে অত জানেনা। অনেকদিন বাংলার বাইরে আছে তাছাড়া সে তো বাংলা সাহিত্যে অত ইন্টারেস্টেড নয়। টুকটাক কিছু নাম জানে। নিজের ভালোলাগে তাই বাংলায় দু কলম লেখে। যদিও একদল পাঠক ওর পেছনে লেগে আছে ও গল্প লিখতে পারেনা বলে। ওর গল্পে হাই সোসাইটির কথা থাকে যেটা সাধারণ পাঠক নিজের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পারেনা।

বড়লোকের গল্প থাকে যেটা মধ্যবিত্তের মনে হয় বিলাসিতা, ড্রিম ওয়ার্ল্ড। আর ছাপোষারা তো বড়লোক মানেই জানে - রক্ত চোষা, অসৎ উপায়ে পয়সা করনেওয়ালা।

মণি ভৌমিক, আজিম প্রেমজি, নারায়ণ মূর্তিও যে বড়লোক তা কিন্তু তারা মনে রাখেন না।

তাদের মানব দরদের কথা ফলাও করে বলে বেড়ায়। কাজেই চম্পাকলির লেখা অনেকের কাছেই সমাদৃত নয়।

তবুও সে চেষ্টা করে তার গভীর, বোধ সপন্ন লেখাগুলোকে বৃহত্তর মহলে পৌঁছে দিতে।

একজন তো বলেই দিল - স্বপ্নের বাজার পত্রিকায় কটা গল্প বেরিয়েছে আপনার ?

- -একটিও না।

- তাহলে লেখার মান বুঝবেন কি করে ? জানবেন কি করে যা লিখছেন সেগুলো প্রকাশযোগ্য কিনা ?

- কেন কনফিডেন্স বলে কি কিছু নেই ? নিজের লেখার গুণমান নিজেকেই বুঝতে হবে । যিনি আমার লেখা বাছবেন তিনি যে রাইট পার্সেন সেটা তো আমাকেও দেখতে হবে ! অনেক স্বপ্নের বাজারের লেখক ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় আবার কেউ কেউ ওখানে না লিখেও সাহিত্য একাডেমি পায় । আসল হল নিজের জীবনবোধ ও গভীরতা সুন্দর ভাবে এক্সপ্রেস করা । সেটা হলেই রাইট ওপরচুনিটি নিজে থেকেই আসবে। বলেনা, প্রতিভা কখনো চাপা থাকেনা । তখন দেখবেন স্বপ্নের বাজার আপনার স্বপ্নকে তাদের বাজারে ছাড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে । দে উইল জাস্ট গিভ ইউ আ চান্স । রেস্ট ইজ ইওর্স । ক্ষমতা থাকলে এমনিই এগোবেন, পাঠক নিলে সফলতা আসবে, নাহলে সব ভোঁ ভা । কোন পত্রিকাই কিছু করতে পারবে না ।

লোকে উত্তর শুনে মুচকি হাসে । মনে মনে বলে-প্রবাসী বাঙালী তো ! কিসুই জানেন না । *লড়াই লড়াই লড়াই - লড়াই করে বাঁচতে চাই !*

কলকাতাবাসীর এই স্লোগান আতস্থ হয়ে গেছে । একমাসে যেখানে ৪টে বন্ধ হয় সেখানকার লোক একটু প্যারানয়েড হবেনা এও কি সম্ভব ?

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে যে জল হয় তা তারা মানতে পারেন না ।

- -শুধু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ? ব্যস্ ? নির্ঘাত অন্য কিছুও লাগে । বিজ্ঞানীরা খোলসা করে বলেন না ।

এহেন চম্পি একদিন সন্ধ্যায় বাতাসবাড়ির গেটে, বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফিরছে । এমন সময় দেখলো এক বয়স্ক ভদ্রলোক খুব কষ্ট করে হেঁটে যাচ্ছেন । বয়সের ভারে ন্যুব্জ । চম্পির স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতায় সে বৃদ্ধ কে সাহায্য করে । তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয় । চম্পির সি-২০৩ আর ওনার সি-৩০৩ । নাম নিখিলেশ চন্দ । ভদ্রলোক একাই থাকেন । রিটায়ার্ড আই এ এস অফিসার । ওনাকে পৌঁছে দিতেই উনি ভেতরে আমন্ত্রণ জানালেন ।

পরিপাটি করে সাজানো । স্ত্রী গত হয়েছেন । ছেলেরা বিদেশে । একজন হার্ভাডে অন্যজন মস্কোয় । একজন অধ্যাপক অন্যজন ইন্ট্যালিজেন্স অফিসার, মস্কোয় গেছেন কাজে ।

ওনার বসার ঘরে বেশ কিছু ছবি টাঙানো । পিকাসো, ভ্যান গখের । ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন,

- সবই রেপ্লিকা ।

- বুঝতে পেরেছি । অরিজিন্যাল তো কিনতে পারেন কোন মিত্তল বা বিড়লা ।

- আর একটা ছবিও আছে । সেটা আমার আনাড়ি হাতে আঁকা । অন্য কোনদিন দেখাবো।

এরপর থেকে বেশ কয়েকবার চম্পি ওনার বাড়ি গেছেন । একদিন হঠাৎ উনি বললেন- আমার খুব লেখার শখ আছে । আজ একটি কবিতা লিখেছি, শুনবে ?

কবিতাটি খুব গভীর, প্রণব ধ্বনি ওঙ্কার নিয়ে লেখা । নামটিও ওম্ । চমৎকার লেখা ।

ব্রহ্মান্ডের সমস্ত শব্দের মূল হল ওম্ । ওম্ ধ্বনিই ম্যাগনিফাইড হয়ে অন্যান্য শব্দের সৃষ্টি করে।

উচ্চারণ : ও-উ-ম ।

বেশ ইন্টেরেস্টিং লেখা । এবং পাকা হাতের, কনডেন্সড লেখা । এক একটি শব্দ এক একটি উপন্যাস রচনা করেছে । একবারে প্রখ্যাত লেখকদের মতন ।

– আপনি বুঝি খুব লেখেন ?

– হ্যাঁ এক সময় খুব লিখতুম । এখন আর লিখিনা ।

– কেন ? এত সুন্দর লেখা আপনার ! এক একটা কথাই যেন এক একটা বই ।

– আজকাল সেরকম পাঠক কৈ ? আমি বাতিলের খাতায় । আমার লেখা লোকে বোঝে না তাই কলম ধরিনা ।

– তা যা বলেছেন । আজকাল সত্যিকারের পাঠকের বড় অভাব । সত্যিকারের সমঝদার পাঠক কৈ ?

ভদ্রলোক হো হো করে খুব হাসলেন । তারপর বললেন - বুঝলে ঋতুপর্ণা, ( চম্পির পোশাকী নাম, চম্পাকলিটা পেন নেম ) একজনের লেখা আমার খুব ভালো লাগে । খুব গভীর লেখা । এভিডেন্টলি আ গিফটেড রাইটার । ওর একটা ছবিও আমি এঁকেছি । কল্পনা করে করে । কেমন হতে পারে সেই মেয়ে ! আমি যেবার রবীন্দ্র পুরস্কার পেলাম সেই বছর তো ভারত সরকার আমাকে পদ্মভূষণও দিল, সেইসময় আমিও এই মেয়েটির মতন করে সব ভাবতাম । আজ অনেক ধীর স্থির হয়ে পড়েছি । ফুরতে চললাম তো ! তবে কবিতায় আজও আছি ।

চম্পির তো আক্কেল গুডুম । বলেন কি ! পদ্মভূষণ পেয়েছেন ? রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন? ইনি কে ? এনার কথা তো জানেনা সে ! এনার লেখা তো প্যান্প্যানে নয় । ঠিক চম্পি যেমনটি চায় সেরকম । বাড়ি গিয়েই নেট বন্ধুদের মাঝে খোঁজ নিতে হবে ! নেটেও নিশ্চয় পাবে ।

এতবড় লেখক, ওর মনের মতন এক লেখক এই বাতাসবাড়িতেই থাকেন, জানা ছিলনা তার? পরম সৌভাগ্য তো,আর ঠিক ওপরতলায়ই থাকেন । ওনার ছত্রছায়াতেই আছে সে । দারুণ ব্যাপার ।

এইসব ভাবছে এমন সময় ভদ্রলোক তার প্রিয় রাইটারের একটি লেখা ও আনাড়ি হাতে আঁকা কাল্পনিক ছবি নিয়ে এলেন । ছবিটি দেখে কথা সরে না চম্পির ! যেন কোন বেলজিয়ান গ্লাস তার সামনে মেলে ধরেছেন নিখিলেশ চন্দ আর লেখাটির নাম অবিনশ্বর -চম্পাকলি সেন ।

# আশ্রমিক

কলকাতার বিশাল বাড়িতে দেয়াসীনের বসবাস। তার বাবা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মা ডাক্তার। বাগান ঘেরা বিরাট পৈত্রিক বাড়িখানি ঠাকুর্দার তৈরি। তিনি খুব নামজাদা উকিল ছিলেন। সেকালে একটি বিখ্যাত মামলা জিতে অনেক পসার হয়েছিল তাঁর।

সমস্ত রোজগার দিয়ে বাড়িটিকে সাজান উনি। ফটক পেরোলে বড় বড় দেবদারু গাছে ঢাকা পথ, মোরাম বিছানো। সেই পথ পেরিয়ে গাড়ি বারান্দা। তারপরে মূল বিল্ডিং।

ভেতরে অনেকগুলো ঘর সার দিয়ে রয়েছে। শ্বেতপাথরের টেবিল তাতে তাজা গোলাপ সাজানো। হাল্কা ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি মো মো করছে।

ছোটবেলায় দেয়াসীনের ঐ ঘরে ঢোকা বারণ ছিল কারণ সে বেশ কয়েকবার ফুলদানি ভেঙে দিয়েছিল। পরে অবশ্য ঢুকতে পেতো। দাদুমণি যতদিন বেঁচে ছিলেন ওকে বুকে করে আগলে রাখতেন। উনি মারা যাবার পরেই শুরু হল তার দুর্দিন।

কারণটা কিছুই নয় খুব সাধারণ। সে ছিল হাতে পায়ে দুষ্টু এবং পড়াশোনায় মাঝারি। সারাটা দিন খেলে বেড়াতো, পড়ায় মন ছিলনা কাজেই পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হতনা। বিদ্বান পিতা মাতার কাছে ক্রমাগত মার খেতে খেতে মোটা চামড়া হয়ে গিয়েছিল।

শেষের দিকে সে কেমন অ্যালুফ হয়ে গিয়েছিল।

তার ভাললাগতো শুধু খেলা করতে আর গল্পের বই পড়তে। বাড়িতে একটা বিরাট লাইব্রেরি থাকায় নানান ধরণের পুস্তকের সমাহার ঘটেছিল। সেগুলো পড়তে বেশ লাগতো। আর বিকেল বেলায় বন্ধুদের সঙ্গে রাজ্যের খেলা খেলে বেড়াতো। হা ডু ডু, গোজিকোট, কানা মাছি।

স্কুলে যেতে তার আদৌ ভালোলাগতো না।

কাকা পিসি মাসির ছেলেপুলেরা যখন পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করতো তখন ওর বাবা মায়ের মুখটা দেখবার মতন। বেচারা দেয়াসীন ! পড়তে যে ওর মোটেই ভালো লাগেনা !

অপদার্থ গাধা ইত্যাদি বিশেষণ গুলো শুনে শুনে কান পচে গিয়েছিল। বাবা মা উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় ওর ওপরে অনেক চাপ ছিল। বেশি অসুবিধে সৃষ্টি করতো গৃহবধূ আত্মিয়রা। নিজেরা হয়ত গ্রাজুয়েশনের গন্ডিটাও পেরোন নি কিন্তু দেয়াসীনের বিচার করার সময় সব ভুলে যান। শুধু প্রকৃতিদত্ত রূপের জোরে এক একটি টাকার কুমিরের ঘাড়ে চেপে মেদের আধিক্যে নদনদে শুয়ারির মতন এইসব মহিলারা অন্যের বিচার করতে বসে যান। কোন মেয়ের বিয়ে হল কার হলনা কে কোন এক্সজামে কত পার্সেন্ট পেল, কে ইংরেজির কোন বানান ভুল করলো সমস্ত কিছু এই গৃহবধূদের নখদর্পণে যাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে মজা করে দেয়াসীনের পিসতুতো দাদা নাম দিয়েছিলেন -- ডোমেস্টিক ইঞ্জিনীয়ার।

নিজেদের পুত্র কন্যাদের সাফল্যে এঁরা খুশি হন, নিজেদের জীবনে যা হয়নি তা পুত্র কন্যাদের মাধ্যমে পেতে চান। দেয়াসীনের ভালো লাগে ক্রিয়েটিভ কাজ। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রেখে বিজ্ঞান না পড়লে লোকে তো বোকা বলবেই। ফলে মানুষ হিসেবে সে কত বড় তার বিচার হয় তার রিপোর্ট কার্ড অনুযায়ী। কাজিনেরা সবাই জয়েন্টের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভালো ফল

করেছে । কেউ বা আই আই এমে পড়তে গেছে দেয়াসীন টেনে টুনে পাশ করলো । কলেজের গন্ডী পেরোলো তাও বাণিজ্য নিয়ে কাজেই আত্মীয় পরিজনের কাছে সে অচ্ছুত । মধ্যবিত্ত বাবা মা বিদেশী গাড়ি চড়তে পারলেই বর্তে যান কাজেই সন্তানের টাকায় বিদেশী গাড়ি কিনে যারা চড়েন তারা একই সঙ্গে খুশি ও গর্বিত । --দেখো আমার আত্মজকে দেখো ! দেখেছো কেমন তৈরি করেছি ।

সেখানে দেয়াসীনের মা বাবার কোন জায়গা নেই ।

পরোপকারী ও মানুষ হিসেবে প্রথম সারিতে আসা দেয়াসীনের সৃষ্টিশীল মন অঙ্কের খাতায় হাঁপিয়ে ওঠে তাই সে পড়ে যায় বিফলের দলে । কোনক্রমে একটা ছোট ফার্মে চাকরি জুটিয়ে দিন গুজরান করতে থাকে ।

মন কিন্তু পড়ে থাকে খোলা আকাশের দিকে যেখানে সাতরঙা রামধনুর খেলা চলে ।

ডেবিট ক্রেডিটের খাতা ফেলে উদাসী চোখে চেয়ে থাকে সুনীল মেঘের আসা যাওয়ার পথপানে ।

হয়ত কোনদিন সেও পাড়ি দেবে মেঘের দেশে । ঐ খানে যেখানে মেঘেরা কানাকানি করে ।

সেদিন ছিল বড়দিন । দেয়াসিনের এন আর আই মামা সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন ভারত । আসলে কিছুদিন এখানে থেকে কিছু রসদ নিয়ে ফিরে যাবেন । ওখানে গিয়ে গরীব ভারতবাসীদের নিয়ে হাসি তামাশা করতে হবে না ? ঘরোয়া আড্ডায় ?

শুধু পার্টিতে গায়ের ভারতীয় গন্ধ ঢাকার জন্য বিলিতি আতর মেখে যেতে ভুলবেন না । তাও যদি একটা ফেরারি বা পোর্শে থাকতো !

যাইহোক ভদ্রলোক এসেই নানান খুটিনাটি তথ্য নিয়ে পড়লেন । স্বভাবতই দেয়াসীনের লেখাপড়ার ব্যাপারটাও এলো । সাধারণ মানের কাজ করে শুনে নাক কুঁচকে বললেন-

- ডাল বয়, রিয়েলি ডাল ।

দেয়াসীনের মন ভেঙে গেলো । চুপ করেই রইলো ভদ্রতার খাতিরে । তারপরে মামা মামিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখাতে যেতে হল । ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আর কি !

এন আর আই মামাবাবু একটিও পয়সা খসালেন না। সব খরচ দেয়াসীনকেই করতে হল । মাইনেও পায়নি তখন আর বাবা মায়ের কাছ থেকে সে কোন অর্থ নিত না । নিজের সামর্থ্যেই চালাতো সব খরচ । শুধু খাবারের পয়সাটা মা বাবা নিতেন না । নিতে চাইতেন না ।

মামা বাবু উপুড় হস্ত করলেন না । আসবার সময় কিছু গিফট এনেছিলেন সবই সেলে কেনা বোঝাই যায় আসলে গরীব ছোটলোক ভারতবাসীর আবার আর্মানি কি কাজে লাগবে ? ওরা কি কিছু বুঝবে ? অতএব নিয়ে এসো আজে বাজে জিনিস । মামাবাবু অবশ্য জানেন না যে আজকাল ভারতেও কড়ি ফেললে বিদেশী ব্র্যান্ডেড জিনিস মেলে । শুধু মধ্যবিত্তরা হয়ত কিনতে সক্ষম নন ।

মামা আপদ সপরিবারে বিদেয় হতেই দেয়াসীনের ওপর আবার দোষারোপ । সে নাকি মামাদের সঙ্গে যথেষ্ট সভ্যতা করেনি । পরিবারের সবটুকু সুবিধে নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া আর মাঝে মাঝে দেশে এসে ইংরেজি বুলি কপচানো মামাবাবুর আঁতে ঘা লেগেছে কেন জানেন ? কারণ দেয়াসীন তার মামাতো ভাইকে কতগুলো সত্য কথা জিজ্ঞেস করেছিল --

*লাল মুখো বাঁদরের দেশ ভালো নাকি ভারত ? ঐ দেশে নিজেকে ব্রাত্য মনে হয়না ? সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন হিসেবে খারাপ লাগেনা ? সাহেবরা ডার্টি ইন্ডিয়ান বলে গালি দিলে কেমন লাগে ? কেমন লাগে যখন গাধার মতন খাটায় আর নিজেরা পার্টি করতে চলে যায় ?*

এই সব অপ্রিয় সত্যই কাল হয়েছে । না বললেই বোধ হয় ভালো হত ।

বাবা মায়ের কাছে যারপরনাই ঝাড় খেয়ে দেয়াসিন স্থির করলো যে সে আর বাড়িতে থাকবে না । এই অবহেলা অসহ্য । কথাগুলো কি সে ভুল বলেছে ? ওরা কিন্তু যুক্তির ধার ধারলেন না । বিদেশী মামাকে খুশি করতেই বেশি তৎপর হলেন ।

ও যে বললো বিদেশে পড়াশোনার কত সুযোগ, কত মূল্য দেয় ওরা যে কোন কাজকে, যে কোন বয়সে যা ইচ্ছে পড়া যায় তাই নিয়ে কেউ নিন্দে করেনা, ছোটবেলা থেকে রুটি নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে হয়না - মননের দাম দেয় মানুষ সেগুলো কেউ কানে তুললো না ।

প্রবাসী বাঙালীরাও তো বলে যে আজকাল কলকাতায় ঢুকলে মনে হয় - সময় এখানে থমকে দাঁড়িয়েছে, জগতের সব শেষ হয়ে গেছে, প্রলয় আসন্ন ইত্যাদি ।

শুনতে খারাপ লাগে ওদের কিন্তু কিইবা করার আছে ? যা সত্য তা সত্যই । মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।

দেয়াসীনও নাছোড়বান্দা । অনেক হয়েছে । আর নয় । ছোট্ট একটা ব্যাগে নিজের জিনিসপত্র কিছু গুছিয়ে একদিন সে বেরিয়ে এলো চিরতরে তার বাড়ি থেকে । যেখানে অবহেলা ও অবজ্ঞা, অসম্মান সেখানে সে কিছুতেই থাকবে না । অনেক হয়েছে আপোসের পালা সাঙ্গ হল এবার ।

প্রথমে ট্রেনে করে অনেকটা পথ এলো । দক্ষিণ ভারত । মাদ্রাজের কাছে চলে এলো । সমুদ্রের ধারে কিছুদিন কেটে গেল । তারপর শহরের দিকে চলতে লাগলো । চলতে চলতে অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে এসে পৌঁছালো একটি গ্রামে । পাহাড়ের মাথায় অনেক কেল্লায় । সবই পরিত্যক্ত । দেয়াসীন তো রাজস্থানে গেছে । সেখানকার কেল্লা গুলো অবশ্যই ভিন্ন ধাঁচের । এগুলো অন্যরকম । একটা পাহাড় দেখে তো মনে হল যে থরে থরে কেউ পাথর সাজিয়ে রেখেছে । এই বুঝি একটা আরেকটার ঘাড়ে পড়বে !

পথে কত অচেনা মানুষের সাথে আলাপ হল । ভারি সুন্দর দেশ । আর লোকজনেরাও তার চেনা ছকের বাইরে । এই তাহলে আসল বিশ্ব ? ওদের জগৎ এতো ক্ষুদ্র কেন ?

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে । জল, একটু জলের বড় প্রয়োজন । এদিক বড্ড গরম যে ।

দূরে একটি আশ্রম দেখা যাচ্ছে । ধীর পায়ে হেঁটে গেল সেই আশ্রমের পানে । রুদ্রাক্ষের মালা পরা এক সন্ন্যাসী, কাঁধে ঝোলা । চোখগুলো রক্তবর্ণ ।

- বেটা কেয়া বাত হ্যায় রে ?

- পানি, এই টুকুই বলতে পারলো দেয়াসীন ।

সন্ন্যাসী আশ্রমের দিকে আঙুল দেখালেন । দেয়াসীন পা বাড়ালো । এখন বসন্তকাল । গাছে গাছে ফুল, কোকিলের কুহু কুহু অথচ এত গরম পড়েছে যে বলার না ।

আশ্রমে প্রবেশ করতেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল । সুন্দর খড়ের ছাউনি, ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডাকছে- কাঁ কাঁ করে । ও আগে কখনো ময়ূরের ডাক শোনে নি, এত কাছ থেকে ময়ূর

দেখেও নি । কি সুন্দর রঙ তাদের । ময়ূরী গুলো সুন্দর নয় কেমন মুর্গীর মতন দেখতে । উড়ে উড়ে ওরা গাছে বসছে । ভক্তগণের সমাবেশ হয়েছে হয়ত কোন বিশেষ পূণ্যতিথি আছে। পাথরের মন্দির প্রাঙ্গন থেকে ভেসে আসছে মধুর স্তোত্র পাঠ । হাওয়ায় ভাসছে চন্দনের সুবাস । মনোরম চারিপাশ । এমন সময় একজন খালি পায়ের সাদা ধুতি পরিহিত মানুষ এগিয়ে এলেন ওর দিকে ।

ক্লান্ত মুখ পানে সস্নেহে চেয়ে বললেন - একটু জল খাবে ?

বড় মধুর সেই কন্ঠস্বর । যেন কত আপনজন, কত দিনের চেনা । প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো দেয়াসীনের । নিজেই খুলে বললো তার সব কথা ওনাকে । ওনাকে ভরসা করা যায় । ওনার মুখের প্রশান্তি বলে দেয় উনি অনেক উচ্চস্তরের মানব সন্তান । দেয়াসীনের বড় লোভ হয় একটি বার ওনার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসতে । ওনার স্নেহধন্য হতে । তাই মনের সবটুকু জ্বালা যন্ত্রণা নি:শেষ করে ঢেলে দেয় আশ্রমিকের কাছে । মনটা শান্ত হয় । একটি বারের জন্যেও মনে হয়না যে এই মানুষটা ওর একদম অচেনা।

আশ্রমের পেছনে একটা পাহাড় আছে । খুব উঁচু এমন নয় তবে ভারি সুন্দর সবুজে মোড়া । ওখানে ওঠার জন্য আশ্রমের তরফে একটা পাথরের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে সেটা দিয়ে পায়ে পায়ে চললে পৌঁছে যাওয়া যায় চূড়ায় । সেখানে আছে একটি শীতল ঝোরা । বেশির ভাগ জল আসে বর্ষার সময় অন্য সময় শুকনো থাকে তবে জায়গাটি দৃষ্টিনন্দন । এই পাহাড়ে আছে ভেষজের অমূল্য ভান্ডার । আশ্রমের একটি ভেষজ কারখানা আছে সেখানে অনেক ওষুধ তৈরি হয় ।

আর লেমন গ্রাসে ঢাকা পাহাড়ের ঢাল । সুন্দর গন্ধ আছে । স্থানীয় মানুষজন সেই গ্রাস জলে ফুটিয়ে চা তৈরি করে খায় । দেয়াসীন একটি ছিঁড়ে শুকে দেখেছে । প্রাণজুড়ানো সুবাস ।

এই পাহাড়ের চারিপাশে ১৫ কিলোমিটার পথ মানুষ পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করে । সেটি একটি পূণ্য কর্ম বলে মানা হয় । আসলে মানুষ তো খুঁটিতে বাঁধা । এই পাহাড়কে শিবের প্রতিরূপ মানা হয় । তাই খুঁটি বা লিঙ্গের চারিপাশে যত ঘুরবে তত ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবে । অহং নাশ হবে শেষে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে । দেয়াসীন কয়েকবার চেষ্টা করেছে । পরম ভক্তি সহ হাঁটলেও ৮ কিলোমিটারের বেশি প্রদক্ষিণ করা হয়নি এখনো ।

এই আশ্রমে এসে ওর খুব মজা লাগছে । এতদিন ভেবেছিল ও একটি আবর্জনা, বস্তাপচা অস্তিত্ব । কিন্তু জগৎ সংসারে ও যে নিকৃষ্ট নয়, ওরও যে যথেষ্ট মূল্য আছে সেটা যেন বুঝতে পারছে । এতদিনে নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে । কিছুই হারায়নি তার সবই তো আছে ঠিকঠাক ।

আশ্রমিক ঐ ভদ্রলোক ওর সব কথা শুনে একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন আশ্রমের একটি ছোট ঘরে । বললেন ফ্যান নেই একটু কষ্ট হবে হয়ত তবে কিছুদিনের মধ্যেই বৃষ্টি হবে ।

আশ্রমের টুকটাক কাজের দায়িত্ব দিলেন ওকে । এখানে তো প্রচুর বিদেশি আসেন । কত মানুষ বসে মেডিটেশন করছেন সমাধির কাছে । এটা শ্রী মহানন্দ বাবাজির আশ্রম । উনি সেলফ্ রিয়েলাইজড্ সোল ছিলেন । সোজা কথায় আত্মজ্ঞানী । ১৯৫৫ তে ওনার মহাসমাধি হবার পরে ভক্তরা এখানে আশ্রম নির্মাণ করেন । এখানে কোন দীক্ষা নেই । শুধু আপন মনে বসে ধ্যান করো । মহানন্দজির টিচিংস্ ফলো করো । কোন টাকা পয়সা চাইবার দৃষ্টিকটু ব্যবস্থা নেই । কারো ইচ্ছে হলে ডোনেশন দিতে পারেন । কোন চেলাবাজি নেই, ক্লাববাজি নেই । ধর্মের কচকচানি নেই । আছে শুধু সেবা ও ধ্যানের প্রথা ।

মহানন্দজির কথা অনেকটাই যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ির মতন :

*আমার পূজায় ফুল বেলপাতা লাগেনা । এই পূজায় সব ভগবানেরা অদৃশ্য শুধু পরমানন্দ থেকে তৈরি হয়েছে এক মহাশূন্যতা ।*

খুব ভালো লাগলো দেয়াসীনের । অপার শান্তি যেন । এতদিন যে জীবনে সে অভ্যস্থ ছিল তার চেয়ে কত আলাদা এই জগৎ । কত অচেনা কিন্তু কত আপন । আর সেই ভদ্রলোক ! যিনি ওকে থাকার ব্যাবস্থা করে দিলেন উনি কি মাটির মানুষ । আশ্রমে সবার খাওয়া হয়ে গেলে নিজে হাতে এঁঠো পরিস্কার করে নিচ্ছেন । খালি পায়ে সারা গ্রাম চষে বেড়াচ্ছেন প্রচন্ড গরমে ।

কোন বিকার নেই । অদ্ভুত মানুষ । এত শক্তি উনি কোথায় পান ?

- রোজ রাতে আমি নিয়মিত ধ্যান করি ।

বলে ওঠেন ডাক্তার আইয়ার । পীতম আইয়ার । বাড়ি ছিল মাদুরাই শহরে । ইংল্যান্ডের ডাবল এফ আর সি এস । সার্জেন হিসেবে যথেষ্ট সফল ছিলেন । ভেলোরে কাজ করতেন তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং সব ছেড়ে চলে এলেন এই আশ্রমে । হয়ে গেলেন আশ্রমিক । তারপর থেকে এই মেঠো পথ চলা শুরু । ভোর চারটে থেকে রাত বারোটা অবধি ওনাকে পাওয়া যায় । তারপর ধ্যান এবং শেষে অল্পক্ষণ ঘুমানো । গভীর ধ্যান করলে ঘুমানোর প্রয়োজন হয়না - বলেন ডাক্তার । সহজ সমাধিতেই থাকেন আজকাল । একেই কি বলে যোগনিদ্রা ?

৬ ফিট লম্বা, টকটকে গায়ের রং মাথার চুল কদম ছাঁট করা সদাহাস্যময় এই মানুষটিকে দেখে মনেই হবেনা উনি এত শিক্ষিত এত সফল ছিলেন । শিশুর মতন সরল ।

একদিন দেয়াসীন জিজ্ঞেস করেই ফেলে- আপনি সব ছেড়ে এই খানে কেন ?

- এটাই তো আসল জায়গায় হে ! সবাইকেই তো একদিন এখানে আসতে হবে । যে যত আগে আসবে ততই মঙ্গল । এই তো জীবনের লক্ষ্য । আমরা গড়পরতা মানুষ যা করি সবই তো অহং চরিতার্থ করার জন্য । আসল লক্ষ্য তো আনন্দ । বিজ্ঞান কি মানুষের সুখের জন্যই এত আবিস্কার করছে না ? তাহলে এমন কোন উপায় যদি থাকে যাতে চির সুখ পাওয়া যাবে সেটা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি ?

আর সুখ এবং আনন্দ কিন্তু সুক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ব্যাপার ।

মানুষ সুখী হবার চেষ্টা করে আর সাধকেরা পরমানন্দে অবগাহন করেন । বুঝলে কিছু ?

সত্যি দেয়াসীনের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছেনা । সে চিরটাকাল জেনে এসেছে সে মধ্যমেধার ছাত্র । কিন্তু আজ এই মহাজগতের গল্প শুনে তার একটুও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আমাদের জীবনের লক্ষ্যটা ঠিক কি । এই সর্বত্যাগী, আশ্রমিক অথচ সন্ন্যাসী নন মানুষটির কাছে এসে সে যেন নতুন করে উপলব্ধি করছে জীবনকে । তবে দার্শনিক তত্ত্বের চেয়েও যেই কথাটি তার অন্তরকে ছুঁয়ে গেলো তা হল- কাউকে নীচু করে কখনো ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে না । প্রত্যেকের নিজস্ব জায়গা থাকে সেটা তাকে ছাড়তে হয় ।

*কিসের আশায় এই ভদ্রলোক সব ছেড়ে এই গ্রামে একা একা পড়ে আছেন? কোন সে মুক্তো ? পারেনা কি দেয়াসীন ডুবুরী হয়ে সেই মুক্তোর ঝাঁপিটা খুঁজে বার করতে ?*

*হাতে সময় বড় কম, সে আর সুযোগ নষ্ট করতে চায়না ।*

বসন্তদিনে পড়ন্ত বেলায় পূর্বাশ্রমে ডাক্তার আশ্রমিক আইয়ারজি কোলে করে একটি ছাগলশিশুকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। ছাগলটির একটা পা কেউ ভেঙে দিয়েছে। হয়ত চলমান কোন গাড়ি কিংবা দুষ্টু ছেলেপুলেও হতে পারে। কোলের ওপর তাকে বসিয়ে হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে ঠ্যাং পরিচর্যা করলেন। ডাক্তারি বিদ্যে দিয়ে।

শুশ্রুষার পর ওটাকে বেঁধে দিলেন একটি খড়ের গাদার ওপর সযত্নে। তারপর দেয়াসীনের দিকে ঘুরে বললেন- দক্ষিণী খাবার বিস্বাদ লাগছে না তো?

দেয়াসীনের কাছে খাদ্য এখন শুধু বাঁচার জন্য একটা প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যাতীত কিছুই নয়।

সেই বাঁচা যার মাধুর্য্য সে হারাতে বসেছিল শহুরে কোলাহলে। এখানে এই নিরালায় এসে সে নতুন করে সব খুঁজে পেয়েছে। অমূল্য রতন খুঁজে পেয়েছে। সেই রতনই ভাগ করে নিতে চায় অন্য আশ্রমিক দের সঙ্গে। বুঝে গেছে ছুটে বেড়ানো জীবন নয়, শান্তির স্রোতে অবগাহন করাই জীবনের মুল লক্ষ্য। সেখানে টাকা পয়সা ডিগ্রী যশের কোন মূল্যই নেই। একেবারেই নেই। সেগুলো মানুষের সৃষ্ট এক একটি মেকী বিশ্ব। যার জালে জড়িয়ে পড়ে দেয়াসীন হাঁস ফাঁস করছিল এতদিন। হারিয়ে ফেলেছিল নিজের ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে। হয়ত বা আমরাও ফেলছি, প্রতিদিনের ইঁদুর দৌড়ের সামিল হয়ে।

# চন্দনী

আজ ধর্মপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কুমারী চন্দনী ঘোষের ছেলের বিয়ে । নিজের নয় অবশ্যই - পালিত পুত্র, কোটি টাকা খরচ করে সে মন্ডপ সাজিয়েছে অনেক বড় বড় মানুষের সমাগম হবে এই আসরে । আসলে রাজনীতির লোকজন তো আসবেই তাছাড়া চন্দনীর ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের লোকজনও আসবে । এছাড়া একগাদা বিউরোক্র্যাট্স্, ফরেন ভিজিটার ( সনাতন হিন্দু বিয়ে দেখতে ) এবং অন্যান্য অতিথিরা । চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে ওর সমুদ্রের ধারের ফার্ম হাউস : স্যান্ডপাইপারে ।

ওর নামের অর্থ কিন্তু মশলা, চন্দন গন্ধ -আতর কিংবা নদী নয় । ওর নামের অর্থ চন্দন রঙ । চন্দন চন্দন --- চোখের বড় আরাম হয় । চন্দনীর বাবা ছিলেন ভাস্কর । জলপাইগুড়ির মেঠোপথের বাসিন্দা তরুণ, ব্যায়ামবীর প্রভাস মাটির ভাঙ্গাগড়ায় এক অথরিটি হয়ে ওঠেন সহজাত দক্ষতায় ।

চন্দনীর মনে পড়ে সে যখন খুব ছোট বাবা তাকে বসিয়ে একটা পাথরের মাথা তৈরি করেছিলেন । আজও সেটা চন্দনীর বেডরুমে আছে ।

বাবাই নামটা রেখেছিলেন, একজন ভাস্করের রংয়ের প্যালেট থেকে উঠে এলো এক অনন্য ভাস্কর্য । মেঘবরণ চুল, দীঘল হরিণ চোখ, তাজা নরম ঠোঁট ----চন্দনের মতন গাত্রবর্ণ !

ওরা দুই বোন । ছোটবোন সুন্দরী নয়, সাধারণ চেহারা তার । চন্দনী রূপসী । তাই সে বারবার উঠে আসে তার বাবার সৃষ্টিতে । কখনো পোড়ামাটির ছাঁচে, কখনো শিলাখন্ডের কঠোরতায় কখনো বা তামার তারের ছন্দে । চন্দনী ভেঙেচুড়ে একাকার হয়ে যায়, নতুন রূপ পায় বাবার নিপুন হাতের ছোঁয়ায় ।

বাবাই বলতেন পৃথিবীতে চার ধরণের মানুষ হন । সরল, তরল, গরল এবং বিরল । সরল মানুষ সংখ্যায় কম । তরল ( যাদের কোন প্রিন্সিপল নেই, সুবিধে বাদী ) ও গরলই বেশী । বিরল তো প্রায় নেই । পরবর্তী জীবনে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি তার বাবা কোন পর্যায়ের মানুষ ।

পড়াশোনায় কোনদিনই তেমন উৎসাহ পেতনা চন্দনী । কোন শক্তির জন্য মানুষ ভাসছে না হেঁটে বেড়াচ্ছে, লোহা গলালে কি বেরোয়, বাদর কতটা গতিতে তৈলাক্ত লাঠি বেয়ে ওঠানামা করলে সফল বাদর হবে এইসব ঘোড়ার ডিম জেনে কি হবে ? মানুষ কেটে মাংস আর হাড্ডির স্তুপ শেযে ভয়ানক কঙ্কাল দেখে মানুষকে হাড্ডির আলমারি মনে করার কোন প্রয়োজন আছে? নিজের বোনকে কঙ্কালের মোড়কে দেখলে বোন অর্থাৎ হাড় মনে হতে পারে ভয় লাগতে পারে, কখনই নিজ ভগিনী মনে হবে না । বরং প্রকৃতি যেই সমস্ত পুতুল হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তাই নিয়ে খেলা করে কাটানো ভালো নয় কি ? পুতুলের পোস্ট মোর্টেম করতে গিয়ে জীবনের সুন্দর অধ্যায়গুলো নষ্ট হবে বেসিক কিছু বদলাবে কি ? চাঁদকে দিনে উঠিয়ে সূর্যকে মুচরে ফেলে নবগ্রহকে বগলদাবা করা যাবে কি ? কি লাভ ? অশান্তিই বাড়বে ।

কাজেই কি দরকার কাটা ছেঁড়া করে ? তার ভালোলাগে শিল্পীদের ।যাঁরা প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করেন । বিজ্ঞানীদের মতন সবকিছুকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নাঙ্গা করেন না । একটা সুন্দর মূর্তি বানান, মূর্তি ভেঙে খড়ের কাঠামো বার করেন না ।

মূর্তি দেখেই তার সুখ, ভেতরে হাতি আছে না জিরাফের ডিম জেনে কি হবে ?

ওর এক বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়াও হত । সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । চন্দনীকে বলে বসলো - নেচে কি হয় ? তোর গুরু ছেলে হয়ে নাচে কেন ? বিনা পারিশ্রমিকে সব জায়গায় নাচ দেখায় কেন ?

চন্দনী বেশ ঝাঁজিয়ে ওঠে- তোর মেশিন বানানো বুদ্ধি নিয়ে এগুলো চর্চা না করলেই নয় ?

হ্যাঁ অসাধারণ নাচতো সে । প্রসিদ্ধ এক ভারতনাট্যম গুরুর কাছে কিছুদিন তালিম নেয় । নৃত্য বিশারদ গুরু ও তাঁর পত্নী এতই নাচে বিভোর যে স্ত্রী হয়ত রান্না করছেন তখন স্বামী কিছু মুদ্রা দেখালেন, স্ত্রী শসা কাটা বন্ধ করে ছুরি হতে নিয়ে আরো কিছু নতুন মুদ্রা করে দেখালেন । বেরসিকের কাছে হয়ত খুবই অদ্ভুত লাগতে পারে, ছুরি নিয়ে আক্রমণ করছেন বলেও মনে হতে পারে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি ইজ ক্রিয়েটিভিটি । অল ওয়েজ অ্যাহেড ।

ভাগ্যের ফেরে সাধারণ পরিবারের মেয়ে চন্দনী হয়ে উঠলো মালায়লি ছবির একজন প্রথম সারির নায়িকা । ঢলঢলে মুখ খানি, অসামান্য লাবণ্যে ভরা দেহপল্লব এবং অভিনয় ক্ষমতায় সে প্রথম দিকে চলে এলো । মাদ্রাজ থেকে কেরালায় এসেছিল পেটের দায়ে। প্রথম দিকে রান্নার কাজ করেছে একটি হোটেলে । বাঙালী বলে রন্ধনের হাত বেশ ভালো ছিল তার । অসুবিধে যে হয়নি এমন নয়, বিশেষ করে প্রথম দিকে স্থানীয় মানুষদের কালো কুচকুচে ললাটে শিবের মতন চন্দন চর্চিত দেখে অনেক সময়ই জেব্রা ক্রসিং বলে অসম্ভব হাসি পেত । অবশ্য কপালের ফেরে ধীরে ধীরে রামগরুড়ের ছানাও হতে হল । যার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল সে তো কিছুদিন পরেই চম্পট দেয় । বাংলা মুলুক থেকে রাজনৈতিক ঝামেলা এড়ালো ...চলে এলো মাদ্রাজ । সেখানে থেকে কেরালা । তারপর একদিন কেরালা থেকে ছেলেটি কাজ নিয়ে পাড়ি দিল সুদূর আরবে । টেকনিক্যাল কাজ জানতো । খবরের কাগজে দরখাস্ত দেখে চলে গেল একদিন । চন্দনীকে এসে নিয়ে যাবে বলে গেল কিন্তু মাস ঘুরে গেল বছর ঘুরে গেল সে আর এলোনা। প্রথম দিকে চিঠি আসতো । পরে সেটাও বন্ধ । ওদের অবশ্য বিয়ে হয়নি । প্রথম জীবনের ভালোবাসা তো ! তাতে দেহ কম মন বেশি ছিল । তবুও খুব দু:খ হয়েছিল । ধাক্‌কা সামলাতে বেশ কিছু দিন লাগে । বাংলায় ফেরার কথা ভাবেনি । কোথায়ই বা যাবে ? কোন মুখে যাবে ? তাই এই অচেনা পরিবেশেই জীবন যুদ্ধের সৈনিক হয়ে নেমে পড়লো ময়দানে । ক্রমশ তো জিতেও গেল । আজ সে একজন সফল মানুষ । জীবন সম্বন্ধে তার কোন ক্ষোভ আজ আর নেই ।

চন্দনী যেই ঘুপচিতে উঠেছিল সেখানকার একটি মেয়ের সাহায্যে যোগ দিল সিনেমা দলে । সুন্দর চেহারা ছিল সহজেই কাজ জুটে গেল শুধু মালয়লি ভাষাটা শিখে নিতে হল । খটমট ভাষা সন্দেহ নেই কিন্তু ঘাড়ে চাপ পড়লে মানুষকে অনেক পাহাড় পর্বত ডিঙাতে হয় আর এতো সামান্য ভাষা শিক্ষা । ধীরে ধীরে ছায়াচিত্র জগতে সে বেশ উঁচু জায়গায় বসলো । কেবল অভিনেত্রী হিসেবেই নয় একজন ক্লিন মানুষ হিসেবেও তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো । ভারতবর্ষে যা ভালোমনুষ হবার মাপদন্ড তার সবকিছুই ছিল চন্দনীর স্বভাবে । ফিল্মি জগতে থেকেও মদ খায় না, চরিত্র খারাপ নয়, একটি অনাথ ছেলেকে দত্তক নিয়েছে, প্রতি রবিবার গরীবদের ধনসম্পদ বিলোয় আর কি চাই ? কাজে কাজেই সে মানুষ হিসেবেও প্রথম সারিতে আসে । মালয়লিরা যদিও মদ খেতে পারে প্রচন্ড ও সেটা তাদের হিসেবে কোন অপরাধ নয় তবুও মদ যে ভালো নয় সেটা অবশ্যই বোঝে ।

এখন তো চন্দনীর বয়স বেড়ে গেছে আর নায়িকা থেকে চরিত্রাভিনেত্রী হবার কোন ইচ্ছে তার ছিলনা তাই বেশিরভাগ সেলিব্রিটির ক্ষেত্রে যা হয় ওর পরিণতিও সেটাই হল । রাজনীতিতে পদার্পণ । এবং এখন মুখ্যমন্ত্রী । একটা মানবদরদী মন, নিস্কলুষ চরিত্র এবং ক্রিয়েটিভ

ট্যালেন্ট সমস্ত মিলিয়ে পাবলিক হৃদয়ে বেশ একটা জায়গা করে নিল চন্দনী । যার স্ক্রীন নেম নেত্রকলা ।

আজ টানা দশ বছর ধরে সে ধর্মপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । প্রচুর কাজ করেছে, মানুষের জন্য ।এই রাজ্যে মালায়লি বেশি । মুল কেরলায় তো বামপন্থী সরকার।কিন্তু চন্দনী মালয়লি সুভা দলের নেত্রী । তার শাসনে এই কয়বছরে রাজ্য বেশ এগিয়ে গেছে । ব্যাঙ্গালোরের পরেই ধর্মপুরকে সাইবার সিটি বলা হচ্ছে । শ্রমিক, মজুর, কৃষক সবার কল্যাণেই অনেক কাজ করেছে তাদের সরকার তার নেতৃত্বে । তবে মধ্যবিত্ত মানুষের কিছু ক্ষোভ আছে কিন্তু সেগুলো নিয়েও ওরা চেষ্টা করছে কাজ করার । এহেন ডাইনামিক, সৎ নেত্রকলা তো জনপ্রিয়তা পাবেই । উল্টো দিকে আরেক মানব দরদী নেতা ইনি বামপন্থী দলের, মোটেই কলকে পাচ্ছেন না কারণ উনি কটুভাষী এবং প্রকাশ্যে মদ্যপান করেন । স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীতে গমনের প্রমাণ পাওয়া গেছে তার বিরুদ্ধে । তা হলেও উনি সাচ্চা জনদরদী । মানুষের কথা বলেন তাদের জন্য কাজ করেন কিন্তু কয়েকটি ভুলের জন্য লোকে ওনাকে ভোট দিয়ে সমৃদ্ধ করেনা বলেই ওনার দলের লোকের ধারণা । ফলে বিগত দুই ইলেকশনে উনি চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত । এখন উনি বিরোধী দলনেতার আসন অলঙ্কৃত করেন ।

কমিউনিজম সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা ব্রাত্য অবশ্যই । ধনীরা গরীবদের কথা ভাবেনা, দরিদ্র মানুষ বেসিক চাহিদা গুলো মেটাতে অক্ষম অথচ একটা শ্রেনী জলের মতন পয়সা খরচ করে চলেছে। এইসব দৃষ্টান্ত দেখায় বিরোধী দল । কেউ মানে কিন্তু এই পথের সরিক হয়না । কেউ আবার মানেও না আর তৃতীয় পক্ষ তর্ক করে । তারা বলে : এটাই তো মানুষের বেসিক শিক্ষা হওয়া উচিৎ যে দূর্বলদের সবলেরা দেখবে। বামপন্থী নেতার যুক্তি- তোমরা তো ইনকাম ট্যাক্স দাও তাহলে কিছু অর্থ ব্যয় করে কমিউনিজমকে সাপোর্ট করো । বিপক্ষ নারাজ, তাদের যুক্তি আমি রোজগার করেছি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই অর্থ বিলাবো কেন? আমাকে কে দেখবে অসময়ে ?

টানাপোড়েন চলতেই থাকে । ভোট জোটে না বাক্সে । চন্দনী তার অভিনেত্রী হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা ও সৎ, নিষ্কলুষ, পরিচ্ছন্ন ইমেজ দিয়ে জিতে যায়, প্রতিবারই । সে বাম মনোভাবাপন্ন নাহলেও দরিদ্রপ্রেমী । প্রতি রবিবার তার বিশাল সরকারি বাংলোয় একটি জনদর্শনের আসর বসে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ জানানোর জন্য এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থা পাবার জন্যে এই জনদর্শনের কোন বিকল্প নেই । কত হতদরিদ্র আসেন একটু সুবিধে যদি পাওয়া যায়, একটু ভরসা একটু সাহায্যের হাত ধরার জন্য ।

চন্দনীর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে । তার যা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে সিনেমায় নামার কথা তো নয়ই আবার রাজনীতিও সুদুর পরাহত । ওর বাবা ছিলেন ভাস্কর । মোটামুটি প্রখ্যাত একটি নাম । আর ওর মা ছিলেন গাইয়ে । শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী হলেও আধুনিক গানও গাইতেন । রেডিওতে গান করতেন । আবার ফাংশানেও গান গাইতেন ।

চন্দনীর মনে পড়ে প্রায় প্রতিদিন স্টুডিও থেকে ফিরে এসে বাবার ছোটখাটো জিনিষ নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি তারপর গালিগালাজ এবং শেষে যাচ্ছেতাই মারামারি । চন্দনীর খুব খারাপ লাগতো । ওর বোন তো ছোট ছিল কিন্তু চন্দনী সবই বুঝতো । একদিন তো মা খাচ্ছিলেন এমন সময় বাবা পায়ের জুতো খুলে মা কে মুখে মারেন । সেদিন চন্দনী স্থির করেছিল যে আর যাই হোক নিজের পছন্দের ছেলে ছাড়া সে বিয়ে করবে না । মা বাবার ছিল সম্বন্ধ করে বিয়ে । কেউ কাউকে বিয়ের আগে দেখেনি কিন্তু যেহেতু বাবা একজন ভাস্কর তাই মা আশা করেছিলেন যে উনি খুব সুন্দর একটি চরিত্র হবেন ঠিক একটি অপরূপ মূর্তির মতন ।

কিন্তু বাস্তবে সব হিসেব উল্টে গেল । মনে পড়ে ঝগড়া ঝাটির পর মা একা একা বসে জানালর ধারে কাঁদতেন । জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে মাঠঘাট । তার মায়ের এত কষ্ট অথচ কারো কোন বিকার নেই এমন কি প্রকৃতিরও । এই দুনিয়ায় কেউ কারো নয় আমরা আসলে সবাই অনেক কিছু ভেবে নিতে পছন্দ করি । হয়ত যার সেরকম কোন মূল্যই নেই । আমাদের বসবাস তো মনে, মন সুখী হলেই আমরা সুখে থাকি আবার উল্টোটা । তাহলে যদি মনটা ঠিক করে নেওয়া যায় সব সমস্যার সমাধান সম্ভব ! ধীরে ধীরে ও মন সারানোয় ব্রতী হল । মনের যেখানে যেখানে কেটে যেতো সেখানে ও অদৃশ্য অ্যান্টিসেপ্টিক ঘষে নিত ।

এরপর একদিন মা তাদের দুই বোনকে নিয়ে বাড়ি ছাড়লেন । চন্দনীরা তিনজন এসে উঠলো এক সাধারণ পাড়ায় । পাশেই মুসলমান পট্টি । তার মা একটা ঘর ভাড়া পেল রাখিভাই আসলামের গৃহের পাশে । আসলাম টাকা নিতে চায়নি কিন্তু মা রাজি হননি । ওদের ছোট্ট ঘরের সীমানা পেরোলেই মুসলমান পাড়া । নানান বয়সের, স্তরের মানুষের বাস । কেউ ফকির, কেউ কবি, কেউ সাধারণ চাকুরে কেউ বা চিকিৎসক । একটা মসজিদ ও ছিল । সেখানে চন্দনীরা জুম্মাবারে মোম জ্বালাতে যেতো । ক্রমে মায়ের রোজগারে সংসার চলতে লাগলো । গান গাওয়া ও টিউশুনির সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা গানের দল তৈরি হল । আসলাম মামা সেখানে তবলা বাজাতো আর ওর বৌ আসুরা মাইমা হারমোনিয়ামে সুর ধরে রাখতো । মা তো খুব ভালো গান গাইতেন । ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, চন্দনীর মনে পড়ে একবার ওস্তাদজি ওদের বাড়ি এসে বলেছিলেন- মা তোর বাড়িতে তো অসুরের বাস, তুই সুরের চর্চা করবি কি ভাবে ? সুর কে বাঁচিয়ে রাখিস মা ।

চন্দনী ওস্তাদজিকে পাগল ভেবেছিল । কারণ তাদের বাড়ি অসুর রয়েছে অথচ কোনদিন তার অথবা বোনের চোখে পড়েনি ?

আলাদা চলে আসার পর এমনি ওদের ছোট্ট সংসারে কোন ঝামেলা ছিলনা, হয়ত বাবার সঙ্গে থাকার সময়কার মতন স্বচ্ছলতা ছিলনা কিন্তু রোজ মারপিট, চিল্লা মেল্লি ছিলনা । রাতের ঘুমটুকু শান্তিতে হত । তবে একদিন হঠাৎ বাবা তার বিরাট মোটরবাইক খানা নিয়ে ভটভট করতে করতে ওদের পাড়ায় হানা দিল । তারপর থেকে প্রতিদিন । বোনকে ডেকে একদিন চুয়িং গাম দিল । চন্দনীর সাথে অবশ্য দেখা হয়নি । মাও বোধহয় বাবার আসাটা পছন্দ করতো । কারণ একদিন দুপুরে সে দেখলো তাদের দরজা বন্ধ । পর্দার ফাঁক দিয়ে কিছু চরম দৃশ্য দেখে মায়ের ওপরে এতো ঘৃণা হল যে বলার না । যেই বাবার জন্য তারা ঘর ছেড়েছে সেই বাবাকে এইভাবে ঘরে ঢুকিয়ে:নাহ্ ! নিজের মায়ের ওপর সেই বিতৃষ্ণার শুরু যার শেষ হল বাড়ি থেকে পালিয়ে - দেখো কেমন জব্দ করেছি ! সঙ্গে শুধু এনেছিল তার পরম প্রিয় সেই মূর্তিটা, বাবার তৈরি তার ছোটবেলার পাথেরর মস্তক খন্ড । পরে খবর পেয়েছিল যে মা ফিরে গিয়েছিলেন বোনকে নিয়ে আবার তাদের বাবার কাছে ।

নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা বোঝার মতন বয়স তার ছিলনা তখন । জীবনের অন্যদিক তো দেখলো ঘর ছাড়ার পর । আজ সে বুঝতে পারে কেন হাজার মার খেয়েও মা মাটি কামড়ে পড়ে ছিল, কেন বাবা চোরের মতন তাদের ঘরে এলে মা সমস্ত মেনে নিতেন । বুঝতে পারে মানুষ বলাই সার মুখোশটা বেশি মানান সই শব্দ । কারো মুখোশ আলগা বলে হাওয়ায় উড়ে যায় কারোর টা চেপে বসে যায় জীবনেও খোলেনা । আঠার মতন আটকে যায় ।

সে নিজে তো একদিন বেরিয়ে এলো মনের মানুষের সঙ্গে কিন্তু ভাগ্য তার সহায় না হওয়ায় তলিয়ে গেল অন্ধকারে । তারপর আস্তে আস্তে সে নিজেকে শক্ত করলো । চলে এলো সিনেমা জগতে । কিন্তু মূল্যবোধ হারায় নি । কোন প্রডিউসারের কাছ থেকে মদের পয়সা নেয়নি, কোন

হিরোর অশ্লীলতার জালে জড়িয়ে পড়েনি । বাজারে তাকে নিয়ে কোন কুৎসা নেই । কাজ শেষ হলেই স্টুডিও থেকে সোজা ঘরে । পালিত পুত্র ললিতের মাকে প্রয়োজন । আসলে ছোটবেলায় নানান অত্যাচার দেখে দেখে চন্দনী ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গিয়েছিল । প্রথম জীবনে ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়লেও পরবর্তীকালে সে অনেক মেপে পা ফেলতো । কাউকে কাঠিটি গলাতে দিত না ।

আজ তার ছেলের বিয়ে এক ডাকসাইটে শিল্পপতির কন্যার সঙ্গে । লাভানইয়া নাম তার । সে আবার ছবি টবিও করে তবে তেলেগু ভাষায় । একটা সময় তেলেগু নায়ক মল্লিকার্জুনের সাথে লিভ ইন রিলেশনে ছিল । তাই চন্দনীর প্রথমে আপত্তি ছিল একে পুত্রবধূ করায় কিন্তু ছেলে বেঁকে বসলো । একে ছাড়া কাউকে সে বিয়ে করবে না । পাক্কা ২ বছর সে বিদেশে কাটালো তারপর চন্দনী বাধ্য হল মত বদল করতে । আসলে চন্দনীর নিজের ভাবমূর্তির ব্যাপারও তো ছিল । যদি ছেলের এই বিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনে কোন প্রভাব ফেলে তাই সে একটু সাবধানীও ছিল তবে শেষমেশ হার মানতে বাধ্য হল । আজ তো সেই মাঙ্গলিক তিথি । শুভক্ষণ । একটু পরেই অতিথিরা আসবেন দলে দলে ।

চন্দন কালারের, মভ পাড়ের নকশা কাটা দামী শাড়িটি পরে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল চন্দনীকে ।

বিরোধী বামপন্থী নেতা জামুট্টী এলেন অতি সাধারণ একটি গাড়িতে । ধুতিটা লুঙ্গীর মতন করে পরা । ওপরে ফতুয়া । খুবই সাধারণ পোশাক আশাক । এসেই সুন্দরী মহিলা ও মদের খোঁজ করতে লাগলেন । এই তো ওনার একটা বদভ্যাস । সব কিছু বড্ড খুল্লাম খুল্লা করে ফেলেন ।

কোন অতিথি যাতে উপহার না আনেন সেই ব্যবস্থা করেছিল চন্দনী । কিন্তু তবুও অনেকে নববধূকে আশীর্বাদের জন্য কিছু দিতে আগ্রহী দেখে বলাই ছিল যা প্রাপ্তি হবে সব যাবে একটি শিশুদের জন্য কাজ করে এরকম সংস্থায় । সেইমতন ওরা ডোনেশনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হল । ভালই প্রাপ্তি হবে বোঝই গিয়েছিল । যাক কিছু বাচ্চার মুখে তো হাসি ফুটবে এই উপলক্ষ্যে, এই শুভদিনে । চন্দনীর শিশুপ্রেম তো সর্বজন বিদিত । ললিতকে তো সে তুলে এনেছিল এক আশ্রম থেকে ।

ছেলে হিসেবে দত্তক নিলেও সে ছিল তার বন্ধুও বটে । তাই ললিত বড় হয়ে একবার ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেন সে বিয়ে করেনি । চন্দনী বলেছিল যে তার এক প্রেমিক ছিল । সে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় ।

- পুরুষ জাতকে তুমি ঘৃণা কর তাইনা ?
- তাহলে কি তোকে বুকে টেনে নিতাম ?
- আমি তো ছেলে ।
- ছেলেরা পুরুষ নয় ?
- ধুস্ ! ছেলে তো ছেলেই ।

মৃদু হেসে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়েছিল চন্দনী । পরম মমতায় ।

আজ তার আত্মজর জীবনে বিশেষ দিন, তার বিয়ে । চন্দনী সাজবে না ? প্রিয় রঙে ঝলমল করছে সে । রংয়ের ব্যাপারে তার খুব ফ্যাসিনেশন আছে । কোন মানুষ যদি বাজে কোন রঙের ছাতা নিয়ে বেরোয় চন্দনীর তাকে বিন্দুমাত্র পছন্দ হবেনা । সামান্য রুমাল থেকে শুরু করে

চিরুনি এমনকি টুথব্রাশের রঙকেও সে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে । সে তো ক্রিয়েটিভ জগতের মানুষ । তার কাছে ক্রিয়েটিভিটির অর্থ হল সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি ব্যাপার । কোন শিল্পী যদি ক্যাটক্যাটে বেমানান রংয়ের বস্তু ব্যবহার করে তাহলেই হয়েছে, চন্দনীর কাছে সেই শিল্পীর কোন মূল্যই থাকবে না । সে যত ভালো পোর্ট্রেটই আঁকুন না কেন । সুরুচির ধারক ও বাহক চন্দনী । মানুষকে বিচার করে তার রুচি দিয়ে । বিভিন্ন মানুষকে সে দেখে রংয়ের শেডে । কেউ নীল কেউ গাঢ় নীল কেউ সবুজ কেউ হালকা সবুজ কেউ বা ধূসর হলুদ।

পুরো দুনিয়াটা একটা রংয়ের কারখানা । আজব রংয়ের কারখানা । সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রংয়েরা । কাঁচা রং, পাকা রং আর মিশ্র রং । আর কি কেউ ওর মতন এই রং মশালের মিছিল দেখতে পায় ?

চন্দনীর একমাত্র শখ হ্যান্ড ব্যাগ কেনা । কত শত হ্যান্ড ব্যাগ যে তার আছে কোন হিসাব নেই। কোনটা ট্রেন্ডি কোনটা চটের সুন্দর কারুকার্য করা কোনটা পাটের, কোনটা কাপড়ের গায়ে নকশা কাটা আবার কোনটা নিতান্তই প্লাস্টিকের ব্যাগ অথচ অপরূপ । খুব সুন্দর । বাড়িতে একটা ঘর বোঝাই হ্যান্ড ব্যাগ । ললিত বলে - তোমার হ্যান্ড ব্যাগ একদিন নিলাম হবে দেখো ।

চন্দনী হাসে । বলে- আমাকে নিলাম করবি না তো ? তোরা তাও পারিস্ ।

===

সেলিমপুরা তামিলনাড়ু রাজ্যে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম । সেখানকার এক জমিদার পরিবারের পুত্র জনকস্বামী । জনসেবক । জনপ্রিয় কিন্তু মিডিয়া প্রিয় নন । তার একটাই কারণ সাংবাদিকদের উনি পাত্তা দেননা । বিশাল মহলে থাকেন আন্নামালাই পাহাড়ের কোলে । ক্ষেতিবাড়ি আজও করেন । অবসরে জনসেবা করেন । বিয়ে করেছিলেন কিন্তু স্ত্রী গত হয়েছেন আজ অনেক বছর । ছেলেপুলে নেই । মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্ট একটি তামিল পত্রিকায় কবিতা লেখেন । মল্লবর্ম নাম পত্রিকাটির, তামিল সাহিত্য পত্রিকা । যদিও ওনার কবিতা বেশির ভাগই স্লোগান সর্বস্ব । রস, মাধুর্য্য কম, বাস্তব বেশি বেশি টাইপের পদ্য, বছরে একবার কবি সম্মেলন হয় ওনার প্রয়াসেই । ওনার মহলে । সুবিশাল পাহাড়কে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সবুজ সীমানায় কবিতা পাঠের আসর বসে, তারপর নিজেরাই সুর দিয়ে সেই কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেন । মাঝে মাঝে মোটা অর্থ দিয়ে শহর থেকে নামীধামী নামেদের আনানো হয় । মুভি স্টারদের দক্ষিণে বিশেষ কদর । অনেক জায়গায় তাদের মন্দিরও আছে, সেখানে উচ্চশিক্ষিতরাও নিয়মিত এইসব স্টারদের পুজো করে । এরা সিনেমা পাগল জাত । তাই বেশ কিছু সিনেমার মানুষদের পদধূলি পড়ে আন্নামালাই পাহাড়ের পাদদেশে । মুক্ত প্রাঙ্গনে তারা সৃষ্টিশীলতায় অবগাহন করেন । শুধু খাদ্য জোটে লঘুপাক, শাক সব্জি । হালকা নারকেল দেওয়া ডাল বা সম্বর, দইভাত ( তাই কপাকপ খাচ্ছে ) আর শেষ পাতে পায়েসম্ । এতেই আনন্দ এতেই পৈটিক ক্ষুধা সুধাময় হয়ে ওঠে কারণ - *আম তো বেজিটেরিয়ান আয় জি ! ( হাম তো ভেজিটেরিয়ান হ্যায় জি )*

আজও একটা কবি সম্মেলন আছে তবে জনকস্বামী অসুস্থ তাই অন্যরা এর ভার নিয়েছেন । জনকের মনও ভালো নেই । কেমন উচাটন করছে, চারদেওয়ালের মধ্যে গুমরে মরছে । দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলেছে তার মন । কাকে দেখার জন্য যেন বড্ড ব্যাকুল হয়েছেন আজ ।

===

বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ মাখা পরিবেশ, একদিকে ফুলের স্তর, গেটের মাথায় ফুলের অপূর্ব কাজ, রঙ মিলিয়ে সব ফুল দিয়ে চূড়া বানানো হয়েছে । আর অন্যদিকে নীলাভ সমুদ্র । ঢেউয়ের গর্জন বিয়ের বাড়ির কোলাহলকে ঢেকে দিয়েছে । নোনা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে শামিয়ানা । রূপবতীরা

কেশ ভারে ন্যুব্জ । বহুমূল্য অলঙ্কারে মোড়া ললনারা সামুদ্রিক তান্ডবে কিঞ্চিত আলুথালু । এরই মধ্যে ললিতের অকস্মাৎ কি যেন মনে হল । পরিচিত গন্ডী ছাড়িয়ে সে এগিয়ে চললো অন্দর মহলের দিকে । মূল ফটক পেরিয়ে কিছুটা গেলেই শোবার ঘর । অর্থাৎ কয়েকদিনের শোবার ঘর । অনুষ্ঠান ফুরিয়ে গেলে স্যান্ডপাইপার ছেড়ে আবার ওরা ফিরে যাবে নিজেদের গৃহে ।

অস্থির পদচারনায় মায়ের অস্থায়ী ঘরে ঢুকলো সে । সচরাচর মায়ের বেডরুমে ঢোকেনা ।

আসলে চুনীর আংটিটা খুঁজছে সে । একজন জ্যোতিষী পরতে দিয়েছিলেন । এখানে এসে পরশু খুলে রেখেছিল কিন্তু হঠাৎ মনে হল আজ তো তার বিয়ে আজ ওটা পরে নেওয়া যাক । যদি কোন অমঙ্গল টল হয় আবার । যেই ভাবা সেই কাজ । মায়ের ঘরে ঢুকে খুঁজে চলেছে বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু হদিস মিললো না । তন্ন তন্ন করে খুঁজছে অকস্মাৎ একটা সুটকেশের ঢাকনি খুলতেই পুরনো হয়ে যাওয়া বিবর্ণ একটা ছবি হাতে এলো । তার মায়ের কম বয়সের ছবি । ভারী সুন্দর মুখখানি, লাবণ্যে ভরপুর । ওর স্ত্রী যিনি হচ্ছেন তারও নাম লাভানইয়া মানে লাবণ্য তবুও সে কিন্তু মায়ের মতন সুন্দরী নয় । মা যেন অপরূপা । অনিন্দিতা, নির্মলা।

ভাবতে ভাবতে মায়ের ডানপাশের সাথীর দিকে চোখ গেল । কোন ফিল্মের লোক হবেন হয়ত! ঘনিষ্ঠভাবে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে । পরণে দক্ষিণদেশের কোন ছোটখাটো রাজার পোষাক । মাথায় হীরের দ্যুতি । চোখগুলো বাঙ্ময় । চমকে উঠলো ললিত -এ যেন তারই এক কার্বন কপি ।

নীচে সই করা - রাজা জনকস্বামী ।

হতবাক ললিতের অদ্ভুত চাহুনি ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে । শ্যান্ডেলিয়ারের মেকি আলোকসজ্জা বড় অস্তত্বিতে ফেলেছে তাকে, তার মুখ থেকে সবটুকু লালিত্য শুষে নিয়েছে দীপগুলি ।

চূর্ণ বিচূর্ণ ললিত ঘরের অন্যপাশে দেওয়ালের ঝোলানো কুমারী চন্দনী ঘোষের পোর্ট্রেট খানি টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে পদদলিত করতে থাকে । উন্মাদের মতন । প্রবল এক ঝড়ের তান্ডবে সব তচনচ হয়ে গেলেও ঘরের আবহাওয়া বড় শব্দহীন মনে হয় ।

*সমুদ্র তীরে তীব্র বাতাসে এলোমেলো ললিতের আঁখির আঠায় শুধুই এক ধূসর মরুভূমির চিত্র, বড় বড় ফণিমনসার ঝাড় আর শুস্কতায় ভরা ।*

# নাস্তিক

লেখক নবীনবরণের খুব নাম আছে । নবীনবরণ মুখার্জি । বাঙালী তো এরোপ্লেন চালানো কিংবা সাব মেরিন ডিজাইনে তেমন আগ্রহী নয় যতটা আগ্রহী লেখালেখিতে । সারা বাংলাতে খুঁজলে কম করে কয়েক কোটি অনু পত্রপত্রিকার হদিস তো পাওয়াই যায় । কিন্তু সফল পাইলট অথবা কর্পোরেট সি ই ও ইত্যাদি লাইনে সেরকম এদের দেখা মেলে না। স্বভাবতই নবীন বরণকে যে সবাই হাসি মুখে বরণ করবেন এ আর এমন নতুন কথা কি ?

তার ওপর উনি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন ফিরোজৌদোল্লার পারিবারিক নানান ঘটনা নিয়ে, সেখানে কেচ্ছাও আছে আর রাজপরিবারের গল্প তো সবসময়ই আকর্ষক । ফলে খুব তাড়াতাড়ি তিনি সাফল্যের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে যান। এতটাই যে বাঙালীর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে দুবেলা গালাগালি দিয়েও আজও উনি লোকের মানস চোখে উচ্চাসনেই বসেন ।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন কোন বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বকেই উনি ছাড়েন না । সবার জীবন তরী পারের উনি কান্ডারী । সবার ভালো মন্দ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন । একবার এক সাংবাদিক একটা বেফাঁস প্রশ্ন করে ফেলেছিল- আচ্ছা নবীনদা, আপনার আগে কেউ বোঝেন নি যে এইসব বিখ্যাত মানুষেরা এত খারাপ সব চরিত্র ?

- দেখো, সব কিছুর একটা সময় আছে । সেই সময়টা না এলে কিছুই হয়না । আমার জন্ম হয়েছে এদের মুখোশ খোলার জন্য বুঝলে না ?

সাংবাদিক চুপ ।

নবীন বরণের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল উনি নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও কোন ধর্ম টর্মের ধার ধারেন না।

পৈতে খুলে ফেলেছেন । আর দুবেলা তেড়ে গালিগালাজ করেন ধর্ম গুরু বা ঐ পথের পথিকদের ।

বলাবাহুল্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ওনার পড়া হয়ে গেছে এবং সার বস্তুও বোঝা হয়ে গেছে যে এগুলো সব ট্র্যাশ । ধর্মের এইসব লেখক ছিলেন সাংঘাতিক কল্পনা প্রবণ মানুষ । আর শত শত যুগ ধরে এত সব মানুষ যে এগুলো মানছেন তারা সবাই গাধা । নবীন বরণ একমাত্র বুদ্ধিমান মানব সন্তান । তাই উনি নিমেষেই সব ধরে ফেলেছেন ।

তবে ভাগ্যিস ওনাকে লেখিকা শোভা দে দেখেন নি । তাহলেই হয়েছিল । ওনার কুমড়োপটাশের মতন বদন দেখে শোভা দে কি বিশেষণে ওনাকে ভূষিত করতেন কে জানে। উনি তো অমিতাভ বচ্চনকে ডাল বলেছেন । সেই ভয়েই হয়ত নবীন বরণ কোন প্রাদেশিক কনফারেন্সে বড় একটা যাননা ।

ওনার লেখার বিষয় বস্তু এত স্ট্রাইকিং হয় যে জনমানসে সহজেই জায়গা করে নেয় । আজকাল সব লেখায় যৌনতার ছোঁয়া থাকে । একবার এক সাহিত্য সভায় এক ভদ্রলোক তো ওনাকে নাস্তানবুদ করেছিলেন - মশাই আপনি আমার লাইফ পুরো পাবলিক করে দিলেন ?

- কেন হে ?

- আপনি ফুল্লরা উপন্যাসে যে বীর দত্তর চরিত্র টা এঁকেছেন ওটা তো আমাকেই কটাক্ষ করেছেন ।

নবীন বরণ যতই বলেন যে উনি ভদ্রলোককে এই প্রথম দেখছেন কে শোনে কার কথা ।

-আপনারা লেখকেরা পেয়েছেন টা কি ? যা খুশি লিখে দেন আপনাদের মোটিভ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেনা বলে তাই না ? অথচ বেশির ভাগ সময় তো বানিয়ে লেখেন । আমার কথা যা লিখেছেন অনেকটাই তো আপনার রং চড়ানো ।

তর্কাতর্কি চলতেই থাকে এবং শেষমেশ নবীনবরণ ক্ষমা চেয়ে নিস্কৃতি পান ।

উনি থাকেন খাস কলকাতায়, হিন্দুস্থান পার্কের একটি বাড়িতে । ফ্ল্যাট নয় বাড়ি । ছোটগল্প নয় উপন্যাস । অনেক ফুলপাতা, অনেক বিস্তার, অনেক মাধুর্য্য । এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে দেশভাগের সময় তবে গড়পরতা সব বাঙাল যা বলে থাকে যে ঐ দেশে তাদের সবার জমিদারি ছিল সেটা উনি বলেন না । ওনার সোজা সাপটা জবাব- আমার বাবা গরীব পন্ডিত আর মা লোকের বাড়ি ধানভানতো ।

নিন্দুকে বলে যে সম্ভবত এই কারণে হি ল্যাকস্ সফিসটিকেশান । নোংরা ঘাটতে পছন্দ করে । নোংরামো করতে পছন্দ করে । একবার এক ঘরোয়া পার্টিতে উনি তো পাশে বসা এক ক্রিকেট খেলোয়াড়কে বলেন সামনের সুন্দরী মেয়েটিকে নগ্ন কল্পনা করতে । বেচারা খেলোয়ার এসেছে মফস্বল: থেকে কিঞ্চিৎ কনসারভেটিভ । লজ্জায় মরে । অবশ্য নবীনবরণ তখন একটু মদের ঘোরে ছিলেন ।

===

বিজ্ঞান সত্য আর সব মিথ্যা । এই স্লোগান নবীন বরণ তার প্রতি লেখায় প্রচার করেন । যদিও - *গণেশ কি করে দুধ খায়, এ কি সম্ভব ?* এই বিষয়ে একজনকে জ্ঞান বিতরণ করতে গেলে নবীনবরণকে সে উল্টে বলে বসে- এগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য পদার্থবিদেরা রয়েছেন আপনি লেখায় মন দিন ।

বলাবহুল্যই নবীনবরণ চটে যান । অবিজ্ঞান পড়ুয়াদের যেমন বিজ্ঞান ছুঁয়ে নিজেকে একটু বুদ্ধিমানের দলে তুলে দেওয়া হয় সেরকম আগাগোড়া আর্টস পড়া নবীন বরণ সব সময় বিজ্ঞানের বুলি কপচান যাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ নির্বোধ না ভেবে বসে ।

এক ধর্মের ধ্বজাধারীকে তো সেদিন নাকানি চোবানি খাওয়াতে গেছিলেন ।

-বিজ্ঞানে সব প্রমাণ আছে, তোমাদের ঈশ্বরের প্রমাণ আছে ? পারো তোমার ঈশ্বরকে দেখাতে? ওকে আসতে বল আমার সামনে ।

উল্টো দিকে ধর্মের ধ্বজাধারি একজন এফ আর সি এস ডাক্তার । চুনোপুটি নন । যুক্তিতে তিনিও কম যান না ।

- আপনি সারা জীবনে যেই দশটা ভালো কাজ করেছেন তার নাম বলুন আগে ।

নবীন বরণ ৩ টের বেশি মনে করতেই পারলেন না । তখন অপরপক্ষ বললেন- দেশের প্রেসিডেন্ট যেখানে আপনার সাথে দেখা করবেন না আপনি এতই নগণ্য সেখানে মহাবিশ্বের প্রেসিডেন্ট আপনার কাছে আসবেন এটা আপনি আশা করেন কি করে ।

বেগতিক দেখে নবীন বরণ আর কথা বাড়ান নি ।

মদ, মহিলা ও মোহ এই তিন *গুণের* কারক নবীন বরণের বৌকে আড়ালে অভিজাত সমাজের মহিলারা - রাস্টিক লেডি বলে ব্যাঙ্গ করে । তার কারণ ওনার স্ত্রী মাধবী একদমই ডিগনিফাইড নন । চেহারায় কোন চমক নেই, সাজতে জানেন না । গ্রেসফুল নন । ৭০ বছরেও ভুরু চেঁছে, ব্লাস করে পথে বেরোন এবং সর্বোপরি কথা বলতে জানেন না । হ্যা হ্যা করে বিশ্রী দাঁতের পাটি বার করে জনসমক্ষে হাসেন, তখন দাঁতে আর লিপস্টিকে মাখামাখি হয়ে একাকার । ভীষণ জোরে পাড়া কাঁপিয়ে কথা বলেন । তাই লোকে বলে ওনার কোন ক্লাস নেই পতির গর্বে গরবিনী ও তারই ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্তে আছেন ।

তবে ওনার সব থেকে বড় অসুবিধা বোধহয় ওনার পতির বহু নারীতে গমন । ওনার দূর্বল চরিত্র এগুলো যদিও মেনে নিয়েছে । প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই বলে ।

-আজকাল তো সবারই গার্ল ফ্রেন্ড থাকে এ আর এমন কি ? পুরুষ মানুষ তাও বিখ্যাত, দু একটি রমণী তো আসতেই পারে জীবনে । আমার সঙ্গে তো ছোটবেলার আলাপ। আমিও তো বুড়ো হয়েছি !

যেন নবীন বরণ বুড়ো হননি । তা এরকম সবার এক একটা সুপত্নী থাকলে দুনিয়ার চেহারা অন্যরকম হত বৈকি ! এটা হয়ত ওনার চারিত্রিক ঘাটতি নয়, বৈশিষ্ট্য । শুধু দু:খ এই যে লোকে বুঝলো না । সাধারণ বলে অবজ্ঞা করে গেল চিরটাকাল ।

প্রতিদিন সকালের কাগজ খুললেই নবীন বরণের ধর্মকে গালাগালি দেওয়া লেখা পড়া যায় । পৃথিবীর কোথাও কিছু ম্যাসাকার হোক উনি সেই ধর্মকেই টেনে আনবেন ।

আর রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানেন না তার জীবনের এমন সব ঘটনা নবীন বরণ জানেন । সেইসব লিপিবদ্ধ করেন । অনেক জায়গায় কাঁচা খিস্তি দিয়ে দেন । কিছু লোক এনজয় করেন কেউ আবার আড়ালে বলেন - অহং সর্বস্ব লেখা ওনার । লেখায় অহং এর গন্ধ লেগে আছে।

সব থেকে মজা হল যখন একবার এক ফকির কে বলে বসলেন- তোর ভগবানের পেটে টেনে একটা লাথি মারবো শালা !

ফকির বেচারা কুপোকাৎ । উনি সত্যি সরল মানুষ । একজন বড় লেখকের সঙ্গে আলাপ হবে ভেবে এসেছিলেন গ্রামের মাঠে । যেখানে গ্রামের অনুভব পত্রিকা সাহিত্য সম্মেলন ডেকেছিল।

উনি বলেন - বেটা এয়সা মাত বোল । ভগবান তেরে অন্দর ভি হ্যায় । তু কেয়া খুদ কো লাথ মারনা চাহতা হ্যায় ?

- দুর বেটা ভগবান ফান কিস্‌সু হয়না বুঝলেন, এসব সাধারণ মানুষকে ঠকাবার মতলব ।পারেন প্রমাণ করতে ? আমি কিন্তু প্রমাণ করতে পারি যে পৃথিবী শুধুই বিজ্ঞানের সুত্রে চলছে । আইনস্টাইন বলেছেন যে প্রকৃতিই ঈশ্বর । তবে কারো ভালো বা মন্দ করতে পারে এমন কোন ঈশ্বর নেই ।

- আচ্ছা বল দেখি আইনস্টাইন তো ফোর্থ ডায়মেনশনের কথা বলেছেন, তারও আগে এন এথ ডায়মেনশনের কথা কোন কোন ম্যাথেমেটিশিয়ান বলে গেছেন !

নবীন বরণ তো হাঁ । এটা তো জানেন না । এন এথ ডায়মেনশান যে হয় তাই তো জানতেন না । বিজ্ঞানের চটি বই মুখস্ত করে কি আর জ্ঞান হয় !

মনে মনে মাথা চুলকাচ্ছে নবীন, বরণ এখন যার লজ্জায় ঈষৎ লাল ।

ফকির কিন্তু থামেন নি । উনি আপন মনেই বিড়বিড় করে চলেছেন - মানুষের ক্ষতি করলে নিজের ক্ষতি হয়, উপকার করলে ভালো হয়, এ তো যুগ যুগান্ত ধরে চলে আসছে । আইনস্টাইন কি করবে ?

লেখক একটু অবাক হলেন । চরিত্রটিকে কাল্টিভেট করতে হচ্ছে, ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটর মনে হচ্ছে ।

- আপনি কবে থেকে ফকির হলেন ?
- জন্ম থেকেই । আমার বাবা মা বৈষ্ণব ছিলেন, মাধুকরি করে দিন গুজরান করতেন ।
- তাহলে আপনি আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন কি করে ?
- আমি পড়ালেখা করেছিলাম । ভুপদার্থবিদ্যা নিয়ে ডক্টরেট করেছিলাম । কিছুদিন সিংহলে একটা কলেজে অধ্যাপনাও করেছি । আর কোন ডেটা আমি আপনাকে দেবো না। আমি চাই না আপনি কোন গল্পে আমাকে নায়ক বানান । বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফকির হনহন করে হাঁটা লাগালেন । লেখক বিমূঢ়, হতবাক ।

সাহিত্য সভা বসেছে । তাবড় তাবড় লেখক কবি এসেছেন । তাদের ভেতরে ঈশ্বর বিশ্বাসী ও প্রেমী বেশ কিছু লেখক লেখিকা আছেন । তাঁরা ঈশ্বর কে নিয়ে কেউ কেউ কবিতা লিখেছেন

সেইসব পাঠের সময় নবীন বরণ মুখ চুন করে বসেছিলেন ।

ভাগবৎ প্রেমের কিছু আলেখ্য শুনে উনি যতটা সম্ভব মুখ বেঁকিয়ে বসে রইলেন । যেন খুনীর স্তব হচ্ছে । এরপরে যখন জানা গেল যে তরুণ কবি একজন মাইক্রো বায়োলজিস্ট তখন নবীন বরণ রীতিমতন খাপ্পা ।

- এরাই আরো মানুষকে বিভ্রান্ত করে । শিক্ষিত লোকজন যদি এইসব মিথ্যাপ্রচার করে তাহলে অশিক্ষিত লোকজন কি করবে ?

একজন ফুট কাটেন- কেন সত্যজিৎ রায় তো বেদ উপনিষদকে প্রচন্ড শ্রদ্ধা করতেন ।

- উনি একজন গ্রেট ফিল্ম মেকার, সুন্দর সিনেমা বানাতেন খুব দক্ষ হাতে --নবীন বরণের সাফ জবাব ।

ভাবখানা এমন যেন সিনেমা বানাতেন উনি আবার বিজ্ঞানের কি জানেন ।

আর সাংবাদিক রশিদা খাতুনের সঙ্গে খুব ভাব নবীনের । রশিদা ওকে দাদা বলে । আসলে ধর্মের ব্যাপারে রশিদাও একটু একরোখা । মহিলাদের মুসলিম ধর্মে অনেক সুবিধে দেওয়া আছে যেটা একটা শ্রেনির জন্য মানুষ জানতে পারেন না, মহিলাদের পদদলিত করেন ইত্যাদি । এই নিয়েই রশিদার লড়াই । বোরখা পরা, পুরুষদের সঙ্গে ওঠাবসা না করা এগুলোর বিরুদ্ধেই রশিদার জিহাদ ।

তাই নবীনদার সাথে ভালই মিলেছে । দুজনে ভারি ভাব ।

শুধু নবীনদার স্ত্রীর একটু মনটা খুঁতখুঁত করে । রশিদার জন্য চিন্তা হয় ।

স্বামীর জন্য আজকাল আর ভাবেন না । স্বামী তার থেকে অনেক দুরে চলে গেছেন ।

মনে পড়ে বিয়ের আগে যখন প্রেম করতেন তখন মাধবী ছিলেন একঢাল কালোচুলের এক কন্যা। মুখশ্রী মোটামুটি একটু উঁচু কপাল, চাপা নাক, চওড়া ঠোঁট।

নবীন কতদিন পুকুর ঘাটে ওর চুল ধরে বসে থাকতেন। তারপর একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

-আমি কোনদিন বিখ্যাত লেখক হবনা তবুও আমাকে বিয়ে করবে মাধু ?

মাধবী হেসেছিলেন - দুনিয়ার শতকরা কজন মানুষ বিখ্যাত হয় গো ! আর বিখ্যাত হলে তুমি যে বড্ড দূরে চলে যাবে।

আজ কি সেই কথাগুলো নবীনবরণের একবারও মনে হয় ? লেখকেরা সংবেদনশীল মানুষ কিন্তু সে কি শুধু বাইরের লোকের জন্য ? সারা জগৎ এর মানুষের জন্য তারা সেন্সিটিভ কিন্তু কাছের মানুষ ? আজকাল তো মাধবীর জন্মদিনে কাঁচের চুড়ি কিনে আনতেও ভুলে যান নবীন বরণ। অথচ কাঁচের চুড়ি যে এই বয়সেও কত প্রিয় তা তো তার অজানা নয় ! পুরনো দিনে গ্রামীণ মেলায় দুজনে একসঙ্গে মিলে ঘুরতে গিয়ে ঘুগনি আর কাঁচের চুড়ি কেনা হতই হত।

অনেক সময় নবীন বরণের পয়সা থাকতো না, মাধবীর থেকে ধার করে নিয়ে মাধবীকেই চুড়ি কিনে দিতেন। আর বলতেন - পরে শোধ করে দেবো।

যদিও আর কোনদিনই শোধ করা হয়ে ওঠেনি।

===

দক্ষিণের তিরুপতি যেমন প্রখ্যাত মন্দির, বালাজি অধিষ্ঠিত সেরকম আরো নামী মন্দির আছে। এক হল গুরুভায়ুর অন্যটি সাবারিমালা আবার আছে কাক্কে সুব্রান্ধানিয়া ( শচীন তেন্দুলকর এখানেই পুজো দিয়েছিলেন গত বছর )। অনেক জায়গায় অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। কোন কোন জায়গায় আবার জোয়ান মহিলারাও ঠাঁই পাননা।

এক পূণ্যতিথিতে গুরুভায়ুরের মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন বাঙালী ধার্মিক কবি রতন গাঙ্গুলি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান তিনি। একমাত্র পুত্র অনেক দিন যাবৎ লিউকেমিয়ায় ভুগছে। পরমেশ্বরের কাছে এসেছেন প্রাণের আকুতি নিয়ে।

হঠৎ লাইনে দাঁড়ানো এক ব্যাক্তির দিকে চোখ গেল। চমকে উঠলেন।

দ্বিতীয় লাইনে ঐ ব্যাক্তি রতনকে দেখতে পাননি। দেবদর্শনের পরে রতন ছিটকে বাইরে চলে এলো। পুজোর থালি নিয়ে প্রায় ছুটে ধরে ফেললো সেই ব্যাক্তিকে।

-আ আপনি এখানে ?

সেই ব্যাক্তিও কম অবাক হননি।আসলে এই দূরদেশে একজন পরিচিত মানুষ জুটে যাবে এতো কম কথা নয়, অবাক হবেন বৈকি !

স্বভাবসিদ্ধ ভাবে হেসে সপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন- হ্যাঁ আমিই। জলজ্যান্ত আমি। অবাক হচ্ছো রতন ?

রতন আর কি বলবে সেতো কিংকর্তবিমূঢ়।

যাকে চিরটাকাল সবাই নাস্তিক বলে জেনে এসেছে, সারা বাংলা জানে উনি একজন প্রবল ধর্ম বিরোধী মানুষ তিনি এই দূর দেশে গুরুভায়ুর মন্দিরে ?

রতনকে অবাক করে দিয়ে উনি খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলে উঠলেন - আমি নাস্তিক নই, ভীষণ ভাবেই আস্তিক । বেদ বেদান্ত সব আমি গুলে খেয়েছি ।

পুরো বেদান্তকে চারটি শব্দে ভাগ করা যায় ----

the whole Vedanta can be compressed into four words,

*deham* [the body]

*naham* [I am not the body]

*koham* [Who am I ?]

*soham* [I am He]

রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন না- গীতার অর্থ হল ত্যাগী হও । বাসনার জাল ছিঁড়ে ফেল । যেকোন কাজই তো মানুষ করে আনন্দের জন্য । পরম আনন্দ পেতে হলে বাসনা ত্যাগ করতে হয় ।

নিয়মিত ধ্যান করলে কুটস্থে ( তৃতীয় নয়ন ) সিনেমার স্লাইড শোয়ের মতন অনেক জিনিস দেখা যায় । আলোর খেলা, দূর দুরান্তের ঘটনা, গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জের নানান প্রাণের আভাস ।

এমন কি প্রিয়জন কোথায় আছেন, কি করছেন সবই দৃষ্ট হয় ।

ধ্যান করো রতন, নাকি খালি পুজোর থালা সাজিয়ে মন্দিরে ছোটাছুটি কর ? মেডিটেশন করো মেডিটেশন, তাতেই কাজ হবে ।

রতন আর কি বলবেন ? উনি অবাক চোখে চেয়ে আছেন ।

শুধু বলতে পারলেন- কিন্তু আপনি তাহলে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করেন কেন ?

হা হা হা হা- জোরে হেসে ওঠেন নবীন বরণ । তারপর হাসি থামিয়ে গুরুগম্ভীর গলায় বলে ওঠেন --

--বাজারে যেটা খাবে সেটাই তো লিখবো । তা নাহলে বিখ্যাত হব কি করে ? এই বিজ্ঞানের যুগে অবৈজ্ঞানিক জিনিস লিখলে লোকে মানবে কি ? আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ।

ধর্ম তো আমার ব্যাক্তিগত জিনিস । আমার মনের ভেতরেই থাকনা । ঢাক পিটিয়ে লাভ আছে ?

- কিন্তু কেউ যদি আপনার পথে চলেন ? ধর্মকে ত্যাগ করেন ?
- সবার ঘাড়েই তো একটা করে মাথা আছে, তবুও যদি কেউ আমার দেখানো পথেই চলেন তাহলে দোষটা কি আমার ?

*মন্দিরের কোলাহল ও কাসর ঘন্টার আওয়াজে চাপা পড়ে গিয়ে শেষোক্ত কথাগুলো যেন কবি রতনের কানে অনেক দুর থেকে ভেসে আসে* - দোষটা কি আমার ! দোষটা কি আমার !

# আগন্তুক

নিঝুমগড়ে খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে । পৌষের পড়ন্ত বেলায় আকাশ থেকে যেন বরফ ঝরে!

ছোট্ট স্টেশানের একজন স্টেশান মাস্টার বারীন পাল । বাড়ি খড়দহে। কর্মসূত্রে বিহারের এই অঞ্চলে

আপাততঃ পোস্টেড আছে । সংসারের দায়দায়িত্ব নেই । ঝাড়া হাত-পা । আর পাঁচটা ছাপোষা মানুষের মতন বিয়ে একটা করেছিল বটে কিন্তু স্ত্রী আজ দশ বছর হল মারা গেছে । পাড়াপড়শীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল কুলু- মানালী, ফেরার পথে বাস উল্টে যায় গভীর খাদে । ভগ্ন হতাশ, বারীন পাল তারপর থেকে ডুবে যায় কাজে । দ্বিতীয়বার পানিগ্রহণের সাধ হয়নি । একা একা দিব্যি আছে । অবসর কাটায় বাগান করে । নানান গাছগাছালির বীজ কিনে আনে সপ্তাহান্তের হাট থেকে । সেই হাট বেশ দূরে । সাইকেলেই লাগে আধঘন্টা । স্টেশানের একটি লেবারকে নিয়ে চলে যায় হাটে । তারপর গাছে গাছে যখন ফুল ফোটে খুব আনন্দ হয় । সারা বাড়ি যেন হাসছে । তখন মনে হয়না উনি একা, মনে হয়না আজ দশবছর তার গৃহ রমণী হীন । নিরালা, নিঃসঙ্গ ।

তা এমনি আর কাজ কি ? সারাদিনে মোটে পাঁচটা ট্রেন যায়, সেগুলো পাস করানো আর টুকটাক কিছু অফিসিয়াল কাজ । স্টেশানের লাগোয়া কোয়ার্টার । সেখানেই তার স্বপ্নের বাগান । রং মিলিয়ে মিলিয়ে ফুলের চাষ করা হয় । দৃষ্টি নন্দন । শীতে গোলাপ ফোটে । একটা মিষ্টি গন্ধ পুরনো বিল্ডিংয়ের আনাচে কানাচে ঝরে পড়ে । নিঃস্তব্ধ শীতে, শান্ত কোয়ার্টার ভাষাময় হয়ে ওঠে ।

===

আজকাল বেজায় ঠান্ডা পড়েছে । বিকেল হতে না হতেই হিম পড়ে । হাত পা জমে যায় । ওর হেল্পার অর্থাৎ খালাসী, থাকে বেশ দূরে তাদের কোয়ার্টারে । ছেলেপুলে আছে তার, জোয়ান বিবি আছে, রাতে ঘরে যেতেই হয় । নাহলে সন্ধ্যার পর থেকে বড্ড একা লাগে বারীনের । মন হয় কারো সঙ্গে লুডো বা তাস খেললে ভালো হত । আজকাল অবশ্য সে একটা উপায় বার করেছে । শহর থেকে বিভিন্ন ফুলের চাষের ওপর কিংবা ফুলের ওপর বই কিনে আনে । সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে । আর একটা ময়না পুষেছে । সেটা কথা বলে- কৃষ্ণ রাধে নয়, *একটি গাছ একটি প্রাণ* । *গোলাপ কলি দল বেঁধে এলো* -- এইসব বারীন শিখিয়েছে । রান্না বান্না বারীনই করে । কখনো সখনো ওর খালাসী বাছুয়া রেঁধে দেয় ।

সেদিন রবিবারের দুপুর । লাস্ট ট্রেনটা পাস করিয়ে এসে ডুবে গেছে একটি উপন্যাসের পাতায় । এই উপন্যাসের লেখক বিহু । খুব নামজাদা সাহিত্যিক ।

বারীন রসিয়ে পড়ছিল বইটা । তারপর কখন যে চোখ বুজে এলো ! বিকেলে ময়নার ডাকে ঘুম ভাঙলো । *একটি গাছ একটি প্রাণ* । *গোলাপ কলি দল বেঁধে এলো* --একটু শহরে যেতে হবে । উঠে হাত মুখে ধুয়ে নিয়ে রওনা দিল শহর পানে । পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এলো । কেনাকাটা করে যখন বাসায় ফিরলো তখন বেশ রাত হয়ে গেছে । ঠান্ডাও পড়েছে তেমন । যাকে বলে হাড়কাঁপানো শীত ।

বাছুয়া গরম গরম ভাত বানালো, আলু, ডিম সেদ্ধ দিল । সেই ভাত ঘি দিয়ে মেখে পরম তৃপ্তি করে খেয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে শুলো বারীন ।

চোখটা আটকে গেল একটা খবরে । *সাহিত্যিক বিহু এবারে জ্ঞানপীঠ পাচ্ছেন ।*

বিহু শুধু নামী লেখকই নন একজন মহান মানবসন্তান । ওনার নিরলস জনসেবা ওনাকে লেখক থেকে মহামানবে উন্নীত করেছে । মানুষদের চিরটাকাল ভালোবেসেছেন । হতদরিদ্রর জন্য, পঙ্গুদের জন্য অনেক কাজ করেছেন । আবার রাভা উপজাতির জন্য নানান প্রকল্প চালু করেছেন । সাধারণতঃ এগুলো মন্ত্রী টন্ত্রীরাই করেন । লেখকেরা কম করেন । তারা সাহিত্য সেবক । সমাজসেবক নন।

বিহু কিন্তু হৃদয়ের একটা পাশ সমাজের জন্য রেখেছেন । অন্যপাশটা সাহিত্যের । প্রচুর গরীব ছাত্র ওনার দানে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে । ভারতবর্ষে এগুলো করলে মাইলেজ অনেক পাওয়া যায় বিশেষ করে করিয়ে যদি সেলিব্রিটি স্টেটাসের হন । কিন্তু বিহু হৃদয়ের টানে করেন । সেটাই ওনাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে দেয় । শীতের বিকেলে হালকা শার্ট পরা রিক্সওয়ালাকে ভাড়ার সঙ্গে দিয়ে দেন নিজের শালখানি ।

আরো একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া আছে ।

ওনার একটি পত্রিকা ছিল । পান্ডব । বেশ নাম করেছিল । সেখানে লেখা বাছার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল চুনীলালের । তো চুনীলাল একাই একশো । মধ্যমেধার এই লোকটি, হাতে অঢেল ক্ষমতা পেয়ে নিজেকে জহুরী ভাবতে শুরু করেছিল । কে কবি হবেন কে গল্পকার সব সেই ঠিক করতো । প্রবন্ধ নিয়ে গেলে বলে গল্প আনুন, গল্প নিয়ে গেলে কবিতা আনুন, কবিতা নিয়ে গেলে বলে রম্যরচনা আনুন। আর কেউ সবই একসঙ্গে নিয়ে গেলে বলে আপনার লেখার বাঁধুনি নেই । আপনি মন দিয়ে চাকরী করুন ।

এক প্রতিভাবান গল্পলেখককে সে ভ্রমণ লিখিয়ে বানিয়েই ছাড়বে । লেখক রাজি না হওয়ায় তার কোন লেখাই ছাপা হলনা পান্ডবে । এইভাবেই বিহুর অগোচরে সব চলছিল । বাধ সাধলো লেখিকা কৃষ্ণভামিনী । থাকেন মহারাষ্ট্রে । বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী সহ মারাঠি ভাষায়ও লেখেন । চার চারটে ভাষাতে যার এত সাবলীলতা ও হিন্দী ও মারাঠীতে বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছে তিনি চুনীলালের দাবরানী মানবেন কেন ? তাও আবার তিনি খাটি মুম্বাইয়া । ভেতো বাঙালী নন যে মিনমিন করবেন। বুঝতেই পারলেন যে চুনীলাল একটি মেনাস । তাই সোজা হাজির হন বিহুর কাছে এবং চুনীলালের কপাল পোড়ে । ঝাড় খেয়ে আধমরা সে । লেখকদের ভ্রমণ থেকে গল্প, গল্প থেকে কবিতা এই অকারণ অপারেটিং সিস্টেম চেঞ্জ করানোর খেলা ঘুচে গেল । একজন গল্পকার ট্র্যাশ গল্প লিখছে, মনে হচ্ছে রেসিপি লিখেছেন তাকে চূনিলাল বাণী বসু বানিয়েই ছাড়বেন - আপনি অসাধারণ লেখেন । লেখিকাও ভারি খুশী । আক্কেল গুড়ুম হল পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে । পাঠকের আক্রমণে লেখিকা পর্যুদস্তু । শেষে চুনীলালকে জেরা করতে জানা গেল যে লেখিকার রূপমুগ্ধ সে । তাই ক্রমাগত লেখা ছাপিয়েছে । ওনার বাজে আবর্জনা লেখাগুলোকে মনে হয়েছিল ওনার মতনই সুন্দর । শেষকালে বিহুর কাছে উত্তম মধ্যম খেয়ে যখন মান সম্মান বাঁচানো দায় ঠিক তখনই বিহু হুকুম দিলেন সমস্ত পুরনো লেখা বার করতে । উনি নিজে সব বাছবেন । এবং দেখা গেল যাকে চূনী ভ্রমণ লিখিয়ে বানিয়েছিল সে আদতে কবি, যাকে গল্পকার করেছিল সে প্রবন্ধকার এইরকম ।

পায়াভারী হয়ে গেছিল, জব্দ হল কৃষ্ণভামিনীর কৃপায় ও লেখক বিহুর মহানুভবতায় ।

এই উপাখ্যান পড়ে বারীন খুব ইম্প্রেসড্ হল । মনে মনে ভাবলো সামনা সামনি দেখা হলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে । এমন বড় হৃদয়ের লেখক দেখা যায়না চট করে, সত্যি উনি মহান । কিন্তু ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের অমিলই বেশি হয় । এতবড় লেখকের সঙ্গে তার মতন ছাপোষা মধ্যবিত্তের দেখা হবার কোন সম্ভবনাই নেই । তবে কলকাতায় গেলে একবার চেষ্টা করবে । কত সাহিত্য সভা টভা তো হয় ওখানে । আর এখন পাজির পায়ঝাড়া চূনিলালও তো নেই ! নিজের মনেই হেসে ওঠে বারীন ।

কিছুদিন কেটে গেছে । এক সন্ধ্যায় বারীন ময়নার সঙ্গে কথা বলছে । নতুন বুলি কপচাচ্ছে ময়না ।

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইলো--

আরে সবে তো রাতি শুরু হল-পোহাইলো কি রে ! বারীন হেসে ওঠে ।

এমন সময় টিনের দরজায় ঠক্ঠক্ । বাছুয়া লন্ঠনটা নিয়ে দেখতে গেল ।

দরজা খুলতেই দেখে এক শহুরে বাবু দাঁড়িয়ে । খুব নীচু গলায় জিগেস করলেন- ভেতরে আসতে পারি ?

কে রে বাছুয়া ?-বারীন দাওয়া থেকে হাঁক পাড়ে । --এক বাবু, অন্দর ঘুসনা চাহতা হ্যায় ।

--আনে দো ।

লন্ঠন হাতে বাছুয়ার পিছে পিছে বাবুটি ভেতরে প্রবেশ করেন ।

কেতাদস্তুর পোশাক আশাক । মাথায় একটি হ্যাট পরা ।

- নমস্কার আমি কলকাতা থেকে আসছি, আমার নাম রমাপদ বসু । আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে । ড্রাইভার বাইরে আছে, সকাল নাহলে তো গাড়ি সারানো যাবে না যদি রাতটুকু থাকার অনুমতি দেন খুব উপকৃত হব ।

এই পরবাসে একজন বাঙালী দেখে বারীন যারপরনাই খুশী ।

- জায়গা হবেনা মানে, আপনি স্বচ্ছন্দে থাকুন । বাছুয়া জরা চায়ে বানাও । - ড্রাইভারকে ভেতরে ডাকুন । বাইরে যা শীত ও জমে যাবে ।

ড্রাইভার হরিচরণ যুবক, মালিকের ডাকে ভেতরে এলো । সকাল হলে একটি মেকানিক ধরে আনা হবে, রাতটুকু কাটবে এই রেলওয়ে কোয়ার্টারেই ।

সবাই মিলে জমিয়ে বসলো উঠোনে, রাতের খাওয়ার পরে । গরম গরম খিচুরি, বেগুন ভাজা আর সেঁকা পাপড় । শেষপাতে বোদে । খাসা ব্যবস্থা ।

- আরে খাওয়া দাওয়া নিয়েই থাকি বুঝলেন না, মিহিস্বরে বলে বারীন ।

আগুন জ্বালানো হল, আগুনকে ঘিরে বসলো ওরা তিনজন । আগুন পোহাচ্ছে । বাছুয়া শয্যা পেতেছে, অতিথিদের বাইরের ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছে ।

- আপনার এখানে কি প্রায়ই অনাহুত অতিথিরা আসেন ? রমাপদ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন ।

– আরে মশাই এলে তো বেঁচে যেতাম । একাকীত্ব কাটতো । কিন্তু কোথায় ? সব ভোঁ ভা।

– একা বলছেন কেন ? নিরিবিলি আপনার ভালোলাগেনা ?

– মন্দ লাগে বলবো না তবে মাঝে মাঝে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় ।

– মনে করবেন না । প্রকৃতি আছে তো, প্রকৃতি কথা বলে সেই ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন দেখবেন কথা ফুরাবে না ।

বারীন মৃদু হাসে । হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে - একটি গাছ একটি প্রাণ -- চমকে ওঠেন রমাপদ। কে !

– আরে ও আমার পোষ্য, ময়না । বারীন চওড়া হাসি দেয় ।

রমাপদ ময়নাটির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ রঙ্গরস করেন । আগুনের তাপ কমে এসেছে । কিছু কাঠকুটো দিতেই বহ্নিশিখা লেলিহান হয়ে ওঠে । বাছুয়ার কণ্ঠে ভেসে আসে গান-

পরদেশী, পরদেশী জানা নেহি, মুঝে ছোড়কে ---!

বারীন তার বাগানের গল্প করে । কত ফুল ফুটিয়েছে সেসব গর্ব করে বলে । ভোরের আলোয় বাগান দেখাবার প্রতিশ্রুতিও দেয় ।

রাত বাড়লে ওরা আস্তে আস্তে যে যার বিছানায় শুতে যায় । গায়ে লেপ চাপিয়েও শীত কমছে না । তার ওপর লেপগুলো যেন এক একটা বরফের চাঁই । খাটে রমাপদ ও নীচে শুয়েছে ড্রাইভার হরিচরণ । পাশের ঘরে বারীন । ময়না দাঁড়ে ।

নিঝুমগড়ে, নিঝুম রাতে জেগে আছে শুধু একফালি চাঁদ । কুয়াশার জাল ছিঁড়ে যার স্নিগ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে ঘুমন্ত রেল কোয়ার্টারের আঙিনায় ।

পরদিন ভোরের ট্রেনকে পাস করাতে বারীন চলে যায় স্টেশানে । সেখানেই এক কাপ চা জুটে যায় । বাড়িতে তখনও ঘুমিয়ে রমাপদ ও তার ড্রাইভার । খালাসীকে রেখে বারীন স্টেশানে চলে আসে । একটু বেলা বাড়লে বাসায় ফেরে । বাছুয়াকে বলা আছে । পুরি - সবজি বানাবে । সঙ্গে ঘন মোষের দুধ । এতদিন পরে বাঙালীর দেখা পেয়েছে খাতির করবে না ?

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘরে ফেরে । দেখে অতিথিরা জলখাবার না খেয়ে চলে গেছে । ড্রাইভার সকালে উঠে গাড়ি সচল করেছে । অতএব আর অপেক্ষা কিসের ? শুধু রেখে গেছে একটি প্যাকেট । প্লাস্টিকে মোড়া একটি ছোট প্যাকেট । টাকা পয়সা নাকি ? বারীন খুলে দেখে কি আছে তাতে । সাথে সাথে -*গোলাপ কলি দল বেঁধে এলো* -- ময়না ডেকে ওঠে ।

প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ে একটি ঝকঝকে বই । পলাশ খোঁজে বসন্ত - লেখক বিহু ।

বারীন চমকিত । ভদ্রলোক কি অন্তর্যামী ? জানলেন কি বিহুর লেখা ওনার বেশ পছন্দের ?

বই খুলতেই প্রথম পাতায় ভেসে উঠলো পরিস্কার বাংলায় লেখা কটি লাইন-

আপনার আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ । আমার পরের উপন্যাসে আপনার একটি চরিত্র রাখবো।

পথের বাঁকে বাঁকে আপনার মতন বন্ধুরা আছেন বলেই আমরা পথভোলা লেখকেরা আজও বেঁচে আছি । গাড়ি আমার খারাপ হয়নি । আমি একটি চরিত্র খুঁজছিলাম । গল্পের একটি প্লটের সন্ধানে পথে নেমেছিলাম । অচেনাকে চেনা হল জানা হল, এবার তাতে প্রাণ সঞ্চারের পালা ।

মিথ্যাচারের জন্য লজ্জিত, আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন ।

শুভেচ্ছা,

বিহু ।

ধপ করে বস পড়লো বারীন, হাতল ভাঙা চেয়ারে । এ যে অকল্পনীয় । সাহিত্যিক বিহু তার অতিথি হয়েছিলেন ? একটুও আঁচ করতে পারেনি সে ? আর তাকে তো বাগানটাও দেখানো হলনা ! রং মিলন্তি পুষ্প মেলা । হাতের কাছে একজন এতবড় লেখককে পেয়েও মনোরম সেই শোভা দেখাতে পারলো না ! পোড়াকপাল কি আর সাধে বলে ? পা ছুঁয়ে প্রণামও করা যে হল না তার !

সাহিত্যিক বিহুর কাছে মানুষ বিহু এবারও জিতে গেল । একটুও বুঝতে দেননি যে তিনি এতবড় এক চরিত্র, সহজ ভাবে মিশেছেন । স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন যেন !

মাথার ভেতরে চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে, চারিপাশ কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে ।

বাইরে উঠানে বাছুয়া হাঁক পাড়ে - বাবু নাহানে কে লিয়ে গরম পানি চাহিয়ে কেয়া ?

হাঁ - গলাটা চড়িয়ে একবার ময়নার দিকে ফিরতেই সে বলে উঠলো - প্রকৃতি আছে তো !

বাহ্ বড় তাড়াতাড়ি কথা শিখে নিয়েছো তো বাছাধন । এবার তুমিও পালাও--!

খাঁচার দরজাটা খুলে উড়িয়ে দেয় ময়নাটাকে, নীল আকাশের বুকে যদি কোন চরিত্র খুঁজে আনতে পারে । এককীত্বটা ডাইরি লিখেই কাটাবে এবার থেকে, বারীন স্থির করেই ফেলে ।

স্কুলজীবনে অল্পস্বল্প লিখতো সে। এবার ডাইরিতে প্রথম লেখাটি লিখবে বিহুকে নিয়ে । বিহুর কথা । হয়ত একদিন কেউ পড়বে, ছাপাবে সেই উপাখ্যান । শুন্য দাঁড় পানে চেয়ে ভাবুক হয়ে যায় নিঝুমগড়ের স্টেশান মাস্টার বারীন । এক অনাস্বাদিত নতুন ভুবনের খোঁজে ।

# ফিউজিটিভ

## ১

অলিভ রঙের টয়োটা ইনোভা এসে দাঁড়ালো সবুজ গাছে ছাওয়া এক বিশাল প্রান্তরে । লালমাটির পথ মিশে গেছে ঘন জঙ্গলে । দুধারে হাঁটু সমান কফিগাছ । গেটের একপাশে কাঠের ফলকে লেখা - উডরিজ্ প্ল্যান্টেশনস্ ।

চান্দ্রেয়ী নেমে দাঁড়ালো । ভীষণ রিফ্রেশিং । ভীষণ সতেজ চারিপাশ । মন ভালো হয়ে যায় নিমেষেই ।

বেশ কিছুটা দূরে উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে এক একটি কাঠের বাড়ি, কটেজ বলাই ভালো । সমুদ্রনীল ট্রাউজার পরা জার্মান সাহেব গোয়ার্ড বাকে এসে হাত বাড়ালেন : হাই, নাইস টু মিট ইউ । চান্দ্রেয়ী প্রতিনমস্কার জানালো । -আজ বিশ্রাম নিন । ২৫০ কিমি ড্রাইভ করে এসেছেন ! কাল সকালে কথা হবে ।

গোয়ার্ড এই প্ল্যান্টেশনের মালিক । জার্মানি থেকে সুদূর ভারতে এসেছিলেন সিমেন্সে চাকরী নিয়ে । ভারত ভালো লেগে যায় । অত:পর এখানে বসবাস । আজকাল বিভিন্ন ফসল চাষ করে বিদেশে এক্সপোর্ট করেন । অর্গানিক উপায়ে ফলন হয় । কফি, কার্ডামম, পেপার, ধান, চা সবই চাষ হয় । ১০০০ একরের সুবিশাল জমি । ভেতরে একটি নদীও আছে । বেশ চওড়া । সেখানে মাছ ধরা হয় । নাম মৈনা নদী । মালপত্র নিয়ে চাপরাশির পেছন পেছন নিজের কটেজে এসে প্রবেশ করলো চন্দ্রেয়ী ওরফে চন্ । বেশ বড় কাঠের বাড়ি । উঁচু ছাদ । শক্ত নীলাভ মেঝে । পুরনো ধাঁচের পাথর বসানো বিশাল বাথরুম । একটা বাথটাবও আছে ।

বসার জায়গা, শোবার ঘর, খাওয়ার ছোট জায়গায় বড় টেবিল পাতা এবং ঘরের এককোণে একটি ফায়ার প্লেস। ব্যাস্ ! বসার জায়গা থেকে বন দেখা যায় । বুনোফুল, তার সুবাস, পাখির কলকাকলি ---চন্দ্রেয়ী আর কিইবা চাইতে পারে ?

সে এখানে এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছে । কি করলে ফলন বাড়বে, কোন বীজ বপন করলে লাভের খাতায় মোটা সংখ্যা জমা হবে এইসব দেখাই ওর কাজ ।

সুদূর পুণা থেকে কর্ণাটকের জঙ্গলে সে এই চাকরী নিয়ে এসেছে যত না কাজের তাগিদে তার চেয়েও বেশি শহুরে জীবন থেকে পালিয়ে । একটি ঘটনা বদলে দিয়েছে তার জীবন রেখা । কি ভেবেছিল আর কি হল !

একরাশ হতাশা এসে গ্রাস করে তাকে । নাহ্ ! আর ভাবতে চায়না সে ।

পাস্ট ইজ পাস্ট । এই কয়মাস অনেক ভেবেছে । নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে, আর পারা যাচ্ছেনা । কাল থেকে শুরু হবে তার অন্য জীবন ।

দরজায় ঠ্কঠক - একটি স্থানীয় মেয়ে সুদৃশ্য মেটে রঙের টি পট আর বিস্কুট নিয়ে দাঁড়িয়ে।

চন্ সরে দাঁড়ায় । মেয়েটির নাম কোমল । কোমল চায়ের পট রেখে মিষ্টি হেসে তাকায় ।

-ম্যাডাম, ফায়ারপ্লেসে আগুন দেবো ? বাইরে খুব ঠান্ডা ।

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাশে জমানো কাঠকুঠো নিয়ে নিপুন হাতে সাজিয়ে দেয় । অগ্নিসংযোগ করে । লেলিহান বহ্নিশিখার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। চনের মনেও ।

রাতে কাঠের উনুনে রান্না করা হাঁসের মাংস সঙ্গে গরম ভাত, কালো জিরে, নারকেল দিয়ে ঝিরি ঝিরি লাউঘন্ট আর ফ্রুট স্যালাড । বেশ উপাদেয় । মাছ ভাজাও ছিলো । পমফ্রেট । লেবু কচলে, কাঁচা পেঁয়াজ মশলা টশলা দিয়ে বেশ লাগলো ।

## ২

কোঁকড় কোঁ -রুস্টার ।সবার ঘুম ভাঙানোর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন ।ক্রমাগত ডেকেই চলেছেন । ভারতবর্ষের সকলে যদি এতটা দায়িত্ববান হতেন তাহলে হয়ত ইতিহাস অন্য কথা বলতো ।

কান ঝালাপালা করা ডাকে অগত্যা উঠতে বাধ্য হয় চন্ । ফ্রেস হয়ে বাইরে আসে । শিউলি ঝরা প্রান্তরে হালকা শিশিরের শিরশিরানি সরিয়ে কোমল হাসিহাসি মুখে ওর ঘরের দিকে আসছে । কাছে আসতেই দেখতে পায় চায়ের ট্রে । মনটা খুশিতে ভরে ওঠে । চন্ চা প্রেমী । সারাদিনে অন্তত:২৫ কাপ চা খায় । বাড়িতে মা বকুনি দিতেন । বলতেন চায়ের ফ্যাক্টরিতে কাজ নিতে । চা চাষ বিদ্যা আয়ত্ব করতে । নিজের মনেই হেসে ওঠে চান্দ্রেয়ী ।

-গুড মর্নিং ম্যাম । চায়ের পট থেকে চা ঢেলে গালে টোল ফেলে হাসে কোমল । মেয়েটিকে ভারী সুন্দর দেখতে । গোধূম বর্ণা, টানা টানা চোখ । মিষ্টি মুখখানি । জাতিতে কোঙ্কনি, ম্যাঙ্গালোরের দিকে বাসা । ভারত শ্রেষ্ঠা সুন্দরী আইস্বরইয়া (ঐশ্বর্য রাই )তো কোঙ্কনি, ওদের গায়ের রঙ ভারি সুন্দর হয়। ভাষা হল -টুলু । কোমল সপরিবারে এখানে থাকে । বাবা এখানে দরোয়ান । মা হেঁশেল সামলান । আর আছে ৪- ৪ খানা ইয়া বড় কুকুর । সে কি চেহারা তাদের, দেখলেই ভয় লাগে । তেমনি বাজখাঁই গলা । ঘেউ ঘেউ করে ভয়ের ঢেউ তুলে চলে আসে । মনে হয় এই বুঝি দিল ভবলীলা সাঙ্গ করে ।

প্রাতরাশ সেরে চন্ হেঁটে যায় গোয়ার্ডের ঘরের দিকে । শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে উনি কফি অফার করেন । বাগানের ফ্রেস কফি যাকে এরা বলেন ফিল্টার কফি, তাই খেতে খেতে চলে আলাপন ।

-আপনার কাজ বুঝিয়ে দেবে মুন্নিরাজ, আমার কেয়ারটেকার । প্ল্যান্টেশনটাও ঘুরিয়ে দেখাবে ও।আমার ম্যানেজার একটু শহরে গেছে । ফিরে এলে আলাপ হবে। ভারি কাজের মানুষ । প্রায় একার দক্ষতায় সবকিছু সামলাচ্ছে । এবার আপনারা দুজনে মিলে কাজ করবেন । মৃদু হাসলেন গোয়ার্ড ।

হালকা হাসি ছাড়িয়ে যায় চনের মুখে ।

## ৩

দিন দুই কেটে গেছে । ইতিমধ্যে চন্ প্ল্যান্টেশনটা ঘুরে দেখে নিয়েছে । বিশাল এলাকা জুড়ে কত রকম শস্য চাষ হয়েছে। চা বাগান একটু ঢালু জায়গায়, অন্যদিকে কফি বাগান, লাস্যময়ী ঝর্ণা, নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে কমলা লেবুর বাগান - মুন্নিরাজ যেই সাঁকোকে ইন্দো জার্মান ব্রিজ বলে অ্যাড্রেস করলো। একটি ভেজা ভেজা পাহাড়ি পথ ধরে উঠে গেলে রয়েছে সবুজ বনতল। নিরিবিলি । তিরতিরে ঝর্ণার শব্দ কানে আসে । সেখানে নাকি অনেক বিদেশী এসে একাকী সময় কাটায়, প্রকৃতির সান্নিধ্যে । বেশ ইন্টেরেস্টিং।

চান্দ্রেয়ী আজ পরেছে আসামানী রংয়ের শাড়ি । খোঁপায় হলুদ ফুল, কানে ঝুমকো । চোখে কাজল । আজ সে ভারি খুশি, প্রকৃতির মতন হাসছে । নতুন জীবনে প্রবেশের আনন্দে মোহিত ।

একটা রঙীন প্রজাপতির পেছনে দৌড়ে গেল ।

- সাবধান- ওদিকটা ঢালু ! পরিচিত পুরুষকণ্ঠে পরিস্কার বাংলায় কথা কানে এলো ।

ঘুরে দাঁড়ালো চান্দ্রেয়ী । শুধু একবার । তারপরেই ফ্ল্যাশব্যাকের মতন পর পর কিছু ঘটনা মনের আয়নায় প্রতিফলিত হল । এক অদ্ভূত অনুভূতিতে শিহরিত হয় সে ।

অভ্র এখানে ? অভ্র কিন্তু একটুও অবাক হয়নি ! ধীরস্থির ভাবে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

ভালো আছো তো ? গুরু গম্ভীর কন্ঠ বেজে ওঠে ।

চন্ কি আর বর্তমানে আছে ? হারিয়ে গেছে অতীতে । যাকে ভুলতে এখানে আসা সে স্বয়ং এখানে হাজির ? অদ্ভূত কো-ইনসিডেন্স ।

একটা খুনীর, আসামীর কোন প্রশ্নের জবাবই সে দেবেনা । যারা নিরীহ মানুষ মারে তাদের সঙ্গে কোন আলাপনই চলতে পরে না । বেশ দৃঢ়ভাবে ওকে পাশ কাটিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে সে চলে এলো গোয়ার্ডের ঘরের দিকে । বড় অদ্ভূত সেই পদচারণা । ভেতরে ঢোকার মূহুর্তে কানে এলো- চন্ !

সেই ডাক । প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে । চাপা ভালোলাগায় অন্তর শিহরিত হয় । ভুলবো বললেই কি ভোলা যায় ? ভোলা কি এতই সহজ ? মানুষের মনের গতিবিধি বড় অদ্ভূত । সেইজন্যেই তো এত নিয়ম কানুন । এত বেড়াজাল চারিদিকে । তাতেও কি মন মানে ? সে আপন আনন্দে পচ্ছন্দের পথে ধাবমান ।

আর প্রেম যে মরে না । সময়ের সাথে সাথে হয়ত আরো গভীর হয় । কচি ঘাসের মতন, একটু জলের ছোঁয়া পেলেই সতেজ হয়ে নব জীবন লাভ করে ।

পরদিন সকালে মুন্নিরাজ ওকে নিয়ে গেল গুরু পদ্মসম্ভবের মনাস্ট্রী দেখাতে । বেশ অনেকটা পথ । পাহাড়ি এলাকা । রাস্তাঘাটে লোকজন দেখে মনে হচ্ছে যেন দার্জিলিং এসে পড়েছে । ওটা আসলে তিব্বতী সেটেলমেন্ট । প্রচুর তিব্বতী দেখা হল । মালা জপ করতে করতে কাজ করছেন । মুন্নিরাজ ওকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল সব । হঠাৎ মনাস্ট্রির পেছন থেকে অভ্র আবির্ভূত হল । মুন্নিরাজ হে হে করতে করতে এগিয়ে গেল । চান্দ্রেয়ী অপ্রস্তুত । কি করবে ভাবছে । এমন সময় অভ্র নিজেই এক বৃদ্ধা লামার ডাকে পাশের ছোট রাস্তায় ঢুকে

গেল । চন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো । মুন্নিরাজ মৃদু হেসে বললো- উনি ওরকমই । কত মানুষ যে ওনাকে চেনে ! পথে বেরোলেই বোঝা যায় । সবাই ওনার বন্ধু ।

এবং শত্রুও - চন মনে মনে বলে ।

মুন্নিরাজ হয়ত ভাবছে, অভ্র ওর সাথে কথা না বলাতে অসভ্যতা হয়েছে । কিন্তু নিজের অজান্তেই যে সে চান্দ্রেয়ীকে কত বড় সমস্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

তারপরে গেল ডুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে । ভেবেছিল বিশ্ববন্দিত হস্তী বিশারদ প্রফেসর রমণ সুকুমারকে দেখতে পাবে । ওনার হস্তী প্রেমের কথা সর্বজন বিদিত । তাঁর ও ব্যাঘ্র প্রেমে পাগল খ্যাতিমান ব্যাঘ্র বিশারদ ভাল্মীক থাপারের একটা ইন্টারভিউ পড়েছিল দা হিন্দু পত্রিকায় । তখন থেকেই ওদের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী । কিন্তু আদর করে ডাকা এলিফ্যান্ট সুকু কে কোথাও দেখতে পেল না। বুনো হাতির মতন জানোয়ারের সাথে যিনি সময় কাটান সেই বীরপুরুষকে দেখার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু কোথায় তিনি ?

বদলে এক গুচ্ছ বাচ্চা হাতি আর মা হাতিকে দেখলো । জলকেলি করছে । কিছু মানুষের বাচ্চা তাদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়েছে । মা হাতি বাচ্চা হাতিকে মানব সন্তান চেনাচ্ছে । মজাই লাগছিল । আমরা ওদের জানোয়ার বলি । ওরা আমাদের কি বলে কে জানে ! নদী পেরিয়ে ফেরার সময় কোথার থেকে অভ্র এসে উদয় হল । নৌকোয় ওঠার সময় হাত বাড়িয়ে ধরলো । সারা দেহে অদ্ভুত সঙ্কেত প্রেরণ করছে মস্তিষ্ক । বুকটা খালি খালি লাগছে । পা টলছে । অভ্র নৌকোয় ছিল । ওপার থেকে এসে আর নামেনি । দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো । প্রায় পাঁজাকোলে করে নামিয়ে নিল নৌকোর মধ্যে । আর ঠিক সেই সময়টুকু চান্দ্রেয়ী মোহাচ্ছন্ন হয়ে ছিল । হুঁশ এলো নেমে যাবার পরে । নৌকো চলতে শুরু করেছে । মুন্নিরাজ উঠে পড়েছে । দুপাশের ঘন জঙ্গল কেমন থম্ মেরে আছে । শীতের আকাশও বড্ড থমথমে । সুদীর্ঘ, ঋজু, সুপুরুষ অভ্র নৌকোর অন্য পাশে বসে একমনে জলে মাছেদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে । চনের মনেও যে রঙীন মৎস্য কন্যা ডানা মেলেছে তা কি ও বুঝতে পারছে ? সারা অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে রূপালি অভ্রকণা, নদীর জলে কি তা ধুয়ে ফেলা যায় না ?

কাহলিল জিব্রানের একটি কবিতার লাইন মনে পড়ছে ::

When love beckons to you follow him,

Though his ways are hard and steep.

And when his wings enfold you yield to him,

Though the sword hidden among his pinions may wound you.

And when he speaks to you believe in him,

Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.

For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning. ---------

বিকেলে ফেরার পরে গোয়ার্ড ওকে সব খাতা পত্র দেখালেন । কি কি কাজ করতে হবে তার একটা হিন্ট দিলেন । তারপর ওকে পাশের লনে নিয়ে গেলেন । বেতের চেয়ারে বসে জোরে হাঁক পাড়লেন- কফি লাও ।

চন্ মাথা নীচু করে ঘাসফুল দেখছে । অদ্ভুত রঙ । পাশের চেয়ারে কে যেন এসে বসলো ।

তাকাবো না ভেবেও চোখ চলে যায় । চোখাচোখি হয় । আজও দৃষ্টি সেরকমই স্থির, গভীর । ওরই ভাষায় এই দৃষ্টি হল- এক্স রে আইস্ এর পেনিট্রেটিং চাহুনি ।

ও বলতো - তোমার মনটা আমি পড়তে পারি ।

ও কি বুঝতে পারছে চন্ এখন কি ভাবছে ? মনের চারদেয়ালে কোন জিজ্ঞাসার আলো খেলা করছে ? যদি ও বুঝতো ! হৃদয়ের লুকানো কোণে এক ফিউজিটিভের জন্য অসম্ভব কোমলতা কিছুতেই যুক্তিবাদী মন দিয়ে চাপা দেওয়া যাচ্ছেনা । অভ্র তো ফিউজিটিভ । পলাতক এক আসামী । সেদিনটা কি করে ভুলে যাবে চন্ ! সেই ২২শে মাঘ ? প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের পুণার আবাসন দেখতে নিয়ে যাবে বলে অভ্র ওকে সকাল বেলা সঙ্গে নিয়ে বেরোয় । বেশ কিছুটা চলার পরে পাউ ভাজি খাবার বায়না ধরে চন্ । দারুণ ভালোলাগে । একটা ফুটপাথের দোকান থেকে পাউভাজি কিনে খায় ওরা । সেখানেই এক ব্যাক্তির সঙ্গে ঝামেলা ও পকেট থেকে একটি পিস্তল বার করে অভ্র ওকে শুট করে । লোকটি সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যায় ।জটলা শুরু হয় এবং তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় । চান্দ্রেয়ী এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনায় কিঞ্চিৎ হতচকিত । বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল । অভ্র পিস্তল পেল কোথায় ? আর গুলি করলোই বা কেন ? ঐ লোকটার সঙ্গে কথোপকথন ওর কানে আসেনি । একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে । কিন্তু যাই হোক, যত ঝামেলাই হোক একজন নিরীহ মানুষকে খুন করার কোন রাইট কারো থাকতে পারেনা । দ্রুত পা চালিয়ে রাস্তায় নেমে আসে চন্ । আর এক মুহূর্তও নয় এই খুনীর সঙ্গে । লোকটি নিশ্চয়ই আন্ডার ওয়ার্ল্ড কোন গোষ্ঠির সাথে যুক্ত । জোর বাঁচা বেঁচে গেছে আজ । বেশী দেরী হয়নি । বিয়ের পরে মুখোশ খুললে ওর জীবনটাই নষ্ট হত । মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল চান্দ্রেয়ী ।

কিন্তু আজ আবার দেখা হল এবং এমন এক সময় ও জায়গায় যার জন্য সে প্রস্তুত ছিলনা । কিন্তু বুকের ভেতরটা টনটন করেছে । গা শিরশির করেছে । এরকম তো হবার কথা নয় । একটা খুনীকে কেন ভোলা যায়না ?

সমস্ত অপরাধ ঢেকে যায় ভালোবাসার পরশে -অবাক কান্ড ! নিজের জীবনে নাহলে চনের বিশ্বাস করতে কষ্ট হত ।

প্রথম যখন পুণায় আলাপ তখন চান্দ্রেয়ী থাকতো একটা মেসে । ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম পড়াতো ।অভ্রর সঙ্গে আলাপ দোলের দিন, একটি অটোস্ট্যান্ডে । চন বাজার সেরে ফিরছিল । একটি অটো অনেক ক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে ছিল দোকানের সামনে ।মারাঠীরা খুব ধনে পাতা খায় । চন বাজারের থলি হাতে অটোয় ওঠার পর অটো ওয়ালা কি মনে করে জানা নেই বলে বসলো- আপ ধনিয়া নেহি লিয়া ? চন মৃদু হেসে বলে - নেহী । মজার ব্যাপার হল অটোওয়ালা অটো ঘুরিয়ে দিল, বাজারের কাছে গিয়ে নিজেই দরদাম করে একটি ধনেপাতার আটি এনে হাজির করলো। চনের মারাত্মক হাসি পেল । ফুটপাথের দিকে চোখ যেতেই দেখলো এক ব্যাক্তি ওর দিকে চেয়ে হাসছেন । আবার একদিন সেই ব্যাক্তির সঙ্গে অন্য জায়গায় দেখা । সেদিন মুখোমুখি । চনের খেয়াল ছিলনা কিন্তু ভদ্রলোক

ওকে চিনতে পেরে সেদিনের ধনেপাতার ঘটনা বললেন । উনিও বাঙালী । দুজনে খানিকক্ষণ খুব হাসলেন ।

সেই শুরু । আলাপ গাঢ় হল ।ধীরে ধীরে ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে হৃদয় মাতাল । কিন্তু অন্য একটা

বিশ্রী ঘটনা কেমন সব বদলে দিল ।যার জন্য চান্দ্রেয়ী একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা ।

## ৪

ঐ ঘটনার পর সে পুণা ছেড়েছে । কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছে । তারপর চাকরি নিয়ে ব্যাঙ্গালোর হয়ে এসেছে কূর্গের এই বনপ্রান্তরে । কিন্তু সহসা এখানেও বরষার আগমন । চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে ।

কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে কোলের ওপর । অভ্রর দৃষ্টি এড়ায় না । এই অরণ্য সন্ধ্যায় ওরা বার বি কিউ করছে গোয়ার্ডের প্ল্যান মাফিক । রেড ওয়াইনের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে চলে কাজের কথা । অভ্র উল্টো দিকে পাথরে বসেছে । ডীপ ব্রাউন শার্ট পরেছে । চান্দ্রেয়ীর প্রিয় রং । হয়ত ইচ্ছে করেই পরেছে, কে জানে ? চন ওকে আড় চোখে দেখছে । ও কিন্তু সোজা তাকাচ্ছে । ওর কি কোন অনুশোচনা নেই ? প্রফেশন্যাল খুনী মনে হচ্ছে ! একটা আস্ত মানুষকে মেরে ফেলে কেমন নির্দ্বিধায় বসে আছে দেখো ! আর চনেরও বারবার ওর দিকেই

দৃষ্টি যাচ্ছে কেন ? মনে মনে চান্দ্রেয়ী স্থির করে অল্প কিছুদিন পরেই ইস্তফা দিয়ে চলে যাবে সে । যতদিন না থাকলে অভদ্রতা হয় ঠিক ততদিনই থাকবে । তারপর কোন অজুহাত দিয়ে ফিরে যাবে । অভ্রর সঙ্গে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । যার কথা জানে যে সে একজন দাগী আসামী তাকে কি ক্ষমা করা যায় ? আর যাবার সময় জানিয়ে যাবে যে এই বীরপুরুষ আসলে একজন খুনী । বলা তো যায়না কি মতলবে এখানে রয়েছে! সাহেব দেখে হয়ত সব হাতাবার তালে আছে ।

ওয়েল মিস দত্তা, প্লিজ চক আউট ইওর প্ল্যান্স্ উইথ হিম অ্যান্ড স্টার্ট ওয়ার্কিং । অল দা বেস্ট ।

গোয়ার্ড চালকের আসনে । মালিক সুলভ কন্ঠস্বর ভেসে আসে ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে চান্দ্রেয়ী । মাথা নিচু করে কিছু ভাবে । দূরে একটা পাখি অজানা সুরে গেয়ে ওঠে ।

পায়ের কাছে কয়েকটা রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে চলাফেরা করছে । অন্যসময় হলে ওদের পেছনে ছুটতো, এখন বিরক্ত লাগছে । আনমনা হয়ে হাঁসেদের রঙ্গ দেখছে এমন সময় গোয়ার্ডের কন্ঠ চিন্তায় ছেদ আনে - আপনাকে বলা হয়নি, আমাদের ম্যানেজার মি:অভ্র বাসু একজন এক্স ইন্ট্যালিজেন্স এজেন্ট । বহুদিন চেষ্টা করেও ধরা যায়নি এমন এক ক্রিমিন্যালকে ধরার সুবাদে মোটা পুরস্কার পেয়েছেন । এবং শুধু ধরাই নয় এনকাউন্টারে লোকটি মৃত । সব উৎপাত বন্ধ । দূর্ধর্ষ এক অপরাধী ছিল । অভ্র বাসুর খাতায় কলমে নাম কিন্তু পৃথ্বীশ বাসু ।

সবাই অভ্র বলেই ডাকে । অত:পর ম্যানেজার সাহেবের গোয়েন্দাগিরি ভালো না লাগায় সব ছেড়ে জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আর সবচেয়ে স্ট্রাইকিং হল ওনার প্রাইজ মানির

অনেকটাই উনি এই প্ল্যান্টেশনে ডোনেট করেছেন । বলে হা হা করে জোরে হেসে ওঠেন গোয়ার্ড ।

হাসিটা অসহ্য লাগছে । সত্যি বলছেন তো ? নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না । ইচ্ছা হচ্ছে গায়ে চিমটি কেটে দেখতে । অভ্র ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছে ? কফি বনের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে সে ।

চান্দ্রেয়ী জিগেস করেই ফেলে- আপনি ঠিক জানেন ? ও নির্দোষ ?

কেন মিস দত্তা আপনি কি ওনাকে চেনেন ?

চিনতাম । খুব ভালো করে চিনতাম -কিন্তু !

আর কোন কিন্তু নয় । উনি একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার ছিলেন । কর্মসূত্রে উনি পুণায় যান, এদের প্রফেশন্যাল কারণেই পরিচয় গোপন রাখতে হয় জানেন নিশ্চয়ই । যেমন কোন দেশের সিক্রেট এজেন্টের

কাজের ব্যাপ্তি বা ধরণের কথা সম্ভবতঃ তার স্ত্রীও জানেন না । আমি কিন্তু সব জেনেই আপনাকে এখানে আহ্বান করি । কারণ আপনার বায়োডেটা সব থেকে আগে ওর হাতেই এসেছিল । বাসু তোমার পুরনো আই ডি কার্ডটা ওনাকে দেখাও না !

অভ্র দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসে ।

--লুকিয়ে পুণা গিয়েছিলাম তদন্তের কাজে, চোর ধরতে কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেল আমার মনচোর ।

অভ্রর মুখে দুষ্টু হাসি । যেই হাসি দেখে ভুলে যাওয়া যায় সব দুঃখ। মুছে ফেলা যায় সব অভিমান । তা অভিমানই বৈকি ! নাহলে একবারো সে খোঁজ নিলনা, একবারো খতিয়ে দেখলো না সে যা ভাবছে সেটা আদৌ সত্যি কিনা ?

ঘটনার পরেই পুণা ছাড়লো ?

এতখানি অবিশ্বাস করলে আমাকে চন্‌ ? একবার জানতে চাইলে না কেন আমি ওরকম করলাম ? তোমায় আমি কত খুঁজেছি । তোমার মেসের কেউ বলতে পারলো না তুমি কোথায় । একবার মনে হয়েছিল কলকাতার কথা । কিন্তু কেউ তোমার বাড়ির ঠিকানা দিতে পারলো না। অভ্র অভিমানী ।

না মানে ---( যদিও মেসের মেয়েদের সব খুলে বলেনি কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দিতে যে সেই বারণ করেছিল আজ আর তা বলা যায়না )

কোন কথাই আর বলা হলনা । দূরে গোয়ার্ডের ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে ঘন বনে হ্যালোজেন বাতির পথ ধরে ।

হলুদ আলোয় চান্দ্রেয়ীর কমলালেবুর মতন ঠোঁট জোড়া বন্ধ হয়ে গেছে ওর পুরু ঠোঁটের ভেতরে । কফি গাছের আবডালে অভ্র আগের মতনই সাহসী, রোমান্টিক । ওর গভীর লোমশ বুকের মাঝে হারিয়ে যায় চান্দ্রেয়ীর তুলতুলে অস্তিত্ব ।

রোমান্টিকতা ! তোমার জন্ম কবে ? কোথায় ?

বৃদ্ধ তো হওনি তুমি বৃদ্ধা ধরিত্রীর মতন !

হৃদয়ে তোলো বীণার ঝঙ্কার ।

উচ্ছল নদী যেন, বাঁধন হারা,

নদীও পোড়ায় ।

জ্বলে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি - তুমি কি দহনের আভাস পাও ?

নাকি স্তব্ধ পৃথিবীর মতন তুমিও এক শিলাখন্ড ?

জীবনের প্রথম কবিতা লিখে বাইরে চেয়ে আছে চন । ধূসর পাহাড়, তুঁতে আকাশ যেন ডাকছে আয় আয়-কফি ফুলের মৃদু সুবাসে এক মাদকতা ছড়িয়ে যাচ্ছে শিরায় শিরায়, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছে জানালার বাইরে হঠাৎ পিঠে আলতো পরশ । বেবী পিঙ্ক রঙের জন মিলারে অভ্র মোহময় । হাতে একগুচ্ছ রঙীন ফুল আর চোখের পূর্বরাগের আহবান । রূপসী চান্দ্রেয়ী ডুবে যায় গভীর রোমান্টিকতায় ।

# সৃজনী

সাক্ষী সান্যাল একজন ফ্যাশন ডিজাইনার । বসবাস ওড়িষ্যার এক গ্রামে । গ্রামটা কিছুটা পুরীর কাছাকাছি । সাক্ষী যখন ফ্যাশন নিয়ে পড়েছিল তখন ভারতে এই বিষয়ে লোকেরা সেরকম ওয়াকিবহাল ছিলনা । তার পিতা ছিলেন অর্থনীতির শিক্ষক । উনিই প্রথম সাক্ষীকে এই বিষয়ের কথা বলেন । সাক্ষী ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো ছবি আঁকতো, কালার সেন্স ছিল দূর্দান্ত । বাবাকে বলতো- বাবি, তোমার ইকনমিক্স সাবজেক্টটা অসম্ভব খারাপ । বইগুলো খুব বাজে ।

- কেন ? পিতা কৌতুহলী ।

- তোমার মোটা বইগুলো অসম্ভব কদাকার, একটাও ছবি নেই ওগুলোতে । পড়লে তোমার মাথা ধরে যায়না ?

আদরিনী কন্যার কথায় পিতা হেসে গড়াগড়ি । অনেক খুঁজে টুজে কিছু টুথপেস্টের ছবি দেখাতে পেরেছিলেন । তবেই মেয়ের শান্তি - যাক্ নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো । হলই বা পণ্য চিত্র তবুও চিত্র তো !

স্কুলে সব থেকে বেশি এনজয় করতো নিডল্ ওয়ার্ক ক্লাসটা । বাড়িতেও পুরনো ফেলে দেওয়া কাপড়ের টুকরো ওর হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠতো অনন্য । ছোট ছোট কাপড় জুড়ে তেড়ে ও চমৎকার একটা বেডকভার বানিয়েছিল । কুরুশের কাজেও ওর হাত ছিল খুব পোক্ত । তাই কলেজের গন্ডী পেরিয়ে ও যখন বাবাকে বললো ওকে ফ্যাশান কলেজে ভর্তি করতে বাবা না বলেন নি । তবে ওকে পড়তে যেতে হল দিল্লী । পড়ার সময় অনেক বড় বড় ফ্যাশান গুরুর সঙ্গে ওর মোলাকাৎ হয়েছে । কত কাজ জানেন তারা, সব বিদেশের নামীদামী প্রতিষ্ঠান থেকে ওনারা পাশ করে এসেছেন । তাদের সান্নিধ্যে ওর সহজাত দক্ষতা পূর্ণতা পেল ।

পাশ করার পরে ও নিজের দোকান খুলে বসলো । তবে শহরে নয় গ্রামে । দক্ষ কারিগর রেখে ও নিজেই ডিজাইন করতো । উইভার, শিল্পী, দর্জি রেখে একটা ছোটখাটো ওয়ার্কশপ চালু করলো সে । মাঝে মাঝে এদিক ওদিক প্রদর্শনীও হত । ভুবনেশ্বরে একবার এক প্রদর্শনীতে আলাপ হল এক অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে । ডারায়াস নাম তার । সে ছিল শিল্পী মানুষ, বস্ত্রশিল্পের দুনিয়ায় কাজ করতো । সোজা ভাষায় ফ্যাশন টেকনোলজিস্ট ।

সাক্ষীর সঙ্গে ডারায়াসের মনের মিল হল । ওরা বিয়ে করলো । তারপরে এই গ্রামে একসাথে শুরু হল নবজীবন ।

সাক্ষীর এক ক্লাসমেট ছিল পুরুষোত্তম নাম তার । তার বাবা একজন খ্যাতনামা ডাক্তার । সম্ভবত সেই কারণেই ছেলেটি কিঞ্চিৎ উন্নাসিক । কোন কিছুকে ভালো বলার জন্য যেন তার জন্ম হয়নি ।

তার বিচারে শুধু নোবেল প্রাইজ পাওয়া কিংবা অস্কার পাওয়া মানুষজনই সেরা ।

কিন্তু কোন বিষয়ে একটা নোবেল পেতে গেলে সেই বিষয়ের ভিত্তিটা যে অনেকজনকে মিলে অনেকদিন ধরে তৈরি করতে হয় সেটা পুরুষোত্তম মিস করে গেছে । যিনি নোবেল পেলেন তিনিই ঐ সাবজেক্ট টির জনক এরকম হয় কি ?

সাক্ষী ছেলেটিকে এড়িয়ে চলে । তবে যেহেতু বন্ধু তাই ভদ্রতার খাতিরে কিছু যোগাযোগ রাখতেই হয় । অবশ্য বন্ধু শব্দটা সে ব্যবহার করেনা, বলে -আমার ব্যাচমেট । বন্ধু অনেক গভীর শব্দ, অনেক দায়িত্ব, ভালোবাসা, মমত্ব মিশে আছে সেই শব্দটার সঙ্গে । কাছের মানুষ যেমন সবসময় নিকটজন হননা সেরকম ক্লাসমেট মানেই বন্ধু নয় ।

ছেলেটি ভালো ডিজাইনার ছিল তবে ওর নকশায় একটু রস কম, বেশি পাশ্চাত্যের ছোঁয়া । এই জাতীয় ডিজাইনকে সাক্ষীর একটু দূরের জিনিস মনে হয় । সে বেশ ভারতীয় পন্থায় ডিজাইন করে । আমাদের দেশে কি শিল্পের অভাব । বাটিক, বালুচরি, কাঁথা স্টিচ কত হরেক রকমের সব ব্যবস্থা রয়েছে । বিদেশী ডিজাইন তাকে বড় একটা টানে না । যদিও ডারায়েসের কল্যাণে মাঝে মাঝে কিছু শো দেখতে যেতেই হয় কিন্তু ঐ অবধিই ।

তার কারিগরেরা সবাই দক্ষ । সাক্ষীর ইন্সট্রাক্‌শন পেয়ে ওরা কাজ করে । বিখ্যাত সব নামেদের অর্ডার আসে কখনো সখনো । যেমন এক বিরাট ধনবানের একমাত্র পুত্রের জন্য চাই এথনিক ড্রেস । বিয়ের পোষাক । তলব হল সাক্ষীর । মাঝে মাঝে বাংলা ছবির কস্টিউম ডিজাইন করে সে । ঋতুপর্ণ ঘোষের কাজিন পিকলু ওর স্কুলের মেয়ে । যোগাযোগ আছে । সেই সুত্রেই কিছু কাজ পায় । এইভাবেই চলছে । বিজ্ঞাপন কম বলে হয়ত যতটা হতে পারতো ততটা পরিচিতি নেই ।

তবে সাক্ষী কোন ম্যানুপুলেশন করেনা । জীবনকে সে নিজের ছন্দেই বইতে দেয় । কোন দলাদলি, পিঠ চাপড়া চাপড়ি, খেয়োখেয়ির মধ্যে সে নেই । সে ভালো করেই জানে প্রয়োজন ফুরালে ছুঁড়ে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগেনা মানুষের । যত দিন শাঁস ততদিন নেবে শ্বাস -- তারপরেই গলা টিপে ধরবে । তার বিশেষ প্রিয় একটি পদ্য হল-

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, ভাই বলে ডাকো যদি দেবো গলা টিপে

হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা, কেরোসিন শিখা বলে এসো মোর দাদা ।

সে চাঁদাকে গলায় লটকায় না, আবার কেরোসিন শিখাকেও অবজ্ঞা করেনা । সবাইকে নিয়েই চলতে ভালোবাসে । তার কোন গডফাদার নেই । সে নিজের মতন করেই কাজ করতে ভালোবাসে । সবটুকু সৃষ্টিশীলতা উজাড় করে দেয় প্রতিটি সুতোর বুননে । লেসের নক্‌শায়।

====

ওর স্টুডিও খুব সুন্দর একটা বনপ্রান্তরে । গ্রামের শেষ ভাগে । বিশাল জায়গা জুড়ে ছোট ছোট কিছু টালির ঘর । সেখানে সুতো ঝাড়াই বাছাই হয় । তারপর তাতে প্রাণ সঞ্চার হয় । গড়ে ওঠে এক একটি অ্যাফ্রোদিতি । রংয়ের মাধুর্যে, নিপুন বুননে প্রতি পোশাক হয়ে ওঠে ডিজাইনার ড্রেস । আর সাক্ষী একটা পোশাক তৈরি করে ছাঁচটা নষ্ট করে ফেলে । কোন ডিজাইনের কপি রাখেনা যাতে দ্বিতীয় বার ওটা তৈরি করা না যায় । এটাই ওর বিশেষত্ব । ফলে নো রিপিটেশন ।

ওর সাম্রাজ্যের নামটিও সুন্দর - সেঁজুতি । ডারায়াসের দৌলতে যেটা হয়েছে : স্যনজুটি ।

এত সুন্দর নামের এত বিদিকিচ্ছিরি উচ্চারন শুনে সাক্ষী রেগে গিয়েছিল । কিন্তু ডারায়াস যুক্তিবান পুরুষ। ওর হিসেব হল- আমি যখন তোমায় স্যাকসি ( উচ্চারণের কল্যাণে হয়ে যায় সেক্সি ) বলি তুমি প্রতিবাদ করনো না তো ? পাল্টালে সবই পাল্টানো উচিৎ তাইনা ?

সাক্ষী চুপ । কি করবে দয়িতের মুখে সেক্সি শুনতে মন্দ লাগেনা যে !

এখন ওদের কর্মশালা ঐ অঞ্চলের এটা একটি দর্শনীয় স্থান । শিল্পীর অনন্য স্ট্রোক ও তাঁতির জাদুকরি যন্ত্রসঞ্চালনে কিভাবে সৃষ্টি হয় বস্ত্রকাব্য তাই দেখতেই দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে ।

====

সেদিন সকালে খবরের কাগজটি নিয়ে বসেছিল ডারায়েস । একটি বিজ্ঞাপনে চোখটা আটকে গেল । কটক শহরে একটি ডিজাইনার শো হবে তাতে ভারতের বড় বড় সমস্ত ফ্যাশন গুরু বা হাউজ স্টল দেবে । এক্সিবিশন হবে । প্রথম পুরস্কার মোটা অঙ্কের তবে তার চেয়েও বেশি যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল পুরস্কার প্রাপক প্যারিসে ফ্যাশন শো তে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন বিনা শর্তে ।

বিজ্ঞাপন পড়ে ডারায়াস খুবই উত্তেজিত । কাগজটি নিয়ে স্ত্রীকে দেখাতে গেল । সাক্ষীর অ্যাম্বিশন এমনিতে একটু কম । শুনেটুনে খুশি কিন্তু অংশগ্রহন করবে কিনা সেটা ঠিক করতেই কদিন কেটে গেল । আর বললেই তো সুযোগ হবেনা, প্রথমত দরখাস্ত দিলে লটারি হবে । এবং পরে বাছাবাছির পর্বও আছে । ইচ্ছে হলেই যাওয়া হবে এমন নয় ।

ডারায়াস বললো- দরখাস্ত দিয়ে দাও ।

- দিলেই হয় তবে চান্স পাবো না হয়ত ।
- দিয়েই দেখো না ।
- এই জানো চান্স না পেলে খুব খারাপ লাগবে ।
- তবুও চেষ্টা করো হারাবার তো কিছু নেই ।

ডারায়াসের কথায় অবশেষে ও দরখাস্ত দিল ।

ইতিমধ্যে পুরুষোতম এসে হাজির । ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখেছে । সাক্ষী ওখানে স্টলের জন্য দরখাস্ত দিয়েছে জেনে প্রথমে খুব একচোট হাসলো ।

- তুই ? তুই কি করে চান্স পাবি ওখানে তো সব বিরাট ব্যাপার !
- হ্যাঁ জানি, তবুও তো ইচ্ছে করে ।
- হা হা হা, সে তো আমারো আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

সাক্ষী তার বন্ধুকে ভালই চেনে কাজেই কথা বাড়ায় না । জানে যাই বলুক ও হেসে উড়িয়ে দেবে অথবা এড়ে তর্ক করবে । আর ওর মুখ খুব খারাপ । অসম্ভব বাজে কথা বলতে পারে।

লঘু গুরু মানে না ।

সূর্য ডুবে গেছে । আকাশে আবীর খেলা । বসন্তে গাছে গাছে ফুলের সমারোহ । বনপথ ফুলে ফুলে ছাওয়া । গরম চা হাতে পুরুষোত্তম এসে বসলো ওদের কুটিরের বারান্দায় । দূরে নীলাভ পাহাড়ের রেখা । ভেসে আসে কামিনী ফুলের মিষ্টি গন্ধ ।

- এটা কে লাগিয়েছে এখানে ? কামিনী গাছটার কথা জিজ্ঞেস করে পুরুষোত্তম ।

- আমি, সাক্ষীর মৃদু জবাব । কামিনী আমার প্রিয় ফুল । অনেকে কুন্তি ফুল বলে ।

ধূসর গোধুলী র মতনই সাক্ষী কিছুটা বিবর্ণ আজ । অন্যসময় হলে কামিনী ফুলের ইতিহাস শোনাতে বসে যেতো ।

*এমন সময় ডারায়াসের পদার্পণ ।*

কিছু কথাবার্তার পর পুরুষোত্তম তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে ওঠে - তোমরা ওখানে স্টলের জন্য অ্যাপীল না করলেই পারতে, ওটা বড় বড় ফ্যাশন আইকনের জায়গা । আমাদের মতন সামান্য লোকেরা ওখানে কল্কে পাবেনা । আর কি করে যে লোকে ওখানে জায়গা পায় এ আমার কাছে এক বিস্ময় ।

ডারায়াস প্রতিবাদ করে- কিন্তু কোন একটা জায়গা থেকে তো শুরু করতে হবে, আমার হবেনা বা আমি পারবো না বলে বসে পড়লে চলবে কি করে ?

পুরুষোত্তম হেসে ওঠে । ভাবখানা যেন- অন্য কেউ পেলেও তোমরা কি করে পাবে ? এতই সহজ ?

তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলে ওঠে - এই সপ্তাহে মুম্বাই গিয়েছিলাম । সব্যসাচী মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ হল । দা গ্রেট ডিজাইনার সব্যসাচী । রোহিত বাল ও ছিলেন ।

তবে সব্যসাচী ইজ সব্যসাচী ।

সাক্ষী নীরব ।

ডারায়াস বলল- তুমিও অ্যাপ্লাই কর না কেন, স্টলের জন্য ?

- আমি ? পাগল ?
- কেন হয়ত প্রাইজ পেতেও পারো ।
- মাথা খারাপ নাকি তোমাদের ? প্রাইজ পেতে হলে আমাকে কত বড় বড় লোকের পোশাক তৈরি করতে হবে, কত বড় বড় ফ্যাশন শোতে অংশ নিতে হবে । কি যে বল ডারায়াস !

এইভাবে হয় নাকি ?

পুরুষোত্তম তির্যক ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে । ডারায়াস কথা বাড়ায় না ।

ঘন অন্ধকারের জাল ধীরে ধীরে সেঁজুতির আঙিনা আচ্ছন্ন করে ফেলে ।

কামিনী ফুলের মিঠেল সুবাসে আকাশে নক্ষত্র পুঞ্জও ঢেকে যায় । শুধু একটা চিনচিনে ব্যাথা ছড়িয়ে যায় সাক্ষীর অন্তরে । ভীষণ কষ্ট । যন্ত্রণা । কিসের যন্ত্রণা ? অবজ্ঞা ? আন্ডার এস্টিমেশন নাকি চাপা ঈর্ষা ?

===

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে । একদিন ডাকমাধ্যমে ওরা একটি চিঠি পায় ।

কটক ফ্যাশন শোতে ওদের ডাক এসেছে । সাক্ষীর পাঠানো স্যাম্পেল দেখে ওদের ভালো লেগেছে । তার কাজের পরিধি ও বিশেষত্ব ওদের মুগ্ধ করেছে । বেশ নতুনত্ব আছে ওর সৃষ্টিতে ।

টাই অ্যান্ড ডাই, বাটিক সব কিছুকে একছাঁচে ঢেলে যেই পাশ্চাত্যের পোশাক ডিজাইন করেছে তা অনবদ্য । লেহেঙ্গা চোলিতে এনেছে ধনেখালির ছোঁয়া । খুব ক্রিয়েটিভ কাজ । খুবই প্রশংসিত ।

বাংলাদেশী গামছা শিল্পী বিবি রাসেল তো উচ্ছসিত ওর কাজ দেখে । গামছা ছাড়াও যে সুন্দর ড্রেস করা যায় সনাতন ভারতীয় বস্তু দিয়ে তা ওনাকে মুগ্ধ করেছে । একটা জামায় সাক্ষী সাঁচী -সারনাথের স্থাপত্যকে বেস করে কাজ করেছে । অফ হোয়াইটের ওপর মেহেন্দী রংয়ের কারুকার্য । অপরূপ সেই শৈলী । বিবি রাসেলের কথা সরেনা ।

আজ দু দিন হল ফ্যাশান এক্সিবিশনে স্টল দিয়েছে সাক্ষী কিন্তু হাজার হাজার প্রশংসা কুড়িয়েছে সে । পুরুষোত্তমর ডেরোগেটারি কমেন্টস ও ডিসকারেজিং কথাবার্তায় যে আঘাত পেয়েছিল আজ সেই ঘায়ে যেন অনেকটাই মলম লাগলো ।

সবথেকে ভালো লাগলো যখন সব্যসাচী মুখার্জি নিজে এসে ওর কাজের প্রশংসা করলেন এবং বললেন- আপনাদের মতন আরো অনেক ডিজাইনার আমাদের ভারতে প্রয়োজন ।

পাথ ব্রেকিং কনসেপ্ট, স্বাধীন চিন্তা ভাবনা করতে পারা ডিজাইনার পেলে আমরাও জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবীদার হতে পারবো । ট্যালেন্ট আর এক্সোটিক ট্যালেন্ট দুটো আলাদা।

আপনি যেমন কেমিক্যাল ব্যাবহার না করে প্রাকৃতিক উপায়ে রং তৈরি করে কাজ করছেন তা কিন্তু খুবই এনভায়ারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি । এইভাবেই কাজ করুন । এগিয়ে যান ।

সাক্ষী বলাবাহুল্য ভারি খুশি । সেদিন রাতে ও আর ডারায়াস একটা থাই জয়েন্টে খেতে গেল।

লেমনগ্রাস রাইস দিয়ে থাই গ্রীন চিকেন কারি খেয়ে আনন্দে অবগাহন করলো দুই সৃষ্টিশীল প্রাণ ।

একজন সৃষ্টির কারিগর অন্যজন জাদুকর ।

===

ওরা কটক ফ্যাশান শো তে স্টল পেয়েছে দেখে পুরুষোত্তম মাঝে ফোন করেছিল । তখন একটু চিমটি কাটাও হয়ে গেছে ।

- ভাগ্য আজকাল সবার সঙ্গ দিচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে ।

সাক্ষী কোন কথা বাড়ায়নি । কত কথা বলবে, কত জ্ঞান দেবে । তারপরে একেবারেই যখন আটকাতে পারবে না তখন বলবে - হ্যাঁ ও ছোটমোট ডিজাইনিং ভালই করে ।

সাক্ষী এসব জানে । সাক্ষী দেখেছে ওর চেনা মানুষেরা যারা মেখলা পরতে বিশেষ ভালোবাসতো তারা ও ডিজাইনিং শুরু করার পরে বলতো- আমি মেখলা পরিনা একদম, আমার স্যালোয়ার সুট টাই বেশি প্রিয় ।

অথচ আগে তারা একটা মেখলার জন্য সারা শহর চষে বেড়াতো । এখন যেহেতু সাক্ষী বানায় তাই ওটা ভালোলাগে বললে পাছে কিনতে হয় । তার চেয়ে -না পসন্দ বলে দেওয়াটাই বেটার । লোক চরিত্র দেখে দেখে ও হাঁপিয়ে গেছে ।

আজকাল সেজন্য কেউ কিছু বললে ও কথার চেয়ে কথার কারণে বেশি জোর দেয় । কেন বলছে সেটাই রিসার্চ করে বার করার চেষ্টা করে ।

যাইহোক স্টলের বিকিকিনিও ভালো হয়েছে । সাক্ষীর স্পেশাল ক্ষমতা ওর কালার কম্বিনেশনে । ও দেখেছে অনেক ডিজাইনার যারা বেশ বাজারে কাজ করার অভিজ্ঞতা রাখে তারাও ক্যাট্ক্যাটে হলুদের সঙ্গে বিশ্রী লাল অথবা তুঁতে মিলিয়ে পোশাক বানিয়েছে । বড্ড চোখে লাগে । একেবারে কাঁচা রং ব্যবহার করা কোন ভালো ডিজাইনারের লক্ষণ নয় । হ্যাঁ চড়া রং ব্যবহার নিশ্চয়ই করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে বিষয় এর ওপরেও গুরুত্ব দিতে হবে । যেমন এক ক্লায়েন্ট ওকে বলেছিল তার বিয়ের শাড়ি হবে কচি কলা পাতার সঙ্গে পার্পেলের কম্বিনেশান ।

জঘন্য কম্বিনেশন । যে কোন ভালো ডিজাইনার আঁতকে উঠবেন । সাক্ষী কিন্তু এমন সুন্দর ভাবে পোশাকটি তৈরি করলো যে রং এর এই চোখে লাগা ব্যাপারটা পুরো বিনষ্ট ।

বিয়ের কনে খুশি । বিয়ের দিন ওর বাড়িতে যখন সাক্ষী গেল তখন কনে তো ওয়াইন হাতে ব্রা আর প্যান্টি গোছের একটা খাটো পোশাকে এসে হাজির ।

- আজকে তুমি আমায় করে তুলবে অনন্যা মিসেস ডিজাইনার ।

সাহসী কনের সপ্রতিভতার সাক্ষী হয়ে রইলো ডিজাইনার সাক্ষী সান্যাল ।

===

আজ শেষ দিন । পসরা সাজিয়ে ওরা বসেছে । হঠাৎ একজন মহিলা বেশ ট্রেন্ডি সাজে এসে হাজির হলেন কাউন্টারে । কিছু দেখতে চান, পোষাক আষাক কিংবা অন্য কোন কাজ ।

স্টলের ছেলেটি সব বার করে দেখাচ্ছে এমন সময় সাক্ষী এলো ।

দেখেই চিনতে পেরেছে । সেই সাহসিনী । অল্পসময়েই কনে থেকে পৃথুলা রমনী । রমনীয়তা হারিয়ে গেছে মেদের স্তরে । পরণে ঢোলা হাফ প্যান্ট আর বিভাজিকা প্রকাশিত লেসের জামা । ঢাউস বক্ষযুগল যেন উপচে পড়ে যাবে মেলা প্রাঙ্গনে । সাক্ষী চোখ সরিয়ে নেয় । মাঝে মাঝে ওর মনে হয় মানুষ পোশাক পরে কেন ? শরীর ঢাকার জন্য নাকি আদিমতার আভাস দেবার জন্য ?

পরস্পর কুশল বিনিময়ের পরে উনি একগাদা জিনিষ কিনলেন । প্রায় ৩,৫০,০০০ টাকার বাজার করলেন । তারপর সাক্ষীকে একটা আসন্ন বিবাহের, মেমবধূর পোশাকের অর্ডার নেবার জন্য একখানি কার্ড দিয়ে চলে গেলেন ।

বিয়ে হবে এক বিলিওনিয়ারের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে এক ডাচ কন্যার । মেয়েটি ওদের দেশের ছোটখাটো মডেল । বিয়ের পোশাক হিসেবে তার জন্যে ১৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন উত্তর ভারতীয় রাজঘরণার রাজবধূর পোশাক যেমন হত তেমনি কিছু বানিয়ে দিতে হবে । মোটা পারিশ্রমিক মিলবে । উগ্রতার আড়ালে মুগ্ধতা, মলাটের ভেতরে একরাশ ফুল । স্বভাবতই সাক্ষী খুশি ।

যথাসময়ে এক্সিবিশন সমাপ্ত হল । ওড়িয়া কবি জগন্নাথ দাসের কবিতা পাঠ দিয়ে আসর শেষ হল । নিজেদের জিনিসপত্র গুটিয়ে যে যার গৃহাভিমুখে । ভেবেছিল কিছুই পাবে না, তবুও সাহস করে এগোনোতে আজ তার ভাঁড়ার পরিপূর্ণ । এত প্রশংসা, উৎসাহ এবং সব শেষে ভালো একটা কাজের খোঁজ পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছিল ।

নির্দিষ্ট দিনে ফিরে এলো ওদের কর্মশালা কাম গৃহ সেঁজুতিতে ।

আবার নব উদ্যমে শুরু হবে কাজ । একটু গবেষণার প্রয়োজন তো । ১৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজবধূ কি পরে বিয়ে করতেন জানার জন্যে কিছু দিন লাইব্রেরীতে কাটাতে হবে । তার পরে শুরু হবে সুতোয় রূপটান ।

ব্যস্ত সাক্ষী দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় স্টুডিওর দিকে হঠাৎ ডারায়াসের কন্ঠস্বরে চলার ছন্দ বিঘ্নিত হয়।

হাতে সেদিনের কাগজ ----

গোটা গোটা কালো কালো অক্ষর গুলো থেকে চুইয়ে পড়ছে রঙীন বাস্তব ।

সাক্ষী মোহিত, চমকিত, বাকশক্তিহীন ।

প্যারিস ফ্যাশান শোতে অংশ নেবার জন্য একমাত্র ভারতীয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কটক ফ্যাশন শো ও এক্সিবিশনে জুরি মহোদয়গণের বিচারে প্রথমস্থান দখলকারি এসথেটিক ডিজাইনার সাক্ষী সান্যাল ।

বর্তমান বর্তমানই । তাকে মেনে নিতেই হয় । যতই আমাদের হিসেবকে সে বুড়ো আঙুল দেখাক না কেন । কাজেই কেমন লাগছে বান্ধবীর এই অ্যাচিভমেন্টসের কথা জেনে - এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ ডিজাইনার পুরুষোত্তমকে পাওয়া যায়নি ।

বড় মধুর এই ক্ষণে খবরের কাগজটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে সৃষ্টিশীল একটি মন প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায় বুনোফুলের মাদকতায় ।

পৃথিবীর সমস্ত রামধনু যে আজ ডারায়াসের পকেটবন্দী ।

# হোমশিখা

সোসালেইট বিবি পালিত একটি হোটেল চালায় । থাকার ব্যবস্থা বেশি নেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাই এলাহি । ব্যাঙ্গালোর শহরের তাবড় তাবড় লোকেরা তার হোটেল বলা ভালো রেস্তোরাঁতে খেতে আসে, সিনেমার লোক, নাটকের লোক, ফ্যাশন আইকন, জকি, এয়ারলাইন প্রফেশন্যাল কে বাদ ?

আসলে বিবি পালিতের একটা অন্য পরিচয়ও আছে । সে ছিল ফিল্ম ড্রিস্ট্রিবিউটর । তারপর পয়সা কামিয়ে নিয়ে একটা সিনেমাও বানিয়ে ছিল - ত্রিকালদর্শী নামে ।

ভগবান টগবান নিয়ে । ভক্তি মূলক ছবি । চলেছিল বেশ । ধর্ম বা সেক্সের সুড়সুড়ি থাকলে পাবলিক ভালো খায় ! বেশ ভালই চললো ছবিটি । নাহ্ বিবি পালিত বুদ্ধিমতী বটে । তারপর কোন অজ্ঞাত কারণে আর সিনেমা বানায়নি । হোটেল খুলে বসেছে । নিজে অভিনেত্রী হতে পারেনি শর্ট হাইট বলে । মুখটা যদিও অপূর্ব । ভীষণ অ্যাট্র্যাকটিভ ।

চোখগুলো খুব এক্সপ্রেসিভ । তাই নায়িকা না হলেও সে পিওপেলস্ হিরোইন । পাবলিক ফিগার ।

হোটেলটায় সেইজন্যেই হাই ফাই লোকেরা আসে । বেশির ভাগই বিবির পূর্বপরিচিত । অবশ্যি এখানে খাবার বেশ ভালো পাওয়া যায় । বিবি মূলত বাঙাল তাই রান্নার দিকে ঝোঁক ছিল, জিভেরও স্বাদ আছে । বেশ এক্সপার্ট কুক রেখেছে । হোটেলের রমরমা, ইনোভেটিভ খানা মেলে এখানে ।

বাঙালী ডেলিকেসিও আছে । চিতল মাছের মুইঠ্যা লোকে গপগপিয়ে খায় । মিষ্টি দই চেটেপুটে খায় ।

আর বিবির রেস্তোরাঁ - প্রিমরোজ আরো একটা কারণে বিখ্যাত । এখানে যে কোন অতিথি সোজা কিচেনে ঢুকে যেতে পারবে । ভেতরে কি ভাবে রান্না হচ্ছে সব নিজে চোখে দেখতে পাবে । বিবি আবার মাঝে মাঝে রেসিপিও বাতলে দেয় । ফলে মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে পেট মোটা থপথপে স্বামীরা বিবির প্রিমরোজই প্রেফার করেন ।

সদাহাস্যময়ী সুন্দরী বিবির স্বামী নটবর পালিত বেশ কিছুকাল হল মদ্যপানে লিভারে ফেটে পটল তুলেছে । বেদম মদ খেতো । এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল । ট্যারা চোখ তাই বিবি আদর করে ওকে টেরুসোনা বলে ডাকতো ।

যখন বয়স ছিল তখন টাকা ছিলনা, আর যখন টাকা হল তখন বুড়ো হয়ে গেছে তাই চোখ আর কোনদিনই সোজা হলনা । বৌ ও কি সোজা হল ? শোনা যায় টেরুসোনাকে অন্য ঘরে রেখে বিবিমনা উপপতি নিয়ে পাশের ঘরে রাত কাটাতো । ব্যাঙ্কে টাকার পরিমান বাড়ে তাতে।

একবার তো এক পুলিশ ব্যারাকে বিবিকে পাওয়া গিয়েছিল । ভোরবেলা । তবে এইসব কিছুই নিন্দুকেরা বলেন ।

বলবেই তো নাম হলে বদনাম হয়ই । হিংসা, হিংসা ! এক জেনেরেশনে এত টাকা করে ফেললে লোকে দুয়ো তো দেবেই ! নিজেদের হচ্ছে না কিনা !

বিবির ছেলে প্রতীপ পড়াশোনায় বেশ ভালো । আই আই টি ম্যাড্রাসের ছাত্র ।

চরিত্রেও কোন দাগ নেই । বিবি ছেলেকে সব সময় আগলে আগলে রেখেছে ।

তবে মদ্যপান করে । সেটা ছোট বয়স থেকেই করে । মদের নেশা ধরিয়েছে বড়মামা । বাপের মৃত্যু দিনে সারাটা দিন নির্জলা উপবাস করেছিল শুধু মাঝে একটু হুইস্কি খেয়েছিল প্রতীপ । ঢুকুঢুকু ওদের পারিবারিক অলঙ্কার ।

বিবির বাবা ছিল দারোগা । দাদার জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে বসে ।

সেই বৌকে এত ভালোবাসতো যে একঘর লোকের মাঝে বৌকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতো দারোগাবাবু । তার ছেলেমেয়েরা তো রসিক হবেই ! বিবির মাও পানরসিকা ছিলেন । সন্ধ্যায় মদের আসর বসলে বিধবা চারুদেবী নাতিদের বলতেন - ওরে আমারটা একটু কড়া করে দিস!

তো বড়মামা একটা ছোট্ট গেলাস কিনে এনেছিল প্রতীপের জন্য, ও তাতেই মদ খেত । সেই অভ্যাসটা এখন লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে । সেটা নিয়ে বিবি একটু চিন্তিত । ভাবছে মিউজিক ডায়রেক্টর পবন কুমারের মেয়ে উপাসনার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে কিনা । সংসার হলে প্রতীপ হয়ত থিতু হবে, এত মদ গিলবে না ।

পবনকুমার খুব নামী সুরকার । বলিউড কাঁপাচ্ছেন । ওনার-

*হাকু চুকু হাকু হাকু -চিয়াও চিয়াও-*

গানটা নাকি আমেরিকার কোন জ্যাজ মিউজিক থেকে ঝাড়া । ওটার জন্যই তো উনি ফ্লিম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডটা বগলদাবা করলেন এইবছর । ঘ্যামা চেহারা, বিন্দাস হাভভাব ।

হাতের দশ আঙুলে চোদ্দটা আংটি । হঠাৎ দেখলে গিটারিস্ট বলে ভুল হতে পারে । এছাড়া গুচ্ছের মাদুলি । অমুক বাবাজি তমুক স্বামীজির দেওয়া ।

--সাক্সেস ভায়া অত সহজে আসেনা । তোমার মতন একশোজন সুর দিচ্ছেন, তুমি অ্যাওয়ার্ডটা পাবে কিসের জোরে যদি স্পেশাল পাওয়ার না থাকে ?

ওনার মেয়েটি কিন্তু সুশীলা । উপাসনা নামের মতনই নির্মল স্বভাব, কোমল ।

সুন্দরী তো বটেই নাহলে বিবি ওকে পছন্দ করবে কেন ?

বিবির আবার কুৎসিতদের একদম না পসন্দ । দেখতে খারাপ মানে মানুষও খারাপ । কুৎসিতদের সে এড়িয়ে চলে ।

তার মতে কুশ্রীদের দেখলে মায়া মমতা হতে পারে কিন্তু শরীর জাগতে পারেনা কখনই ।

এহেন বিবিদেবীর হোটেল প্রিমরোজে একদিন আগুন লাগলো । আর লাগবি তো লাগ একদম সমস্ত হিসেবের খাতাপত্র পুড়ে ছাই । শর্ট সার্কিট । পেপারে খবর বেরোলো । লোকে হা হুতাশ করছে । রেস্তোরাঁ টানা ১৫ দিন বন্ধ রইলো।নিন্দুকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই রটিয়ে দিল যে বিবি নিজেই আগুন লাগিয়েছে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য । বিবি অবশ্য এদের মোটেই পাত্তা দেয়না । হোটেল তুলে সে এবার বসলো চিট্ফান্ডের ব্যবসা খুলে । প্রিমরোজ ফাইন্যান্সিয়ালসের ঝাঁ চকচকে অফিসটা একেবারে শহরে মধ্যস্থলে । বিরাট বিল্ডিং । মভ কালারের, ইতালীয় স্থাপত্যে তৈরি ।

মিনি স্কার্ট, ছোট টপ পরা পঞ্চান্ন উর্দ্ধ বিবি সদাহাস্যময়ী, লাস্যময়ীও বটে । নিজেই ক্লায়েন্টদের বুঝিয়ে দেন কি ভাবে কোন স্কিমে টাকা রাখলে বেড়ে যাবে চট করে । কত মানুষ আসেন টাকার থলি ভরা বিশ্বাস নিয়ে ।

তারপর যখন সত্যি সত্যি টাকা অল্পদিনে বেড়ে তিনগুণ হয়ে যায় মধ্যবিত্তের মুখে চওড়া হাসি ।

-সাধারণ লোকগুলো খুব সরল হয় লক্ষ করেছিস, বিবি বলে ওঠে দাদা রবীনকে ।

কত সহজে ওরা মানুষকে বিশ্বাস করে । একটু শিক্ষিত হলে তো কথাই নেই !

এই বিশ্বাসকে এক্সপ্লোয়েট করতে হবে তবেই ব্যবসা বাড়বে।

তা ব্যবসা বাড়লো বই কি ! অনেক টাকা গেল বিবির সিন্দুকে । আজকাল সে কখনো কখনো সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে সুইজারল্যান্ড যায় । একটা কটেজ বুক করাই থাকে । ওখানে সে বিন্দাস ভাবে থাকে আল্পসের পাদদেশে সবুজ বনানীর মধ্যে । নরম ঘাসের আদরে ডুবে যায় সুখনিদ্রায় । কিছুটা সুইস ভাষাও শিখে নিয়েছে । ভাষা শেখার ব্যাপারে সে একদম তুখোড় ।

সুইস ভাষার একটি ধারা আসলে জার্মানের একটি ডায়ালেক্ট । অন্য রকম ও আছে ।

বিবি ভারতে কিছুটা জার্মান শিখেছিল ওর এক জার্মান বান্ধবীর কল্যাণে । যত টাকা হবে তত সুইজারল্যান্ড আসা বাড়াতে হবে, বড্ড সুন্দর যে এই দেশটি । টাকাগুলো খরচ করার তো একটা জায়গা চাই ! ভারতের মতন হা ঘরে দেশে খরচের আর কতটা স্কোপই বা আছে?

বিবিকে প্রকৃতি শুধু রূপই নয় একটি পরিস্কার মাথাও দিয়েছে । ফলে সরল মানুষের ততোধিক সরল বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা তার কাছে কোন বিগ ডিল নয় । একদিন প্রিমরোজ চিট্‌ফান্ডের সমস্ত টাকা নিয়ে বিবি হাওয়া হয়ে গেল ।

কোন পাত্তাই নেই । বাড়ি বন্ধ ব্যাঙ্গালোরের, কলকাতার, মুম্বাইয়ের, পুণের । ছেলে হাওয়া । কোন হদিস মিললো না।

এত লোকের টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে পুলিশ তো খুঁজবেই ।

ব্যাঙ্গালোরের হাই সোসাইটিতে এখন একটাই আলোচ্য বিষয় - বিবি পালিত অন্তর্ধান রহস্য ।

ফ্যাশন গুরু জে জে তো বিবির খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল । একসঙ্গে ঢুকুঢুকু, লং ড্রাইভ ।

শরীর শরীর খেলা হত কিনা তা অবশ্য কেউ জানেনা তবে পাবলিকলি্‌ ওরা খুবই বেশি ঘনিষ্ঠতা করতো তাই নিন্দে রাজ্যের মাসিপিসিরা খোরাক পেয়ে যেতেন । করলেই বা কি ? টেরুসোনা তো চলে গেছে তাই বলে বিবির কি একটা চাহিদা নেই ! দেহের নাহলেও মনের তো আছেই ।

লোকে খালি বাজে কথা রটায়, কোন কিছু অ্যানালিসিসে যেতে চায়না । বেচারা বিবি ! মাত্র পঞ্চাশে বিধবা হলে কি সব শখ আহ্লাদ ভুলে যেতে হবে নাকি ? বৃন্দাবন বাসী হতে হবে ? ধর্ম নিয়ে সিনেমা বানানো চলে কিন্তু নিজের জীবনে শুদ্ধতা মানার কি তেমন কোন প্রয়োজন আছে ? দিব্যি তো চলছে সব !

এইতো সেদিন কলকাতায় এক ডাকসাইটে কমিউনিস্টের সঙ্গে মিটিং ছিল । মালটা খালি বুকনি ঝাড়ে ।

*রোটি কাপড়া আউর মাকান*-হ্যাঁ আজকাল বিবি বাংলার সঙ্গে হিন্দী মিলিয়ে কথা বলে ।

এদিকে সেদিন বিবির বাড়ি নেমতন্ন খেতে এসে বিলিতি মাল, টার্কির রোস্ট চেটে পুটে খেল । বিবির কুত্তাও এত খায়না । বেটা তোরাই তো গরীবদের লুটিস - এত খাস কেন ? নেমতন্ন বলে ডবল পেট খেতে হবে ?

বিবির ভারি মজা লাগে । একটা হাড্ডি ছুঁড়ে দেয় আর ওগুলো লুফে নেয় । সেদিন তো ব্রেস্ট ওপেন জামাটা পড়েছিল ।বুকের কাছটা খোলা । প্রায় সবই বেরিয়ে আছে । কমিউনিস্টটা কাৎ । বার বার তাকাচ্ছিল । তাতে অবশ্য বিবির সুবিধেই হল । একটা জায়গায় সই দরকার ছিল, সহজেই হয়ে গেল । মধ্যবয়স্ক সফল লোকগুলো বোধহয় বেশির ভাগই পার্ভার্ট হয় । বিবির অভিজ্ঞতা তাই বলে । একটু শরীর শরীর খেলা দেখালেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

ভাগ্যিস পড়ে তবেই না কত সুবিধে হয় । সবাই সাধুপুরুষ হলে বিবির চলে কি করে ?

কোন কবি লিখেছিলেন না বোধহয় অন্নদাশঙ্কর -

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি, সব কিছুর মূলে কমিউনিস্টি -

বিবি শুনেছিল কবি তড়িৎ ত্যাগরাজের কাছে । বাঙালী কবি । অত্যাধুনিক কবিতা লেখেন । বেশির ভাগের মধ্যেই অঙ্কের ফর্মুলা থাকে । কত ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাস শিখেছিলেন পাবলিক কে জানাতে হবে না ?

এই বিজ্ঞানের যুগে আবার কবি বলে কেউ যদি বোকা ভেবে বসে ! তবে বোকা উনি নন কারণ ওনার ছদ্মনাম ত্যাগরাজের পেছনে যুক্তিটা শুনলেই বোঝা যাবে । কবি মানে কি ? কবি মানে ত্যাগী । কি ত্যাগ ? সমস্ত ইনসিকিউরিটি । তবেই সাচ্চা কবি হওয়া চলে । তাই ওনার ব্যানার্জী পদবী ত্যাগ করে উনি ত্যাগের রাজা হয়েছেন ।

নীচু জাত বা জাতহীন নিয়ে মনে ওনার কোনই ইনসিকিউরিটি নেই ।

সেরা জাত ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম জ্ঞান আছে কি ? সৃষ্টি রহস্য জানেন কি ? ) সেটা ত্যাগ করা ভারতে বসে এত সহজ নাকি ? কত লোক ব্রাহ্মণ দেখেই কবিতার ভক্ত হয়ে যাবে ।

-হে হে, যে সে কতা ? পৈতে পরে কবিতা লেখেন ! আছে তোমার ওরকম ঝকঝকে একখানা পৈতে ?

বিবি অবশ্য ব্রাহ্মণদের দুচক্ষে দেখতে পারেনা । ওর স্পিরিচুয়াল গুরু তো একবার অব্রাহ্মণদের বেদপাঠে অধিকার নেই বলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন । বিবি তখন গুরুকে বলেছিল- গুরু দেব আপনি আজকাল ওদের আটকাতে পারবেন না ! ওরা বই কিনে পড়বে নাহলে নেটে পড়ে নেবে ! গুরু তাইনা শুনে খচে বোম ।

বিবি তো ওনার খাস শিষ্যা । আসলে মাঝেমধ্যে ভালই উপঢৌকন জোটে গুরুর । তা অব্রাহ্মণের টাকা নেওয়া চলে, তাই দিয়ে আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করা চলে অথচ সে বেদ পড়লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে বিবির মাথায় ঢোকে না।

গুরু এখন উত্তরপূর্ব ভারতে । কোন চম্বা লামা শিষ্য আছে, হেভিওয়েট বক্সার ছিল এখন রাজনীতির এক বিগ শট তারই আতিথ্য গ্রহণ করেছেন সুদূর অরুণাচলে ।

এখন বিবি ও তো বেপাত্তা। বেমালুম হারিয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা তাকে। সবাই ভাবছে যে সে নির্ঘাত বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। পুলিশ ভারতে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। একবার ধরতে পারলেই হল।

বিবির সব বাড়ি আজ ৬ মাস হল তালা বন্ধ। ওর ভাইটাইরাও জানেনা সে কোথায়। ছেলেক নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

পুরনো চাকর রুশু, যে একধারে বিবির খাস লোক ছিল সেও বেপাত্তা।

===

নিজের বিজ্ঞাপন নিজেকেই করতে হয়। খবর তৈরি করো। প্রথম পাতায় উঠে না এলে লোকে চিনবে কি করে ? এমন কিছু করো এমন কিছু বলো যাতে লোকে তোমায় দেখলেই চিনে যায়। এই মন্ত্র বিবি দিনরাত জপতো।

তাই তার আশেপাশে সব সময় কিছু তরুণ সাংবাদিককে ঘুরঘুর করতে দেখা যেত। হয়ত কিছু মাসোহারাও জুটতো তাদের। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মন্দ হত না। বিবিরও নাম প্রায় দিনই উঠে আসতো পেপারের রঙীন কাগজে।

- বিবি পালিত হেসেছেন, বিবি পালিত শিল্পপতি সুজয় বালিয়ার নতুন এয়ারলাইন লঞ্চের পার্টিতে উত্তাল নেচেছেন। মুক্তোর বিজ্ঞাপনে বিবি পালিত, লিয়েন্ডার পেজের সঙ্গে বিবি, নারায়ণমূর্তিকে বিবি একটি গাছ উপহার দিলেন তাতে লেখা- *হে নারায়ণ স্টে ইয়াং।*

পরিবেশবিদ বিবি পালিতের সবুজ আড্ডা মাতালেন জ্ঞানপীঠ পাওয়া লেখক ইউ আর অনন্তমূর্তি।

সুস্মিতা সেনের সঙ্গে লীলা প্যালেসে ডিনারে বিবি পালিত --হোটেলে যাবার পথে নগ্ন ভিখারী শিশুকে কোলে নিয়ে ছবি তুললেন বিবি। ভিখারিনী মাকে দিলেন ১০০০ টাকার নোট।

খবর খবর আর খবর। মিডিয়ার সর্বত্র বিবির গল্প। কখনো মাইশোর সিল্কে, কখনো স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ পরে আবার কখনো প্লেন জিন্স পাঞ্জাবীতে ঝলমল করছেন বিবি।

বিল গেটস্ ব্যাঙ্গালোরে এলেন। সবাই ভাবলো এবার নিশ্চয়ই বিবি কোন চান্স পাবে না। কি করে পাবে ? কোথায় বিল আর কোথায় বিবি ! কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজ খুলে সবাই হাঁ !

বিলের সঙ্গে বিলের কবজি ধরে ঝুলে পড়েছে বিবি ! গোলাপী টপ কালো ভেলভেটের স্কার্ট পরা গলায় ৫০ লাখি হীরে ঝক ঝক করছে। জানা গেল বিলের জন্যে নিজে হাতে কাস্টার্ড বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিবি। দেশী কাস্টার্ড। একেবারে সনাতন দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে বানানো। পারেও বটে ! কি করে যে ম্যানেজ করে এও এক বিস্ময়।

ব্যাঙ্গালোরের একটি দৈনিকের বাচ্চা সাংবাদিক হিরণ হুডা জাতে হরিয়ানভি হলেও থাকে মধ্যপ্রদেশে। গোয়ালিওর থেকে ৫০ কিমি উত্তরে ওর বাসা। তবে বেশির ভাগ সময় দিল্লীতেই থাকে। ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে আসে নিজের গ্রাম পিঞ্জরাপুরে।

খুব সুন্দর গ্রাম। পাহাড় ঘেরা, নদী বয়ে চলেছে কুলকুল করে। আর যত দুরে চোখ যায় শুধু সবুজ ক্ষেত।

নরম ঘাসে মোড়া, বিভিন্ন ফলন হয় সেখানে । কোকিল ডাকে মধুমাসে । নির্জন পাহাড়ি ঝোরা পেরিয়ে

বুনো গোলাপের উপবন । সুন্দর চোখ জুড়ানো রং তাদের । দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় । ব্যাঙ্গালোরের দৌড় ঝাঁপ আর প্রায় ২৪/৭ কাজের চাপ নিমেষে উধাও প্রকৃতির সান্নিধ্যে । হিরণ বছরে অন্ততঃ একবার তো আসেই এখানে ।

রিচার্জড হয়ে ফিরে যায় কাজের জগতে । এবারও সপ্তাহ খানেকের অবসর বিনোদনের জন্য বেছে নিয়েছে এই নিরিবিলি মনোমুগ্ধকর স্থান । আজ দিন তিনেক সে বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয়নি । চতুর্থ দিনে

সকালে টাটকা মোষের দুধ আর জোয়ারের চাপাতি মাখন ছড়িয়ে খেয়ে আয়েষ করে একটা বেনারসি পান খেল ।

খাইকে পান বেনারস ওয়ালা, খুল যায়ে বন্ধ আকাল কা তালা---

হিরণের এই এক বদভ্যাস । সঙ্গে পানের সরঞ্জাম নিয়ে ঘোরে । লোকে ঠাট্টা করে । যাইহোক পান খেয়ে সে হাঁটা লাগালো নিরুদ্দেশে । আজ একটু ঘোরা যাক । দুপুরে ফিরবে বলে গেল বাড়িতে । হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছালো গ্রামের অন্যপ্রান্তে । স্বামী শুদ্ধানন্দজীর আশ্রম আছে সেখানে । কৃষ্ণভক্ত স্বামীজি । ওনার একচেলার শহরে যাতায়াত আছে । স্বামী স্বরূপানন্দ জি নাম তার । হিরণ গুটিগুটি পায়ে আশ্রমে ঢুকলো । সুন্দর সাজানো গোছানো । একদিকে গোশালা অন্যদিকে সার দেওয়া ঘর । পাথরের ঘর, অপরিপক্ক ছাদ ।

হিরণ মুগ্ধ চোখে দেখছিল, ভাবছিল এটা নিয়ে লিখবে, এত সুন্দর একটা আশ্রম এমন সময় বাবাজি এলেন । ওকে দেখে একটু অবাক হলেন । সামান্য কথার পর ওকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সেরে যেতে বললেন । ভালই হল ।

- গয়ারাম ! হাঁক পাড়লেন স্বামীজি ।
- আয়া জি ! রোগা শীর্ণ গাল ভাঙা এক বৃদ্ধ । পরণে কমলা একফালি কাপড়, উদোম গা।

এই বাবুকে পুরনো অতিথিদের সাথে খেতে বসিয়ো ।

-জো হুকুম জি ।

এরপর হিরণ কিছুক্ষণ কাটালো এদিক ওদিক করে । মূল মন্দিরে বংশীবদন, শ্রীকৃষ্ণের একটা মূর্তি রয়েছে তার সামনে বিশাল যজ্ঞকুন্ড । অর্দ্ধ দগ্ধ অগ্নিমন্থের চিহ্ন থেকে বোঝা যায় এখানে নিয়মিত যজ্ঞ হয় ।

দেওয়ালে অনেক ছবি । হোমশিখা ঘিরে সব মহাআরা বসে আছেন । নানান বয়সের, নানান ধাঁচের ।

হিরণ একমনে দেখছিল । কখন যে সময় কেটে গেল বোঝেনি । গয়ারামের ডাকে হাজির হল ডাইনিং হলে । মাটিতে চাদর পাতা । শালপাতার থালা । অন্য অতিথিদের বসার ব্যবস্থাও চোখে পড়লো ।

গয়ারাম আপন মনেই বলে উঠলো যেন- তিন জন ছিল একজন স্বর্গে গেছেন । ভগবানকো পেয়ারা হো গ্যায়া ।

- কে ? কে স্বর্গে গেছেন ? হিরণ কৌতুহলী ।

- ছোটাসাব । কম আলোতে গাড়ি ঘুরে খাদে পড়ে মরে গেলেন । খুব ভালা আদমি ছিলেন । আমায় কত টাকা দিয়েছেন ।

- কে ছোটাসাব ?

- কেন মেমসাবের ছেলে !

- মেমসাবটা কে ?

- কেন অঞ্জু মেমসাব ! সারূপনন্দাজির (স্বরূপানন্দ জি) সাথেই তো এলেন । উনি তো দুচোখে দেখতে পান না। অন্ধা আছেন । গয়ারাম খুবই দু:খিত বলে মনে হল, সত্যি ভালোমানুষেরা বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যান ।

ইতিমধ্যে অঞ্জু মেমসাহেব একটা লাঠি হাতে ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন ।

আকাশী নীল শাড়িতে আকর্ষনীয়া । হিরের নাকছাবিটি জ্বলজ্বল করছে নাকে । খোলা চুলে একগুচ্ছ সাদা ফুল গোঁজা ।

হিরণ স্পষ্ট দেখতে পেল পুলিশের জেরা থেকে বাঁচতে এই আশ্রমে নাম ভাড়িয়ে গা ঢাকা দিলেও কৃষ্ণকানহাইয়ার মূর্তির সামনে যে যজ্ঞ হয়, তারই হোমশিখায় বিবি পালিতের চোখ দুটো পুড়ে চিরদিনের মতন নষ্ট হয়ে গেছে । তার কোল শূন্য করে চলে গেছে আদরের ধন প্রতীপ, বিবির মেধাবী মদ্যপ ছেলে । যে ছিল তার বংশের একমাত্র চিরাগ ।

পাশ দিয়ে একটি হরিণ চলে গেল, দ্রুত পদচারনায় ।

--কাছেই জঙ্গল তো, ওরা প্রায়ই আসে- গয়ারাম দাঁত বার করে হাসছে ।

*হিরণ নীরবে ওকে দেখছে । দেখছে গয়ারামের হাড় বের করা মুখ, গর্তে ঢোকা চোখজোড়া যা হরিণ চোখের মতনই সরল, নিষ্পাপ - গয়ারামের অবয়বটা আস্তে আস্তে হরিণে রূপান্তরিত হচ্ছে ।*

*ও দেখছে ঘন অরণ্যের ভেতর এই আশ্রমে থাকতে গেলে মানুষকে কতটা খোলস ছাড়তে হয় । কতটা জৈব হতে হয় ! দগ্ধ হতে হয় ।*

*দূরে একটা পাপিয়া ডেকে ওঠে-চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল ।*

# চেনা অচেনা

মাসটা বৈশাখ । ভারতবর্ষের সীমান্ত বর্তী এক গ্রাম । এটা এয়ারফোর্স স্টেশান বলেই বোধ হয় গ্রামটা কিঞ্চিত বর্ধিষ্ণু । এয়ার ফোর্সের ছোটখাটো অফিসারেরা যাদের খেতাবি নাম নন কমিশন্ড অফিসার তাদের স্ত্রীরা দুপুর বেলটা কাটান গপ্পিয়ে অথবা সেলাই ফোড়াই করে । সারাটা দিন কোথায় কি হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় এই মহিলা মহলের বেসরকারি গেজেটে ।

তারপর চলে সেইসব খবরের ময়না তদন্ত । দিনগত পাপক্ষয়ের মাঝে এইসব আলোচনা ওদের কাছে অক্সিজেনের মতন ।

রেখা ভাদুড়ি এরকমই এক নন কমিশন্ড অফিসারের পত্নী । বাংলাদেশের বরিশালের বাসিন্দা ছিল রেখার পিতৃকূল । তারপরে দেশ বিভাগের পর চলে আসে সর্বসান্ত হয়ে ভারতে । পশ্চিমবাংলায় না থেকে চলে যান সোজা কানপুর । বাবা মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসেস এ যোগদান করেন । কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান স্ট্রোকে । মা একলা মেয়েকে নিয়ে চলে যান ভাইদের কাছে সেটাও কানপুরেই । কিন্তু ভাগ্য সহায় না হওয়ায় মাও কিছুদিনের ভেতরে একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান । রেখা মানুষ হতে থাকেন মামাবাড়িতে । যৌবনে পা দিতেই দজ্জাল মামীর তাড়নায় বিয়ে হয় এয়ার ফোর্সের তরুণ, সুগায়ক এক টেকনিক্যাল কর্মীর সঙ্গে ।

ভদ্রলোক সারাটা দিন কাজের পরে বাকি সময়টা পরোপকার করে আর গান করে কাটাতেন । স্ত্রী কে সঙ্গ দিতেন না । স্ত্রী ইন্ট্রোভার্ট, বিশেষ অভিযোগ ছিল না তাঁর ।

একদিন এক সাধুকে নিয়ে এলেন ভদ্রলোক । আসলে রাস্তায় ওনার মোটর বাইকটা খারাপ হয়ে যায় । সেই সময় ঐ সাধু বোম ভোলেনাথ করতে করতে যাচ্ছিলেন, মোটরবাইকের কাছে আসতেই সেটা স্টার্ট নিয়ে নেয় । ব্যস্, রেখার স্বামীর ধারণা হল উনি মহাত্মা । তাই বাবাজিকে এনে ঘরে তুললেন । স্বামীর কুসংস্কারের চিরসাক্ষী রেখা কোন বাদানুবাদ না করে বাবাজিকে সেবা করলেন । তারপর একমাত্র মেয়ে (দুটি ছেলে) যে কিনা অসম্ভব হতশ্রী বলে বিয়ে হচ্ছিল না তাকে এনে বাপ হাজির করলো । বাবাজি মন্ত্রপূত ফুল টুল দিলেন । এতেই নাকি বিয়ে হবে । আসলে রূপ তো ফিরবে না কিন্তু পাত্রপক্ষের মনটা পালটে যাবে । পুরুষের একেই মনে হবে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ।

আজকাল তো বিয়ের বাজারে পাত্র সুলভ কারণ আগে যেমন বয়সের একটা ব্যাপার ছিল আজকাল তা নেই । বয়সে ৮ বছরের ছোটকেও পতির আসনে মেয়েরা বসাচ্ছেন । দেখুন না তেন্দুলকার, অভিষেক, সইফ আলি আরো কত আছে । কাজেই পাত্র পাবার স্কোপটাও বেশি।

আর কেউ- দিদিদের দিকে কুনজর দিচ্ছে রে ! বলে পুরনো জমানার মতন ব্যঙ্গ করবে না ।

বাবাজি ঘরের সমস্ত সোনাদানা আনতে নির্দেশ দিলেন । তারপর একটা ঘরে যজ্ঞ করবে বলে দরজা আটকে বসলেন । এবং পিছনের দরজার তালা ভেঙে পগার পার ।

বিয়ে হলনা পেঁচির । উপরন্তু গয়নাও চৌপাট । অতএব সবাই মিলে কাঁদতে বসে গেলো ।

ভদ্রলোক অবশ্য শুধরালেন না । আবার এক সন্ধ্যায় এক অনাহুত অতিথিকে এনে হাজির করলেন । এবারে লোকটি এক পথিক । অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । বিনয়বাবু অর্থাৎ রেখার দয়ালু পরোপকারী পতিজী তাকে গৃহে ঠাঁই দিলেন । নিজের আত্মীয় পরিচয়ে ।

লোকটি চুপচাপই থাকতো । ছোট ছেলেপুলেদের সাথে খেলা করতো । মেয়েটি অবশ্য দূরে দূরে থাকতো । কিন্তু লোকটি ওকে দূর থেকেই পর্যবেক্ষণ করতো ।

বেশ রোমাঞ্চ হত মেয়ের বুকে । আসলে হতশ্রী চেহারার জন্য কোন পুরুষ কোনদিন তাকাই নি ওর দিকে কিন্তু হৃদয়ে তো বসন্ত আসেই, দোলা লাগেই ।

আয়না ওর শত্রু । একটা বিশাল জমিদার বাড়ির আয়নার মতন আর্শি ছিল ওদের । ছোট্ট কোয়ার্টারে বড়ই বেমানান । আসলে ওটাও বিনয়ের অবতার বিনয়বাবু কারো উপকার করতে কিনেছিলেন ।

রেখা মাঝে মাঝে ওটার সম্মুখে সাজতো । লম্বা চুল ছিল ওনার । নিজের হাতে তৈরি করা বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে চুলে লাগাতেন ।

লোকটি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতো । একদিন রেখা আর্শির মাধ্যমে দেখে ফেললেন ।

স্বামীকে বললেন । স্বামী বললেন- আরে ওরকম মানুষের চোখ পড়েই যায় । কিছু বদমাইশি তো করেনি ।

রেখার কথাটা মনে ধরেনি । কারণ সে দেখেছে যে খাবার সময় লোকটি নিজের খাটে চড়ে বাবু হয়ে বসে খায় আর মাছের কাঁটাগুলো থু থু করে ঘরের চারদিকে ফেলে । এঁঠো পরিষ্কার করেনা । সেই বিছানাতেই শুয়ে পড়ে । ব্রাহ্মণ ঘরণী রেখার কাছে এ এক চরম অরাজকতা বৈকি !

কিন্তু প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই । বিনয় শুনবেন না । গৃহযুদ্ধ হবে । কাজেই চুপ করে থাকেন ।

সেদিন ২৫শে বৈশাখ । কবিগুরুর জন্মদিন । রেখা আশপাশের সব ছেলেপুলেদের নিয়ে একটা রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করেছে । কেউ একটু হাত ঘোরাতে পারে সে নাচছে । কেউ একটু গুনগুন করতে পারে সে গাইছে ।

গরম কালে - আজি ঝরঝর মুখর বাদল ( বাদর ) দিনে, অথবা

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আর রে ছুটে আয় আয় আয় ।

ওস্তাদের গিটকিরি অথবা তুমুল তালের গান নাহলেও শুনতে ভালই লাগে কারণ এই সঙ্গীতের মধ্যে হৃদয়ের ছোঁয়া আছে । আন্তরিকতা আছে ।

কবিগুরুর ছবিটা সুন্দর জুঁই ফুল দিয়ে সাজিয়ে কিছু মিষ্টি মুখের আয়োজন করেছিল রেখা ।

বাজার তো অনেক দূরে । গ্রামের দিকে । চাষিরা টাটকা ক্ষেতের সবজি নিয়ে বসে ।

কম দামে অন্যান্য নানান আকর্ষক বস্তুও পাওয়া যায় । সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে ওরা সবাই মিলে অনেকটা পথ হেঁটে যেতো সেই সবজি বাজারে । কচি পাঁঠাও মিলতো সপ্তাহে দু দিন । শালপাতায় করে বিক্রি হত ।

আর অনেক মন্ডামিঠাইয়ের দোকান ছিল তবে সবই ঘিয়ে ভাজা ধরণের মিষ্টি ।

সেই এনে খাওয়া হল । কচি কাঁচারা খুব খুশি । খুশি অন্যরাও ।

বিনয় তার ভরাট গলায় গাইলো- এ পরবাসে রবে কে !

রেখা ঈষৎ মিহি গলায় আবৃত্তি করলো বীরপুরুষ ।

*মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে, মা কে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে -- !*

রবীন্দ্রনাথ । বাঙালি জীবনের অঙ্গ । তা সেই বাঙালি দেশেই থাকুন কিংবা বিদেশে ।

বিনয়ের এক পিসির নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । মৈত্রেয়ী নাম তাঁর ।

পুজনীয় বিধুশেখর শাস্ত্রী ওনার গ্রামের বাড়ির পড়শি হতেন । তারই সঙ্গে পিসির বাবা যান রবীন্দ্র ভিটেয় । জমিদার বাড়ির এক শাখার ছেলে তো বিনয় । জীবনের অনেকটা সময় বুকটা ফুলিয়ে নিয়ে পেছনে কিঞ্চিৎ হেলে হাঁটতেন । জমিদারি চালে । বাড়ি থেকে পালিয়ে এয়ার ফোর্স জয়েন করার পর অবশ্য এই হাঁটা শুধরে যায় ।

রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত হল । সবাই চলে যাবার পর মাথায় চাপ ও ব্যাথা অনুভব করে রেখা । কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন । চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে । মাথাটা ঘুরে গেল । বিনয় ভরপেট খেয়ে একটু গড়াচ্ছিল । এমন সময় ছেলেপুলেরা এসে ডাক দিল ।

- বাবা মা কেমন করছে ।
- কেমন করছে ? কোথায় ?
- বাইরে, বারান্দায় ।

বিনয় প্রায় ছুটে আসে । দেখে মাটিতে লুটাচ্ছে রেখা । দৌড়ে গিয়ে কোলে নেবার চেষ্টা করে । ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়েছে সে ।

কোনক্রমে তুলে নিয়ে আসে শোবার ঘরে । ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয় ।

ওর মেয়ে পাশের বাড়ির সিধু কাকাকে গিয়ে খবর দেয় । সিধু ওদের খুবই আপনজন । কলাটা, মুলোটা নিয়ে যায় ঠেকা বেঠেকায় আবার সাহায্যও নেয় বিনয়ের । হাঁড়ির গল্প করে । কিন্তু এতো আপনজন ও বেঁকে বসে । সিধুর মোটা থপথপে বৌ যার এয়ারফোর্স কলোনিতে

*হাতি মেরে সাথি* বলে বদনাম আছে সে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে দেয় -- ও যেতে পারবে

না । অম্ল শূলের ব্যাথা চাগাড় দিয়েছে ।

এদিকে সিধু একটু আগেই দিব্বি এগ রোল সাঁটাচ্ছিল । কচিকাঁচারা দেখেছে ।

বুঝে গেল রেখার মেয়ে দামিনী যে লোকটি আসবে না ।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে- দাঁড়া ব্যাটা, আসবি না চিনি চাইতে ! আসবি না সুবিধে নিতে ! দেখাচ্ছি মজা ।

তখন অন্ধকার ভেদ করে সেই অনাহুত অতিথি লোকটি আসে । নাম বলেছিল ধীরজ ।

ধীরজ সাইকেল নিয়ে চলে যায় কাছের ডাক্তার খানায় । রেখার অচৈতন্য দেহটা কোলে নিয়ে বিনয় হতবাক হয়ে বসে থাকে । ওটা এয়ারফোর্সের ডাক্তার খানা ।

নিয়ম হল অ্যাম্বুলেন্স করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া । কিন্তু ধীরজের তো সেটা জানার কথা নয় । তাই সোজা ডাক্তার পরঞ্জাপের কোয়ার্টারে হানা দিল সে ।

সাইকেলে স্পীড তুলে দেয় ধীরজ । তারপর উঁচু নিচু মিনি জঙ্গলে ঘেরা রাস্তাটা দিয়ে সোজা হাজির হয় এয়ার ফোর্সের ডাক্তারের কাছে । চিকিৎসক পরঞ্জাপে রাজি হন না কলে যেতে ।

ওরা খুব প্রটোকল মেনে চলেন । ধীরজ কয়েকবার ভদ্রভাবে অনুরোধ করে । চিকিৎসক শোনার বান্দা নন । শেষে পাঁজাকোলে করে তুলে ধরতেই মত বদলে নিজের গাড়িতে চড়ে বসেন ডাক্তার । যথাসময়ে বিনয়ের বাড়ির কড়া নড়ে ।

ডাক্তার এসে গেছেন । দেখে টেখে বিধান দিলেন যে ফিটের ব্যামোর পূর্বাভাস ।

ওষুধ পথ্যি লিখে দিয়ে চলে গেলেন । রাত বেড়েছে । কেই বা আবার হাসপাতালে দৌড়াবে তাই

সেদিন কিছুই পাওয়া যাবে না । আর মাত্র তো কয়েক ঘন্টা তারপরই কাক জোছানায় ভরে উঠবে ধরা তল শেষে সুয্যিমামা হাসবে ।

তাই পরদিন ভোরে বিনয় ধীরজকে সঙ্গে নিয়ে ওষুধ কিনতে গেলো । ফেরার পথে মোটরবাইক থেকে ধীরজ অকস্মাৎ গান্ডীব নদের জলে ঝাঁপ দিল । কি ব্যাপার কে জানে ! কিছুই বোঝা গেলনা । বিনয় অবাক হলেও করার কিছুই নেই । কাজেই কিছুক্ষণ ব্রিজের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একবুক কষ্ট নিয়ে ঘরে গেলো । তারপর সবই গতানুগতিক ।

বৌ সুস্থ হল । অচেনা ধীরজের মহান কীর্তি আর চেনাছকের হাতি পতি সিধুর কার্য কলাপ চুপ করে শুনলো । শরীর অনেকটাই সুস্থ এখন । একটু গরম দুধ খেল সাবু দিয়ে । তারপর ওষুধ খেল । বাইরে একটা কোকিল অসময়ে ডেকে যাচ্ছে । সেদিন রাতে ডাকছিল । আজকাল সবই অদ্ভুত জিনিস ঘটে । রাতে কু হু কুহু শুনে বিনয় বললো- ভূত কোকিল ডাকছে গো !

শুনে সকলে হেসে লুটোপুটি ।

শোনা যায় জোয়ানদের ভারী জুতোর শব্দ । দূরে, মেন রাস্তায় । ঝরে পড়া কৃষ্ণচুড়ায় পথ ঢেকে আছে । সেগুলো নির্মম ভাবে পাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সৈনিকের দল । যেন কোন সতর্কতা জারি হয়েছে । ফুলগুলোর জন্য কষ্ট হয় রেখার । ওদের সঙ্গে কথা হয় তো রোজ দ্বিপ্রহরে ।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এলো সিধু । খুব হাঁপাচ্ছে । ভীষণ ।

- বিনয় দা, বিনয় দা ! হাঁক পাড়ে উঠনো এসে ।
- কি ব্যাপার এতো হাঁপাচ্ছো কেন ? বিনয় স্বভাবতই কৌতুহলি ।
- বিনয়দা ঐ লোকটা ! লোকটা !
- লোকটা কি ?
- ও ও পাকিস্তানের চর । এখানে আড্ডা গেড়েছিল সব খবর বার করার জন্য ।

কতটা কি পেয়েছে জানিনা। ওদিকে সেনা বাহিনী টহল দিচ্ছে। জানিনা কি হবে।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নিল সিধু। ওর চোখমুখ কেমন বেরিয়ে আসছে। ভয়ে, উত্তেজনায়।

বিনয় অবাক হয়ে গেছে। ওর কালো সীসার মতন মসৃণ চেহারা বরফের মধ্যে শুয়ে শুয়ে প্রতীক্ষা করছে এক অপ্রত্যাশিত বিপ্লবের। যেখানে মুখোশগুলো উড়ে গিয়ে এক একটা মুখ বসে যাচ্ছে মানুষগুলির দেহে। চেনা অচেনার গণ্ডী ছাড়িয়ে ভুবন ভরে উঠছে অদ্ভুত এক মাধুর্য্যে।

# এইডস্

## প্রথম গল্প:

## ডাইরির একপৃষ্ঠা

পলাশ গাছটার ফাঁক গলে আলোর রশ্মি এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরটায় ।

একদিকে বসে লিলি । হাতে একটা খোলা ডাইরি । ডাইরির এক পাতা ।

একটু আগেই আভরণকে পুড়িয়ে ফিরেছে । আভরণ বক্সি । ওর কলেজের বন্ধু ।

পুড়িয়ে ফিরেছে যেন নিজের দেহটাকেই । চেতনাটাকেই ।

ওদের বিয়ে হবে সেটা তো ঠিক ছিল । কলেজ থেকে বেরিয়েই বিয়ে হবে। আসলে আভরণের বাবার তো বিশাল চেন রেস্তোরাঁ আছে । তাই কলেজ থেকে বেরিয়েই ও রেস্তোরাঁর মালিক হত । একমাত্র পুত্র । আর বাধা কিসের ? লিলি ঠিক করেছিলো হোটেল ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স করেই ওদের রেস্তোরাঁতে যোগ দেবে । কিন্তু সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেলো ।

ওরা তিন বন্ধু । আভরণ, লিলি ও পিয়াস । একসঙ্গে ওঠা বসা । ঘোরা, বেড়ানো । খেলা ।

লিলি নাচিয়ে । নাচের প্রোগ্রামে ওর সঙ্গে এসকর্ট হিসেবে যেতো আভরণ কিংবা পিয়াস ।

পিয়াস একটু মেয়েলি ধাঁচের । সরু গলা, ল্যাকপ্যাকে চেহারা কিঞ্চিৎ ন্যাকা গোছের ।

অনেকটা মিস্টার বিনের মতন দেখতে । তবে গাড়ি চালানোর হাত খুব ভালো ।

একদিন ও আর লিলি রিক্সা করে ফিরছিল, গা য়ে গা লেগে গেছে । পরে বন্ধুরা ঠাট্টা করছিল-

কি রে লিলি, পিয়াসের সাথে জড়াজড়ি করে যাচ্ছিলি কেন ?

লিলি সপ্রতিভ ভাবে বলে ওঠে- পিয়াস আবার পুরুষ হল কবে ?

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক পিয়াস লিলির প্রেমে মত্ত ।

আভরণও লিলি পাগল কিন্তু প্রকাশ নেই । লিলি কিন্তু আভরণকেই কামনা করে ।

ওদের যখন কোথাও যাবার থাকে ওরা তিনজনেই একসঙ্গে যায় কিন্তু পিয়াস বুঝতে পারে যে ওকে ওরা দুজন ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছে না । হতাশ হয়ে যায় বেচারা, কিছু বলাও যায়না ।

শেষে একদিন জানা গেল যে লিলি ও আভরণ বিয়ে করবে কলেজ খতম হলেই । আভরণ মাতৃহীন । তাই একজন নারী ঘরে এলে ভালই হবে । সংসারে একটা শ্রী আসবে ।

পিয়াসের বাবা প্যাথোলজিস্ট । নিজের ল্যাব আছে । ভদ্রলোক বেশ ভালো । লিলিরা ওদের বাড়ি গেলে বেশ হেসে হেসে কথা বলেন ।

মনেই হয়না যে উনি এত বড় একজন ডাক্তার । সেই পিয়াসের ল্যাবেই তো ধরা পড়লো আভরণের এইডস্ হয়েছে । শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল কুমায়ুনে ট্রেক করে ফেরার পরেই । তারপরই তো জানা গেল যে এই মারাত্মক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে ওর দেহে ।

Efaviren ; যার brand name Stocrin সেই ওষুধ নিতে হত আভরণকে । এটা এইডস্ রোগীদের লাইফ সেভিং ড্রাগ ।

সেবার ওরা তিনজন বেড়াতে গেলো পেলিং । কলকাতা থেকে ড্রাইভ করে যাওয়া হল । এয়ার টেলের একটা কার র‍্যালিতে পিয়াস যোগদান করেছিল । ওদেরকেও বললো সঙ্গে যেতে।

আভরণ তো যাওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল । সব সময়ই বলতো- শালা ! আর কটা দিনই বা আছি !

অন্ততঃ বেড়িয়ে নি ।

লিলি রাগ করতো এরকম অলুক্ষুণে কথায় কিন্তু সবাই জানে যে এটাই হার্ডকোর ফ্যাক্ট । সত্য সত্যই, অপ্রিয় হলেও ।

ডেজ আর কাউন্টেড - বলে হেসে ওঠে আভরণ, লিলিকে দেখিস পিয়াস ।

পিয়াস হাসে, গম্ভীর হয় লিলি । অদ্ভুত এক ধূসরতায় ছেয়ে যায় ঘরখানি ।

দূরে হিমালয়, ধ্যান মগ্ন । এই হিমালয়কে অনুভব করতেই তো ছুটে ছুটে আসা ।

ওরা অন্য গাড়িতে এসেছে । পিয়াস এয়ারটেলের লোকের সঙ্গে নিজের মারুতি এস্টিমে ।

র‍্যালির জন্য এস্টিমই সব চেয়ে ভালো । গাড়িতে সারা দুনিয়া ঘুরে গিনেজ বুকে নাম তোলা রূপালী রঞ্জন লিলিদের পাড়ায় থাকেন । আর বাংলা ছবির রূপা গাঙ্গুলি তো র‍্যালি এক্সপার্ট । তাঁর সঙ্গে পরিচয় নেই অবশ্য ওদের । ভদ্রমহিলা আনলাইক বেঙ্গলী লবঙ্গ লতিকা গার্লস বেশ ডাকাবুকো ।

লিলির ভালো লাগে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । নিজে সে খুবই নরম সরম কিন্তু পুরুষোচিত নারীত্ব বেশ উপভোগ করে । আর রূপা ইজ আ ডার্লিং । জেনেটিক্যালি ব্লেসড্ । সি ইজ বিউটিফুল ।

কুস্তিগির নারীদের আবার লিলির না পসন্দ । অথবা ওয়েট লিফটার দের । লিলির মাঝে মাঝে কবিতা লেখার বাতিক আছে ।

ওয়েট লিফটার রমণীর প্রথম রাতের সিনটা মনে মনে কল্পনা করে হেসেই মরে সে ।

স্বামী প্রবেশ করলেন ফুলে ঢাকা ঘরে । ঘোমটা খুললেন তারপর আলতো করে হাতটা ধরে মিহি গলায় বললেন- প্রি-ইইইইইইইইইইইই আহ্ ইয়ে !!

অর্থাৎ এত শক্ত হাত যে ভদ্রলোকের কবজি ঘুরে গেছে । হাত নয় তো এক খানা লৌহ খন্ড।

নিজের মনেই হেসে ওঠে লিলি ।

ওরা উঠেছে আভরণের বাবার একটি কটেজে। পাহাড়ের ওপরে একটি ছিমছাম কটেজ। লগ হাট গোছের। একদিকে পাইন বন। বারন্দাটা পাইনের ছায়ামাখা। একজন কেয়ার টেকার আছে। সিকিমি। তারই কন্যা সিকিম সুন্দরী রান্না করে। সন্ধ্যে বেলায় নীলচে পাহাড়ের মেয়ে ঘরে এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় সেন্টেড দিয়া। কিসব পাহাড়ি তেল দিয়ে জ্বালানো হয়, পোকা মাকড় তাড়ায় আর অপূর্ব গন্ধ হয় সারাটা ঘরে। আর আছে একটি ছেলে কিসম নাম তার। সে ঘর সাফ করে। বাইরের লোক বড় একটা আসেনা। তবুও কিছুদিন ধরেই লাইফ সেভিং ওষুধ জঢ়ষদক্ষভশ চুরি যাচ্ছিল আভরণের ঘর থেকে। কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শেষে লিলি ভাবলো নিশ্চয়ই আভরণ ভুলে যাচ্ছে কোথায় রাখছে ওষুধ গুলি। পেলিং এ এই ওষুধ মিলবে না। এটা বিশেষ একটা দামী মেডিসিন। সব জায়গায় মেলেও না। লিলি ঠিক করলো ও নিজেই ওষুধটা রাখবে ওর কাছে। এদিকে দায়িত্ব নেবার আগেই ফুরিয়ে গেল ওদের ওষুধের ভান্ডার। শেষ ডোজটি হাতছাড়া হয়ে গেল।

একটা সময় আভরণ বিনা ওষুধে দিন কাটাতে লাগলো।

পিয়াসকে বলাতে সে বললো যে তোরা কলকাতা ফিরে যা তাহলে।

কিন্তু কলকাতা ফিরতেও তো সময় লাগবে। অন্তত : চার পাঁচ দিন। ড্রাইভ করেই তো যেতে হবে তাই লিলি ওকে নিয়ে রওনা দিল কলকাতা অভিমুখে। এই ওষুধ এইডস্ রুগীদের কাছে ঢালের মতন। আয়ু বাড়ায়।

পথে লাগলো সাতদিন।আভরণ আর পারছিল না। খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না শেষে। বাড়ি ঢুকতেই দিন কয়েক পরেই ভাইরাল ইনফেকশনে তো মারা গেল।

পিয়াস তখনো হিমালয়ে। খবর পেয়েই চলে এসেছিল সে। তারপর দাহ কার্য হল। হল ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে সব কাজ। শোক করার সময় কৈ ?

কতটা ধর্মে আছে আর কতটা মানুষের বানানো তা জানেন বিধাতা।

যদিও লিলির সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি তবুও সে বিবাহিতা স্ত্রীর মত দাহের পর সমস্ত নিয়ম পালন করেছিল। মনে মনে তো তাকে স্বামী বলেই স্বীকৃতি দিয়েছিল।

কিন্তু আভরণের মতন সৎ, চরিত্রবান ছেলের এই বিশ্রী অসুখ হল কি করে ? এটা সবার কাছেই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন।

হয়ত রক্ত নেবার সময় হয়েছে। গল ব্লাডার অপারেশনের সময় তো রক্ত দিতে হয়েছিল ওকে।

অনেক রক্ত। অপারেশন অবশ্য হয়েছিল পিয়াসের বাবার নার্সিং হোমে।

সংক্রমণ হয়ত রক্ত থেকেই এসেছি। দূর্ভাগ্য ছাড়া কিইবা বলা যায় একে ?

এত ভালো একজন মানব সন্তান এইভাবে ফুরিয়ে গেল যে বেঁচে থাকলে এই অবক্ষয়ের যুগে সমাজের উপকার হত। নিজে না খেয়ে গরীব মানুষকে খাইয়ে দেওয়া, অঢেল অর্থ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জীবন যাপন কোটি কোটি হতদরিদ্র ভারতবাসীর কথা মনে রেখে যে তাদের তো বেসিক নিডস্গুলোও জোটে না। মুখে সোনার চামচ নিয়ে যারা জন্মায় তাদের পক্ষে এগুলো করা অত সহজ নয়। যারা দারিদ্র্য দেখে তারা তবুও কিছুটা করার কথা ভাবে। বড়লোকেরা কোথায় ভাবে ?

কম ধনীই অসহায়দের কথা ভাবে। ওদের দু:খে ব্যাথিত হয়।

আভরণ তো সুস্থ থাকাকালীন সন্ধ্যে বেলায় একটা মেন্টালি চ্যালেঞ্জড্ ছেলেমেয়েদের স্কুলে গিয়ে পড়াতো। সেটা রুবি জেনেরাল হসপিটালের দিকে।

একদিন মজা করেই পিয়াস বলেছিল- দেখ লিলি অভি তোকে না জানিয়েই হয়ত কোন খারাপ মেয়ে মানুষের সঙ্গে সহবাস করে।

লিলি অসম্ভব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল- তুই এত নিচে নামবি ভাবতে পারিনা। মজা করেও এত নোংরা কথা তুই বলতে পারলি ? ছি ছি ! এত নিম্ন রুচির কথা বলা মানে নিজেকে নিচে নামানো তা তুই বুঝিস না ?

পিয়াস হেসে ওকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছিল।

লিলি অবশ্য তারপর অনেকদিন ওর সঙ্গে কথাই বলেনি।

আজ একবুক কষ্ট নিয়ে এসেছিল পিয়াসের কাছেই। আভরণের অভাব ভুলতে একটু কথা বলা একটু সহমর্মিতা এইসব। পিয়াস বাড়ি ছিলনা। দাহ সেরে ও কোথায় গেছে। তবে চলে আসবে। ওর বাড়ির লোক লিলিকে ওপরে ওর ঘরে গিয়ে বসতে বললো।

লিলি ওপরে এসে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সূর্যাস্তের আলোয় ঘরটা মায়াবী লাগছে।

কিন্তু লিলির সেই দিকে মন নেই।

ও আজ নি:স্ব হয়ে গেছে।

এমন সময় চোখ যায় ডাইরির দিকে। পিয়াসের ডাইরি। গাঢ় সবুজ রঙের বাঁধানো একটা ডাইরি।

হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। আনমনা ভাবে। কোন বদ মতলব ছিলনা। পরের ডাইরি খুলে পড়ার মতন মেয়ে সে নয় এমনিই আর এখন ওর যা মনের অবস্থা।

হঠাৎ ওর চোখটা চলে যায় দুটি লাইনে।

লাল মার্কার দিয়ে লেখা।

এখন ওর জন্য আমি ড্রাগস্ ধরেছি। ওকে আমি কোনদিন ক্ষমা করবো না।

এই ও টা কে ? আর পিয়াস ড্রাগস্ ধরেছে কি ? শুধু এইটুকু কৌতুহলে যে ডাইরির পাতা পড়া শুরু তা যে লিলির জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনবে সে কি কেউ জানতো ?

লিলি একটু আগে নি:স্ব ছিল এখন সে সর্বসান্ত হয়ে গেল।

আরো যা লেখা ছিল :

*অভিকে আজ এইডস্ এর জীবানু সমৃদ্ধ, রক্তমাখা আলপিন ফুটিয়ে দিলাম। ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। শুধু একবার -আহ্ ! করলো।*

*এবার দেখো মজা !*

*ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া বার করছি। আমি না থাকলে লিলি ফুলের গন্ধ নিতে কি ভাবে চাঁদু ?*

*পেঁয়াজি বার করে দেবো ।*

*লিলিকে বিছানায় নিয়ে কিৎকিৎ খেলা ! মর শালা ! দেখি কে তোকে বাঁচায় । লিলিকে আমি না পেলে তুইও পাবি না ।*

আবার বেশ কিছুটা গ্যাপ দিয়ে কিছু সাধারণ কথা লেখা তারপর লেখা -

*আমি ডাণ্ডা ( মারিয়ানা ) নিতে শুরু করেছি । এর সঙ্গে Stocrin মিলিয়ে নিলে দারুণ লাগে ।*

*কত সুখ স্বপ্ন দেখি । কত আনন্দে ভেসে বেড়াই, আকাশে, স্বর্গে, আলোর মেলায় - লিলি আর আমি আমি আর উহ! লি-ল-লি, লিলি আর আমি -----------অভিটা শালা হারামী ।*

*---- আজ অভির হোটেলের ঘর থেকে শেষ Stocrin টা ঝেড়ে দিলাম ।*

*চাঁদ, মানিক আমার এবার যাও ! স্বপ্নে যাও সোনামণি । লিলুয়া এখানেই থাক আমার সঙ্গে ।*

*আমার বাহুপাশে ।*

*লিলিকে আমি ভোগ করবই । স্বেচ্ছায় যদি না আসে ওকে গুন্ডা দিয়ে ইলোপ করবো -তারপর দেখি কোন শালা আমায় আটকায় !*

লিলির দু চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে । মুখটা নোনতা হয়ে গেছে ।

বুকের ভেতরে জমে থাকা সমস্ত ব্যাথা, কষ্ট যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে । ও আর সহ্য করতে পারছে না । ধীরে ধীরে ওর অবসন্ন, ব্যাথাতুর দেহটি লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে ।

পশ্চিমের আকাশে ময়ুখমালি ততক্ষণে এক সীমাহীন অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছেন ।

# দ্বিতীয় গল্প:

# বীক্ষণ

## ১

তিলক গুপ্ত সব মিলিয়ে মোট দশবারে ডাক্তারি পাশ করেছে এটা সবার জানা আছে । জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টা তিলক হেসে খেলে প্রেম করে অতিবাহিত করেছিল । ফলস্বরূপ মেডিক্যালে আশা অনুরূপ রেজাল্ট হয়নি । বাবা ছিলেন আর্মির কমিশন্ড অফিসার, কাজের জন্য সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছেন । সেই সুত্রে তিলক নানা জতি নানা ভাষাভাষির সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল । তাই পড়াশোনায় ভালো ফল না করলেও একটা উদার মন ও দৃষ্টি ভঙ্গী তৈরি হয়েছিল ।

ছোটবেলা থেকেই উচ্ছৃঙ্খল তিলক যৌবনের বেশির ভাগটা কাটিয়েছিল নারীদের মাঝে । প্রথম দিকে পাড়ার মেয়ে বন্ধু, তারপর কলেজের মেয়ে বন্ধু এবং একদম শেষদিকে প্রস কোয়ার্টারের মেয়েদের সান্নিধ্যে তিলকের দিন কাটতো । এরই মাঝে পড়াশোনা ঢিমে তালে চলতো কাজেই সময় মতন চিকিৎসক হিসাবে ওথ নেবার সুযোগ হয়নি তার । ফাইন্যালি যখন ডাক্তারি পাশ করলো তখন বাড়িতে মহাধুমধাম সহযোগে উৎসব পালিত হল । যেন স্বর্গ থেকে কেউ পারিজাত ফুল পেড়ে এনেছে, উৎসাহ, উদ্দীপনায় তিলক মোহিত । মনে মনে স্থির করলো এবার কিছু একটা তাকে করতেই হবে । তার ওপর সবাই কত ভরসা করে, ডাক্তার হিসেবে সফল হলে বাবা মায়ের মুখখানি উজ্জ্বল হবে । বেটার লেট দ্যান নেভার !

বাবার কাছ থেকে ফান্ড যোগাড় করে প্রথমেই কলকাতায় একটি চেম্বার খুলে বসলো তিলক । শুধু এম বি বি এস ডিগ্রীর কল্যাণে রোগী খুব একটা হতনা তার ...আজকাল তো সব বড় বড় ডিগ্রী হোল্ডারদের জমানা, প্রতিটি বিভাগেরই স্পেশালিস্ট দেখা যায় । সেইসব কিছুই তিলকের করায়ত্ত্ব নয় বলে বোধহয় রোগীর আনাগোনা কম ছিল । তারপর বাবার পরামর্শে তিলক ঠিক করলো এম ডি তে একবার চান্স নেবে, দেখাই যাক বড়জোর আর একবার ফেল করবে । সেই সব সাথপাছ ভেবে সে একদিন এম ডি তে ভর্তির হবার জন্য দরখাস্ত দিল । যথাসময়ে পরীক্ষা হল কিন্তু আমাদের তিলক পুরো ফেল । কি আর করা, মনের দু:খ চেপে সে আবার ডাক্তারিতে মনোনিবেশ করলো । ইতিমধ্যে তার জীবনে একটি পরিবর্তন এসেছে । পুজোর ছুটি কাটাতে সে গিয়েছিল তার ফরেস্ট অফিসার দাদার কাছে, ত্রিপুরায় । সেখানে এক বনবালার সঙ্গে একটু বেশি ফিজিক্যাল হয়ে পড়ায় বনবালা অন্ত:সত্ত্বা হয়ে যায় । মেয়েটি আদিবাসী গোষ্ঠিভুক্ত হওয়ায় তীর ধনুক হাতে সভ্য মানুষের আখড়া তছনছ করতে তার দলের লোকেরা চড়াও হয় তিলকের দাদার ওপর । তিলক ততদিনে বেপাত্তা । কলকাতায় গা ঢাকা দিয়েছে । পুরনো অভ্যাস সহজে তো ছাড়া যায় না তাই একটু অতিরিক্ত মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বনবালার তরফ থেকে যা দাবী করছে তা তো মানা সম্ভব নয়, ওকে তো বিবাহ করে স্বীকৃতি দেওয়া চলে না । এরকম আজগুবি প্রস্তাবে রাজি হওয়া মানে তো নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা । তাই একপ্রকার পালিয়ে চলে এসেছে কলকাতায় । এদিকে

তিলকের দাদা পুলক গুপ্তর হয়েছে মহাসমস্যা । স্ত্রী কন্যা নিয়ে তার সংসার, চাকরীসুত্রে তো বনেই কাটাতে হবে । কাজেই আদিবাসীদের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট মেটাতে তাকে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়েছে । শেষকালে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সব কিছু মিটমাট হয়েছে । ভারতে থাকার এই এক সুবিধে যদি কড়ি ঢালো তাহলে দিনটা তোমার হতে বাধ্য । তুমি অপরাধী কিনা সেটা অনেকাংশেই নির্ভর করবে তুমি কার ছেলে, কত টাকা আছে তোমার, তোমার বংশ মর্যাদা কি এইসবের ওপর । কাজেই যদি ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রং হয়, দু একটি থার্ড গ্রেডের ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক গুরুকে পকেটে পুরে ফেলতে পারো তাহলেই কেল্লা ফতে । আইন তখন তোমার হুকুমে উঠবে বসবে । তিলকের দাদা পুলকের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটলো । তবে পুলক সাবধানি হয়ে গেল কারণ বারবার যদি অন্যায় কাজ দিয়ে হিসেব পাল্টানো না যায় ও বেচারি ঝুলে যাবে । চাচা আপন প্রাণ বাঁচা !

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে । পুরনো ঝামেলা চুকে গেছে । সাবধানী হয়েছে তিলকও। মানুষ ভুল থেকেই শেখে । সে থিতু হয়েছে । বিয়ে করেছে এক সুন্দরী, কার রেসিং চ্যাম্পিয়ন কোটিপতির মেয়েকে । মেয়েটি উচ্চশিক্ষিতাও বটে । মেরিন সায়েন্স নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেছে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে । তিলকের সঙ্গে আলাপ হয় একটি ঘরোয়া পার্টিতে । প্রথম দর্শনেই সুপুরুষ তিলকের প্রেমে পড়ে তনয়া, তনয়াই নাম তার । বিয়ের পরে কিছুদিন তিলক তার ডাক্তারি চালিয়ে যায় । তনয়াকেও চাকরির প্রয়োজনে যেতে হত বিভিন্ন সমুদ্রের পাড়ে । নানান ডেটা নিয়ে স্টাডি করে নানান তথ্য বার করতো মেরিন লাইফ ও সমুদ্রের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে ।

যখন বারে বারে পরাস্ত হত সমুদ্রকে জানতে গিয়ে তখন মিঠে সুরে অভিমানী গলায় গেয়ে উঠতো দু এক কলি-

*হে সাগর যখনই তোমায় দেখি, তোমার অন্ত নাহি পাই, দু চোখে রং নিয়ে ভাবি, আমিও সাগর হয়ে যাই !*

-এই তুমি সাগর হলে আমার চলবে কি করে হ্যাঁ ? গালে মৃদু টোকা মেরে বলে তিলক ।

তনয়া মিষ্টি হাসে । আসলে বৈজ্ঞানিক মনের আড়ালে তার একটি নরম তুলতুলে অস্তিত্ব আছে । যে তাকে দিয়ে গাওয়ায়, নাচায় । হ্যাঁ দারুণ নাচে তনয়া । কুচিপুরি । আবার চটুল হিন্দী গানের সঙ্গেও থর্টি ফোর, টোয়েন্টি সিক্স, থার্টি ফোর দুলিয়ে নেচে ওঠে -ছাম্মা ছাম্মা ও ছাম্মা !

তনয়াকে তাই তিলক মজা করে বলে : পিউপেলস্ সায়েন্টিস্ট ।

এইভাবে ছন্দে, বর্ণে, গীতিতে, গন্ধে হৃদয়ে দোলা লাগিয়ে কিছুদিন চলার পরে দুজনে পাড়ি দিল ক্যানাডা । আসলে প্রথমে গেল তনয়া, পি এইচ ডি করতে । তার এক বছর পরে চলে গেল তিলক । তিলকের বাবা মা ভারি খুশি । ছেলে ধীরে ধীরে সাফল্যের সিঁড়ি ভাঙছে ।

- আজকাল খুব বোর লাগে জানো, তিলক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ।
- লাইব্রেরীতে বসতে পারো তো, তনয়া আশা জাগায় ।
- হ্যাঁ সে তো বসি কিন্তু কি মনে হয় জানো ? বিদেশে এসে আমার স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে।

- তা কেন ? এখানে তো তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, দেশে কত রেস্ট্রিকশন ভাবো তো!
- ঁ সে তো আছেই কিন্তু স্ত্রীর পয়সায় খাচ্ছি ভাবলেই কেমন যেন লাগে !
- এই স্ত্রীর পয়সা আবার কি হ্যাঁ ? স্ত্রীর পয়সা কি তোমার পয়সা নয় ? তনয়া অভিমানী ।

তিলক ওকে আলতো করে কাছে টেনে একটা চুমু দেয় ।

কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য তিলক ওয়ার্ক পারমিট জুটিয়ে নিল । তবে ডাক্তার হিসেবে নয় ডাক্তারের সহকারী হিসেবে সে কাজ করবে ।

দেশে থাকতে সে কিছুদিন ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের একটি প্রোজেক্টে কাজ করেছিল । সেই কাজটি ছিল এইডস্ রুগীদের নিয়ে । তাদের মধ্যে সচেতনাতা বাড়ানো, সাহায্যে করা ইত্যাদি । বেশ নাম হয়েছিল তিলকের । এখানে এসেও সেই কাজেই ব্রতী হল ।

একটা ছোট টিম তৈরি করলো । পাঁচজনের টিম । টিমের প্রধান যদিও ডাঃ সাইমন রিচার্ডস্ কিন্তু সেটা খাতায় কলমে । আসলে দলটি পরিচলনা করে তিলক ....এবং সুষ্ঠুভাবে । তার কাজের ধরণ একদম ভিন্ন । সে তথাকথিত পুঁথির ধার ধারে না । নিজের তৈরি কিছু নিয়মের মধ্যে কাজ করে । এইডস্ রুগীর সঙ্গে ওঠাবসা করা তার কাজের অঙ্গ । ফলে খুব তাড়াতাড়ি সে সবার মন জয় করে নেয় । শুধু পেশাগত ভাবে রোগীকে পরামর্শ দান না করে তাদেরই একজন হয়ে যাওয়া মুখের কথা নয় । আসলে একটা সময় তো তিলক দেহপোজীবিনীদের সঙ্গে মাখামাখি করেছিল তাই তাদের জীবনের অনেক খুঁটি নাটি তার নখদর্পণে ছিল । পরবর্ত্তীকালে তাই কাজের ক্ষেত্রে ওর সুবিধেই হয়েছে । তিলক তনয়ার কাছে কিছু গোপন করেনি । সে সব জানে । স্বামীর নতুন ভুবন আলোকিত করায় সেও ব্রতী হয়েছে ।

উই আর প্রাউড টু হ্যাভ হিম অ্যামং আস -ডাঃ রিচার্ডস্ বলে ওঠেন ।

খবরের কাগজের লোক অনুসন্ধানী - কবে, কোথায়, কিভাবে তিলক এর সাথে রিচার্ডস্ এর আলাপ সব জেনে নিচ্ছে । তিলক তো ওদের দেশের মাপকাঠিতে ডাক্তার নয় । তবুও ওকে সংবাদিকগণ - আ ডক্টর ফ্রম ইন্ডিয়া - বলে সম্বোধন করতেন ।

# ২

জীবনের বাকি দিনগুলো যখন হাতে গোনা যায় তখন সাধারণ মানুষ ভেঙে পড়ে । নিজের দোষেই যে সব সময় এইডস্ রোগে লোকে সংক্রামিত হয় তা তো নয় । অনেক ক্ষেত্রেই রক্ত থেকে সংক্রমণ আসে । সেইসমস্ত মানুষ যারা ভাগ্যের পরিহাসে এই রোগাক্রান্ত তারা প্রচন্ড একরোখা হয়ে যান কিংবা নুইয়ে পড়েন । তিলক তাদের কপালে রাজতিলক এঁকে দেয় । অর্থাৎ তাদের বাঁচার মানে খুঁজে দেয় । তিলকের সাহচার্যে এক এইডস্ রোগাক্রান্ত মেয়ে একটি ব্যালে ডান্স কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে । লোলিটা নাম তার । বয়স মোটে ২৫ । স্বর্ণকেশী, আয়ত আঁখি এই মেয়েটি ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল । তিলক তাকে কাউন্সেলিং করে একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে । বুঝিয়েছে যে জীবন ক্ষণস্থায়ী । এই তিলকই কাল কোন দূর্ঘটনায় প্রাণ হারাবে না তার কি কোন গ্যারান্টি আছে ? তাই বলে কি

সে সব কাজকর্ম হাসিগান ছেড়ে ঘরে বসে থাকবে ? কথাটা খুব মনে ধরেছিল লোলিটার। তার পরেই সে আবার নবউদ্যমে নাচের অনুশীলন শুরু করে। বাকিটা ইতিহাস।

একগুচ্ছ ফুল নিয়ে সে হাজির হয় তিলকের দরবারে।

- ডক্টর ইউ মেড মাই ডে। একটি চুম্বন এঁকে দেয় তিলকের গালে।

- কনগ্রাচুলেশন, হুইশ ইউ অল সাক্সেস।

কিংবা বাংলাদেশী মহিলা আসমা। আসমা একজন টার্মিন্যাল পেশেন্ট। রোগটি এসেছে তার নাবিক বর সুলেমনের কাছ থেকে। কথায় বলে নাবিকদের বন্দরে বন্দরে বৌ থাকে। সুলেমনের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে। আসমা দিন গুনছে। কিন্তু ভারতীয় ডাক্তার তিলকের সংস্পর্শে এসে কেমন সব বদলে গেল। এখন আসমা আর তার শেষের সেই ভয়ানক দিন নিয়ে চিন্তিত নয়। সে হাসে খেলে গায়, রান্না করে, হ্যাঁ তিলকের জন্য বিরিয়ানি বানায়। জানে কাজ সেরে এসে ডাক্তার ঠিক খেয়ে যাবেন, বাংলায় দুটো কথা হবে। প্রশ্ন করবেন আজ সে মেডিটেশন করেছে কিনা তাই নিয়ে। আসলে ডাক্তার সাহেব একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচে চিকিৎসায় বিশ্বাসী। উনি বলেন আজকাল ডাক্তারি শাস্ত্রে একটি নতুন ধারা আসছে Proteomic medicine, জিন ম্যাপিং করে চিকিৎসা নির্ধারিত হবে। সবার ওষুধের ডোজ, ওষুধের ধরণ হবে পৃথক। জ্বর মানেই আর পেরাসিটামল নয়, জ্বর মানে একজনের জন্য পেরাসিটামল, অন্যের জন্য অন্য কিছু হতে পারে। কি হবে তা ঠিক করবে তার জিনের গতিপ্রকৃতি। আসমা এতদিন জানতো জিন মানে ভূত এখন জেনেছে যে জিন নামে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক পদার্থ মানুষের দেহে আছে। এই জিনই আমাদের বংশের ধারকবাহক। এরই প্রতাপে আসমার বেটা আসলাম, আর সিংহর ছানা আরেকটা সিংহ। সবই ডাক্তার সাহেব বলেছেন।আজ একটু সিমুইয়ের পায়েস করেছে, ডাক্তার সাহেব এলেন বলে।

তিলক প্রতিটি রোগীর ইন্ডিভিজুয়ল কেয়ার নেয়। সে যখন রেড লাইট এরিয়াতে যেত তখন সেটা ছিল নিছক খেলা, দৈহিক সম্ভোগের নেশা। কিন্তু সে দেখেছিল কত বাচ্চা মেয়েদের ওখানে ধরে আনা হয়, ঋতুচক্র শুরু হলে লাইনে নামানো হয়। অনেক সময় বারবনিতাদের মেয়েরা পালাতে চায় ঐ অসুস্থ পরিবেশ থেকে কিন্তু মায়েদের হুকুমে তারাও আস্তে আস্তে একদিন শিকার হয় বিকৃত কামনার। একটি নিষ্পাপ কুঁড়ি হয়ে যায় পদদলিত, অনাদৃতা। খুন হয় একটি সুন্দর গোলাপ। কোন বিচার পায়না। অপরাধ শুধু বারবনিতার ঘরে জন্ম নেওয়া। একদিন সেও এইডস্ রোগের শিকার হয় অথবা অন্য নোংরা যৌন রোগের।

তিলকের আজকের সংবেদনশীল অস্তিত্ব তাকে টেনে নিয়ে যায় সেইসব মেয়েদের হাত ধরার জন্য। তাদের জীবনতরী পারের কান্ডারি হবার জন্য। কলকাতায় থাকাকালীন হুয়ের হয়ে কাজ করার সময় ওখানে সে গিয়েছিল। কিছু পুরনো লোকজন এখনো আছে। পম্পি, সিতারা, লাজো, জাহ্নবীরা। আছে লীলা মাসী, রুমকি মাসী। তিলককে দেখে তারা চিনতে পেরেছিল।

- বাবু তুই এসেছিস আমাদের ভালো করতে, তোর ভালো হবে রে বাবু ! একটা শালি কুত্তিয়া এসেছিল, ফটাস ফটাস করে মাগী অনেক ছবি তুললো, অনেক ছবি । তারপর টিভিতে দেখালো সেই ছবি । কাজ কিছুই হলনা । ৫ লম্বর ঘরের বিন্দী ছিলনা ? ও তো এই রোগের মাত্র কদিনের জ্বরে শেষ । তিলক মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, আশ্বাস দেয় । জীবনকে সে চিনেছে আজ নিজেরই ভুল থেকে, বুঝেছে এই জগৎ পুতুল নাচের মঞ্চ, নানান পুতুলের ভীড় । তারা বেশির ভাগই মুখোশ পরা । তিলক পুতুল থেকে মানুষে উত্তীর্ণ হতে চায় । তাই বেছে নিয়েছে এই অন্য ভুবন । হেঁটে চলেছে রাঙামাটির পথ ছেড়ে রুক্ষ মরু প্রান্তরে । কোন এক মরূদ্যানের আশায় । কেউ কেউ হারিয়ে যায়, চিরতরে, কেউ হারিয়েও ফিরে আসে । তিলক গুপ্তর দিবারাত্রির কাব্য সৃষ্টি হয় মরনাপন্ন এইড্স রোগীদের শয্যার পাশে । রক্তরেখা যেখানে ভেদাভেদ ভুলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় । হৃদয়ের ছোঁয়া নিয়ে আসে অসহায়ের মুখে হাসি, এক টুকরো বাঁচার আলো ভুবন জুড়ে শুধুই মাধুরী খোঁজার । তিলক হারিয়ে যায় দিগন্তে, হাত বাড়িয়েও তাকে স্পর্শ করা যায়না । আজ সে অন্তহীন পথের যাত্রী । যেই পথ গিয়ে মিশেছে অসীমে । যারা ইন্‌ফাইনাইটকে ভয় না পেয়ে , ফাইনাইট হয়েও নক্ষত্রপথে চলা শুরু করেন তারা একদিন কালপুরুষেই মিলিয়ে যান ।

## ৩

দমদম বিমান বন্দরের ঝাঁ চকচকে মাটি ছুঁয়েছে ধাতব যান । ছায়া ফেলেছে শীতের আমেজ মাখা কল্লোলিনী কলকাতা নগরীতে । তিলক ঢাকা পড়ে গেছে, ফুলে ফুলে, ভালোবাসা ও মুগ্ধতায় । রাশি রাশি শব্দ এসে তার ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে, সবাই ওকে একটু ছুঁতে চায় । প্লেন থেকে নেমেই এই সংবর্ধনা পেয়ে ও মোহিত । বাবা আর এখন বেঁচে নেই । মা আছেন, ভাইবোনেরা আছেন, দাদা পুলক একটা ৫০০ গোলাপের তোড়া তুলে দিল তিলকের হাতে ।

কি যে করবে ওরা ভেবেই পাচ্ছেনা । তিলক পেরেছে, তাদের জন্যে একমুঠো স্বপ্ন কিনে আনতে, সুদূর পরবাস থেকে । বহু আলোচিত *রেড রিবন অ্যাওয়ার্ডে* আজ সে সম্মানিত, বিশ্ববন্দিত । এই পুরস্কার দেওয়া হয় United Nations Development Program (UNDP) এর UNAIDS family থেকে । এইডস্ রোগের জন্য যাঁরা ভালো কাজ করেন, সৃষ্টিশীল কাজ করেন তাদের কে । রোগ যাতে আরো না ছড়ায়, সচেতনতা বাড়ানো, রোগীদের সেবা করা, আউট স্ট্যান্ডিং লিডারশিপ এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং একমাত্র ভারতীয় হিসেবে আজ এই পুরস্কার তিলকের পকেটে । সেই তিলক যার দশটা ফেলিওরের কথা আজ আর কেউ মনে রাখেনা, রাখতে চায়না । নিজেকে খুঁজে পেয়েছে সে বিশ্ব সংসারের মাঝে । বিলিয়ে দিয়েছে শ্রম, ভালোবাসা, সেবা অসহায় মানুষের কল্যাণে । তাই তো ওদের মেডিক্যাল কলেজের বৃদ্ধ প্রিন্সিপ্যাল কাঁধটা চাপড়ে বলে ওঠেন - সবারই ভেতরে মণিমুক্তো থাকে, প্রয়োজন শুধু বীক্ষণের !

বীক্ষণ মানে কি ? নাহ্ ! বাংলাটা আজ এতবছর পরে সত্যি ভুলে গেছে তিলক । তাই স্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে করতে ভাবে - এবার ক্যানডা যাবার আগে একটা চলন্তিকা অবশ্যই কিনতে হবে।

# তরঙ্গ

## প্রথম গল্প:

## বৈদ্যুতিক তরঙ্গ

### ১

হিমাচল প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামের মেয়ে বরখা। ভারী সুন্দর সেই গ্রামখানি। প্রকৃতির কোলে ছবির মতন সাজানো এক ছোট্ট জনপদ। সেই গ্রাম ছেড়ে যখন তাকে শহরে পড়তে আসতে হল তখন প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হত। পাহাড়, ঝর্ণা, সবুজের সান্নিধ্যে যারা বেড়ে ওঠে তাদের কাছে শহরের কোলাহল কষ্টদায়ক।

ব্যাচেলর্স ডিগ্রীর ছাত্রী বরখা অবসর যাপন করে ইন্টারনেটে বসে। চ্যাটিং করে।

নানান দেশের নানান বন্ধু ছাড়াও যেই মানুষটির ইলেকট্রনিক সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে সে হল কোফি।

কোফি আফ্রিকায় থাকে। বয়স গোটা ২৫। এরই মধ্যে সারা বিশ্ব ঘুরেছে। সেইসব গল্প বরখাকে মাতিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে ফোনেও কথা হয়। দেখতে তাকে অনেকটা ভিভিয়ান রিচার্ডস্ এর মতন। ম্যানলি কিন্তু ডার্ক। বরখার বেশ লাগে।

বরখার ছোটবেলা থেকেই সাধ ছিল যে সে কোন এক রাজপুত্রকে বিয়ে করবে। যার অনেক সম্পদ থাকবে। ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াতে পারবে, আনন্দ করতে পারবে, জীবন নামক রহস্যময় অধ্যায় কে ভরিয়ে দেবে সুখে। তাদের গ্রামের মুখিয়া পন্ডিতজী কে দেখেছে। কত সুখী তার স্ত্রী কন্যাগণ।

আর বরখাদের মতন সাধারণ লোকেদের কত অসুবিধে পোহাতে হয়। কোথাও যেতে হলে বাসে চড়ে যাও নতুবা ট্রেনে করে। রাজারাজড়া হলে প্লেনে করে যেখানে খুশি ভেসে যেতে পারবে।

মেঘের দেশে। মেঘের ওপারে কি আছে ? দেখতে বড় সাধ হয়। ও কোনদিন প্লেনে চড়েনি।

ইস ! যদি একবার প্লেনে চড়ার সুযোগ হয় কি ভালই যে হবে। আর নীচে নামবে না।

গল্প করতে করতে একদিন কোফিকে বলেই ফেললো মনোবাসনা খানা। কোফি তো হেসে খুন।

এই কথা ? চলে এসো অ্যাফ্রিকা। কত প্লেনে চড়বে আমি চড়াবো।

তাই হয় নাকি ? কোফি বললেই কি আর যাওয়া যায় ?

এদিকে পরীক্ষা এসে গেছে । কাজেই আপাততঃ কোফি পর্ব বন্ধ আছে ।

একমাস পরে যখন পরীক্ষা চুকলো ততদিনে বাবার তার এসেছে । বাড়ি যেতে হবে মা খুব অসুস্থ ।

এক ভোরে বরখা রওনা হল তার বাড়ি । বাড়ি যেতে যেতে ভাবছিল মা কেমন আছেন, মা সুস্থ না হলে তো ফিরতে পারবে না । ইত্যাদি । কোফির নাকি নিজের মা নেই । সৎ মা । ও যখন খুব ছোট তখন ওর মা মারা যান । বাবা আবার বিয়ে করেন । এই সৎ মা নাকি কোফির থেকে মাত্র ১০ বছরের বড় ।

ভদ্রমহিলা আইভরির ব্যবসা করতেন । এখনো নাকি মাঝে মাঝে চেন্নাইতে আসেন । ব্যবসার ব্যাপারে ।

বরখা কোফিকে বলেছে একবার ওনার সঙ্গে ইন্ডিয়া চলে আসতে । কোফি হেসেছে । কারণ জিগেষ করাতে বলেছে যে মা ওকে বিনা কারণে খুব বকেন তাই মায়ের সঙ্গে একা কোথাও সে যায়না ।

বাড়ি পৌঁছে বরখা দেখলো তার মা অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন ।

তবুও সন্তান হিসেবে যত্ন আত্তি করায় কোন ফাঁক রাখেনি সে । পুরো সুস্থ হলে সে গিয়ে দেখা করে এলো মুস্তাফার সঙ্গে । মুস্তাফা ওদের গ্রামের এক বৃদ্ধ । তার জাদুবিদ্যায় ভালো দখল আছে । পয়সা নিয়ে বিভিন্ন ছোটখাটো শহরে জাদুর শো করে । বরখা ওঁরই কাছে কিছু কিছু শিখেছে যা ও মাঝে মাঝে ওর কলেজে বা শহরের অন্য কোন শো হলে প্রদর্শন করে । বেশ নামডাক হয়েছে । দু একটি পুরস্কারও পেয়েছে ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন থেকে ।

মুস্তাফা ওর গুরুজি । জাদুর গুরু । তারই সঙ্গে দেখা করতে গেল গ্রামের শেষ প্রান্তে ।

কোফি কিন্তু জানেনা ওর এই জাদুর অভ্যাসের কথা । বরখা বলেনি । যদি দেখা হয় তখন ছোটখাটো দেখিয়ে চমকে দেবে । বরখার ছেলেবেলার বন্ধুরা অবশ্য বলে যে এই জাদু কাঠির ছোঁয়ায় কি সে পারেনা কোন রাজপুত্র কে নিয়ে আসতে । তারপর গল্পে পড়া স্বপ্নের বিবাহ হবে সেই রাজকুমারের সঙ্গে । বরখা হাসে । কারণ সে জানে জাদুবিদ্যা এক ধরণের চালাকি আর চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয়না । বিয়ে মানে তো জীবনের সঙ্গে জীবনের সেতু বন্ধন । সেখানে কি কোন চালাকি চলে ? বরখা এই অল্প বয়সে এইটুকু অন্ততঃ বুঝতে শিখেছে ।

## ২

বছর ঘুরে যায় প্রকৃতির নিয়মে । আসে নতুন প্রভাত । বরখা গ্র্যাজুয়েট হয় । কলেজের অ্যানুয়াল ফাংশানে যখন সে তুখোড় ম্যাজিক দেখায় তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ওকে ডেকে বলেন যে ভবিষ্যতে সে যদি উচ্চশিক্ষা নেয় তাহলে জাদুবিদ্যায় একটা ডিগ্রী যেন সে অবশ্যই করায়ত্ত্ব করে । বরখা মাথানিচু করে বিনীত ভাবে জানায় যে তার পিতার পক্ষে উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার সম্ভব নয় কাজেই সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা চাকরি খুঁজে নেবে । পরে কখনো সুযোগ হলে জাদুবিদ্যা অবশ্যই শিখবে, প্রফেশন্যালি ।

Houdini, পি সি সরকার সিনিয়র ও জুনিয়র আরো কত নামীধামী জাদুকরের কথা সে পড়েছে ।

মনে মনে ভাবে কোন দিন হয়তবা সেও ওদের মতন জাদু প্রদর্শন করতে দেশ বিদেশে পাড়ি দেবে ।

কত দেশ দেখবে, কত মানুষ দেখবে, জানবে । কিন্তু কোনদিন কি হবে তার স্বপ্নপূরণ ? একটি কচি মনে জেগে ওঠে রঙীন স্বপ্ন । লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি যেন পাখনা মেলে উড়ে যায় দূর দিগন্তে ।

## ৩

স্বপ্নও সত্যি হয় কখনো কখনো । হতেই হবে, নাহলে মানুষ স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেবে যে !

বরখার বিদেশে যাবার সুযোগ এসে গেল । একদিন আচমকাই । ওদের শহরের একটি ইয়ং গ্রুপ বিদেশে যাচ্ছে মিউজিক্যাল শো করতে । কিছু ছেলেপুলে সেখানে নাচগান করে যারা বরখার কলেজের বন্ধু । একটি নৃত্যনাট্যে একজন নারী চরিত্র চাই যিনি অল্পস্বল্প জাদু জানেন । প্রফেশন্যাল জাদুকরের প্রয়োজন নেই । অতএব বরখার নাম প্রপোজ করা হল । এই তরুণীর হাত খুব ভালো । অভিনয়টাও পারে মোটামুটি । কাজেই সুযোগ এলো বিদেশ যাত্রার । সুযোগ এলো অ্যাফ্রিকা যাবার ।

সময় মতন একদিন প্লেনে চড়ে বসলো বরখা ওর গ্রুপের সঙ্গে । ও কিন্তু কোফিকে একবারও জানায়নি যে ও জাদুর জন্য বিদেশে যাচ্ছে । শুধু বলেছে ও একটা দলের সঙ্গে শো করতে যাচ্ছে । কোফিও ভারি খুশী । তার বান্ধবী আসছে সুদূর ভারত থেকে । আর এখন তো সে শুধু বান্ধবী নয়, তার মানসীও বটে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক পূর্ণতা

পেয়েছে । ওরা অকপটে জানিয়েছে দুজন দুজনকে যে তারা কিউপিডের তীরবিদ্ধ ।

শুধু সময়ের অপেক্ষা । নতুন দেশে নতুন ভাবে জানবে কোফিকে, কোফি দেখবে ভারতীয় তনয়ার হৃদয়ের জাদু, যেই জাদু দিয়ে সে জয় করেছে এক পরবাসী, ভিন্ন সংস্কৃতির মনকে।

## ৪

প্রথম যখন আকাশে উড়লো তখন ভারি মজা লাগছিল । কি সুন্দর ফুরুৎ করে প্লেনটা উড়ে গেল তারপর মাটির থেকে কত দূরে আকাশে ভেসে চললো। নিচে শহরটা মনে হচ্ছে একটা স্থপতির তৈরি মডেল । ছোট ছোট গাছ, ল্যাম্পপোস্ট গুলো টুথপিকের মতন । সে দারুণ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছে প্রতিটি ক্ষণ । তবে পরের রাস্তায় একটু ভয় ভয় করেছে । এই প্রথম প্লেনে চড়ছে যদি আর নামতে না পারে ? আর টার্বিউলেন্সের জন্যে যখন পুরো বিমানটা দুলছিল তখন ভয়ে সে পাশে বসা বান্ধবীকে আঁকড়ে ধরেছে । পরে মনে মনে হেসেছে । ভেবেছে কোফিকে বলবে কত কষ্ট করে কত আশঙ্কা বুকে নিয়ে সে এসেছে তার কাছে ।

যথাসময় প্লেন নামলো বিমানবন্দরে ।

নেমেই ছুটতে হয়েছে মালপত্র নেবার জন্য । হঠাৎ শোনা গেল চরম সতর্কতা জারি হয়েছে বিমান বন্দরে । একটা মাছিও যেন গলতে পারবে না । কি ব্যাপার ?

এই দেশের রাজকুমার, ক্রাউন প্রিন্স ডেসমন্ড স্বয়ং এসেছেন তার এক গেস্টকে রিসিভ করার জন্য । লাল কার্পেটে মুড়ে দেওয়া হয়েছে পুরো বিমানঘাঁটি । দেখুক, বিদেশীরাও দেখুক কত সম্মান করে তারা তাদের রাজপরিবারকে ।

ফুলে ফুলে মোড়া সব স্টল । ঝকঝক করছে সারা এয়ারপোর্ট । কি সুন্দর লাগছে । পরীর মতন সুন্দরী মেয়েরা হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রিন্সের জন্য । যেন এক রূপকথার দেশে পৌঁছে গেছে বরখা ।

শ্রাবণ ঘন মেয়ের চারিদিকে থৈ থৈ করছে বসন্তের রং বাহার, পুষ্পরাগ ।

বন্ধুদের সঙ্গে বরখা পায়ে পায়ে এসে পৌঁছলো, গেটে । এমন সময় সিকিউরিটির লোক এসে তাকে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল সবার মধ্যে থেকে । সবাই চমকিত । সবাই মূঢ় ।

কি হল ? জানা গেল বরখাই রাজপুত্রের বিশেষ অতিথি । তাকে রিসিভ করতেই এই এলাহি আয়োজন ।

তার মানে ? কোন জাদুকাঠির ছোঁয়ায় হল এমন অসম্ভব সম্ভব ? জাদুকরী মেয়েটি সত্যি জাদু জানে তাহলে ।

বরখা এখান রয়াল গেস্ট । শুধু গেস্টই নয় সে ক্রাউন প্রিন্সের মনোমোহিনী । গার্লফ্রেন্ড । হবুবৌ ।

সবাই বাকরুদ্ধ । সবাই ভাবছে । কিন্তু কোন মীমাংসা করা যাচ্ছে না । এই অসাধারণ প্রশ্নের । কেউ তো প্রস্তুত ছিলনা এই অভাবনীয় ঘটনার জন্য ।

আর বরখা ? বরখাই কি জানতো যে এমনটি হবে ? সে তো ভেবেছিল তার জাদু প্রদর্শনের কথা জানিয়ে চমকে দেবে কোফিকে । কিন্তু কোন জাদুবলে নিজেই চমকে গেল ? অ্যাফ্রিকার এক দেশের, অশ্বপ্রেমী প্রিন্স ডেসমন্ড যে তারই কোফি কি করে জানবে বরখা? ছবিতে সে তো দেখেছে কোফি ক্লিন শেভ করা নয় চাপ দাঁড়ি সমৃদ্ধ । আর এই কোফির তো বেশ কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, ঘন আঁখিপল্লব, ধরা চূড়ো পরা । বরখার দেখা ছবির সঙ্গে তেমন কোন মিলই নেই ।

রহস্যময় অ্যাফ্রিকার আরো রহস্যময় রাজপুত্রের হাতে হাত রেখে বসে আছে । রাজমহলে ।

সে নিজেও কি কম অবাক হয়েছে ? তার সব স্বপ্ন যে এইভাবে সত্যি হয়ে যাবে কোনদিন কি ভেবেছিল !

গ্রামীণ জাদুকর মুস্তাফার হাত ধরে যে চলার শুরু সে চলার পথেই যে সে খুঁজে পাবে অমূল্য রতন এ যে তার কল্পনারও অতীত । কি বলবে, কিভাবে বলবে কিছুই বুঝে পায়না সরল মেয়েটি । যাকে কোফি কোনদিন বলেনি যে সে একজন রাজকুমার । যার শরীরে বইছে নীল রক্ত । খাঁটি রাজার মতন ।

তাই কোন ফিল্মি ডায়লগ দিয়ে আসর জমাবে সেই চিন্তায় নীরবে নিজের ডেটাবেস ঘেঁটে চলে হিমাচল সুন্দরী জাদুকরি বরখা । এক অপ্রত্যাশিত জাদুকর প্রেমে ।

# দ্বিতীয় গল্প :

# শব্দ তরঙ্গ

রেডি-ও, রেডিও সি-টি--নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এফ এম-ব্যাঙ্গালোরস্ হট মিউজিক স্টেশান ।

গুড ইভিনিং - দিস ইস দা মস্তি রাইড, মাই নেম ইজ সুলচনা সিং, ইওর ড্রাইভ টাইম দোস্ত, আই এম হিয়ার টু প্লে সাম অওসাম মিউজিক ফর ইউ অ্যান্ড গিভ ইউ লট অফ গুডিস---জাস্ট ফোন মাডি ( করো ইন কন্নড় ) ---

আই এম সিওর দা নেকস্ট সং উইল চিয়ার ইউ আপ ইফ ইউ হ্যাড এ ব্যাড ডে ইন অফিস ওর হ্যাভ হ্যাড অ্যাট হোম ওর কলেজ, দিস ইস আ বিপস্ সং, ও বিপ বিপ বিপাসা -- ---গান শুরু,

বিইড়ি জ্বালাই-লে-এ --জিগর সে পিয়া----জিগর মা বড়ি আগ হ্যায় ---

-------------

এক সময় গান শেষ হয়, ভেসে আসে সুলোচনার মিঠেল আওয়াজ যেই আওয়াজ শোনার জন্য সারা ব্যাঙ্গালোরের যুবসমাজ পাগল । কেউ তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায় কেউবা দেখা করতে চায় কেউ ডেট করতে চায় আবার কেউ ওর জন্য চকলেটের কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি দেয় ।

এফ এম -রেডিও, আজকের তরুণ সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সুপার হিট গান, বলিউডি সুপারস্টারের সাক্ষাৎকার, হট গসিপ শোনা যায় । আমীর খান বড় না অমিতাভ বচ্চন সবই সেখানে আলোচনা হয় । এস এম এস করুন, জিতুন নানান লোভনীয় পুরস্কার । ২০০০ টাকার গিফ্‌ট কুপন, বড় বড় শপিং মলে বাজার করার ছাড়, পাঁচতারায় খাবার কুপন, বেড়ানোর কুপন আরো কত কি !

যে কোন সহজ প্রশ্নের উত্তর দিন ও জিতে নিন প্রাইজ । সুলোচনা অনুসন্ধানী-

আই হ্যাভ আ সিম্পল কোয়েশ্চন ফ ইউ-- হোয়েন ডিড উই গেট ইন্ডিপেন্ডেস ?

হিয়ার ইজ অমিত অন এয়ার : অমিত ক্যান ইউ টেল মি দা আন্সার ?

ইয়েস সুলচনা ১৮৬৭-

নো অমিত।

-১৫২৭-

- নো ইট্স রং অমিত।

হ্যালো জে (জয়) -ক্যান ইউ গিভ মি দা রাইট আন্সার ?

- ইয়েস সু, ইট্‌স ১৯৪৭--

ওয়াও ! জে, দ্যাট ইজ রিয়ালি কুল ! জাস্ট কল ৯৫৩৪৫---- মেক অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড ইউ আর দা প্রাউড উইনার অফ আ মারুতি ৮০০ ।

-ইয়াটস্ গ্রেট ম্যান । থ্যাঙ্ক ইউ সু, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ।

জয় খুব খুশী । ব্যালিনো নয় ৮০০ই সই ! একটি ফোনের দূরত্বে একটি স্বপ্নের গাড়ি । স্কুল মাস্টার জয়ের কাছে এ এক পরম পাওয়া বই কি !

এক একটি শো হয়, একে একে জিতে নেয় উপহার, ছোট বড় মানুষ, সকলে । আর বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, বলিউডি কিছু খোঁজ খবর রাখলেই চলে । শাহরুখ খান কবে প্রথম হেসেছেন, আইস্বরইয়া কবে জোরে কেশেছেন, রভীনা উরুতে কি তেল মাখেন, প্রিয়ঙ্কা হজমের জন্য কি শোঁকেন এইসব ।

লোকেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তর দেন । বলিউডোক্লোপিডিয়া মুখস্থ রাখলেই হল ।

সুলোচনা লোকের মুখে হাসি আনে, আনে প্রাণে নব জোয়ার । ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষের এক অন্য

ভুবন সুলোচনা সিং ওরফে সু । রাত গাঢ় হয়, শেষ হয় আলাপন । রেডিও ঘুমিয়ে পড়ে । ঘুমায় চাঁদ, ফুল, চরাচর । জেগে থাকে কটি কচি মুখ, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে পাহাড়ের গায়ে, রেশম সৃষ্টিকারী গুটিপোকারা যেখানে বেড়ে ওঠে মালবেরি বুশ ঘেরা সবুজ প্রান্তরে । ফুলকফি, পালং, টমেটো ক্ষেত পেরিয়ে গুটি কয়েক ঘর নিয়ে অনাথ আশ্রম ::কল্পবৃক্ষ । অনেক বৃক্ষের মাঝে ছোট ছোট ছেলেপুলেদের একটি নিশ্চিন্তের আশ্রয় ।

আজ ছিল হোলি । সারাটা দিন দাপাদাপি করেও বাচ্চারা ক্লান্ত হয়নি । ডিনারে আজ মহাভোজ ।

সচরাচর যা হয়না সেই চিকেন কারি একেবারে মালাবার স্টাইলে সঙ্গে কাজুর মিষ্টি । একটি মুনাফা হয়েছে আশ্রমের তারই সেলিব্রেশন । বাচ্চারা ভারি খুশী । হলঘরে সমবেত সবাই ।

এই আশ্রমের মাস্টার মাইন্ড ম্যানেজার সন্দীপ মুন্সী এসে ঘরে ঢোকে । জেল পালানো কয়েদি ।

রাজনৈতিক বন্দী ছিল, পূর্বাশ্রমে নাম ছিল - জ্যোতির্ময় ।

আজও সে জ্যোতির্ময়, তার জ্যোতিতেই তো এই আশ্রম আলোকিত । আজকাল কেই বা করে অনাথ শিশুদের জন্য কাজ ? সবাই তো নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ! যেমন ওর বন্ধু নিতাইয়ের বৌ বলছিল যে বনের মোষ না তাড়িয়ে একটা বিয়ে করো, সংসার করো ছেলেপুলে করো । জ্যোতি হাসে । বলে -এরাই তো আমার ছেলেপুলে। আর তোমরা সবাই মিলে এত ছেলেপুলে করেছো যে আমার আর চান্স নেই, কোটা পুর্ণ হয়ে গেছে । তৃতীয় বিশ্ব এবার জন বিস্ফোরণে নিউক্লিয়ার বোমার মতন ফেটে যাবে, আমেরিকা ভাবতেই থেকে যাবে কবে এরা নিউক্লিয়ার ওয়েপন বানালো ।

বলে হা হা করে হেসে ওঠে, ডানপন্থী হয়েও অন্তরে বামপন্থী জ্যোতি।

দিনের শুরুতে সূর্যের লালিমা এসে ঢেকে দেয় কল্পবৃক্ষের আঙিনা । পাখিরা কিচিরমিচির করে, অলি ফুলে ফুলে মধু খায় । রাতঘুম সেরে চোখ কচলাতে কচলাতে বাইরে আসে ওরা, কচিকাঁচারা ।

নতুন একটি দিনের প্রস্তুতি নিয়ে । গাছের ছায়ায় বসে ভজন গাওয়া, পড়া, আঁকা দিয়ে শুরু করে শেষ হয় খেলায় । দূরে একটা কেল্লা আছে। পরিত্যক্ত । কৃষ্ণচূড়ার আবীর ছড়ানো পথ ধরে বাচ্চারা সেখানে খেলা করতে যায় । ওখানে কটি ঘর নিয়ে বসে শৌখিন জিনিসের বাজার । কাছের লোকালয় থেকে বেশ কিছু ব্যবসায়ী সেইসব জিনিস কিনে নিয়ে যায় । আশেপাশের মফঃস্বলের ধনবানেরা চড়া দামে শহুরে আধুনিক কেতাদস্তুর সমস্ত জিনিসপত্র কিনতে এখানেই আসে। ৩৫ কিমি দূরে আছে বন্দর শহর । সেখান থেকেও প্রচুর ক্রেতা আসেন তাই ভালই বিক্রী হয় । এই বাজারের মূল উদ্যোক্তা আশ্রমের মানুষজন । সন্দীপ ওরফে জ্যোতির্ময় বাজারে মাল সাপ্লাই করে । মাল আসে ব্যাঙ্গালোর থেকে, ট্রাক বোঝাই হয়ে । সেখানে একটি গোডাউন আছে, মাল চালান হয় ওখান থেকে । মুনাফার সবটাই আশ্রমের কল্যাণে লাগে । সমৃদ্ধ করতে, সুন্দর করতে ।

হ্যালো, দিস ইজ দা মস্তি রাইড, আই এম সু---

ভেসে আসে সুলোচনার কন্ঠস্বর । আজ একটি কম্পিটিশন আছে । বলতে হবে আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেন দের সব থেকে বড় চাহিদা কি ।

লাইনে আছে চরণ --

-হ্যাল্লো চারাণ ! ক্যান ইউ গিভ মি দা কারেক্ট আন্সার ? নিড্স্ অফ ---

-ইয়েস সু, ভেরি সিম্পল, ফুড, শেল্টার অ্যান্ড ক্লোদস্ ।

ওয়াও চরণ, দ্যাটস্ অ্যামেজিং । আই, আই রিয়েলি ফিল ফর দেম ইউ নো আই কান্ট স্লিপ সামটাইম্স্ অ্যাট নাইট হোয়েন আই থিংক অফ দেম, দে শিভার ইউ নো, অল দিস চিলড্ ডেজ, কোল্ড কোল্ড নাইটস্ ইন ব্যাঙ্গালোর ! ( নাকের পাটা ফুলে ওঠা, ফোচ ফোচ, হয়ত কান্না -)

সো চারাণ ইউ আর দা লাকি উইনার অফ রুপিজ ১০০০০ গিফট ভাউচার, ইউ ক্যান শপ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট অ্যাট দা গারুডা ( সীতাহরণের গরুর) মল ।

চরণ খুশী । সময় মতন কুপন নিয়ে আসে রেডিও সিটি অফিস থেকে । আগের বার পেয়েছিল ৫০০০ টাকার কুপন, শপিং করার জন্য । তখন কি কিনেছিল তাও জিগেষ করলো কথাসুন্দরী সুলোচনা । যার একটা চোখ টেরা, লোকে বলে -ও তো লক্ষ্মী টেরা ! চরণ জানে সব দোষ ঢেকে যায় মানুষের গুণে । নাহলে টেরার আবার লক্ষ্মী - সরস্বতী কি ? লুকিং লন্ডন টকিং টোকিও, এ তো ছোটবেলা থেকেই জানে ।

ম্যাঙ্গালোরের দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গালোরে শো হোস্ট করছে । ভাগ্যিস রেডিওতে চেহারা দেখা যায়না । তাহলেই হয়েছিল । চোখ রহস্য খুললম্ খুল্লা হয়ে যেতো । কত যুবকের হৃদয় যে বেলুনের মতন চুপসে যেতো তা কে জানে ?

সুলোচনা ওকে মশলা ধোসা অফার করে । ও খায় না । কেমন বাজে লাগে ধোসা- ইডলি । গুচ্ছের টক আর নারকেলের পিন্ডি । আবার পুদিনা দেয় মাঝেমাঝে সেটা আরো অসহ্য লাগে । কেমন মনে হয় দাঁত মাজার পেস্ট মিলিয়ে দিয়েছে । অথচ এখন এই মুলুকেই থাকতে হবে । উপায় নেই । বাংলায় ফেরার সব রাস্তা বন্ধ । সি পি এম ভার্সেস তৃণমূলে ফেঁসে গেছে তার জীবন । সন্দীপদা না থাকলে বেজায় বিপদে পড়তে হত । এখন সে আশ্রমে কাজ করে । ফুল টাইম জব । কেয়ার টেকার প্লাস অ্যাকাউন্টস্ দেখভাল করা ।

ঝরঝরে ইংরেজিটা পারে ছোটবেলায় মিশনারি ইস্কুলে পড়ার দৌলতে । হিমালয়ের কোলে এক ছোট্ট শহরে ফাদার ডেসমন্ডের কাছে মানুষ সে । তার অবিবাহিতা মা তাকে ওখানে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ।

ফাদার প্রশ্ন করলে বলে যায়- মা হওয়া সব মেয়ের একটি বেসিক অধিকার, নির্মল বাসনা । তার জন্য বিবাহ নামক কোন শীলমোহর লাগা উচিৎ নয় । তবে সে অক্ষম, অসহায় তাই তার শিশুকে ওখানে দিয়ে গেল । ফাদার যেন বড় করেন । কোনদিন যুদ্ধ জয় করে হয়ত সে ফিরে আসবে ।

বলাবাহুল্য সে আর আসেনি । যুদ্ধে হেরে গেছেন কিনা কেউ জানে না । এখন তো অল কোয়াইট অন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট । বাংলা থেকে এই পশ্চিমের মূলুকে এসে মনটা সেরকম ছটফট করেনা শুধু খাওয়া দাওয়াটা যদি আরো একটু ভালো হত !এখন সব ভুলে কল্পবৃক্ষের অনাথ বাচ্চাদের মাঝে নিজেকে খুঁজে পায় চরণ । ভরিয়ে দিতে চায় ছোট ছোট হাতগুলো হিরে মুক্ত জহরে । তাদের মায়ের অভাব পূরণ করার ব্রতে ব্রতী সে।

কল্পবৃক্ষ আশ্রমের পাবলিক রিলেশনস্ সেই চালায় । মাঝে মাঝে, আর মাঝে মাঝে কেন প্রায়ই সে রেডিও সিটি কম্পিটিশনে জিতে নেয় প্রাইজ । কারণ এত সহজ প্রশ্ন করে যে না পারাটাই লজ্জার । লাইক আ প্রেয়ার কার অ্যালবাম ? আরে এটা শুনেই তো সে বড় হয়েছে । মাডোনার গান জানবে না ? লাইক আ ভার্জিন, পাপা ডোন্ট প্রীচ এইসব তো সে কৈশোরে শুনতো । পিট সিগার কি ধরণের গান করেন ? মাধুরী দীক্ষিতের বরের প্রফেশন কি ? বচ্চনের বাবা কেন বিখ্যাত ছিলেন ? জয়া ভাদুড়ী কটা ভাষায় সাবলীল ?

-সোনার অ্যাটোমিক নম্বর কত ? ফটাস করে উত্তরটা দিয়ে দিল । পেয়ে গেলো ২০০০০ টাকার একটি ৪ জি-বির আই পড । কি বোকা না এরা ? সহজ উত্তরগুলোও পারেনা ।

একের পর এক কন্টেস্ট জিতে চলে চরণ । পায় লোভনীয় প্রাইজ । একটা সময় তাকে রেডিও সিটি থেকে স্পেশাল প্রাইজ দেওয়া হয়,প্রতি কন্টেস্টে বিপুল জয়ের জন্য ।

সমৃদ্ধ হয় ব্যাঙ্গালোরের গো ডাউন, কেল্লায় পাথরের অমসৃণ ঘরে মোহরে মোহরে ঠোকা ঠুকি । মাল্লু ব্যবসায়ী উপচে পড়ে, বয়ে যায় লাভের স্রোত ব্যালেন্স শীটের রেখাপথ ধরে ।

হাসি ফোটে কচিকাঁচাদের মুখে, অসহায়, খুঁটিহীন যারা । চলে পার্টি ঘরোয়া ভাবে ।

রেডিও সিটি অমর রহে ! হৃদয়ের অন্ত:সলিলা তরঙ্গ ভেসে চলে ইথারে, মিশে যায় এফ এম স্টেশানে, শুরু হয় আরেক উপাখ্যান, কভি আলবিদা না কহেনার গান দিয়ে :

Dance with me baby, wont you dance with me all night

Won't you party party party, wont you run the floor all night—

পেয়ারে পেয়ারে লমহে, পেয়ারি পেয়ারি বাতে, সপ্নো কি দিন হ্যায়, সপ্নো কি রাতে -----

*where's the party tonight* ??

# The end